বাঙলা সাহিত্যিকী

○ সাহিত্য ○ সংস্কৃতি ○ ইতিহাস ○ ঐতিহ্য
বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ISSN 2227-1635
নব পর্যায়: ১ম সংখ্যা

বাঙলা সাহিত্যিকী

সাহিত্য ● সংস্কৃতি ● ইতিহাস ● ঐতিহ্য
বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা

সম্পাদক
ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী

সহযোগী সম্পাদক
মো: ইকবাল হোসেন

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, বাংলাদেশ

বাঙলা সাহিত্যিকী

নব পর্যায়: ১ম সংখ্যা

প্রকাশকাল:

বৈশাখ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব):

মোহা: ওলিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব):

আহম্মদ শরীফ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বর্ণবিন্যাস:

মো: রবিউল ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মো: আবদুর রহিম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

d প্রকাশনায়:

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

এই পত্রিকার কোন প্রবন্ধ পূর্বানুমতি

ব্যতিরেকে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

প্রচ্ছদ:

পলিন, রাজশাহী

মুঠোফোন: ০১৭১৯-৭১১৩০০

মূল্য: $ ১০০.০০

US $ 7.00

Bangla Shahittiki *(Bengali Research Journal)*

Edited by: Mr. Dr. Ibrahim Ali, Printed by: Shahpir Chisti Printing Press, Kadirgonj, Rajshahi, Published by: Department of Bengali, Rajshahi College, Rajshahi, Bangladesh.

e-mail: bangladepartment1959@gmail.com

বাঙলা সাহিত্যিকী

প্রধান উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ

অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

উপদেষ্টা

প্রফেসর মহাঃ হবিবুর রহমান

উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

প্রফেসর ড. মোসাম্মাৎ রোকেয়া বেগম

বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ

প্রফেসর মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর আল-ফারুক চৌধুরী

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

সদস্য

মোঃ কামরুজ্জামান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোহাঃ ওলিউর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. মোঃ কামাল হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ড. মোসাঃ ইয়াসমীন আক্তার শারমিন

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোঃ ইকবাল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পুলক কুমার সরকার

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

(প্রবন্ধের বক্তব্য ও অভিমতের দায়বদ্ধতা সম্পাদনা পরিষদ বহন করে না)

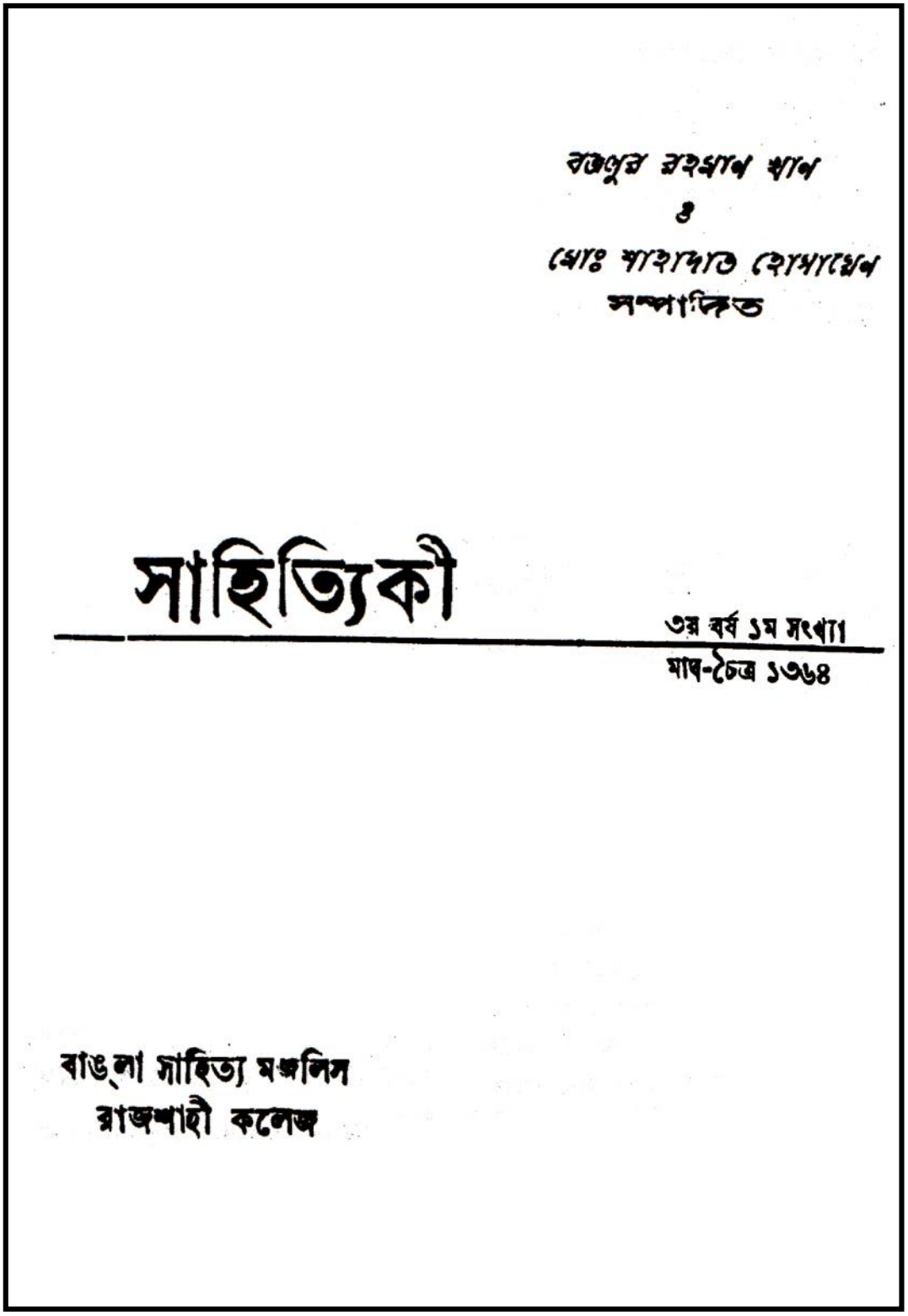

বজলুর রহমান খান

ও

মোঃ শাহাদাত হোসায়েন

সম্পাদিত

সাহিত্যিকী

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪

বাঙলা সাহিত্য মজলিস

রাজশাহী কলেজ

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 'সাহিত্যিকী'র প্রচ্ছদ

সম্পাদকীয়

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক রাজশাহী কলেজের (১৮৭৩) শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকাল পরিক্রমায় বহমান। 'বাঙলা সাহিত্য মজলিস'(১৯৪৮) প্রতিষ্ঠার দ্বারা কলেজটিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার এক নবদিগন্তের সূচনা ঘটে। তাছাড়া 'সাহিত্যিকী' নামে পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সংগঠনটি রাজশাহী কলেজের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। কিন্তু বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটির প্রকাশনাসহ 'বাঙলা সাহিত্য মজলিস'-এর কার্যক্রম অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় চার দশক পর ১৯৯০-এ প্রতিষ্ঠানটি পুনর্জীবন লাভ করলেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আবারও এর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। বর্তমান প্রশাসনের উৎসাহ, প্রয়োজনীয় ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'বাঙলা সাহিত্য মজলিস'-এর নিজস্ব তহবিল থেকে সংগঠনটির মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল 'বাঙলা সাহিত্যিকী'। পত্রিকাটির বর্তমান নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'সাহিত্যিকী' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকার নাম। রাজশাহী কলেজের স্বনামখ্যাত কয়েকজন শিক্ষক সমকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করে 'সাহিত্যিকী' নামটি তাঁদের প্রকাশনায় ব্যবহার করেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবং রাজশাহী কলেজের ঐতিহ্য বিবেচনা করে 'সাহিত্যিকী' শব্দটির পূর্বে 'বাঙলা সাহিত্য মজলিস'-এর 'বাঙলা' শব্দটির প্রাচীন বানান অক্ষুণ্ন রেখে পত্রিকাটির নতুন নামকরণ করা হল 'বাঙলা সাহিত্যিকী'।

মানুষের মানবীয় সাধনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে। মনন ও সৃজনের যুগপৎ সমৃদ্ধিই মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রার নিশানা নির্দেশক। এরই ধারাস্রোতে এসে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যৈষ্ঠে কাজী নজরুল ইসলাম এলেন বাঙালির মহত্ত্ব ও মহিমাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে। বাঙালির প্রাণের কবি, প্রিয় কবি ও বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম দু'জন কবি—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায় পৌঁছে দেন। তাঁর কবিতা-গান আমাদের প্রাণিত ও ঋদ্ধ করে, তাঁর কবিতা ও গানের আধ্যাত্মিকতা আমাদের করে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন। অন্যদিকে 'জাতির জীবনে বসন্ত' এনেছিলেন নজরুল। বিশেষ করে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর বাঙালি-মানসে প্রতিবাদের প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্বলিত হয়। বাঙালি বিদ্রোহের আগুনে হয় স্নাত। স্বপ্ন দেখে সাম্য-মৈত্রী আর স্বাধীনতার। তাই কবিগুরুর সার্ধশত জন্মবর্ষে ও কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার নয়-দশক পূর্তিতে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাতে নবপর্যায়ের 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা প্রকাশের এ প্রয়াস। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের নানা আঙ্গিক নিয়ে রচিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র মূলচেতনা 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য' বিষয়ক গবেষণা পত্রিকার চারিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে বিবিধ বিষয়ের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এতে অন্তর্ভূত।

রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাঙলা সাহিত্যিকী' সৃজনশীল ও মননশীল লেখক-পাঠকদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হবে—এ আমাদের বিশ্বাস। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মানসম্মত গবেষণা প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকাটির অবয়ব সাজাতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পত্রিকাটিকে আরও সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় করে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতায় নিবদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য। 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র অগ্রযাত্রা ও দিক নির্দেশনায় বিদগ্ধ সুধিজনের সহযোগিতা ও পরামর্শ একান্ত কাম্য।

প্রাবন্ধিকগণের জন্য জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:

রাজশাহী কলেজ, বাংলা বিভাগ থেকে ষাণ্মাসিক রূপে প্রকাশিত 'বাঙলা সাহিত্যিকী' একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পত্রিকা। আগ্রহী লেখক-প্রাবন্ধিক 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য' বিষয়ক বাংলা ভাষায় লিখিত যে কোন প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। পূর্বে প্রকাশিত বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান/ পত্রিকায় দাখিলকৃত প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র সম্পাদনা পরিষদ গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করে তা নিম্নরূপ:

১. প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব বজায় রাখা।
২. গবেষণা প্রবন্ধের প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা।
৩. ফুটনোট ব্যবহার ও যথাযথ প্রয়োগ করা।
৪. গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করা।
৫. প্রবন্ধের শুরুতে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ সংযোজন করা।
৬. প্রবন্ধের বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একডেমী প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা। (তবে উদ্ধৃতিমূলের বানান অবিকৃত থাকবে)।
৭. প্রবন্ধের পরিসর যথাসম্ভব আট থেকে বার হাজার হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

পরবর্তী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য লেখা জমাদানের
শেষ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

'বিজয়' সফটওয়্যারে 'SutonnyMJ' ফন্টে কম্পোজ করে প্রবন্ধের দুই সেট প্রিন্ট কপি সিডিসহ জমা দানের জন্য অনুরোধ করা হল। এছাড়াও নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা প্রেরণ করা যাবে bangladepartment1959@gmail.com। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

যোগযোগের ঠিকানা:

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
মুঠোফোন: ০১৫৫৬-৩১৩৪৭৭
ফোন: ০৭২১-৭৭২৬২৩

মো: ইকবাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
মুঠোফোন: ০১৭১৫-৭১৫০৭১
ফোন: ০৭২১-৭৭২৬২৩

সূচিপত্র

গোলাম কবির	≈ রবীন্দ্রনাথের গানে বৈশাখের আবাহন	১
ড. ফরিদা সুলতানা	≈ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: পাঠকের অনুভবে	৫
ড. সালিম সাবরিন	≈ রবীন্দ্রসংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ দার্শনিকতা	১১
মোহা: ওলিউর রহমান	≈ বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ	৩৭
ড. শিখা সরকার	≈ রবীন্দ্র গীতিনাট্য: প্রসঙ্গ নারী ভাবনা	৪৫
আমজাদ হোসেন	≈ রবীন্দ্র কাব্যে সামাজিক অসমতার রূপ	৫০
ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী	≈ কুমুদিনীর ক্রমবিকাশ এবং রবীন্দ্র ভাবনায় নারী	৫৮
মো: ইকবাল হোসেন	≈ রবীন্দ্র কাব্যে গতিতত্ত্ব: প্রসঙ্গ বলাকা	৬৬
আহম্মদ শরীফ	≈ রবীন্দ্র ছোটগল্পে কিশোর চরিত্র	৭৩
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন	≈ রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান: প্রেমের মানবিক উদ্ভাস	৭৮
মো: রবিউল ইসলাম	≈ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ: প্রকৃতি ও প্রবহমান জীবন	৮৫
ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ	≈ নজরুল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন মানবপ্রীতি	৯৮
আল-ফারুক চৌধুরী	≈ নজরুলের প্রবন্ধ: কালের কণ্ঠস্বর	১০৩
আমিনুল ইসলাম	≈ নজরুলের গানে নারী	১১৫
মোঃ কামরুজ্জামান	≈ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা: নব্বই পেরিয়ে	১২৪
ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী	≈ নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা: বিষয় ও শিল্পরূপ	১৩১
ফজলুল হক সৈকত	≈ নজরুলের 'সাম্যবাদী': মানবতা-প্রবণতার চিত্রভাষ্য	১৫২
মো. আবদুল ওহাব	≈ কাজী নজরুলের মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা	১৬২
চন্দন আনোয়ার	≈ কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বিষয়-বিন্যাস: প্রেম, নারী ও যুদ্ধ	১৭০
ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ	≈ রোমান্টিক চৈতন্য ও আধুনিকতা: আহসান হাবীব	২০১
ড. ইয়াসমীন আকতার সারমিন	≈ উনবিংশ শতকে রাজশাহী জেলার বাংলা সাহিত্য	২৪২
ড. মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	≈ প্রাচীন বাংলার সীমানা: উদ্ভব ও বিকাশ	২৪৮
আব্দুস সামাদ আজাদ	≈ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ও তাঁর ট্র্যাজেডি	২৫৯
মুহম্মদ আলমগীর	≈ খাসিয়া লোক সংস্কৃতি: শিশুতোষছড়া	২৬৫
এম আবদুল আলীম	≈ জীবনানন্দ দাশ: বিচ্ছিন্নতার নীলকণ্ঠ কবি	২৭৪
ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম	≈ শওকত ওসমানের উপন্যাস: আঙ্গিক বিচার	২৯৫
মোঃ তানভিরুল হক	≈ প্লেটোর সিম্পোজিয়ামে প্রেমতত্ত্ব	৩১১
ড. আবু নোমান	≈ বঙ্গ-বাঙ্গালা (বাংলা): মধ্যযুগের সাহিত্যে বাঙালি সমাজবিকাশের ধারা	৩২২

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্রনাথের গানে বৈশাখের আবাহন

গোলাম কবির*

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি সম্ভারে প্রকৃতি এত গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, তিনি সমাজ ও জীবনকে বাদ দিয়ে যদি কেবল প্রকৃতির বিষয় নিয়ে তাঁর কলমকে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাবে তাই হয়তো বাংলা সাহিত্যে অনন্য হয়ে থাকতো। কবিতা এবং গানে প্রকৃতিকে ছুঁয়ে যাওয়া , জীবন ভাবনারই অনুষঙ্গ। তাই সূচনা লগ্ন থেকেই বাংলা কবিতার ধারায় প্রকৃতি একাত্ম হয়ে আছে নানা রূপে। রবীন্দ্রনাথ সে ধারাকে আত্মস্থ করে ক্ষান্ত হন নি। প্রকৃতির রূপ-রসকে প্রাণময় করে তুলেছেন তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্পর্শে। কবিতা-গান ছাড়াও গল্প এবং পত্রাবলীতে প্রকৃতি যেভাবে কথা বলে উঠেছে তার তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো রবীন্দ্রনাথকে বর্ষা এবং নদীর কবি বলেই অভিহিত করেছেন তাঁর প্রকৃতি প্রীতির জন্য। মহর্ষি ভবনের অলিন্দ থেকে প্রত্যক্ষ করা প্রকৃতির জন্য বালক কবির হৃদয় আকুল হয়ে থাকতো। এই আকুলতার ছবি আঁকা আছে তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে :

বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-রস-গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ–মিলনের উপায় ছিল না, সে জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।[১]

এই যে নিসর্গের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, তাকে প্রথম তিনি দুচোখ মেলে দেখলেন শিলাইদহে এসে। পদ্মা তাঁর মরমের আবরণের পর্দা উন্মোচিত করে দিল। তিনি বিপুল আনন্দে গেয়ে উঠলেন :

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো -
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে ।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়ালো-
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতো।[২]

এই নিবিড় শোভার প্রকৃতিকে দেখার অনুভব আমরা ছোটগল্পগুলোতেও প্রত্যক্ষ করি। গল্পে অবশ্য জীবনের ভারসম্য সৃষ্টির প্রয়াসে প্রকৃতি তার নিজের স্থান করে নিয়েছে। তবে পত্রাবলী, বিশেষ করে শিলাইদহ শাহজাদপুর পতিসর থেকে লেখা অনেক পত্রে যেন প্রকৃতি জীবনের স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রথমে একটি গল্পের কিছু অংশ আমরা পড়ে দেখি :

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধ সুন্দর; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার ওপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠ বিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানাসুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছেন না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগতখন্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের , তাহার চারিদিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু সমস্তই এখন একেবারে শূণ্য হইয়া গেল কেন।' [৩]

এবার একখানা চিঠি পড়ে দেখা যাক। যে চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ। এখানে দেখা যাবে প্রকৃতি কেমন ভাবে রবীন্দ্র কবি মনের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

..... এ দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুর গুর করে মেঘ ডাকতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটো-বড়ো সমস্ত গাছ-গুলো হুস্ হাস্ নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন চারিদিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের

* প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল-তার হাতে যে কাজই দেওয়া যায় সে সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।.....মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো-কিছুই বলা যায় না।[৪]

আমরা জানি, বৈশাখের শেষ প্রান্তের মধ্যলগ্নে রবীন্দ্রনাথ 'রূপনারাণের কূলে জেগে' উঠেছিলেন। এ কারণে এ মাসটিকে আমরা বেছে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আমাদের সামনে গীত বিতানের বৈশাখ কেন্দ্রিক যে গানগুলো আছে, তার বাইরে যাব না। আর এসব গানের প্রবেশক হিসেবে রবীন্দ্র কবি মানসকে জানবার উদ্দেশে জীবন স্মৃতি, ছোট গল্প এবং পত্রাবলীর কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি।

বৈশাখকে সামনে রেখে শেষ জন্মদিনের আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ যে গানটি রচনা করেছিলেন, সে গান থেকেই আমরা শুরু করবো কবির বৈশাখের আবাহন। এ যেন সমাপ্তি থেকে সূচনা। বৈশাখকে কবি 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' বলে আহবান করে 'জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'কে তিনি আবার ফিরে দেখতে গিয়ে সেই ক্ষণকে 'কুহেলিকা উদ্ঘাটনকারী' 'সূর্যের মতন' দেখাতে চেয়েছেন। কেবল তাই নয়, এখানে তিনি জীবনের জয় ঘোষণা করেছেন এবং নিজের সৃষ্টি ধারার মাঝে 'অসীমের চিরবিস্ময়' ব্যক্ত করার প্রত্যয়ও জানিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে ডাক দিয়েছেন 'চির নূতনেরে'।

ভয়ঙ্কর সৃষ্টিছাড়া এই বৈশাখ বাঙালির চিত্তদ্বারে কী অপরিমাণ শক্তির প্রতীক হয়ে ধরা দেয় সেই অনুভবটুকু আস্বাদনের জন্য আমরা আলোচ্য বিষয়টি বেছে নিয়েছি । গীতবিতানে প্রকৃতি বিষয়ক ২৮৩ টি গান স্থান পেয়েছে। এছাড়া প্রেম-পূজা পর্বের গানগুলোতেও প্রকৃতি রয়ে গেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত। এত ব্যাপক প্রকৃতির ভূবনে পদচারণা এই নিবন্ধে সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের শিরোনামে কথিত বিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখবো, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। বিশ্বসভার কবিতা ধারার নানা ভাষার কবিতার সাথে আমার পরিচয় উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত এবং দীন। সেই সীমিত পাঠ থেকে যতটুকু আহরণের সুযোগ হয়েছে তাতে আমাদের মনে হয়েছে প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার আবাহন এবং তার নির্যাস থেকে মানব সত্তায় উজ্জীবন বোধকরি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। যে-সব গানে আমরা অবগাহন করবো, তাতে আমাদের ক্ষুদ্র বিচেনায় এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে যে কৌতূহলী পাঠকও সে স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

গীত বিতানের প্রকৃতি পর্বের ১০ নম্বর গানে বৈশাখের 'দারুণ দহন বেলা'য় কবি স্রষ্ট্রাকে আবাহন করেছেন 'কঠোর মিলন মেলা'য় একান্ত করে পাবার জন্য। কারণ 'দারুণ অগ্নি বাণে' যখন 'হৃদয় তৃষ্ণায়' ওষ্ঠাগত, তখনই 'ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে'।(১১) রুদ্র প্রকৃতির মাঝে কবির এ কোন আকুতি! না কবির ভয় নেই। কারণ তিনি যে 'ধরার বুকে চোখ মেলেছেন' এই প্রকৃতির রুক্ষ কঠিন রূপের মাঝেই। তাই তিনি অকম্পিত কণ্ঠে ডাক দিলেন বৈশাখ কে:

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।।"- বলে।

বৈশাখের এই প্রথম দিনই দূর করবে বিগত বছরের আবর্জনা, সেই সাথে মুছে ফেলবে ফেলে আসা দুঃসহ 'পুরাতন স্মৃতি'। মুছে যাবে গ্লানি, মুছে যাবে জরা। আর তারই 'অগ্নি স্নানে' শুচি হয়ে উঠবে ধরিত্রী। মায়ার কুজ্ঝটিজাল' যাবে সরে। তবেই তো জীবনের জয় হবে ব্যক্ত।(১৪) আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর শেষ জন্মদিনের জন্য লেখা গানেও এই আশাবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বৈশাখকে কবি 'পথের সাথি'(১৩) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই সাথি 'উদ্দাম উল্লাসে' 'বেড়া-ভাঙার মাতন' রূপে পথ চলতে সাহায্য করবে। হৃদয়ানুভূতি রূপান্তরিত হবে 'বৈশাখী ঝড়ে'-এর মতন। রুদ্র বৈশাখের 'তাপে ভরা' বাতাসে সুর থাকার কথা নয়। 'শুষ্ক কঠিন ধরা'য় পিপাসায় বুক ফাটতে পারে। তাতে ভয় কিসের! এরই ভেতর দিয়ে হতাশা যাবে কেটে। অবসাদ হবে দূরীভূত। সেই শ্রান্তিহীন চিত্তকে কবি ১৭ নম্বর গানে আমাদের আশা জাগানিয়া বাণী শোনাতে চেয়েছেন। আমরা পুরো গানটি শুনে দেখতে পারি :

ঔই বুঝি কাল বৈশাখী
সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি।।

ভয় কিরে তোর ভয় কারে, দ্বার খুলে দিস চারধারে
শোন্ দেখি ঘোর হুঙ্কারে নাম তোরই ওই যায় ডাকি।।
তোর সুরে আর তোর গানে
দিস সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক নেড়ে, যা যাবে তা যাক ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙবে রে –যা রবে তাই যাক বাকি।।[৫]

এ গান শুনে আমাদের বোধে যে ভাবনার সঞ্চার করে, তা থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতি বিশেষ করে বৈশাখ তার প্রচণ্ড ভাঙা-গড়ার প্রলয় নৃত্যের ভেতর দিয়েই নতুন প্রাণের আলোয় উদভাসিত হতে প্রেরণা জোগায়। যখন :

প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘ পথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
খোল খোল খোল দ্বার।[৬]

বলে কবি বেরিয়ে এসেছেন; কিন্তু অধরা ধরা দেয়নি। তাঁর মনে হয়েছে: 'একেলা কেমন করে বহিব গানের ভার।'

সে ধারণা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বৈশাখের মৃদুমন্দ ভোরের হাওয়ায় 'মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ'(১৯) অনুরণিত হয়। তিনি গেয়ে উঠেন:

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।[৭]

সেই অতলের বাণীর মাঝে যেন 'রুদ্রতপের সিদ্ধি' লুকিয়ে ছিল। সেখান থেকেই, 'আশার বাণী উঠলো বেজে।' বৈশাখকে আবাহনের ভেতর দিয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের সাধনায় আশাহত জীবনের আশার বাণী রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন কবি শুনিয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

তথ্যসূচিঃ

১. রবীন্দ্র-সমগ্র, ৯ম খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১৫
২. মিলন, খেয়া, সঞ্চয়িতা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন ঢাকা, মে-১৯৯৭
৩. মাল্যদান, রবীন্দ্র-সমগ্র, ১১'শ খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪২৭
৪. ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুণর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪১১, পৃ. ৩০৫
৫. গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৭, ১৭ সংখ্যক গান, পৃ. ৪৩৩
৬. গীতবিতান, প্রাগুক্ত, ১৮ সংখ্যক গান, পৃ. ৪৩৪
৭. গীতবিতান, প্রাগুক্ত, ২০ সংখ্যক গান, পৃ. ৪৩৪

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ পাঠকের অনুভবে

ড. ফরিদা সুলতানা*

'প্রকৃতির মূল লক্ষ্য মানুষ সৃষ্টি' অ্যারিস্টটলের প্রকৃতি বিষয়ক এ দর্শন বিভ্রান্তি আনে মনে। কারণ প্রকৃতির পক্ষে নিজ উদ্দেশ্য সর্ম্পকে সচেতনতা সম্ভব নয়। ঈশ্বর কোন অস্তিত্বশীল চেতন ব্যক্তি নন, যিনি এ জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। ঈশ্বর অবিনশ্বর।

এ সব কিছু যাই-ই প্রমাণ করুক এ কথা সত্য বলে মানতে হয়, মানুষের জন্যই সবকিছু। মানুষই একমাত্র সত্তা যে তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন। মানুষের চিন্তার গতি জড়াত্মক বস্তুকে সমগ্রতা দেয়। প্রাণহীন একটি জড়বস্তুকে গতিশীল করে কাব্য কবিতায় অসাধারণ গতিশীলতা এনেছিলেন কবি কালিদাস। মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন তিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এনেছিলেন ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যের গতি। গতিই প্রাণ। গতিই জীবন। শীত যায়- সময়ের গতিরথে, আসে বসন্ত। ঋতুর পালাবদলের ধ্রুপদী ছন্দে আনন্দে কবিরা নামেন প্রকৃতি প্রশস্তিতে।

উতল ধারা বাদল ঝরে/ সকাল বেলা একা ঘরে
সজল হাওয়া বহে বেগে/ পাগল নদী ওঠে জেগে
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে/ তমালবনে আঁধার করে॥[১]

কিংবা

আজি দখিন-দুয়ার খোলা/ এসো হে, এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো
দিব হৃদয় দোলায় দোলা,/ এসো হে, এসো হে,এসো হে আমার বসন্ত এসো।[২]

রুদ্র প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী মনে করিয়ে দেয় 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা' তপ্ত মন, তপ্ত মানুষ, তপ্ত পথ, তপ্ত মত। ঋষিকবির কলমে তবু কি অমায়িকতা। এত বিনম্রভাবে প্রকৃতির আরতি করতে কোন কবিকে দেখা যায় নি। ছিন্নপত্রে পাতায় পাতায় প্রতিটি বাক্যে প্রকৃতির বন্দনা। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত কোন ঋতু নিস্প্রভ নয় একটি আরেকটি থেকে। প্রকৃতি, প্রেম, পূজা, স্বদেশ গানের কোন অংশে নেই! কোন অংশে নেই বাংলার মাটি তৃণলতা গাছ পাখি? নৈসর্গিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন নি তিনি পাঠককে। আধ্যাত্মিকতার সেই অনুভবে রবীন্দ্রনাথকে ধরতে গেলে তাঁর লেখার নৈর্ব্যক্তিক গভীর মনস্তত্ত্বে অনুসন্ধান করতে হয়। ছোটবেলায় উপনিষদ পড়া রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা রাখেন নি। নবীন গবেষকরা কোন আধ্যাত্মিক ঈশ্বর চিন্তায় এই বড় কবিকে বাঁধেননি। বাঁধার সাহস পান নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ মানুষের জন্য জন্মেছিলেন, কর্ম করে ছিলেন মানুষের জন্য—

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে/ দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;[৩]{এবার ফিরাও মোরে}

বাঙালির দেশাত্মবোধ জায়গা করে নিয়েছে তাঁরই কবিতা জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'-তে। ভারতের জাতীয় সংগীত ১৯৫০ সালের ২০ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই নেয়া হয়েছিল।

জনগণ মন- অধিনায়ক, জয় হে, ভারত, ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব-সিন্ধু- গুজরাট-মরাঠা-দ্রাবিড়- উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,/ গাহে তব জয় গাথা
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত- ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে,জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥[৪]

শব্দ নির্বাচনের মহিময় গৌরবে চিন্ময়ী মহামায়ায় স্মরণীয় হয়ে আছে ভারতের জাতীয় সংগীতের আরেকটি অংশ- বঙ্কিমচন্দ্রের'বন্দেমাতরম্' শব্দগুচ্ছ:

* লেখক প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী

বন্দে মাতরম্/ সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।/ শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্,/ সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সময় নষ্ট করেন নি কবি। জীবনের শেষ আঁচড়ে অস্তিত্বের যে দর্শন খুঁজেছেন তাকে অস্তিবাদী মনে হলেও কার্যত তাঁর লেখা মর্ত্যের জন্য। অস্তি-নাস্তির বিতর্ক নয়, ঈশ্বর প্রেমের আরাধনা নয়-তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক লেখার অন্তর্গুপ্ত যে সংশ্লেষণ যে নির্যাস, সেখানে আমি তুমি সে এর বৃত্তবন্দী বস্তুর জগৎ এবং আমি তুমি সে এর তিন রূপ লক্ষ্যযোগ্য। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।' অহংবোধে দীপ্ত মানুষ অহংকারী হলে ভেতরের বিনম্র আমি সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে তোমার আমার ব্যবধান ঘুচেছে কি-না। রবীন্দ্রনাথের লেখা বিনম্র আমি তৈরি করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি এটা নির্মাণ করে বলেই এ বাক্য তৈরি হয়েছে 'লিটারেট পারসন অলওয়েজ মডেস্ট লাইক এ ট্রি ফুল অফ ফ্রুটস।' 'নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির' কর্মে মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ণীত হয়েছে। এটা সমঝ্দার পাঠক মাত্রই বোঝেন । নিজের বিনম্র আমি'র এক অংশ অহংকারী আমি। মানুষের কর্ম চিরস্থায়ী হয়। মানুষ অনিত্য। অনিত্য বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সোনার তরী' লিখেছিলেন । আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন তরীতে। অথচ 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী—/ আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'[৫]

কাল, মহাকাল কবির সৃষ্টিকে মূল্যায়ন করেছে। *সোনার তরীতে* কর্মেরই স্থান হয়েছে, কবির নয়। কর্মী নয়, কর্ম বড় এ সত্যবাণী যাঁর লেখায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তিনি মহামানব। কর্মই জীবন, কর্মেই পরিচয়। কর্মই আধ্যাত্মিকতা, কর্মই ধর্ম। কর্মই সব। আশি বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তা অন্বেষণে পার করেছেন জীবনের প্রতিটি প্রহর। স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে মৃত্যুশোকে মলিন না থেকে বার্গসঁ'র গতিপথে হেঁটেছিলেন অক্লান্ত। রচনা করেছিলেন চলমান জীবনের সত্যসন্ধ্য রূপ *শাজাহান, ছবি, চঞ্চলা* প্রভৃতি কবিতা। তাঁর নিকট মৃত্যুও চলমান । জীবনের সাথে ধেয়ে চলেছে ছবির জীবন্ত সমাসোক্তি। personnification জড় পেয়েছে প্রাণ এ অনুভব রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মানসঅনুভব। যিনি বোঝেন তিনি সমঝ্দার । শতাব্দী অতিক্রম করে যায় সে বোধ। অসীম সেই ভাবরাজ্যে পৌঁছে দেয়ার আধ্যাত্মিক কৌশল তাঁর জানা ছিল। উপনিষদের আনন্দ স্পর্শের absolute পরম তাত্ত্বিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কালকে শাসন করে উপনীত হয়েছিলেন মহাকালে। তাঁর চলা দিয়েই এ অনুভবকে বিচার করা যায়। কারার দ্বার খুলে বেরিয়েছিলেন কর্ম সভায়। মৃত্যুর দু'বছর আগেও তিনি লিখেছিলেন 'আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকে মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরী হবে।' অগ্রবর্তী চেতনার আলোক পিয়াসী মানুষ রবীন্দ্রনাথ। যেখানে এসেছেন তিনি- 'তিনি সেথাকার। দরিদ্র সন্তান দীন ধরণীর। তাই তিনি বলতে পারেন 'জমিদারী দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং সেই থেকেই আমার গল্প লেখার শুরু।' কবির জন্ম ১২৬৮ এর ২৫ বৈশাখ মৃত্যু ১৩৪৮ ২২শে শ্রাবণ। লেখার শুরু তাঁর ৮ বছর বয়সে। ১৩ বছর বয়সে প্রথম প্রকাশিত হয় লেখা। ৬৫টি গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। ছোটগল্প লিখেছিলেন ১১৯টি। আড়াই হাজার গান লিখেছেন। ৫০টি নাটক ১৩টি উপন্যাস ৯টি ভ্রমণ কাহিনী আছে তাঁর। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ৪টি। ছবি এঁকেছেন দু'হাজার। ১৭ বছর বয়স থেকে ৭১ বছর বয়সের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন বারো বার।

রবি ঠাকুরের কথা—

নবীন আষাঢ়ে রচি তব মায়া/ এঁকে দিয়ে যাবো ঘনতর ছায়া
করে দিয়ে যাবো বাসন্তী কায়া/ বাসন্তী বাস পরা[৬]

তাতে "সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল/ সুন্দর হবে নয়নের জল/ স্নেহ সুধা মাখা বাসগৃহতল/ আরো আপনার হবে।"[৭] তাই সৌন্দর্যের আকরে ফেলে শুধু মনঃসমীক্ষণেই নামেন কবি। পাঠক হাসেন চোখের জলে। রোদ বৃষ্টি ঝড়ের সমস্ত আলো ছায়া নিয়ে খেলে তা। মনের বাউল জাগে কূলহীন সাগরে। পাঠক বিস্মিত হন। বৃষ্টির ছাটে দাওয়া ভিজে যায়। ছাদের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে ভেসে যায় শোবার জায়গা। অথচ পালঙ্কের বিলাসিতায় স্বপ্নময় বন্দনার ঐশ্বর্যে কবি ভাসিয়ে নেন তাঁকে। কবি হাঁটেন না কাদা মাটি জলে। কল্পনার রংধনু ওঠে কবির আকাশে- পাঠককেও নেন সাথে-"খেয়া নৌকা পারাপার করছে , পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে; চাষারা আঁটি বাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে-.....গুটিকতক গরু বর্ষায় ঘাস অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্বক অলস ভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি

তাড়াচ্ছে.... এই সমস্ত শব্দ একবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে।[৮] দোতলায় সঙ্গীহীন রবীন্দ্রনাথ মনের আনন্দেই বর্ষাকে দেখেছেন। "ডাঙার উপরে উঠে বর্ষার সবুজ পৃথিবীটা একবার দেখে আসা গেল, সেটা বেশ লাগল।.....মাধুর্য অনুভব করা যায়" ।[৯] পালক কোমল গালিচা বিছিয়ে দেন কবি কর্দমাক্ত পৃথিবীর উপর। কারণ, কবি বিশ্বাস করেন conventional হলে সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে। "মানুষ কর্মরাজ্যে বন্দী থাকে ভাব রাজ্যে চায়মুক্তি।"[১০] সৌন্দর্যে পাগল হন কবি,"সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"[১১]

নিজেকে সুন্দরের আদর্শ করতে হলে চারিদিকে সুন্দর করে তোলা চাই। সৌন্দর্যের অর্থ কবির কাছে গভীর। কবির ভাষায় "সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা।"[১২] কবি শঙ্করাচার্য, বিহারীলাল চক্রবর্তী, শেলি কীটস্ এর এপিসিকিডিয়নের ভাবতত্ত্বের সাথে তুলনামূলক ব্যাখ্যা করে কবি যে সিদ্ধান্তে আসেন তা হলো "কেবল চক্ষুকে কিংবা কল্পনাকে নয়-সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তাঁর ঠিক মানেটি বোঝা যায়।"[১৩] বিব্রতকর অবস্থার যে- কোন চিত্রকল্প কবির কলমের কল্যাণ-স্পর্শে তাই সাবলিমিটি পেয়ে যায়। গঙ্গার জলধারা নৌকার গুণটানা বর্ষায় প্লাবিত ক্ষেতের মাঝেও তাঁর সুদূরের সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা। কঠিন শ্রেণি-স্বার্থের উপর মনকে অন্বেষণ করেন বলেই বর্ষার বৃষ্টির দাপট চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে দরিয়া করলেও তাঁর সাথে সহবত না শেখার রসিকতা করতে পারেন কবি। 'এখানকার লাইব্রেরিতে এক খানা মেঘদূত আছে, ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে পড়া গেছে- কেবল পড়া নয়-সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।' কালের ঘড়ি বন্ধ রেখে অনায়াসেই কবি ভাবতে পেরেছেন। 'আজ এই কর্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়। রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্বিন্ধ্যা, চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্যা, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনীর মেঘে ভেসে ভেসে। জুম্বু কুঞ্জের ফল, ফসলভরা মাঠ, গ্রামের বেড়ায় লতিয়ে ওঠা কেয়া ফুল, উজ্জয়িনীর পায়রা আর জনপদ, বধূর স্বপ্নভরা চোখ' দেখেন তিনি কবিতার পঙক্তিমালায়। বর্ষার বন্দনায় চিত্র-সংগীত এক মেলবন্ধনে বাঁধা পড়ে। স্বপ্ন আর কল্পনার মধ্যে খেলা করে মন। কবি আবাহন করেন নিবেদন করেন অর্ঘ্য দেন পূর্বসূরীদের "প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন/ তোমার কাব্যের পরে করি বরিষণ/ নববৃষ্টি-বারিধারা,/ করিয়া বিস্তার নবঘন স্নিগ্ধছায়া/ করিয়া সঞ্চার নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের/ স্ফীত করি স্রোতাবেগ তোমার ছন্দের/ বর্ষাতরঙ্গিনীসম।"[১৪]

এখানেই রবীন্দ্রনাথ আলাদা। তাঁর বর্ষা কাঁদে না, কাঁদায় না বরং ভাবায়। গভীর থেকে গভীরতর করে চিন্তাকে। স্পর্শ করে নিভৃত মনলোক। অন্তহীন জিজ্ঞাসা যেখানে। কবির বাস্তবতা রোমান্টিকতাকে ঘিরে। ক্রিটিক এবং কবি এক নন বলেই ক্রিটিক যে দায়ভার বহন করে না কবিকে সঙ্গত কারণেই তা করতে হয়। কবি আত্মকোটরে অবরুদ্ধ নন। সত্যস্বরূপ আরাধ্য তাঁর। যদিও রূপকল্পে থাকে ইমোজারি ইমাজিনেশন। মনস্তাত্ত্বিক কবি রবীন্দ্রনাথ মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতর কারিগর। তাঁর সমাজচিন্তা শালীন ও সংস্কৃত। গল্প উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র তাই বুদ্ধিদীপ্ত এবং আলোকিত। জ্ঞানের মুক্তিই তাঁর কাম্য। পরিবেশনা তাঁর স্বতন্ত্র।

সাবলীল গীতিময় এক কথায় অসাধারণ এক রচনাশৈলী নিয়ে জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। চিত্তকে করেছিলেন ভয়শূন্য। আপন শক্তিকে করেছিলেন জয়। সংকট থেকে দিয়েছিলেন মুক্তি:

বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম। ঘনায়ে আঁধার/ আসিছে নির্জন নিশা। প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল- উদ্দেশে।/ ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান-
কে দিয়েছে হেন শাপ; কেন ব্যবধান?/ কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?[১৫]

যে পদ্মা বর্ষার ভয়াল—তাকে নিয়েও কাব্য করেন কবি। সেও কি প্রকৃতির সাথে শোকের গাঁটছড়া বেঁধে আরেকবার পাঠকের মনে ভয়ংকর সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! 'চন্ন ফু' বলে খোকাবাবু কদম্বফুলের বায়না দিলে রাইচরণ সেই অসম্ভব কাজটি করতে গিয়ে যে সর্বনাশ আনে কবির কাব্যবোধে তাতে ব্যাঘাত বা পরিবর্তন ঘটে না। আবারও বর্ষার জলের বর্ণনায় অসামান্য ছবি আঁকেন তিনি। "কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সে মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল জল খল খল ছল ছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্নানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।...একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মারতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়।... মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল।... ভাঙা বুকের মধ্যে হইতে এবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, বাবু- খোকাবাবু লক্ষী দাদাবাবু আমার।"[১৬] বর্ষার এ বিসর্জন

সাঙ্কেতিক। প্রত্যক্ষ নয়। বর্ণনার কৌশলে বিসর্জনের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্য রাইচরণের কান্না আতঙ্ক অপরাধবোধ যদিও বর্ষাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়— তবু বর্ণনার সুন্দরতম সত্যে ঘটনাটি এমন একটি আলোকিত মঞ্চ পেয়ে যায়, বর্ষার ভয়াল পদ্মা ছেড়ে পাঠক মগ্ন হয়ে পড়েন মনস্তত্ত্বের এক দ্বান্দ্বিক বিষণ্নতায়। কবির প্রতিটি রচনা আবহপ্রেম, বিরহ, মৃত্যুশোক, জ্বরা দুঃখ বিষণ্নতা থেকে উত্তরণের এমনই এক আত্মিক সৌন্দর্যশক্তি- যাকে কবি নিজেই বলেছেন-এপিসিকিডিয়ন।[১৭]

উপলব্ধি ইন্দ্রিয়াতীত সে উপলব্ধিকে ধরতে রবি ঠাকুরের লেখাকে বিজ্ঞানের তথ্য-তত্ত্বের নিরিখে নয়, অতিন্দ্রিয়সত্তায় পরম বিশ্বাসে উপলব্ধির ইন্দ্রিয়াতীত সত্যে পৌঁছাতে হয়। তবেই রবীন্দ্র লেখার রসবোধ হয়। এর জন্য শিক্ষিত পরিশীলিত রুচিবোধ ও অনুশীলন প্রয়োজন। শাশ্বত পুরাতন চিরন্তনতাকে নিজের স্টাইলে এনেছেন কবি।

তাই সবসময় রবীন্দ্রনাথ পুরনো বিষয় নিয়েও আধুনিক। একথা সত্য উপনিষদের মধ্যে থেকেই জীবনের শাশ্বত রূপকে রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন। তাই চাওয়া পাওয়া জীবন-মৃত্যু সব সত্যের মধ্যেও চলিষ্ণু বর্তমান ছেড়ে অলৌকিক আনন্দ উপহার দিতে পেরেছেন কবি পাঠককে। খণ্ড খণ্ড ঘটনা জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ আনতে পেরেছিলেন অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতা, অখণ্ড-অসীম এক অনুভব। দুঃখ দৈন্যপীড়িত আঁধার ঘরে আলোর সঞ্চালক বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাণোচ্ছল নদীর গান শুনিয়েছিলেন জাতিকে। তাঁর রচনার বৈচিত্র্যের মহিমা অদ্ভুত এবং অপরূপ। রহস্যঘন তবু উদ্দীপক। সাগরের প্রমত্ত জলতরঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখার ভাব অন্বেষণ সম্ভব নয়, শক্তি সাধনার ভৈরবমন্ত্রে উদ্দীপিত না হয়ে ধীর শান্তরসে ভক্তের পুজো নেন রবীন্দ্রনাথ। "বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে? গাছপালা ছায়া কুটির-নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি , সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে- জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; {বিচিত্র প্রবন্ধ, সরোজিনী প্রয়াণ} সুন্দর-নির্মল-পবিত্র রবীন্দ্রনাথ। যাঁর আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ। যাঁর মুক্তি আলোয় যাঁর মুক্তি ধূলোয় ঘাসে ঘাসে। কবি শেলীর মতো রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বাস প্রেমের মধ্যেই মানবজীবনের শ্রেয়বোধ কল্যাণবোধ এবং মুক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল– যুগে যুগে কল্পনায় এভাবেই বাঙালিকে সাজিয়েছিলেন। স্বপ্নকে আবর্তন করেই কৃষি শিল্প-বাণিজ্য গবেষণা বিজ্ঞান। সভ্যতা আর সংস্কৃতির নির্দ্বন্দ্ব সমগতি যা। সেই সমগতি সূত্রে রাখী বেঁধে সাহিত্যাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশনা। সনাতনী বসুন্ধরার অন্তরঙ্গতা যেখানে সবচেয়ে বেশি ছায়া ফেলেছে, সেই পল্লী অঞ্চলের মানুষের খবরে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তাঁর জুড়ি মেলে না । ধর্ম-দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কাব্য কবিতা কথাশিল্প সঙ্গীত চিত্র নৃত্যনাট্য রচনায় রবীন্দ্রমানসে সর্বত্রই মানবপ্রেম। হিতবাদী, সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পে, গল্পগুচ্ছের তিনখণ্ডের গল্পের অতিথি, আপদ, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মনিহারা, দেনা-পাওনা পোষ্টমাষ্টার, ছুটি, শাস্তি-তে মানুষের মনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রকৃতির সাথে পাঠকের নিগূঢ় সম্পর্ক তৈরিতে পারদর্শী কবি। লিরিক সৌন্দর্যের সাথে ঐন্দ্রজালিক ভাষাসৌকর্য রহস্য-রোমাঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পকারের মহিমা দিয়েছে তাঁকে। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি।

ওরিয়েন্টাল সোমিনারী, সেন্ট জেভিয়ার্স, ব্রাইটন পাবলিক স্কুলের ছাত্র এককালের ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে বাংলা সাহিত্যে করলেন দিগ্বিজয়। ১৯০১ এ বোলপুরে গড়লেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম আবাসিক বিদ্যালয়। যা বর্তমানে শান্তি নিকেতন, বিশ্বভারতী। গীতাঞ্জলি দিয়ে আনলেন নোবেল পুরস্কার। মুগ্ধ করলেন বাঙালিকে।

'কীর্তিযস্য সঃ জীবতি।' যিনি কীর্তিমান তিনিই বেঁচে থাকেন। আর্য অনার্য বৌদ্ধ জৈন সব সংস্কৃতির যাগযজ্ঞ বাঙলা সংস্কৃতি। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে সুফী মতবাদ, বৈষ্ণবধর্মের প্রেম-আন্তরিকতা থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাবধারা; বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মধুসূদন, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, লালন ফকির, শ্রীচৈতন্যের উদার বৃহত্তর মানবিকতার (হিউম্যানিজ্‌ম) সর্ব ভারতীয় তথা বাঙালির এক রেনেসাঁ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। মানুষের জীবনের পূর্ণতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ। মার্জিত মানসিকতাকে ঘিরে পূর্ণতার যে সাধনা তাই সাহিত্য, তাই-ই সংস্কৃতি। যার জন্য প্রয়োজন 'ফ্রিডম অব মাইন্ড, ইউনিভার্সালিজম এবং আর্বানিটি।' স্বাধীনতা, বিশ্বমানবতা এবং শালীনতা— রবীন্দ্রসাহিত্যে তারই প্রসার তারই পরিচর্যা। তাই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক মৃত্যুঞ্জয়ী বর্তমান পাঠকের অনুভবে।

তথ্যসূচি:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; গীতবিতান, ১ম খণ্ড, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৭১,পৃ.-৪৫২

২। তদেব, পৃ.- ৫০৭

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, সঞ্চয়িতা, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৫ পৃ.-১৩০

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; গীতবিতান, তদেব, পৃ. ২৫০

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সোনার তরী, সঞ্চয়িতা, তদেব, পৃ.-৫৫

৬। তদেব, পুরস্কার, পৃ.-১০৫

৭। তদেব, পৃ.-১০৫

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ.- ১৬০

৯। তদেব, পৃ.- ৩২০

১০। তদেব, পৃ.-২৭৫

১১। তদেব, পৃ.- ৯০

১২। তদেব, পৃ.- ৯১

১৩। তদেব, পৃ.- ২৯১

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেঘদূত, মানসী, সঞ্চয়িতা, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.- ৪৯

১৫। তদেব, পৃ.- ৫১

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড, ১৪০১, পৃ.- ২৩৭

১৭। তদেব, পৃ.- ২৯১

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্রসংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ দার্শনিকতা

সালিম সাবরিন*

সংগীতই বাংলা সাহিত্যের অঙ্কুরিতবীজ। পল্লবিত ও বিকশিত বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের মহীরূহ ছায়াতলে দাঁড়িয়ে এখনও সাহিত্যের নানা ধারায় নানাভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত । 'চর্যাপদ' থেকে 'বৈষ্ণব পদাবলী' পর্যন্ত বাংলা গানের বিষয় মূলত ধর্মনির্ভর। মধ্যযুগের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধর্মের মতাদর্শগত বা তান্ত্রিক-সাধনার প্রয়োজনে ধর্মীয় সাধন-ভজন সংগীতের প্রচলন ছিল। এমনকি, আঠারো ও উনিশ শতকের কবিগণের, আখড়াই, হাফ আখড়াই, যাত্রা, পাঁচালি, টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতি গানের বিষয় ছিল একমুখী। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা গানের রচয়িতাদের এই বিষয়গত একমুখিতা সংগীত জগতকে একটি অচলায়তনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। অর্থাৎ বাংলা গানের স্রষ্টাদের প্রত্যেকের একক স্বাতন্ত্র্য মূল্যায়ন করলে একথা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক স্রষ্টার মধ্যে ছিল বিষয় বৈচিত্র্যের চেতনা দৈন্য । কেউ ধর্মীয়সংগীত রচনা করেছেন, কেউ প্রেমের সংগীত রচনা করেছেন। যিনি ভগবৎ বা পূজার গান রচনা করেছেন তাঁর চেতনায় ভক্তি নিয়ামক হয়ে উঠেছে, সেখানে মানবপ্রেম প্রাধান্য পায় নি। আবার কেউ স্বদেশ নিয়ে গান রচনা করলেও সেখানে মানবিকবৃত্তির অন্যান্য প্রসঙ্গ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এমনকি, বাংলা গানের পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অতুল প্রসাদ (১৮৬৪ – ১৯৩৪), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫ – ১৯১০), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), প্রত্যেকেই একাধিক বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন। তথাপি পঞ্চপাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য শুধু বাংলা ভাষা নয়, বিশ্বের যেকোন ভাষার গানের চেয়ে তাঁর গান সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ যথার্থই বলেছেন:

> ... বিষয়ের দিক থেকে তাঁদের গান সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন গত শতাব্দীর নিধুবাবু। তিনি বাংলা ভাষার টপ্পা গানের প্রবর্তক। বহু উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা। সেই গানের প্রভাব সমস্ত ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে তাঁর গানগুলো সবই ছিল একই আদর্শের বিরহ বেদনার গান। বাংলার প্রাচীন কীর্তন গানে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার বৈচিত্র্যই কেবলমাত্র প্রকাশ পেয়েছে। শাক্তরা প্রচার করে গেলেন আর এক ধরনের ভক্তির গান। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দী ধ্রুপদ খ্যালের ভঙ্গিতে বাংলা ভাষায় বহু উপাসনার গান রচিত হল। গুরুদেবের সমসাময়িক বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা বাংলা গানে বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলামের নামই আমি করব। এঁরা সকলেই একাধিক বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী ও হাসির গানের কবিরূপে যতটা খ্যাতি পেয়েছিলেন ঠিক সেই খ্যাতি প্রেম বা ভক্তির গান লিখে পাননি। অতুলপ্রসাদের ভক্তি ও প্রেমের গানই বাঙালিকে মুগ্ধ করেছে বেশি। নজরুলের কয়েকটি উদ্দীপক গান ও উর্দু গজলের আদর্শে রচিত প্রেমের গানগুলিই লোকপ্রিয় হল,অন্যগুলি তেমন স্থান পেল না জনসাধারণের মনে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে গুরুদেবের গান বহুমুখী।[১]

বাংলা কাব্যসংগীতের যথার্থ বাগ্‌গেয়কারের সম্মান একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই প্রাপ্য।[২] ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাগ্‌গেয়কার তানসেন, বৈজু, গোপাল, যাদারং, আদারং প্রমুখ বাগ্‌গেয়কারের চেয়ে সকলের সেরা বলে অভিহিত করেছেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভারতীয় সংগীতের দুই ধারা ধ্রুপদী ও লোকসংগীতের উৎস থেকেই তাঁর সাংগীতিক উপাদান গ্রহণ করেননি, বরং প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, ইসলামী এই তিন মহতী ধারার ত্রিবেণী সংগমে আশৈশব অবগাহন করেই বাংলা সংগীতের এক নতুন ভুবন সৃষ্টি করেছেন। একদিকে, দরবারী সংগীত; অন্যদিকে মেঠোসংগীত অর্থাৎ ধ্রুপদ ও লোকসংগীতের সুর এবং বাণী তাঁর সৃজনস্বাতন্ত্র্যে ও প্রতিভার হিরন্ময়ী স্পর্শে লাভ করে নতুন ব্যঞ্জনা। এছাড়াও ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত, বিলেতি সংগীতের সুর ও বাণীকে তিনি নব নব রূপে বাংলা গানের অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ভাসিয়ে দিয়েছেন সীমা থেকে অসীমের স্পন্দনে। ভারতীয়রাগসংগীতের সুরের আধিক্যকে তিনি যেমন সরাসরি মান্য করেননি, তেমনি আবার গানের বাণীকেও সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। এইসব বিশেষত্ব রবীন্দ্র সঙ্গীতকে বাংলা গানের ভুবনে দান করেছে বিশেষ মহিমা। রবীন্দ্রনাথ সত্যিকার অর্থে বাংলা সংগীতের এক প্রতিনিধিত্বশীল পুরুষ। তাঁর সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য:

> সত্যই শিল্পীশিরোমণির অভিধা নিয়েই আসরে এলেন রবীন্দ্রনাথ: মহত্তম বাগ্‌গেয়কার, ভারতবর্ষে যিনি শীর্ষাসীন হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছেন- কি শাস্ত্রীয়,কি দেশজ, কি লোকজ, সংগীতের সকল শ্রেণীতেই নেতৃস্থানীয়- তানসেন, বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, স্বামী হরিদাস থেকে নিধুবাবু, লালন ফকির, হাসনরাজা পর্যন্ত শিল্পী তালিকাটির।[৪]

* লেখক অধ্যক্ষ, শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব বহুমাত্রিক। তবে বিষয়গত ভাববৈচিত্র্যে গুরুদেবের সঙ্গীতচিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব অনতিক্রম্য। তিনি দার্শনিক কবি। তাই তাঁর চিন্তাদর্শন একই বিষয়ের ভেতর বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দান করে যায়। গীতবিতানে প্রায় আড়াই হাজার গানের ভাব, ভাষা ও সুরবৈচিত্র্য সে বিশ্বভুবন মুখরিত হয়ে ওঠে তাতে- ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি ও স্রষ্টার অপার মিলন সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব ঘুচিয়ে দেয়। দান করে মহত্তম অসীমের লীলাবৈচিত্র্য। তাঁর বিচিত্র বিষয়-ভাব ও বাণীর গান যেমন সার্থক, তেমনি রসোত্তীর্ণ। তা যেমন সমকালের তেমনি স্বকালের গণ্ডি অতিক্রম করে চিরকালের রূপ লাভ করে। কারণ, মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি ও প্রবৃত্তির এমন কোন দিক নেই যাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতে বাণীবদ্ধ করেননি। বাংলা তথা বিশ্বপ্রকৃতির এমন কোনো রং নেই- যা রবীন্দ্রসৃষ্টিমনীষার রঙে রঞ্জিত হয়নি। মানবসভ্যতার বিশেষত্ব প্রাচ্যভক্তিবাদী সভ্যতার (Orientalism) এমন কোন দর্শন নেই যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্বিষ্ট হয়ে ওঠেনি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান বলতে আমরা বুঝি বিশ্বপ্রকৃতির গান, বিশ্বপতির গান এবং বিশ্বমানবের গান। গুরুদেবের এই গানের বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের সসম্ভ্রমে মনে রাখতে হবে সঙ্গীত এক বিশুদ্ধ শিল্প। তাতে বাণী দিয়ে বাঁধা সুর বা সুর দিয়ে বাঁধা বাণীর শিল্পপ্রতিমা মূর্ত বিমূর্তের আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলে অবিরাম। তবে বাংলা গানের ধারায় লক্ষণীয় মধ্যযুগ থেকে এই শিল্প বাণীনির্ভর পদাশ্রিত। বাণী ও সুরের ঝরণাধারা শেষ পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায় অরূপের অভিসারে। ফলে, বরাবরই বাংলাসঙ্গীত শেষপর্যন্ত কাব্যসঙ্গীতরূপেই সমৃদ্ধি লাভ করে। সম্ভবত একারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতবিতান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্কালে (পরিবর্তিত সংস্করণ, দুই খণ্ড, মাস, ১৩৪৮) তাঁর গানগুলোর নতুন - বিষয়বিন্যাস করেন। প্রসঙ্গত, তিনি উল্লেখ করেন যে- বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলার অভাবে পূর্বপ্রকাশিত গীতবিতানের বিষয়বিন্যাস যথার্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেন। :

> গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলার বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধের ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।[৫]

তাঁর গানের সাহিত্যরস ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তিনি এই নতুন সংস্করণে নতুন বিন্যাসে গানগুলোর তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন এর ফলে গীতকাব্য পাঠকের পক্ষে তাঁর গানের সাহিত্যরস গ্রহণ করা সহজ হবে। কবি প্রদত্ত বিষয় তালিকাটি নিম্নরূপ:

ক. 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্গত গানসমূহের শ্রেণীস্তর- 'গান', 'বন্ধু', 'প্রার্থনা', 'বিরহ','সাধনা ও সংকল্প', 'আশ্বাস', 'অন্তর্মুখে', 'আত্মবোধন', 'জাগরণ', 'নি:সংশয়', 'সাধক', 'উৎসব', 'আনন্দ', 'বিশ্ব', 'বিবিধ','সুন্দর', 'বাউল', 'পথ', 'শেষ', 'পরিণয়'।

খ. 'স্বদেশ' পর্যায়।

গ. 'প্রেম' পর্যায়ের দুটি ভাষা- 'গান', 'প্রেমবৈচিত্র্য'।

ঘ. 'প্রকৃতি' বিষয়ক গানের বিভাগ- 'সাধারণ', 'গ্রীষ্ম', 'বর্ষা', 'শরৎ', 'হেমন্ত', 'শীত', 'বসন্ত'।

ঙ. 'বিচিত্র' পর্যায়।

চ. 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়।

উপরোক্ত বিন্যাসের আলোকে রবীন্দ্রসংগীতকে প্রধানত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে- পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র। গুরুদেবকৃত এই বিষয়বিন্যাসের সূত্রে তাঁর সংগীতের ভাবসম্পদ অন্বেষণ বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। যদিও সংগীত বিশেষজ্ঞগণ রবীন্দ্রসংগীতকে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর বৈভবে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী। বাণী প্রধান, সুরপ্রধান, ছন্দপ্রধান কিংবা ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ রাগমিশ্রণ টপ্পা বা টপ্পাঙ্গ, কীর্তনাঙ্গ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাজন করে থাকেন। বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যমূল্য অন্বেষণের প্রয়োজনে শুধুমাত্র বিষয়বৈচিত্র্যগত দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। তাই রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্যের স্বরূপ নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

১. দার্শনিকতা

২. স্বাদেশিকতা

৩. আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবতা

৪. বিজ্ঞান ও পরিবেশ চেতনা

৫. লোক উপাদান ও লোকায়ত ভাবনা

৬. নান্দনিকতা

উপর্যুক্ত শ্রেণীবিন্যাসে রবীন্দ্রসংগীতের সূক্ষ্মতর বিবিধ প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তবে স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রচেতনার মর্মমূলে সূক্ষ্মতর দার্শনিক ভাবনা যে অন্তর্গূঢ় রহস্যের মায়াজাল বিস্তার করে আছে, তা সত্যিই এ অধরা মাধুরী। কবির প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর ভাবনা, সৌন্দর্যচেতনা কিংবা দুঃখবোধ যে মহত্তম আধ্যাত্মিকতার রহস্য সৃষ্টি করে; তার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সত্যিই দুঃসাধ্য। সীমার মধ্যে অসীমের স্পন্দন, ভূমির মধ্যে বিশ্বকে বিম্বিত করার এই রাবীন্দ্রিক মানসদৃষ্টি তাঁর সংগীত ভুবনকে দান করেছে বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা। বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কবি S.T Coleridge বলেছেন,‘ No man was ever yet a poet without being at the same time profound philosopher.”[৬] অর্থাৎ মহৎ দার্শনিকই মহৎ কবি। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিশ্বসেরা দার্শনিক কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক ছিলেন কিনা এ প্রসঙ্গ বহুল আলোচিত। সে আলোচনা প্রচলিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক দর্শনচর্চার মাপকাঠি দিয়ে তুল্যমূল্য বিচারে অক্ষম প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত দার্শনিক মাত্রই সত্যের অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ এবং উপলব্ধির মহিমায় তার দর্শন অন্বিত। সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই দার্শনিক। তিনি তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্যের কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে গ্রহণ করেন নি। আবার দার্শনিকগণের মতো জগৎজীবন সম্পর্কীয় নিজস্ব চেতনা প্রবাহকে সুসংহত যুক্তিমাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্বে রূপায়িত করেন নি। বরং তিনি স্বয়ং দার্শনিকসত্তায় ভূষিত করতে তাঁর সবিনয় আপত্তি জানিয়েছিলেন; তথাপি বিশ্বরহস্যের কেন্দ্রে তাঁর ভাবনার আভিমুখ্য, সত্তার স্বরূপ উদঘাটনে তাঁর আমৃত্যু সৃষ্টিশীল মনের ব্যাকুলতা অনিবার্যভাবে সূচিত করে। এই বিশিষ্ট দার্শনিক ভঙ্গীকে হয়ত দর্শনশাস্ত্র সম্মত কোনো তত্ত্ব পরিকল্পনার (System building) পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না ; কিন্তু তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে রেখে গেছেন বিশ্ববীক্ষা ও সংহত দার্শনিক ভাবসঞ্জাত এমন একটি প্রচ্ছন্ন প্রয়াস যার অবলম্বনে ও আশ্রয়ে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রদর্শনের অবয়ব। এই প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য, “রবীন্দ্রচিন্তায় প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মচিন্তা যথা উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম , ও বৈষ্ণববাদের অনুপ্রেরণা এবং পাশ্চাত্যের প্রাণবাদী (Vitalist) দর্শনতত্ত্ব যেমন বের্গসঁর Creative evolution– এর অভিঘাত খ্যাতিমান রবীন্দ্র – অন্বীক্ষকদের কুশলী লেখনীতে ইতঃপূর্বে পর্যাপ্তভাষিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকে এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অবিচ্ছিন্ন রশ্মিতে নিয়ত আলোকিত রেখেছিলেন যা তাঁর একান্তই স্বকীয়–আপন জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। দার্শনিক চিন্তার এই অনন্য মৌলিকতায় বিশেষত তাঁর পরিণত সৃষ্টি এক অসামান্য দীপ্তিতে ভাস্বর।”[৭]

সত্যিকার অর্থে রবীন্দ্রমনন ও রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য বহুস্তরাশ্রয়ী। তাই রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু পাঠক ও শ্রোতার মনে যুগপৎ কৌতূহল এবং বিস্ময় রয়েই যায়। রবীন্দ্রমননের অসামান্য সৃষ্টি–সংগীতেও এই রহস্য অনন্ত কৌতূহলের জন্ম দেয়। এই কৌতূহল মেটাতে তাই মোটাদাগের ওপর রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিক অবয়ব সন্ধানের প্রয়াস নেয়া চলে। বস্তুত, কবির মানসচেতনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবপ্রসূত যে আলোক রশ্মিপাত ঘটেছিল তাতে তাঁর সংগীতের আলোকে নিম্নোক্ত রূপরেখার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব বলে মনে হয়। যেমন:

১. ঔপনিষদীয় দর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত
২. ব্রহ্মদর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত
৩. বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত
৪. বাউলদর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত
৫. জড় চৈতন্যবাদীদর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত

এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসবাদী চেতনা এবং পাশ্চাত্যের র‍্যাশনালিস্ট হিউম্যানিজমের চেতনা রবীন্দ্রমানসকে দান করেছিল এক শুদ্ধতম শিল্পীর মহিমা। বিষয়গুলো বহুমাত্রিক আলোচনার দাবি রাখে।

ঔপনিষদীয় দর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত: এ কথা সর্বজন বিদিত যে , রবীন্দ্রমানসে উপনিষদের প্রভাব খুবই প্রত্যক্ষ। একেবারে প্রথম যুগের কাব্য–কবিতা–সংগীত ও গদ্যরচনা থেকে আরম্ভ করে কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লেখা পর্যন্ত সব সৃষ্টির মধ্যেই এই সত্যের পরিচয় আছে, কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ রূপান্তরিত, কোথাও একেবারে স্পষ্ট। শুধু সাহিত্যে কিংবা সংগীতে নয়, ব্যক্তিজীবনেও উপনিষদের চেতনা তাঁকে কত আচ্ছন্ন করেছিল সে সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন:

> শৈশব হইতেই এই উপনিষদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, কৈশোরে তিনি উপনিষদের শ্লোকগুলি বারবার বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতেন। পারিবারিক জীবনে এবং সামজিক জীবনে চারিদিকে এই উপনিষদের প্রভাব। রাজা রামমোহন রায়

> হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের সংকল্প লইয়া এই উপনিষদক সত্যে হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই হইতেই এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উপনিষদে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে রবীন্দ্রনাথের নিকটে এই উপনিষদের বাণীর জীবন্ত প্রেরণা ছিলেন। সুতরাং প্রথম জীবন হইতেই এই উপনিষদকে তিনি পাইয়াছিলেন প্রচুরভাবে, প্রকৃতির সহজ দাক্ষিণ্যের মতোই।[৮]

উপনিষদের শ্লোকে বলা হয়েছে—দশা বাস্যমিদং সর্বযৎ কিঞ্চ জগত্যম জগৎ।" অর্থাৎ জগতে যা কিছু চলিষ্ণু, তা পরিবর্তনশীল এবং তার সব কিছুই এক পরম সত্যের দ্বারা বিধৃত। এই যে, চঞ্চল পরিবর্তনশীল বিশ্বজগৎ তাতে আনন্দ লাভ করা সম্ভব, ভোগ করা সম্ভব–কিন্তু "ত্যক্তেন' অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা। ভোগের দ্বারা নয়, গ্রহণের দ্বারা নয়। এই অহং ধর্ম হলো বিশ্বপ্রবাহের অখণ্ড সত্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। জগতের সব কিছুই অন্তর্নিহিত এক সত্যে বর্তমান। একের ভাবকে অবলম্বন করে অন্য সকল দীপ্তমান। সে সূর্যের মধ্যে, চন্দ্র তারকার মধ্যে। বিদ্যুতের মধ্যেও আগুনের মধ্যে–আবার সেই সক্রিয় মানুষের মধ্যে। তার ইন্দ্রিয়ে, তার চিত্তে, বুদ্ধিতে, তার আত্মার আনন্দে জ্যোতিতে। উপনিষদে বলা হয়েছে—

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা/ একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহেনুপশ্যন্তি ধীরা/ স্তোষাং সুখং শাশ্বতং নেতারেষাম্ ।।
নিত্যাহিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্/ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেহেনুপশ্যন্তি ধীরা/ স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম ।।

অর্থাৎ, যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা সর্বনিয়ন্তা, সেই একই এক রূপকে বহুরূপ করেছেন, তিনি সকল অনিত্যের ভেতর নিত্য, চেতনের চেতন এবং সেই একই জীবনদেবতাকে কবি রবীন্দ্রনাথ অন্তরাত্মায় বিশ্বছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশের বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনেক গানে ও কবিতায় এই দার্শনিকতা প্রতিভাত হয়।

রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রেই বেদের মন্ত্রকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, শৈশব থেকে বেদ, উপনিষদ এবং সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ়তম সম্পর্ক ঘটেছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সম্পর্কের স্বাদকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, একথা বললে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়ন করা হয় না, তার কারণ তিনি প্রকৃতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নি। মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতি জীবনের উৎসস্থল, সেই উৎসমূলকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করতে গিয়েছিলেন এদিক থেকে তিনি বৈদিক ঋষির মত। সৃষ্টির সমস্ত ঐশ্বর্য, নদী, আকাশ, অরণ্য পর্বত আরো আরো সব বিচিত্র বিন্যাসকে সৌন্দর্যের শোভার মূলে পরম সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন, পাশাপাশি এই শোভায় মানুষও একটি অংশ এই বোধ ও উপলব্ধি তিনি উপনিষদ থেকে পেয়েছেন। বিচিত্র ও বিরাট অস্তিত্বের মধ্যে তিনি নিজেকে অর্থাৎ জীবনকে এবং 'বিরাটতম আমি'কে অনুভব করেছেন। এই কথা তিনি 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের প্রথমেই উচ্চারণ করেছেন—আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ, এই গুলিকে বলে অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার ভালমন্দ লাগা, আমাদের সুখ দুঃখ। এই উপলব্ধি মানুষকে প্রথম অবস্থা থেকেই প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। তাই লক্ষণীয় বৈদিক যুগের ঋষিরা পৃথিবীকে পরম সত্য বলে জেনেছিলেন, কেননা পৃথিবী ছিল তাঁদের নিকট একটি পরম আশ্রয়। এই জন্য তারা কোন দেবতার স্তব করেন নি, তারা স্তব করেছিলেন পৃথিবীর।[৯] প্রকৃতিতে যে সমস্ত শক্তি আছে, সেই সব শক্তির স্তব করেছিলেন তারা। অথর্ব বেদে পৃথিবীকে মাতা হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে। ঋষিরা বলেন—যে মানুষের জন্য উদীয়মান সূর্য জ্যোতির দ্বারা অমৃত লাভ করে সে মানুষ এই পৃথিবীর সন্তান। তাই তারা পৃথিবীর প্রার্থনা করেছেন। পৃথিবীতে অনেক পর্বত আছে, অনেক অরণ্য আছে, অনেক সুগন্ধ আছে। মানুষের প্রার্থনা হবে, সকল অরণ্য এবং সকল হিমবান পর্বত আনন্দময় হোক। যে গন্ধ পৃথিবীর মধ্যে সমদ্ভূত এবং যে গন্ধ পদ্মের মধ্যে সমাবিষ্ট, সে গন্ধের দ্বারা পৃথিবী মানুষকে সুরক্ষিত করবে। গন্ধবদ্ধ সূর্যের সঙ্গে যে পৃথিবী চিরকাল সংযুক্ত সেই পৃথিবীর সবকিছু মধুময়। তাই মানুষের প্রার্থনা, আমার দৃষ্টি যেন কখনও শান্ত ও ম্লান না হয়। রবীন্দ্রনাথ বেদের এই তাৎপর্যকে স্বীকার করেছেন। তাই আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে পৃথিবীকে আশ্রয় করার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত সৃষ্টির এক অখণ্ড ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই অখণ্ড অনাবিল আনন্দময় পৃথিবীর মাঝে তাই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবীর ক্ষয় ও পরাজয় আছে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে মিথ্যা করে অনন্ত আনন্দ সর্বমুহূর্তে বিরাজমান। রবীন্দ্রউপলব্ধির এই তাত্ত্বিকতার সঙ্গে উপনিষদের – 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেদি কদাচন'–এর মিল রয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বলতে ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ রূপরসাদির অনুভবের পরিণামাবস্থাকেই নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন– 'আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। একথা

আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় কথা। উপনিষদের চরম এই কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খলিম্বানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সংপ্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে। এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই। ...কিন্তু কবির বীণায় বার বার বাজিবে–আনন্দাদ্ধ্যেব খলিম্বানি ভূতানি জায়ান্তে...সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে 'আনন্দং সংপ্রযাণ্ত্যভিসংবিশন্তি' যাহা কিছু সমস্ত পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার জন্য নহে'।

তবে একথাও সত্য যে, বিশ্বসৃষ্টি ও স্রষ্টার অন্তর্নিহিত অখণ্ড ঐক্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস কেবল উপনিষদের প্রভাবজনিত নয়। এটি কবির প্রকৃতিগত সহজাত বিশ্বাস যা উপনিষদের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসৃষ্টিকে 'মহাস্বপ্ন' 'মহাসংগীত' এবং 'বিশ্বনৃত্য' বলে অভিহিত করেছেন। সৃষ্টির অশেষ সুরকে নতুন মহিমায় বন্দনা করে কবি বলেছেন—

যে গান আমি নারিনু রচিবারে/ সে গান আজি উঠিল চারিধারে
আমার দ্বীপ জ্বালিল রবি/ প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি
গাঁথিল গান শতেক কবি/ কতই ছন্দহারে।—নৈবেদ্য/ ৩২

সত্যের অনুসন্ধিৎসায় কবি জগতের সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন। "যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ"—এই প্রত্যয়ের সঙ্গে উপনিষদের ভাবচেতনার সাজুয্য রয়েছে। উপনিষদের যোগপন্থা সবার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। রবীন্দ্রনাথও গীতাঞ্জলিতে তাই বলেছেন —'বিশ্বসাথে যোগে কোথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'।

বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বস্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন তিনি। এমনকি, বিশ্বজনের পায়ের তলের ধুলিকণাও তাঁর কাছে হয়েছে স্বর্গের চেয়ে মধুময়। কবিতাতেও এমন অনুভূতি ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন—

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা/ এইখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস – যার পরে/ ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণা বাতাস... (সেঁজুতি/ ৪১)

এই ঘাস, ধূলিকণা, মৃত্তিকা, পাহাড়, নদী,অরণ্য—আকাশ সবার সঙ্গেই তিনি ছিলেন মিশে —এই গভীরতর উপলব্ধির কথা বলেছেন এইভাবে –"সেই বারতা রইল আজ আমি যে বেঁচেছিলাম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে আমার গানে'। গীতালির এক স্থানে লিখেছেন – বিশ্বস্রষ্টার পায়ের নীচে যে ভূমি – তার সঙ্গেও মিশে আছেন তিনি। তিনি লিখেছেন –

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি/ সেই তো স্বর্গভূমি।
সবাই নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি/ সেই তো আমার তুমি। (গীতালি/৬)

সত্যিকার অর্থে জগৎ আনন্দ সাধনার পথে প্রকৃতিই একমাত্র অবলম্বন। তাই কবির গানে আনন্দ ও সৌন্দর্যের রূপ প্রকাশে প্রকৃতি হয়ে ওঠে বড় নিয়ামক। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো সংযুক্ত করে চিত্তের বিমল আনন্দ লাভ করা সম্ভব। এই দর্শন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকেও লাভ করেছিলেন। জগতের সকল কিছুই আনন্দের দিকে ধাবমান। যে চিত্ত সত্যান্বেষী তারই বিশ্ব আনন্দসুধা পান করা সম্ভব। তার উপনিষদের এই ধারার সঙ্গে কবির সারাজীবনের ছিল প্রকৃতিগত মিল। তিনি "The Riligion of man গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন – æThe first stage of my Riligion was through my feelings of intimacy with Nature" অর্থাৎ আমার ধর্মবোধের প্রথম স্তর দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ উদ্বোধনে। প্রকৃতির সঙ্গে গভীর ও অন্তরঙ্গ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। তাই প্রকৃতির আনন্দের সঙ্গেও হয়েছেন একাত্ম। "আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কী পাওগো'— এই মন ও সুর বিশ্বজীবন বিধৃত।

উপনিষদে বলা হয়েছে, আনন্দ থেকেই ভূত সকল জাত হয়, জাতসমূহ আনন্দের দ্বারাই বেঁচে থাকে ; আনন্দেই ফিরে যায়, তাতেই প্রবিষ্ট হয়। জগতে – ভয়ের কোন প্রশ্নই নাই। আনন্দং ব্রাহ্মনো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন— ব্রাহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কোন কিছুতেই ভয় পান না। উপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে—" কো হ্যেবান্যাৎ ক: প্রানাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন সাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি; অর্থাৎ কে চেষ্টা করত, কে বেঁচে থাকত যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। সুন্দর ও আনন্দমদিরা বয়ে যেতে দেখে তিনি পুলকিত হয়েছেন, বাণী ও সুর দিয়েছেন গানে–

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল,/ সুমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল"
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত ফূল্যগন্ধ ;/ শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি ॥
অচল বিরাজ করে/ শশীতারা মণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,/ জয় জয় গীত গাহে সুর নর।

অপর একটি প্রকৃতি বিষয়ক সঙ্গীতে এমন উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন কবি। যেন চির আনন্দ, চির বসন্তে নব নব শোভায় বিকশিত হয়েছে বিশ্ব। নব পুষ্প, নবগীতি, আনন্দ বসন্তে রোমাঞ্চিত চারিদিক।

চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে/ নব কুসুমপল্লব, নবগীত, নব আনন্দ ॥
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকশিত/ নবপ্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য,/ তব প্রেম নয়নছটা।
হৃদয়স্বামী, তুমি চিরপ্রবীণ/ তুমি চিরনবীন, চিরমঙ্গল, চিরসুন্দর ॥

এই ধূলির ধরণী তাই কবির কাছে অমৃত। ধন্য মানবজীবন, ধন্য বিশ্বজগৎ, ধন্য প্রেম, তিনি এই আনন্দযজ্ঞে ধন্য। বিমল আনন্দে কুসুমিত পুষ্পের মত তার সৌন্দর্য অনুভূতি। এই সর্ব আনন্দ তরঙ্গের পরশ মাধুরী কবির মনে এনে দেয় অনাবিল প্রশান্তি। তাইতো তিনি বলেছেন –

আজি হেরি সংসার অমৃতময়/ মধুর পবন, বিমল কিরণ,ফুল্লবন
মধুর বিহঙ্গ কলধ্বনি ॥/ অসীম জগৎস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন !
ধন্য এই মানবজীবন, ধন্য বিশ্বজগৎ/ ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য ॥

গীতবিতানের প্রকৃতিবিষয়ক প্রথম সংগীতেও এমন উপলব্ধির কথা লিখেছেন কবি। এক অসীম অখণ্ড সৌন্দর্যের সুরেই বিশ্বজীবন বিধৃত। জলে স্থলে সর্বত্র এই রূপরস। তিনি লিখেছেন:

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।/ জলে স্থলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা – পারাবারে/ নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,/ নিত্য নিত্যরস ভঙ্গিমা।

সমগ্র বিশ্বচরাচর জুড়ে অবিরাম বেজে চলেছে – অনন্য রম্যবীণা। সমগ্র সত্তায় প্রাণে প্রাণে অপরূপ প্রেমের ও আনন্দের বন্ধন। নদী–সমুদ্র আকাশ সকলেই সেজে আছে রম্যবেশে। প্রেমে প্রেমে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে তুলেছে সব।

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে/ অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে
কুসুম সুরভী মাঝে বীণা রণন শুনি যে–/ প্রেমে প্রেমে বাজে ॥
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে–/ তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,/ ভক্ত হৃদয় নাচে বিশ্ব ছন্দে মাতিয়ে–/ প্রেমে প্রেমে নাচে ॥

তাইতো জীবনের প্রতি, মানবের প্রতি কবির আকুল আবেদন, সকলেই "আনন্দে থাকো, নির্ভয়ে থাকো, নির্মল প্রাণে প্রাণে/ আনন্দ গানে কল্যাণে/ সকলেই অমৃত নির্ঝর শান্তি রস পানে মিলন মধুর সুখে থাকো"। এই আহ্বানে কবি লিখেছেন –

সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে ॥/ জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায়, গৃহে চলো হে আনন্দ গানে।/ সংকটে সম্পদে থাকো কল্যাণে,
থাকো আনন্দে নিন্দা–অপমানে।/ সবারে ক্ষমা করো থাকো আনন্দে
চির অমৃত নির্ঝরে শান্তি রসপানে ॥

কবির এই অনুভূতির সঙ্গে উপনিষদের চেতনা বেশ স্পষ্ট। আভাসিত রবীন্দ্রচিত্তানুভূতির সঙ্গে প্রাচীন ঋষিগণের জগৎ অনুভূতির সাদৃশ্য নিয়ে তাই সংশয় থাকেনা। বিশেষত কবি যেন চিরকালীন সত্যকেই ব্যক্ত করেছেন এই বলে –

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে,/ দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥

পান করে রবি শশি অঞ্জলি ভরিয়া –/ সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি –
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥/ ... ...
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি/ প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।

অথবা –

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।/ ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে ॥
দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে/ উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে ॥

বলাবাহুল্য, উপনিষদের আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি রবীন্দ্র মননে আরো বিচিত্র মাত্রা লাভ করেছে। রবীন্দ্র কাব্যগীতের দার্শনিকতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালির মধ্যে কবির অন্তরের ভাবধারা এবং সাধনার কয়েকটি স্তরের পরিচয় দিয়েছেন। গীতালির ভাবধারা হলো তিনটি। যথাক্রমে–

১. সংসারের নানা কর্মের মধ্যে ও প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে পরম দয়িতের স্পর্শের ব্যাকুলতম অনুভূতি এবং তাঁর সঙ্গে কবির প্রেমলীলার আনন্দ প্রকাশ।

২. সহজ সরল উপলব্ধির বিপুল আনন্দ প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ।

৩. কবির ব্যক্তিগত জীবন লীলাতত্ত্বকে অনুভব করে নিজের অন্তর প্রেরণাতেই সাধন পথে অগ্রসর হওয়া।

এরপর "গীতালিতে' তিনটি প্রধান ভাবস্তরের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন–

১. ব্যথার মধ্য দিয়ে ভগবানকে লাভ– বেদনার পরম দান গ্রহণ;

২. পূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পন;

৩. পথিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ও নবতর চেতনা ও রসের অন্বেষণ।[১২]

উক্ত কাব্যত্রয়ের ভাব পরম্পরা চেতনা রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানেও লক্ষ্য করা যায়। গীতবিতানের সব প্রথমে রবীন্দ্রনাথ যে গানটি সংযোজন করেছেন সেটি কেবল গানই নয়, সেটি কবির জীবন দর্শনের সামগ্রিকতার অন্যতম দিক বলে মনে হয়। তিনি গানে লিখেছেন–

শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে,/ অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।
নিত্যরবে প্রাণ পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা

এই বাণী কবির একান্ত উপলব্ধির উচ্চারণ। সুখ দুঃখের ঢেউ খেলানো জীবন সাগর তীরে আজীবন হাসির মায়ামৃগীর পেছনে কান্নার জলে ভেসে চলাই যেন অনিবার্য ভবিতব্য। স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে এত বিপুল বিচিত্র বেদনা ও বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার তুলনা বিরল। আরো বিরল তাঁর বিশিষ্ট মনোদর্শনের প্রেক্ষাপটে সেই বেদনার অভিনব প্রতিক্রিয়া। তিনি অসীম দুঃখকে সকল সুখের সারিতে পরিণত করেছেন। অপ্রত্যাশিত অপচয় থেকে শুধু নিজেকে রক্ষা করেননি, প্রাণ পুড়ে গিয়ে নিঃশেষিত না হয়ে বরং রূপান্তরে জ্বলে উঠে গানের আগুন।

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন/ আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন॥
যখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায় মাঝে/ সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন/ আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন॥

কবির এ বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মূলে ভারতীয় দর্শন চিন্তার দুঃখ চেতনা নিশ্চয় ক্রিয়াশীল হতে পারে। সমালোচক বলেন,– "চেতনার অন্তর্নিহিত যে চির অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা জাগতিক ব্যর্থতা, মানসিক দুঃখ বেদনার কারণ অনুসন্ধানে রত হয়, সমস্ত দার্শনিক চিন্তার মতো তা ভারতীয় দর্শনের মূলেও ক্রিয়াশীল হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু সেই অন্বেষণের পরিণামে ভারতীয় দার্শনিকরা সেই দুঃখ বেদনাকে কখনোই পরিণামী সত্যের মর্যাদা দেয়নি। তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই তাদের পরম অন্বিষ্ট।"[১৩]

আস্তিকবাদী দর্শনের মূলকথা একটি কল্যাণকামী পূর্ণসিদ্ধি অর্জন। আর বেদনার দহন ছাড়া অন্তরের শুদ্ধি সম্ভব নয়। বস্তুত, দুঃখের কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেই আনন্দ লাভ করা যায়। বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের এই হলো পরম কাম্য। তবে ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন – আপন আপন কর্মই

মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে। শাশ্বত বিধানের বাইরে গেলে জীবনের পরম দুঃখের মাশুল দিতে হয়। সনাতন ধর্মে এই কর্মফলবাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জন্মান্তরবাদ। দুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়েই পূর্ণতার অভিমুখে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন–

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে/ ফোটে তোমার মানস সরোবরে।

ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আলোক ধারায়্লাত হয়েছেন, তবে কাব্যরসের ধারাটি অক্ষুন্ন রেখেছেন । ফলে, তাঁর গান ও কবিতায় এই দর্শন সংজ্ঞায়িত হলেও ভারাক্রান্ত হয়নি। প্রথম পর্যায় থেকে অন্তিম পর্যায়ের কাব্য ও সঙ্গীতে এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য যথার্থ, 'আদি মধ্য ও শেষ পর্যায়েও উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্তিম পর্যায়ে কবি যেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষির স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করেছেন।..... কোন কোন কবিতার বাক শৈলীতে পর্যন্ত উপনিষদের প্রভাব উপস্থিত।'

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্র মনন সঙ্গীত সাধনার বৈচিত্র্যে জীবন রসের আনন্দও হিল্লোলে সূক্ষ্ম আধ্যাত্ম চেতনার সঞ্চার করেছেন। তিনি নিজেই সীমা থেকে অসীমে গেছেন ছাড়িয়ে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যথার্থই বলেছেন:

> উপনিষদ ও বৈষ্ণব সাধনায় ভগবানকে খোঁজার শেষ আছে, পরম শান্তিতে সেখানে সাধনার সমাপ্তি আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্ম সাধনায় তাঁর চরম পরম বস্তু জীবন দেবতাকে খোঁজার আর অন্ত নাই। নিত্য–নূতন সেই খোঁজা, নিত্য নূতন সেই খোঁজার ব্যাকুল আনন্দ ও বেদনা । এ যেন নিত্য নূতন গল্প–রূপ রস ও আনন্দ মেলা।[১৪]

এই অন্বেষণের আনন্দ রেশ বহন করেছেন তিনি। কবি নিজেই নিজের সাধনার মর্মকথার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন–

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর/ যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নব জীবন লোকে।/ নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে।
নবীন হয়ে নতুন যে আলোক/ পরব তব নব মলিন ডোর।/ তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

৩.১.২: ব্রহ্মদর্শন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত :

কোন একক দর্শন চিন্তায় রবীন্দ্রমানস যদি পরিপুষ্টি লাভ করে থাকে তবে তা ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মধর্মের একেশ্বরবাদী চেতনার সঙ্গে যেমন মিলিত হয়েছে উপনিষদের অধ্যাত্ম চেতনা, তেমনি তাঁর ঈশ্বর ভাবনায় দ্বৈত অদ্বৈতবাদের লীলাবাদী বিশ্বাস সারাজীবনই আচ্ছন্ন রেখেছিল। কবির এই বিশ্বাস বরাবরই খণ্ডতাকে অতিক্রম করে অখণ্ড অবয়বে বিকশিত। এই বিপুল বিকাশ উপলব্ধি করা যায় সংগীতবিশ্বের ভেতর অবগাহন করেই। তাইতো "যোগাযোগ উপন্যাসের বিপ্রদাসের মুখে শুনি, সংসারের ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে ; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষদ্রকালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"[১৫] এভাবেই রবীন্দ্রনাথের গানে শাশ্বত চিরকালের এক বিমূর্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর গানে মানবাত্মা, বিশ্বাত্মা, এবং পরমব্রহ্ম ঈশ্বর এক অখণ্ড প্রকাশ । এই ব্রহ্ম ভাবনা কবির জীবনে ও কর্মে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব সঞ্চার করেছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি গীতবিতানের "পূজা পর্বের সঙ্গীতে। সর্বাধিক সংখ্যকসংগীত কবির এই বিশ্বাস থেকেই রচিত। বিষয়বিন্যাসের দিক থেকে গীতবিতানের তেইশ শ গানের মধ্যে ৬১৬ টি পূজা পর্যায়ের গান কবি রচনা করেছিলেন। এই পর্যায়ের গানগুলোকে আরো কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। তা হলো গান ৩২টি, বন্ধু ৫৯টি, প্রার্থনা ৩৬টি, বিরহ ৪৭টি, সাধনা ও সংকল্প ১৭টি, আনন্দ ২৫টি, বিশ্ব ৩৯টি, শেষ ৩৪টি, এমন সূক্ষ্মতর উপপর্যায়গত বৈচিত্র্য গীতবিতানের অন্য কোন পর্যায়ের গানে লক্ষ্য করা যায় না।

পূজা পর্যায়ের গানগুলোকে এ যাবৎ সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রী অমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "পূজা পর্যায়ের গানগুলি তাঁর বিশেষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান। এই গানগুলির কেন্দ্রে রয়েছে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট অনুভূতিগুলির কথা। কবি তাঁর অনুভূতির গভীরেও দুর্জ্ঞেয় ভগবানকে যেসব রূপে উপলব্ধি করেছেন, এই পর্যায়ের গানগুলিতে তাই যুক্ত হয়েছে কখনো আনন্দে, কখনো বিস্ময়ে, কখনো বেদনায়।"[১৬]

অপরদিকে, রবীন্দ্রসংগীতের সুবেদী সমালোচক ড. অরুণকমার বসু পূজার গান প্রসঙ্গে বিস্তৃত এবং অভিনব আলোচনা করে মন্তব্য করেন– "পূজা পর্যায়ের গানগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, তথাকথিত ব্রহ্মসংগীত এবং দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ ও ভক্তিপ্রেরণা থেকে উৎসারিত পূজার গান।"[১৭] অন্য এক গবেষক রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের গানগুলোকে মার্গ বা ধর্মীয় সংগীতের অর্ন্তভুক্ত করে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের সংগীতকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ব্রহ্মসংগীত এবং দ্বিতীয়ত অধ্যাত্মসংগীত। বস্তুত, এই পর্বেও গানের মুখ্য বিষয় হলো

কবির ঈশ্বরভক্তি এবং ঈশ্বর অনুরাগ। জীবনের প্রতি গভীর মমত্ব, জগৎ বা মর্ত্যের প্রতি দুর্মর প্রেম আর দৈনন্দিন দিন – যাপনের আনন্দ বেদনার সরস প্রকাশ ঘটেছে এইসব গানে। পূজা পর্বের ব্রহ্মসংগীত বিশেষ করে দর্শন উৎসারিত গানেরই প্রতিনিধিত্ব করে। স্মরণীয় যে, বাংলা গানের ধারায় ভক্তিবাদ একটি বিশিষ্ট রীতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানেও এই ভক্তিবাদ লাভ করেছে বিশেষ এক ধরনের দার্শনিক প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের প্রথম প্রকাশ রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম সংগীত ভাবনায়।[১৮]

পরবর্তী কালে মহর্ষি দেবেনন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে এই সংগীত ধারা অনুশীলন এবং চর্চিত হয়েছে। মূলত, ব্রহ্মসংগীত রচনার মূলেও সক্রিয় ছিল এক ধরনের সমাজ বিপ্লবের চেতনা। বলাবাহুল্য, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম পুরুষ যিনি বাঙালি জাতিকে মধ্যযুগীয়তা থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের আর্বিভাবের পূর্বে মধ্যযুগীয় শাস্ত্রশাসিত হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব প্রতাপে যে ঘোর অমানিশা বিরাজ করতো—তার বিকৃত রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "মহাত্মা রামমোহন রায়' গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থের একস্থানে লেখক বলেছেন:

> রামমোহন রায় যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদেও যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিলনা; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রায় আবীর, রথযাত্রার দোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে মনের আনন্দে কাল হরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না।[১৯]

ব্রাহ্মপণ্ডিতরাই ছিলেন সমাজপতি। সমাজে ধনসম্পদের প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করেই চলত পূজা পার্বণের আড়ম্বর। সুতরাং সনাতন ধর্মের ভক্তিবাদী মূলপ্রেরণার—অনুশীলন বা চর্চা ছিলনা। মূলত, ব্রাহ্মণ্যবাদের পৌত্তলিকতাকে কেন্দ্র করে আমোদ-প্রমোদ আর ভোগ বিলাসের আড়ম্বরে, অন্যদিকে বর্ণবৈষম্যবাদী সমাজে ধর্মের শুভবোধ পুরোপুরি ব্যাহত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, জড়তা ও অন্ধ মূঢ়তার অচলায়তনে যুক্তির নির্মল আলো এবং মুক্তির বাতাস নিয়ে আসেন রামমোহন রায়। তাঁর প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় —রামমোহন রায়ের প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলা ব্রাহ্মসমাজে সংগীতের একটি অভিনব ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। এমনকি, রামগতি ন্যায়রত্নও স্বীকার করেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার যুগটি ছিল গানের যুগ। এই যুগেই রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও এই চেতনা ধীরে ধীরে রামমোহনের ব্যক্তিপ্রভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বছরই অর্থাৎ ১৮৮২ সালে রামমোহন রায়ের গীত সংগ্রহগ্রন্থ "ব্রহ্মসংগীত প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ব্রহ্মসংগীতের জনপ্রিয়তা বিস্তৃত হয়ে থাকে। হিন্দু পৌত্তলিকতায় শাস্ত্রীয় মন্ত্রের মতোই উচ্চারিত হতো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মন্দিরে এবং আচার অনুষ্ঠানে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। ড. অরুণ কুমার বসুর গবেষণায় কয়েকশত ব্রহ্মসংগীত রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। সংগীত রচয়িতা এবং বৈচিত্র্যের আলোকে ধারনা করা যায় উনিশ শতকে ব্রহ্মসংগীত ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ রূপে বিবেচিত হতো।

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, রামমোহন রায় থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নব ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য রচয়িতার ব্রহ্মসংগীতের আবেদন বাঙালির চিত্তরস পিপাসা মেটাতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে করুনাময় গোস্বামী যথার্থই বলেছেন:

> রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক সঙ্গীত রচয়িতা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। তবে এর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। সুর ও বাণীর উৎকর্ষে এই গানের ভেতর দিয়ে বাংলা ভক্তিগীতির কালজয়ী রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঈশ্বর আনুগত্যের প্রতি গভীর অনুভব এই সঙ্গীত মালায় এমন সুষমা মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তা বিশ্বাসী মানুষমাত্রকেই অনুপ্রাণিত করেছে। সেজন্য ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্ষীয়মান হয়ে পড়লেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের জনপ্রিয়তা ক্ষয় হয় নি। সর্বোপরি, এ গানে কোন সাম্প্রদায়িকতা বা কোন বিশেষ ধর্ম গোষ্ঠীর প্রার্থনা সংগীতের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে নি।[২০]

বাংলা গানের প্রচলিত ভক্তিবাদী পাঁচালী কিংবা পদাবলীর রূপ থেকে বিশুদ্ধ সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতে। কবিগুরুর এই ধারায় সংগীত রচনার ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায়—বিশ বছর বয়সে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবের এক অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম আটটি গান রচনা করেন। এই গানগুলো মার্গসংগীতের আদর্শ অনুসারে রচিত হয়েছিল। তবে এই গানগুলো ভগবৎভক্তি প্রণোদিত

আধ্যাত্মিক সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের যথার্থ অধ্যাত্ম সংগীতের পালা সূচিত হয় গীতাঞ্জলি পর্বে। কিন্তু তার পূর্ব পর্বেও মার্গ সংগীতকেই ব্রহ্মসংগীত বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গীতবিতানের সংগীতের পর্ব বিভাজন করতে গিয়ে ব্রহ্মসংগীতকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন। গীতবিতানে ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যা ৬১৭ টি। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভূতির চেয়ে ধর্মানুভূতির প্রভাব কোনো অংশেই কম নয়। কখনও কখনও ধর্ম ও প্রেম একাকার।

প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/ তাই দিই দেবতারে
দেবতারে প্রিয় করি/ প্রিয়েরে দেবতা।

ব্রহ্মসমাজে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তভাবের সঞ্চার ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকে হরি, মা, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি ভক্তিসূচক সম্বোধিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্মসংগীতের প্রথম পর্যায়ে ঈশ্বরকে মাতৃভাবসূচক ভাবনায় প্রকাশ করা হয়েছে। মাতৃসম্বোধন, মাতৃআবাহন, মাতৃবন্দনা এই যে, মাতৃব্যাকুল প্রাণের আকুতি ভক্তচিত্ত থেকে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর এক নতুন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা রূপলাভ করে রবীন্দ্রসংগীতে। এমনকি, শ্যামাসংগীত, উমাসংগীতে মহামায়া জননী আদ্যাশক্তিতে ত্রিগুণাত্মিক বলে বন্দনা করা হয়। এই মাতৃচেতনা অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন জননীরূপে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রসংগীতে। "নৈবেদ্য" গীতাঞ্জলি (১৩১৭), "গীতিমাল্য, (১৩২২) ও "গীতালী (১৩২১) প্রভৃতি কাব্যে কবি ঈশ্বরকে জীবন স্বামী, প্রভু, জীবননাথ, অন্তর্যামী, প্রিয় প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করেছেন। বস্তুত, এইসব কাব্যের ও সংগীতের ভেতর দিয়েই কবির জগৎ দর্শন, বিশ্বপর্যটন, শেষপর্যন্ত ঈশ্বর সমীপে সমর্পিত হয়েছে। তবে এই ঈশ্বর অনুভূতি কবির কেবল ভক্তি নয়, তাঁর অন্তর উপলব্ধি এবং আত্মপোলব্ধি আনন্দও বটে।

এপর্বের গানগুলো প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী যথার্থই মন্তব্য করে বলেছেন:

> ব্রাহ্মসমাজের মূল যে ধারা, আদি ব্রাহ্মসমাজ, সেই সমাজের ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা।[২১]

একেশ্বরবাদী রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ব্রহ্মসংগীতের বিকাশ ঘটে। সমন্বয়বাদী লৌকিকধর্মের বাউলসাধক লালন শাহ ও রামমোহন উভয়ই রবীন্দ্রমানসচেতনাকে ঋদ্ধ করেন। খ্রিস্টপূর্ব পনের শতকের রচিত ঋগ্বেদে হিন্দুসমাজের চারটি বর্ণবিন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণভেদ ধারনা প্রাচীন হিন্দু সমাজ উঁচুনিচু বিভাজন তৈরি করে দেয়। অপরদিকে, মুসলমান সমাজও প্রচলিত ছিল আশরাফ–আতরাফ শ্রেণিবিভাজন। ফলে, শাস্ত্রজ্ঞ লালন শাহ্ হিন্দু ও মুসলিম সমাজের এই বর্ণভেদকে অস্বীকার করে মানবতত্ত্বকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেন। অস্বীকার করেন হিন্দু-মুসলিম জাতের বিচারও। সুফীবাদ ও বৈষ্ণববাদেও সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্পর্কে আশেক ও মাশেকের, ভক্ত ও ভগবানের। আর লালনের গানে তা হলো মনের মানুষ, রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীতে জীবনদেবতা। রবীন্দ্রনাথ বললেন—দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। তিনি অর্জন করলেন তাঁর কবিত্ব ধর্ম।

বস্তুত, তাঁর গীতাঞ্জলির জীবনদেবতা মর্ত্যলোক ও অমর্ত্যলোকের দ্বৈতরথে বিরজিত হলেন কবির আমি এবং তুমির সম্মিলনে। আপন অস্তিত্বের সন্দেহাতীত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নতুন দার্শনিকতায় দীক্ষিত করে তুললেন। স্রষ্টাকে তুমি ও আমির ব্যবধান। গীতাঞ্জলির এই মর্ত্য-অমর্ত্য চেতনালোকের সীমারেখা প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথÕ গ্রন্থে চমৎকার ভাষায় বললেন:

> গীতাঞ্জলি পড়বার সময়ে সবিস্ময়ে অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ধরে হাঁটছি। একটু এদিকে সরলে পা পড়ে মর্ত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিকে সরলে বাতাসে পাই অমৃতলোকের গন্ধ।[২২]

প্রার্থনামূলক সঙ্গীতে ঈশ্বরানুগত্যের অতি গভীরতর অনুভবের প্রকাশ ঘটে। একেশ্বরের প্রতি তাঁর প্রবল আনুগত্য থেকেই এই সংগীতসমূহ রচিত। ফলে, এই প্রার্থনা সংগীতগুলো সার্বজনীন সমাদর লাভ করেছে। স্রষ্টার প্রতি ভক্তিই শুধু নয়, দেহমনে একধরনের অনির্বচনীয় প্রশান্তির পরশ বুলিয়া দেয় এই প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনা ও বাণী ব্যঞ্জনা। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চা না করেও অনেক সংস্কৃতিবান মানুষ রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনামূলক সঙ্গীতে ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা ভাষী সম্প্রদায়ের মানুষ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষও রবীন্দ্রসঙ্গীতে সন্ধান পান নিজ নিজ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।

তবে উল্লেখ্য যে, বাউল গানের গুরুবাদী দর্শন রবীন্দ্রসংগীতে নেই। কিংবা বৈষ্ণবতত্ত্বের অবতারবাদী আধ্যাত্মিকতাও নেই রবীন্দ্র চেতনায় । রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনায় " নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে/ সর্বত্রগামীরে।" ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিরাট আমিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অরূপ থেকে স্বরূপে তার পরশ প্রার্থনা করেছেন:

অরূপ তোমার বাণী/ অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি ।।
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা–/ আমি শুধু তারই মাটির প্রদীপ, জ্বালায় তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ।।

কিংবা, তিনি বলেন, শুধু চোখের দেখা নয় হে প্রভু / মাঝে মাঝে তোমার পরশ খানি দিও।" তখন মনে হয়, লালনের মনের মানুষই যেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণের মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি যখন বলেন – "প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে / তাই হেরি তাই সকলখানে।" বস্তুত, গীতাঞ্জলি–তে কবি আমি ও তুমি সীমা ও অসীমের পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে মুক্ত সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কখনো বীণার সুর, কখনো আলোকের করুণাধারার গীত ওুাত হয়েছেন। তাই তো তার প্রার্থনা :

১. আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।/ আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ।
যে নতুন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘরের জালে/ আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
২. ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা/ প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
৩. গান তোমার সুরে, দাও সে বীণাযন্ত্র/ শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র।
বাজাও আমারে বাজাও
৪. বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে/ সেই সুরে মোর বাজাও।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই সব গানে কেবল ব্রহ্ম দর্শনই নয়। তাঁর পূজা ও প্রার্থনামূলক সঙ্গীতের ভাববাণীতে সুফীবাদী দর্শনেরও প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। বিখ্যাত সুফী সাধকের মুরিদ হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া প্রতিষ্ঠিত "চিশতী নিযামিয়া" শাখার ফকীরগণই ভারববর্ষে সংগীত শিক্ষার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ড. সুকুমার সেন "ইসলামী বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন : প্রাচীন বাংলা ভারতীয় সাহিত্যের যে সামান্যতম নমুনা অদ্যাবধি উদ্ধৃত হয়েছে, বাংলা চর্যাপদ ব্যতীত বাকী সবটুকুই তার সিন্ধুপাঞ্জাবের মুসলিম কবি হাফিজ, সাদী, রুমি, জামি প্রমুখের গান ও গজলের প্রতি দৃষ্টি দিলেও লক্ষ্য করা যাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার পরম রহস্যভেদের মানব। তারই আকর্ষণে মানুষের চিন্তার ভাবে, কর্মে, সার্বজীননতার আর্বিভাব, মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন, সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনসীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়।" উপনিষদেও ঈশ্বর, কখনো সাকার ও কখনো নিরাকার রূপে বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানবদেবতাও ধরা দেয় সাকার আবার নিরাকারেও। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়ে ওঠে কবির চিত্তে। তিনি বলেন :

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ/ কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমর বিশ্বছবি/ দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,.....
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি/ রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী .....।

আবার জীবনদেবতাকে হৃদয়ের মাঝে ঠাঁই করে দেন এবং নিবেদন করেন – তোমার বিশ্বব্যাপিণী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও / সকল বিশ্ব ডুবিয়া থাক শান্তি পাথারে / সকল দঃুখ সুখ থামিয়া যাক হৃদয় মাঝারে/" আবার তিনি নিবেদন করেন, 'পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে/ শান্তিসদন সাধন ধন দেব দেব হে।'

রবীন্দ্র কাব্য ও গানে সবর্ত্র বিরহের আর্তি। বিরহেরই আরতি নিয়ে তিনি পরম প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছেন। "এসো এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে ... । " অথবা – এসো হে এসো, সজল ঘন/ বাদল বরিষণে–/ বিপুল তব শ্যামল ুহে/ এসো হে এ জীবনে।" আবার পরম দেবতাও মিলিত হয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে নিজস্ব আনন্দ উপভোগের জন্য। কারণ– যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা/ আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা/ .... আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল/ নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।" সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির ইমেজ থেকেও কবি পরম দেবতার

সত্যের সন্ধান লাভ করেন। সে তো বৈকুণ্ঠের দেবতা নয়, মানবদেবতা এবং মর্ত্যদেবতারূপে নিখিলের অর্থাৎ সমগ্রের সামগ্রিকতার, সম্পূর্ণতা বা ভূমার সাধনা করেছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন–

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ/ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস –
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,/ পাগলি ওগো, ধরায় আস।

পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, প্রাণসাগরে অবগাহনের জন্য তিনি আত্মবন্দনা করে লিখেছেন।

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।

রবীন্দ্রনাথের তাই আরাধনামূলক বাণীবন্দনায় মনে হয় সাধক ও সম্বোধক অভিন্ন হয়ে ওঠেন। ব্যাকুল মানবাত্মার মধ্যেই একক সত্তাই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং উভয়ই সমার্থক হয়ে ওঠেন। কবিসত্তায় বাণী উচ্চারিত হয়–

প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তিমোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার–
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।

পূজা ও প্রার্থনা পর্বের সঙ্গীতে কবি বার বার মূলত আত্মসমর্পণ ও আত্মোদ্বোধন করেছেন। অন্তহীন এই বিশ্বের প্রাণপ্রবাহ ও মানব প্রবাহের মাঝে স্রষ্টার ও সৃষ্টির নতুনত্বের মাঝে কবি বার বার নিজেকে আবিস্কার করেছেন। স্রষ্টার সীমাহীন ব্যাপ্তির মাঝে তিনি চেয়েছেন নতুন জন্ম– স্রষ্টারই অভিন্ন সত্তারূপে। আমা হতে, নাথ, তোমাকে মোরে নতুন জন্ম দাও হে"– এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনার শেষ কথা। এই দেবতা হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, তাই আরাধনা বৃহৎ ও মহত্তম মানব দেবতার কাছে।

৩.১.৩: বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রসংগীত:

রবীন্দ্রমননে বৌদ্ধদর্শন এবং গৌতম বুদ্ধের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। তাই তাঁর দার্শনিক গানে বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে সংযোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধকে তিনি বিশ্বসত্য বলে মনে করতেন। মানুষের কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের শক্তিতে বৌদ্ধদর্শন এক নিয়ামক অভিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থে বলেছেন– আমি যখন জাপানে গিয়েছিলাম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য,যেমন সত্য এই আকাশের আলোক; এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্তই সত্য বলে তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে। সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রীপ্রেম।..... সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভাল হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার'।

এখানে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহুপূর্ব থেকেই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি একটি অর্ন্তনিহিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে ১৮৫৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর , পুত্র সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব চন্দ্র সেনকে নিয়ে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পীঠস্থান সিংহলে যান। সেখান থেকে ফিরে আসার পরই তিনি বৌদ্ধ ধর্মদর্শন নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনচর্চার শুরু হয়। বস্তুত সেই প্রেক্ষাপটটি যে রবীন্দ্রমননে প্রভাবপ্রসূত ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। পারিবারিক আবহ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

এছাড়াও পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একটি সার্বজনীন দর্শন আছে। সমালোচক বলেন– 'রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বৌদ্ধ ধর্মকে মানুষের ধর্ম বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।' আর এই বিশ্বাসের মূলেও ছিল বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবজাত ভাবনা। তবে রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আর্কষণের মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব বৌদ্ধ কাহিনী নিয়ে কবিতা ও নাটক লিখেছেন তার রাজেন্দ্রলালের " দ্য স্যানস্ক্রিট লিটারেচার অব নেপাল' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা জীবে প্রেম। এই ধারনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সনাতন হিন্দু সমাজের বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রচারের জন্য "বিসর্জন' নাটক রচনা করেন। এমনকি, "মালিনী' নাটকেও বৌদ্ধধর্মীয় দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। মালিনীর নব ধর্মের যে উল্লাসময় অভিমান চিত্রিত হয়েছে তাতেও রয়েছে বৌদ্ধধর্মের সার্বজনীন দয়ামুগ্ধ রূপ। স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবন থেকেই বুদ্ধদেবের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি বুদ্ধগয়ায় যান এবং মূর্তি দর্শন করেন। তারপর শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে প্রণতি জানাবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। ১৩৪২ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ সাধনাতে গিয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন– "আমি যাঁকে অন্তরের শ্রেষ্ঠমানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।"

প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রী চৈতন্যদেবের পরই রবীন্দ্রনাথ একমাত্র মনীষী হিসেবে বুদ্ধদেবের চরিত্র মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই ছিলেন আস্তিক কবি। তবে বৌদ্ধধর্মের নৈতিক আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই আদর্শকেই তিনি সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন। সমালোচকের মতে, "উপনিষদের যুগে আমরা দেখতে পাই এই সময় যাগযজ্ঞ, আচার–বিচার ইত্যাদির অন্তরালে শাস্ত্রগত তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপারটি ছিল প্রধান, কিন্তু মানব সম্পর্ক অর্থাৎ দয়া, মায়া, করুণা, প্রেম, মৈত্রী ইত্যাদি মানুষের হৃদয়ের সুকোমল অনুভূতিগুলির প্রতি তখন সেভাবে গুরুত্ব আরোপ হতোনা। ত্যাগ, প্রেম, কল্যাণ যা মানুষের শ্রেষ্ঠ মহিমা তাকে তখন দৈবলীলা রূপে চিত্রিত করা হতো। তখন মানুষের চেয়ে দেবতাকে বড় করা হতো। মর্ত্যলোক ছেড়ে অমর্ত্যলোকের মহিমা ছিল অধিকতর স্বীকৃত। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মে মানব সম্পর্ক ও ঐসব হৃদয়বৃত্তিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে শ্রেয়বোধ ও কল্যাণ শক্তির মহিমা নিহিত আছে, তাকে উদ্বুদ্ধ করাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে লিখেছেন : "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানুষকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া, কল্যাণ, তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই। মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তিকে ও উদ্যমকে তিনি মহিয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নয় তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ সম্মিলিত মানুষের ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই তিনি চিরকাল মানবধর্মে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন − My realigion is human riligion. সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মানবমৈত্রী ধর্মের উপাসক। তাঁর ধর্মকে যদি কোন নাম দিতে হয় তবে তা মানবধর্ম। অহিংসা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সততা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বুদ্ধদেব ও মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রচারিত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকে অবলম্বন করেছিলেন। বিশেষ করে বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কত অনুরক্ত ছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় কবির লেখা To the Buddha কবিতায়। এই কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের প্রশস্তি শুধু নয়, তাঁর দর্শনকেও শিল্পিত অবয়বে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট গৌতমবুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। বুদ্ধদেব সত্যিকার অর্থে তাঁর জ্ঞান ও বোধচর্চার দ্বারা মানুষকে পূর্ণতম মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা মানুষকে মহিমাময় হওয়ার দীক্ষা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে এই ত্যাগ এবং মহিমার কথা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব ভোগ ও রাজসুখ পরিত্যাগ করে মানুষের দুঃখ লাঘবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ত্যাগ ও সংযমের সঙ্গে জীবন সাধনায় ব্রতী ছিলেন। ত্যাগ ও সংযমের সাধনায় তিনি বৌদ্ধদর্শন ও চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই বৌদ্ধজাতক, অবদান ইত্যাদি থেকে ত্যাগের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল বহু কাহিনী অবলম্বন করে তিনি কাব্যনাটক রচনা করেছেন। সেখানে দরিদ্র নারী ত্যাগের আবেগে পরিধেয় শেষ বস্ত্রটুকু প্রভু বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করেছেন। প্রজার জন্য রাজা রানীকে ভিখারিনী করেছেন। প্রভুর ওপর ভক্তি ও পূজার আবেগে বৌদ্ধ ভিক্ষু নগরের লাবণ্যময়ী নটীর যৌবন সম্ভোগের আমন্ত্রণ অবহেলা করেছেন। এই সমস্ত ত্যাগদীপ্ত কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় প্রতিভায় কাব্যমহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। ত্যাগের স্বাভাবিক পরিণতিতে আসে সংযম, দেহে, মনে কথায় ও কাজে। সংযমের অপূর্ব মহিমা বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন ধারা দেখলে সহজেই

বোঝা যায়। এই সংযম থেকেই সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেন – "সৌন্দর্যকে পুরো মাত্রায় ভোগ করতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃতি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্ন ব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথবা অল্পই তাহার পেটে যায়, ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশাই হয়।" রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, সৌন্দর্য প্রেমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংযমের অসামান্য গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি বলেছেন:

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে/ নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদের পুণ্যকর্মে করেছ মহান নৈবেদ্য।

বুদ্ধদেবের আদর্শ অনুসরণ করে যেসব জাতি চারিত্রিক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে জাপান তাদের মধ্যে অন্যতম। জাপানিদের চরিত্রের মধ্যে তাদের কথায়, আচার, আচরণে এই সংযমজাত সৌন্দর্যের মহিমার কথা রবীন্দ্রনাথ বহুক্ষেত্রেই ব্যক্ত করেছেন। মূলত, মানুষের আত্মশক্তিকেই বৌদ্ধদর্শনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কর্মে এবং প্রয়াসে যার উপর সুবিবেচকের নিয়ন্ত্রণ আছে, সেই আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়। যুদ্ধে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় না করে কেবল যিনি নিজেকে জয় করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ সংগ্রামজয়ী। আত্মজয়ের এই মহিমা রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীতে বিধৃত হয়েছে। যেমন:

করিসনে লাজ, করিসনে ভয়/ আপনাকে তুই করে নে জয়
..../ সবাই তখন সাড়া দেবে/ ডাক দিবি তুই যারে।

বুদ্ধদেব মানুষের কর্মের মধ্যেই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছেন। এটাই বৌদ্ধধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে যেখানে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে, বুদ্ধদেব সেখানে মানুষের আত্মশক্তি ও বিকাশ ক্ষমতাকে দিয়েছেন অধিক মর্যাদা। বুদ্ধদেব মনে করেন, মানুষ আত্মশক্তির বলেই পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্য ঐশ্বরিক করুণা বা সহায়তা প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মশক্তির এই জয়গানকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাতেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তির প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া, কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই। মানুষের অন্তর হইতে তিনি তাহা আহবান করিয়াছিলেন।" বৌদ্ধধর্মের অন্যতম গ্রন্থ ধম্মপদে বলা হয়েছে– "আত্তাহি অত্তোনো নাথো / আত্তাহি অত্তোনো গতি।" মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। আত্মশক্তির এই মহিমা রবীন্দ্রনাথও তাঁর পূজা পর্বের গানে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে–

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখে তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা,/ দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
..../ আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা–
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী ও করুনা প্রসঙ্গে নব নব ধারনার কথা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট দুঃখ যেন আনন্দেরই নামান্তর। তাঁর দুঃখ পর্যায়ের প্রথম গান "আর রেখনা আঁধারে" দুঃখকে এক আনন্দময় পরিত্রানের চেতনা রূপে কবি আবাহন করেছেন –

কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার সুখের বাণী সয়না যে আর
নয়ন আমার যাকনা ধুয়ে অশ্রুধারে–
আমায় দেখতে দাও।

মূলত, দুঃখ বা গ্লানির আবিলতা মুছে দিয়ে "আমার আপনারে" সত্য করে দেখার যে দুঃখ তাকে আনন্দ ছাড়া কী আর বলা যায়! "দুঃখ আমার অসীম পাথার" গানে স্পষ্ট সেই আনন্দ ধ্বনি। সমালোচক বলেন– "দুঃখের নয়, দুঃখ উত্তরণের এই গানে প্রাপ্তির আনন্দ প্রয়াসের দুঃখ স্মৃতিকে রমণীয় করে তুলেছে।" ২২ অনুরূপ ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন' গানে। দুঃখ অবসানের উৎসব সঙ্গীত বলা যায় একে। মূলত, দুর্যোগের ঘনঘটার ভেতর দিয়ে প্রশান্তির পটভূমি রচিত হয়েছে। আবার "সাগর পাড়ি দেব" গানে সেই আনন্দের তটভূমির উদ্দেশ্যে– দুঃখের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দীপনা প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে, 'যখন তোমায় আঘাত করি', 'দুঃখ যদি না পাবে তো', 'তোমার বাজে বাঁশি', 'আমি বহু সাধনায় প্রাণমনে চাই'– এই গানগুলোতে দুঃখের প্রতিক্রিয়ায় ব্যথিত নয়; কৃতজ্ঞতার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কারণ দুঃখের প্রতিকূল দর্শনই অন্তরে

সত্য উপলব্ধির স্ফুলিঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'নয় এ মধুর খেলা' গানে জীবন লীলায় এই সত্য তাৎপর্য ধরা দিয়েছে। এ খেলা নিছক কোমল– করুণায় মধুর নয়, আবার নয় অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতাও। কঠিনে মধুরে সম্পূর্ণ এ উপলব্ধিকে শুধুই দুঃখকর বললে তাঁর পরিপূর্ণ ছবিটি ধরা যাবেনা। এই পরিপূর্ণতার বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'আজি বিজনে ঘরে' গানে দুঃখের সাধনা পরিণামে সুখ দুঃখের অতীত পরম প্রশান্তিতে পরিণত হয়েছে। সে সুখের আতিশয্যে বিমোহিত হয়ে বলেন, 'আমার হৃদয় ভেঙে দিল কী মাধুরীর ভার' এখানে ঘরের বেদনার পূর্ণতাতেও একই চরিতার্থতার সুর বেজে ওঠে।

দুঃখের গানের মত বিরহের গানগুলোতেও ফুঠে ওঠে মধুরতর মিলনের ছবি। যেমন এই গানটি –

ওগো পথিক আজকে আমার সকল পরান ব্যোমে/ থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় হয়েছে আজ ফুরাল মোর যা ছিল কাজ/ বাতাস এসেছে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে।

তখন মনে হয় এ যেন দুঃখের গান নয়, দুঃখকে অতিক্রমের তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়েছে তার বাণী ও সুরে। কিন্তু বাণী ও সুরের আড়ালেই আবার আছে তত্ত্বকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পারার বেদনাও। এই বেদনা রবীন্দ্রনাথের চিরসঙ্গী। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও কবি এই অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেই হয়তো লিখেছেন

আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন/ সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

ভগবান বুদ্ধের সর্বত্রই ছিল অনির্বচনীয় আনন্দলোক প্রাপ্তি। কিন্তু অহং থাকলে সেই আনন্দ বিশুদ্ধভাবে কখোনই লাভ করা যায়না। তিনি বাসনা বিলুপ্তির কথা বার বার বলেছেন। তিনি বলেছেন মানুষকে সর্বপ্রাণীর কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথও আত্মার শুদ্ধতার কথা স্বীকার করেন। তিনি আত্মার শুদ্ধ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, " আত্মার শুদ্ধ অবস্থা হলো মৈত্রী, করুণা নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধদেব কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেননি। তিনি প্রেম বিস্তার করতে বলেছেন। বিস্তার দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোকে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।"

বৌদ্ধধর্মের সুত্তনিপাতে বলা হয়েছে–

সব্বে সত্তা সুখিতা হন্ড অবেরা হন্ত/ অব্যাপজঝা হোন্তসুখী অত্তানং পরিহন্ত
সব্বে সত্তা স যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্ত।

অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সুখ হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংস হোক সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক সমস্ত প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক, মানব মনে সকল প্রাণী সুখী হোক এই চিন্তাই সদাজাগ্রত থাকবে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন – মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন ; সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে। উর্ধ্ব অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে। '

মৈত্রী ভাবনায় যেসব গুণাবলী বৌদ্ধদর্শনে লক্ষ্য করা যায় তা হলো প্রথমে নিজের প্রতি, তারপর নিজের প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সৌহৃদ্যতা। আচার্যের প্রতি এরপর সর্বাগ্রে এবং শেষে বৈরীদের প্রতিও মৈত্রী ভাবনা বিস্তার করতে হবে। এই চেতনার মতো রবীন্দ্রদর্শনেও একই ভাবাদর্শ দেখা যায়। বিশেষ করে নির্বিশেষ যাত্রার এই সাধনায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের প্রকৃষ্ট সাধনা। আবার করুণার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুভূতি ব্যক্ত হয়। বৌদ্ধ ভাবনায় বলা হয়েছে পরের দুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখী হতে হবে। সুখে ও দুঃখে নির্বিকার থাকার নামই হলো উপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথ মনুষের ধর্ম নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে, সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগ সাধনার দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে চায়।'

সমস্ত সত্তা অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। এই প্রত্যাশা রবীন্দ্র মানসেও লালিত হয়েছে। তিনি ত্যাগে, দুঃখে, সংযমে, সাধনায় এই মানসচেতনা লাভ করেছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ যে উন্নত মার্গে আত্মস্থ হয়েছিলেন তা ছিল বৌদ্ধদর্শন ও ভারতীয় চিন্তারই যোগ্য উত্তরাধিকার।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন বৌদ্ধদর্শন ও উপনিষদীয় দর্শনে সাজুয্য আছে। দুঃখ, মৃত্যু বৌদ্ধদর্শনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও দুঃখের দর্শন নানা ভাবে প্রকাশিত। বুদ্ধদেব যেমন দুঃখের কারণ নির্ণয় করেছেন,তেমনি রবীন্দ্রনাথও দুঃখের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন বহুভাবেই। বুদ্ধদেব দুঃখের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে একেবারে মূলে আঘাত করেছেন। তাঁর মতে অবিদ্যার ক্ষয় থেকে সংস্কারের এবং সংস্কারের ক্ষয় থেকে বিজ্ঞানের ক্ষয়। আবার বিজ্ঞানের ক্ষয়ে নামরূপের ক্ষয়, আর নাম রূপের ক্ষয় হলে হয় আয়তনের ক্ষয়। এইভাবেই স্পর্শের ক্ষয়, বেদনার ক্ষয়। পরিশেষে উপাদানের ক্ষয় হলে আর জ্বরা নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি। এই একই ভাবে রবীন্দ্রনাথ দুঃখের অভিঘাতে, দুঃখের দহনে দুঃখের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে পেয়েছেন। বুদ্ধদেব যেখানে বাসনা বিলাসের মধ্য দিয়ে ত্রিতাপ দুঃখের হাত থেকে নিস্কৃতি দানের চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বাসনাসহ সর্বদুঃখের বীজকে কর্মের কঠোর অভিঘাত সমূলে বিধ্বস্ত করে তুলেছেন। তাই দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গানে বলেছেন –

আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয়না কিছুই আলো।

স্বয়ং বুদ্ধদেব বলেছেন –সংসার যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। এখানে প্রতিনিয়ত দুঃখের আগুন ধিক ধিক জ্বলছে। জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে কারও যেন রেহাই নেই। সকলের একদিন মৃত্যু আসবে। কাজেই মৃত্যুর জন্য বিলাপ করা বৃথা। জীবের পক্ষে জীবন, মৃত্যু দুটোরই সমান গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথও জীবন ও মৃত্যু প্রসঙ্গে এমন কথাই ভেবেছেন। তিনি সমগ্র জীবন ধরে মৃত্যুকে জীবনের মতই ভালবেসেছেন। তিনি বলেছেন –

জীবন তোমায়
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসি নিশ্চয়।

মৃত্যুকে তিনি বন্ধু নাথ, অসমে শরণ জ্ঞান করেছেন। অন্য একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন –

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ/ নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।/ তুমিই তো আনন্দ লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশে শোক, তাপহরণ
তোমার চরণ অসীম শরণ দীনজনার।

বস্তুত, বৌদ্ধদর্শন ভিত্তিক ভাবনার অনুষঙ্গবাহী অন্যান্য সঙ্গীতের একটি তালিকা তৈরি করলে নিম্নরূপ গানগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন–

১. চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি/ তুমি হে প্রভু
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে তোমার জগতে,/ চিরসঙ্গী চিরজীবনে। (পূজা/ ৪৫৩)

২. জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারার এসো।/ সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো ॥
কর্ম যখন প্রবল– আকার গরজি উঠায়ে ঢাকে চারিধার
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো ॥ (পূজা/ ৯৫)

৩. তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে বাজে যেন সদা বাজে গো ॥ (পূজা/ ১০৩)

৪. অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে- নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে ॥ (পূজা/ ১১১)

৫. অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ-
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান ॥ (পূজা/ ১১৪)/ তোমারি ইচ্ছা হউক করুণাময় স্বামী।

৬. তোমারী প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা–
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ॥ (পূজা/ ১১৩)

৭. হে জীবন,হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥/ আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা– করো হে আমার লজ্জাহরণ॥
পরশরতন তোমারি চরণ– লইনু শরণ, লইনু শরণ। (পূজা ১১৫)

৮. দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহবান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে ॥ (পূজা ১১৭)

৯. তোমারী সেবক করো হে আজি হতে আমারে।/ চিত্ত–মাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহো নাথ,
তোমার কর্মে রাখো বিশ্বদুয়ারে ॥ (পূজা ১১৯)

১০. হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।/ সংসারে যা দিবে মানিব তাই,
হৃদয়ে তোমায় যেন পাই। (পূজা ১১৫)

১১. ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জন্ম দাওহে ॥
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে সংশয় হতে সত্য সদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জন্ম দাওহে ॥ (পূজা ১২৪)

১২. পদপ্রান্তে রাখ সেবকে,/ শান্তি সদন সাধনধন দেব দেব হে ॥ (পূজা ১২৫)

১৩. বরিষ ধরা – মাঝে শান্তির বারি/ শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে/ ঊর্দ্ধমুখে নর–নারী। (পূজা ১২৬)

১৪. সার্থক কর সাধন,/ শান্ত কর ধরিত্রীর বিরহকাতর কাঁদন/প্রাণ হরণ দৈন্যহরণ অক্ষয়করুণাধন ॥ (পূজা ১২৭)

১৫. প্রভু তো লাগি আঁখি জাগে;/দেখা নাই পাই/ পথ চাই,/ সেও মনে ভালো লাগে ॥ (পূজা ১৩৮)

১৬. ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে। / আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণ দরশ – আশে ॥ (পূজা ১৭০)

১৭. হৃদয়নন্দনবনে নির্ভৃত এ নিকেতনে।/ এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর ॥ (পূজা ১৬৮)

বুদ্ধদেবের মতাদর্শকে বারবার স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রচিন্তায় বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধভাবনার প্রত্যক্ষ প্রতিভাস যেমন আছে তেমনি পরোক্ষ অনুপ্রেরণাও অলক্ষ্যে কাজ করেছে। তাঁর গানের বহু চিত্রকল্পে, বাণীতে ও ব্যঞ্জনায় সেই ভাবনার পরিচয় মেলে। অনেক সময়েই কবির ভাবনার বিশ্বদেবতা ও করুণা ঘনরূপী বুদ্ধ সমীকৃত হয়ে গেছেন। লক্ষণীয় বৌদ্ধসাহিত্যে শরণ' শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধধর্ম বিকাশের প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। বিনয় পর্বকের পরম্পরা অনুসারে ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মন্ত্রের ব্যবহার বৌদ্ধধর্মের মধ্যে উপসম্পদা গ্রহণের সময় থেকেই গৃহীত হয়েছে। যেমন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি/ ধর্ম শরণং গচ্ছামি/ সংঘং শরণং গচ্ছামি।'

লক্ষণীয় স্মরণ' শব্দটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারের নিত্য নিয়ত দুঃখ কাতর জীব আর্ত হয়ে বুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করেছে। ভিষক যেমন ভেষজ বিধানের দ্বারা রোগীর রোগ, তাপ দূর করেন, তেমনই বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম উপদেশের মাধ্যমে দুঃখক্লীষ্ট জীবকে ত্রাণের পথ দেখান। রবীন্দ্রনাথ তাই বুদ্ধদেবকে মহাত্রাণ মহাশরণ বলেছেন। নিষ্ঠাসম্পন্ন বুদ্ধভক্তের মত তিনি বারে বারে সকাতরে করুণাময় বুদ্ধের কাছে শরণ কামনা করেছেন। তাই বিশেষ ভাবনার পক্ষে রয়েছে তাঁর নিম্নলিখিত গানগুলো। যেমন:–

১. তুমি বন্ধু তুমি নাথ (পূজা/ ৬৯)
২. সকল কলুষ তামস হর, জয় হোক তব জয় (পূজা / ৩৭৭)
৩. পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে (পূজা / ৪৫০)
৪. শীতল তব পদছায়া (পূজা / ৪৭১)
৫. নমি নমি চরণে/ নমি কলুষ হরণে (পূজা / ৫০৩)
৬. শুনেছ তোমার নাম অনাথ আতুরজন (পূজা / ৪৫১)
৭. এখনো আধার রয়েছে হে নাথ (পূজা / ৪৩৩)
৮. ডাকিছে কে তুমি তাপিত জনে (পূজা / ৪২৪)

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্রাতা, মহাশরণ। তাঁর কাছেই তিনি সংসারের দুঃখজ্বালা ভুলে আনন্দ ও সুখ পেতে চান। কারণ বুদ্ধের বাণী জীবকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেয়। মুক্তির পথ দেখায়। তাই কবি তার অনেক গানেই শরণ' শব্দটি প্রয়োগ করে বৌদ্ধ ভাবদ্যোতকে ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন। যেমন তাঁর এই গানটি–

তুমি বন্ধু নাথ নিশিদিন তুমি আমার/ তুমিসুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার
তুমিইতো আনন্দলোকে, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক,/ তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীনজনার ।।

এ গানে কবি রবীন্দ্রনাথ কাতরকণ্ঠে বুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন :

তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার/ তুমিইতো আনন্দলোকে, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীনজনার ।।

বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নিবেদন এই গানে লক্ষ্য করা যায়। মূলত, তিনি অন্তর থেকেই তাঁর প্রতি ভরসা বা আস্থার সম্পর্ক অনুভব করেছেন। যখনই কোন দুঃখ কিংবা সংকট এসেছে, অশান্তি দেখা দিয়েছে তখনই তিনি বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। লাভ করেছেন আত্মার শান্তি। তিনি লিখেছেন :

আজি মম চাহে জীবন বন্ধুরে/ সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে/ সেই চির আনন্দ, বিমল চিরসুধা
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ ।। (পূজা/১৭২)

বৈশাখি পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি পবিত্র উৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি গান রচনা করেছেন। এই গানেও কবি মহাসংকটের দিনে সকল দুর্গতিনাশক বুদ্ধের শরণ করেছেন:

সকল কলুষ তাপসহর, জয় হোক তব জয়/ অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবনময়
মহাশক্তি, মহাক্ষেম, মহাপূণ্য মহাপ্রেম ।।/ জ্ঞানসূর্য – উদয়ভাতি ধ্বংস করুক তিমির রাতি
দুঃসহ, দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর ভয় ।।/ মোহমলিন অতি – দুর্দিন শঙ্কিত– চিত পান্থ
জটিল গহন পথ সংকট – সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত/ দাও দুঃখ বন্ধু তরণ মুক্তির পরিচয় ।। (পূজা / ৩৩৭)

সকল দুর্গতি হরণ করার জন্য পরম করুণাময় মহামতি বুদ্ধের শরণ কামনা করেছেন কবি। বুদ্ধদেবের প্রতি শান্ত সমাহিত, করুণাঘন শীতল পদছায়াযুক্তস্নিগ্ধি রূপটি বার বার কবি উচ্চারণ করেছেন। তাঁর পূজা পর্যায়ের একটি গানে অনুরূপ অনুভূতি প্রকাশিত –

মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দূরে যায়
করুণাকিরণ তাঁর অরুণবিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে ॥ (পূজা / ৪৫০)

শুধু শরণ' নয় মহামতি গৌতম বুদ্ধের অসীম করুণার প্রতিও রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। নানা গানে নানা ভাবে গৌতমবুদ্ধের করুনার জয়স্তুতি করেছেন। যেমন –

১. শীতল তব পদ ছায়া/ তাপহরণ তব সুধা (পূজা / ৪৭১)
২. অগাধ গভীর তোমার শান্তি/ অভয় অশোক তব প্রেম মুখ ॥ (পূজা/ ৪৭১)
৩. অসীম করুণা তব/ নব নব তব মাধুরী/ অমৃত তোমার বাণী (পূজা/ ঐ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার চেতনার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব একাকার। পরম ভক্ত যেমন তাঁর প্রভুর চরণে ভক্তি নিবেদন করে, দুঃখ, শোক, তাপ গ্লানি থেকে মুক্তির আরাধনা করে, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের আশ্রয়স্থলকে শান্ত শীতল পদছায়া বলে কল্পনা করেছেন। সেই আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পন করেছেন। অভয় অশোক' স্বরূপ বুদ্ধ তাঁর প্রেম মুরতি তাঁকে আত্মবিশ্বাস ও শান্তি দান করে। তাই কবি রচনা করেন এই নৈবেদ্য সংগীত:

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজে/ সত্য সুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,/ বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে/ করিছে পান, করিছে দান, অক্ষয় কিরণে ॥ (পূজা / ৪৭৬)

যদিও এই গানে বিশ্বদেবতার বন্দনা করেছেন, তবুও শেষের তিনটি অংশে আমরা বৌদ্ধ অনুষঙ্গের সাক্ষাৎ পাই। লক্ষণীয়–

বহে জীবন রজনী দিন চির নূতন ধারা/ করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
হে প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,/ কত সান্ত্বনা করো বর্ষণ সন্তাপহরণে ॥
জগতে তব কি মহোৎসব, বন্দম করে বিশ্ব/ শ্রী সম্পদ ভুমাস্পদ নিভয়শরণে ॥ (পূজা / ঐ)

সমালোচক বলেন, নমি নমি চরণে গানটিতেও কবি বুদ্ধদেবরই চরণ বন্দনা করেছেন এবং তার চরণে শরণ প্রার্থনা করেছেন। বুদ্ধদেবকে তিনি 'নিখিলশরণ' আখ্যা দিয়েছেন। জীবন মরণে সুখে দুঃখে, জয় পরাজয়ে, ভয়ে সংশয়ে কবি নিজে তাঁর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছেন। গানের কথার মধ্যে বুদ্ধের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে কবি নির্ভীক একাগ্রচিত্তে সংশয়মুক্ত হয়েছেন।" এখানে নমি নমি চরণে গানটিতে লক্ষণীয় কবির শ্রদ্ধা নিবেদনের এমনই চিত্র ফুটে উঠেছে:

নমি নমি চরণে,/ নমি কলুষ হরণে।
সুধারস নির্ঝর হে/ নমি নমি চরণে। (পূজা / ৫০৩)

বস্তুত, রবীন্দ্রচেতনায় বুদ্ধদেবের প্রভাব নানা ভাবেই প্রকাশিত। কবি ভারতবর্ষের এই মহামনীষীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রচনা করেছেন তাঁর অনবদ্য শ্রেষ্ঠ এইসব সঙ্গীত। এই সঙ্গীতগুলো বিশেষ মূল্যায়নের দাবী রাখে। বস্তুত, রবীন্দ্রদর্শনের চিত্তবাণী নানা সুরে মূর্ছিত হয়েছে তাঁর গানে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তাই সম্পদে এক অমৃত সাগর। এই অবগাহনে লাভ করা সম্ভব অনাবিল আনন্দ ও প্রজ্ঞা দুইই।

তথ্যসূত্র :

---

১. শান্তি দেব ঘোষ, "রবীন্দ্রসঙ্গীত', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুর্ণমুদ্রণ পৌষ, ১৪০৮, পৃ: ৯২

২. আবদুশ শাকুর, " সঙ্গীত সংবিৎ', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাWgx, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭,পৃ:৯৫

৩. Dhurojati Parsad Mukerji, 'Tagore's music.", 'Rabindranath Tagore' A centenary Volume 1861 – 1961, Sahitya Akademi, New Delhi, Page – 185

৪. আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ' সংগীত চিন্তা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনাবিভাগ, কলিকাতা, সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯২, পৃ. ৯

৬. S.T Coleridge , ' Biographa Literia' (Essay)

৭. কিরণ শশী দে, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০৫,পৃ.১১৮

৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ" বাক সাহিত্য (প্রা.) লিমিটেড. কলকাতা, 'রবীন্দ্রায়ন', ১ম খণ্ড, সম্পাদক,পুলিন বিহারীসেন সংস্করণ মাঘ ১৪১২, পৃ.৩২

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বপরিচয়' (প্রবন্ধ)

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত চিন্তা' বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৯২, পৃ. ১১৯

১১. Rabindrornath 'The Riligion of man' Landon, 1931, Page.59.

১২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,' রবীন্দ্র – কাব্য পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি , কলকাতা শ্রাবণ, ১৩৭২, পৃ. ৫৪৬

১৩. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান, ' শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ: কলকাতা, মার্চ – ২০০২, পৃ. ২৭৭

১৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ' রবীন্দ্ররচনাবলী,

১৬. শ্রী অমল মুখোপাধ্যায় , 'রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা', করুণাপ্রকাশনী, কলকাতা , আশ্বিন, ১৪০৮,পৃ.১২৯

১৭. ড. অরুণ কুমার বসু. 'বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, শ্রাবণ – ১৪০১,পৃ.৪৮৫

১৮. ড. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন' , সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৌষ, ৩৯৪, পৃ.৮৪

১৯. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রামমোহন রায়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ১৩৯৬, পৃ. ১৮

২০. করুণাময় , গোস্বামী, "সঙ্গীত", 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ,' সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯০, পৃ. ১৬১.

২১. আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৯৯, পৃ. ৩৬

২২. জয়ন্তী ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' করুণা প্রকাশনী, কলকাতা শ্রাবণ, ১৩৯২, পৃ. ১৯৯

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ

মোহা: ওলিউর রহমান*

"পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল পূবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জিভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা–চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।"[১]

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। দিগন্ত জোড়া সবুজের সমারোহ শ্যামল শোভা বন-বনানী, উঁচু-নিচু পাহাড়, পাখির কলকাকলি, দেশ জোড়া রূপালি নদীর বিস্তার আর হাওর-বাওর এবং বিলের মত জলাভূমির অস্তিত্ব আর সবকিছু মিলে এদেশ সৌন্দর্য মহিমার এক অনন্য নিদর্শন। আর এ ঐশ্বর্যের সাথে জড়িয়ে আছে গুণী সাহিত্যসাধকদের জীবনকর্ম এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন জনপদ।

শিলাইদহ : গড়াই নদীর কয়েক কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা/পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর শিলাইদহ জমিদারী ক্রয় করে ১৮১৩ সালে কুঠিবাড়ীটি নির্মাণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথঠাকুরসহ ঠাকুর বংশের প্রায় সকলেই পদ্মা বিধৌত এ এলাকাটিতে বসবাস করেন। মূলত জমিদারী কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য এ বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবলেন জমিদারিগুলো দেখাশুনার দায়িত্ব কার উপর দেয়া যায়। নতুবা এত বড় জমিদারী ছারখার হয়ে যাবে আর তিনিই বা আর বাঁচবেন কতদিন কে বলতে পারে।

বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক মানুষ। বিষয় কর্ম বুঝেন না, দেখেনও না, সত্যেন্দ্রনাথ সরকারি কাজে আজ এখানে কাল ওখানে তার পক্ষে জমিদারি দেখাশুনা সম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও সংসারের কাজে টান কম। হেমেন্দ্রনাথ মারা গেছেন। অন্য দুই ছেলে অসুস্থ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত জমিদারী দেখবার আর উপযুক্ত ছেলে তার নাই। জমিদারীও কম নয় এবং কলকাতার আশেপাশেও নয়। উড়িষ্যার কটক জেলায় পাণ্ডুয়া তালুক আর বালিয়া তালুক। পূর্ববঙ্গে পাবনা জেলার সাজাদপুর, নদীয়া জেলার বিরাহিমপুর (শিলাইদহ), রাজশাহী জেলার কালিগ্রাম পরগনা (পতিসর) ঠাকুরবাড়ির যে জমিদারিগুলো বঙ্গদেশে ছিলো তার সবই পড়েছে এখনকার বাংলাদেশে।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি কাজকর্ম শিখতে হয় এবং পারিবারিক এক আদেশে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি দেখাশোনার উদ্দেশ্যে (২৫ নভেম্বর ১৮৮৯) স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ, কন্যা মাধুরীলতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পদ্মার তীরবর্তী শিলাইদহের অপরপারে ধূ-ধূ করছে চর, এর শেষ দেখা যায় না, আবার বালিকে নদী বলে মনে হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই, ফাটল ধরা ভিজে কালো মাটি এবং শুকনা সাদা বালি।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার অপূর্ব সুযোগ পদ্মার ভাঙা-গড়ার চিত্র এবং বিচিত্র জীবনের সাথে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হতে পেরেছিলেন বাংলাদেশে আগমনের ফলেই। পৃথিবী যে বাস্তবিক অর্থে সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে বুঝতে পারতেন না। শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি সোনারতরী, চৈতালী, কল্পনা, চিত্রা, ক্ষণিকা, কথা ও কাহিনী, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, বলাকা, চিরকুমার সভা এবং গল্পগুচ্ছ রচনা করেন।

বিচিত্র প্রকৃতি উপভোগ, ইহজগত, পরজগত, দার্শনিক, আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির অবয়ব এখানেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে; 'সোনার তরী' কবিতায়–মানবজীবনের চিরন্তন সত্যের সন্ধান, গভীরতর দর্শনকে রূপকার্থে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সময়ের চলমান স্রোতের

* লেখক সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

প্রবহমানতায় মানুষ তার অনিবার্য মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে কোন কীর্তিরই মৃত্যু হয় না। মহাকালের হিসাবের খাতায় সবই লিখা থাকে।

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি–

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ ১৩০০ বঙ্গাব্দে(১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত এবং 'সোনার তরী' কবিতা ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে) ফাল্গুন মাসে রচিত।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মেঘ ও রৌদ্র'। এ গল্পটি সম্পর্কে ২৭ জুন ১৮৯৪ তে শিলাইদহ থেকে পত্রে লেখেন–

> কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট্ এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম, পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি, সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন? যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি, তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই–যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনার রাজ্যে অবতরণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে; আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকর-বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিৎ ছিলো, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হলো–তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে।...আমি ভাবলুম এই তো আমি কোন উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে নিজেকে নিজে সুখি করতে পারি।[২]

শিলাইদহে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ বলেন-

> বোটে ছিলাম আমি একলা, সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাঝি, আমার মতো চুপচাপ প্রকৃতির আর ছিল এক চাকর-ফটিক তার নাম সেও স্ফটিকের মতোই নিঃশব্দ। নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মতো সহজে । বোট বাঁধা থাকতো পদ্মার চরে। সে দিকে ধূ ধূ করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন তৃণশস্যহীন, মাঝে মাঝে জল আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখিরদল। নদীর ওপারে গুচ্ছপাতার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবন যাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায় ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষীরা গরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থর গতিতে চলতে থাকে ডিঙি নৌকা পাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু হু করে জল চিরে যায় জেলে নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয় যেন সে খেলা- এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ দু:খ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নালিশ নিয়ে। পোস্টমাস্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সংকট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের ছাদ ওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারার হাট, কত ভাঙ্গনধরা তট, কত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বন-ঝাউ আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উচুঁ পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙশালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়। সেদিন দেখলুম একজন সমালোচক লিখেছেন আমার গল্প অভিজাত সম্প্রদায়ের গল্প, সে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করেনা। গল্পগুচ্ছের গল্প বোধ হয় তিনি আমার বলে মানেন না। সেদিন গভীর আনন্দে আমি যে কেবল পল্লীর ছবি এঁকেছি তা নয়, পল্লী সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই সে সময়ে আজকের দিনের পল্লীদরদী লেখকেরা 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দটার সৃষ্টিও করেননি। সে দিন গল্পও চলেছে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধা জীবনও চলেছে এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের আতিথ্যে। ...
>
> 'সাধনা'র যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলু'র ফরমাস আসত, গল্প চাই। জীবনের পথ চলতি কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায় (২০ অক্টোবর ১৯৩৬)।[৩]

ছোটগল্প রচনা প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে ধরেন- "আমি প্রথমে কেবল কবিতাই লিখতুম? গল্পে-টল্পে বড়ো হাত দিই নাই। মাঝে একদিন বাবা ডেকে বললেন তোমাকে জমিদারির বিষয় কর্ম দেখতে হবে। আমি তো অবাক ? আমি কবি মানুষ পদ্য-টদ্য লিখি, আমি

এসবের কি বুঝি? কিন্তু বাবা বললেন তা হবেনা; তোমাকে এ কাজ করতে হবে। কী করি? বাবার হুকুম কাজেই বেরুতে হল। এই জমিদারী দেখা উপলক্ষ্যে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকেই আমার গল্প লেখারও শুরু হয়।"

শিলাইদহের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে শিখিয়ে নেয় কবিতা গল্প এবং গান রচনার মন্ত্র। এখানে রচিত গানগুলির মধ্যে আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, আলো আমার আলো ওগো, পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে। এখানে কবি অবস্থান করেন ১৯২২ সাল পর্যন্ত।

সাজাদপুরঃ সিরাজগঞ্জের সাজাদপুরে ছিল রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারী তত্ত্বাবধানের কাচারি। পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নীলকরদের নীল কুঠি ছিল। সে কারণে এখনও অনেকে একে কুঠিবাড়ী বলে। পরে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা/পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এটি নিলামে কিনে নেন। এখানে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। এবং দ্বিতল ভবনটি বর্তমানে রবীন্দ্র যাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯০ সালে জমিদারী তত্ত্বাবধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে আসেন এবং ১৮৯০ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ৭ বছর জমিদারির কাজে সাজাদপুরে আসা যাওয়া এবং অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অনেক অসাধারণ কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেন। এর মধ্যে সোনারতরী কাব্যের দুই পাখি , আকাশের চাঁদ, হৃদয় যমুনা, প্রত্যাখ্যান, বৈষ্ণব কবিতা; চৈতালী কাব্যের নদীযাত্রা, ইছামতি; কল্পনা কাব্যের যাচনা, বিদায়, মানস প্রতিমা, প্রবন্ধ, ছিন্নপত্র, ও ছিন্নপত্রবলীর আটত্রিশটি পত্র রচনা করেছেন, বিসর্জন নাটকও এই স্থানে রচিত। সাজাদপুরে গল্প লেখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে । এপারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা । দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবন যাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর ধূ ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে সব ছোটগল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ পোস্ট্মাস্টার, সমাপ্তি, ছুটি প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

> "১২৯৮ বঙ্গাব্দে হিতবাদী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় পোস্টমাস্টার গল্পটি, এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন—কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেন কালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্মাস্টার এসে উপস্থিত। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জা মিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানা রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।"[৪] (সাজাদপুর ২৯ জুন ১৮৯২)

সাজাদপুর থেকে ১৮৯৫-তে লেখা ছিন্নপত্র থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ অতিথি গল্পটি সম্পর্কে বলেন-

> "বসে বসে সাধনার জন্য একটা গল্প লিখছি- খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্যলোক ও ঘটনা কল্পনা করেছি তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদী তীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ এই ছায়া বেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবেনা । তারা কেবল কাটা শস্যই পায় , কিন্তু শস্যক্ষেতের আকাশ বাতাস শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ড ভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়। সবটা পাঠককে দেয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেননি।"[৫]

ভারতী, হিতবাদী, সাধনা, সবুজপত্র, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে ছোট গল্প। সাজাদপুরে অবস্থান কালে সাধনায় প্রকাশিত হয় ছুটি, সমাপ্তি, ও ক্ষুধিত পাষাণ এবং হিতবাদীতে রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারা-প্রসন্নের কীর্তি।

সাজাদপুরের প্রজা সাধারণের কল্যাণার্থে রবীন্দ্রনাথের গো খামার স্থাপন করেন। গরীব মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করতেন, সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য গরীব প্রজার খাজনা মওকুফ করেছেন তিনি। উচ্চ, নীচ, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে ছেলেমেয়েদের ভালবাসতেন, তাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা

করেছেন। এখানে রচিত উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে রয়েছে-বঁধু মিছে রাগ কোরোনা, আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে, ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে উল্লেখযোগ্য।

পতিসরঃ পতিসরে রবীন্দ্রনাথের আগমন ঘটে ১৮৯১ সালে । পতিসর হল কালীগ্রাম স্টেটের কাচারি বাড়ি। নওগাঁ ও বগুড়া জেলার ৬০০ টি গ্রাম নিয়ে কালীগ্রাম পরগনা গঠিত। এর আয়তন ছিল ২৩০ বর্গমাইল। রবীন্দ্রনাথ কালীগ্রাম পরগনার উন্নয়নের জন্য চালু করেন সমবায় ও পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, দরিদ্র প্রজাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা, সে উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয় কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক।

নয়া পল্লিসমাজ ও নতুন মানুষ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা। মন্ত্রমুগ্ধের মত এ কাজটা দীর্ঘদিন ধরে করে গেছেন। পরে রথীন্দ্রনাথের হাতে তারও পরে সুরুলে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে কৃষি ও কারিগরী কর্মকাণ্ডের জন্য শ্রী নিকেতনের সূচনা। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন 'পতিসরে পল্লী সংস্কারের কাজটা তাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে'।

তিরিশ বছর বয়সে জমিদারী দেখতে এসে দশটি বছর পূর্ববঙ্গে কাটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতোমধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকল্প করেছেন তিনি বেঁচে থাকতেই জমিদারির যথাযথ ভাগ বাটোয়ারা করতে চান। পুত্র হেমেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীদের হাতে চলে যায় উড়িষ্যার জমিদারি। গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে সাজাদপুর পরগনা আর রাজশাহী জেলার পতিসর কালীগ্রাম পরগনা রবীন্দ্রনাথের ভাগে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় শিলাইদহ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন জমিদারি ভাগাভাগি হওয়ার পর ১৯২২ সালে। এরপর নিজ জমিদারী কালিগ্রাম পতিসরকে নিয়ে গ্রামোন্নয়ন কর্ম, অবসরে কবিতা, গান লেখা সেই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপভোগ, পতিসর থেকে কবি লিখেছেন-

> "জ্যোৎস্না প্রতি রাতেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠেছে। আমি তাই আজকাল সন্ধ্যের পরও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই।... জ্যোৎস্নায় এই ধূ ধূ শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখাতে হয়।"[৬]

কলকাতা, শিলাইদহ বা পতিসরের বসন্তে কবির এই ভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। তাইতো কলকাতায় বসেও কবি লিখতে পেরেছেন "বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এনেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম"।

অন্য এক পত্রে ইন্দ্রিরা দেবীকে লেখা কালিগ্রামের প্রকৃতিকে পাওয়া যায়- 'এদিকে গরমটাও বেশ পড়েছে-কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করিনে। তপ্ত বাতাস ধূলো-বালি খড় কুটো উড়িয়া নিয়ে হু হু শব্দ করে ছুটছে প্রায়ই, হঠাৎ একজায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণিবাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধূলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে-সেটা দেখতে বেশ লাগে।

এত সাধের পতিসরকে ছেড়ে কলকাতায় বসবাস করলেও কবি কখনও ভুলতে পারেননি তাঁর প্রিয় পতিসরকে-তাইতো তিনি শান্তি নিকেতনে বসতি স্থাপন করলেও সুরুলে শ্রী নিকেতন গড়ে তোলেন এবং ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি উন্নয়নের প্রয়াস পান। প্রজারাও কবিকে ভোলেননি। তিনি কলকাতা থেকে একাধিক বার পূর্ববঙ্গে এসেছেন। সংবর্ধনা পেয়েছেন পতিসরে, সিলেটে, শিলাইদহে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও নারায়নগঞ্জে। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডিলিট উপাধি দেন। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এ পুরস্কারের সমুদয় অর্থ কালীগ্রাম পরগনার উন্নয়নে ব্যয় করেন। পতিসরে অবস্থিত 'কালীগ্রাম রবীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট' স্থাপন করা হয় ১৯১৩ সালে। ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কবির বিচরণ। পতিসরে কবিকে সংবর্ধনা দেয়া হয় প্রজাদের পক্ষ থেকেও। এখানে অবস্থান কালে অসংখ্য গান, গল্প, উপন্যাস, চিঠিপত্র লিখেছেন।

পতিসরে রবীন্দ্র রচনাবলীর তালিকায় রয়েছে-

চিত্রা:- পূর্ণিমা, সন্ধ্যা,

চৈতালী:- মধ্যাহ্ন, পল্লী গ্রামে, সামান্যলোক, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, কর্ম, বনে ও রাজ্যে তপোবন, ঋতু, সংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্ত পথে, তালগাছ।

কল্পনা:- মাতার আহবান, হতভাগ্যের গান, ভিখারী, মানস প্রতিমা, সংকোচ, প্রার্থী, সুকরুণা, বঙ্গলক্ষী, শরৎ।

ক্ষণিকা:- বাণিজ্যে বসতে লক্ষী, ছড়ার ছবি, আকাশ প্রদীপ, বিদায় অভিশাপ (কাব্য নাট্য) কথা ও কাহিনী, দুই বিঘা জমি।

গান:- বিধি ডাগর আঁখি, যদি বারণ কর তবে গাহিব না, বঁধু মিছে রাগ করোনা, আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা, সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে । জলে ডোবা চিকন শ্যামল, আমি কান পেতে রই এবং তুমি নবরূপে এসো প্রাণে।

গল্প:- ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা।

প্রবন্ধ:-ধর্মের নবযুগ, পিতার বোধ, রাজা প্রজা (অংশবিশেষ) পঞ্চভূত (অংশবিশেষ)

উপন্যাস:- গোরা ও ঘরে বাইরে (অংশবিশেষ)

ছিন্নপত্রাবলী:- ৯, ১০, ১২, ১৩, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭,১১৮, ১১৯, ১২০, ১৫২, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, সংখ্যক চিঠি।

দক্ষিণডিহি: খুলনার ফুলতলা উপজেলার তীর্থ নদ ভৈরবের কোলঘেঁষা রবীন্দ্রনাথের মামার বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ী। এখানেই ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সেরেস্তার কর্মচারী বেনী মাধবের কন্যা মৃণালিনী দেবীর সাথে কবিগুরুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

জমিদারী দেখাশুনা করতে এসে রবীন্দ্রনাথ-বাংলাদেশের পরিবার, সমাজ, দারিদ্র্য, পিচ্ছিল পল্লীপথ দেখেছেন। ফলে তার গল্পের উপকরণের অভাব কখনও হয়নি। ছিন্নপত্রের ১৫৩ টি পত্রের (১৮৮৭-১৮৯৫) প্রায়ই সকল পত্রই শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লেখা। এই সময়ের যাবতীয় চিঠি ইন্দিরাদেবী দুটি খাতায় নকল করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। এই খাতা দুটি অবলম্বনে ১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র প্রকাশ পায়। সর্বশেষ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয় চিঠিপত্র। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বসতি ছিল যশোর ও খুলনায়। শিলাইদহে পাটের ব্যবসা শুরু করে প্রতিষ্ঠা করেন "টেগর এন্ড কোম্পানী"। পরে কোম্পানীর অফিস কুষ্টিয়া শহরে স্থানান্তরিত হয়। ওই শহরে এখনও টেগর লজ বহাল আছে।

১৮৭৪ সালে নাটোরের রাজা মহারাজা শ্রী জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে রাজশাহী এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য সভায় তিনি 'শিক্ষার হেরফের' শির্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রাজশাহীতে রচিত কবিতাগুলোর মধ্যে ঝুলন, সমুদ্রের প্রতি, বিদায় অভিশাপ, এবার ফিরাও মোরে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২ সালের নভেম্বর মাসে লোকেন্দ্র পালিতের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী আগমন করেন। রাজাশাহী কলেজ পরিদর্শন করেন ২৬ নভেম্বর। তিনি (১৩-৩০ নভেম্বর পর্যন্ত) রাজশাহীতে অবস্থান করেন। ১৮৯৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছেন; এসময় ঢাকেশ্বরী মন্দির, নারায়নগঞ্জ, ফতুল্লা ভ্রমণ করেন। গোয়ালন্দ ফেরীঘাট হয়ে তিনি স্টিমার যোগেও নারায়নগঞ্জে এসেছেন, ওখান থেকে বিখ্যাত তুরাগ হাউসে। কুমিল্লা এবং আগরতলা থেকে ফেরার পথে কুমিল্লার টাউন হলের বীরচন্দ্রনগর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতা করেছেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের আহবানে গিয়েছেন বরিশালে। বরিশাল থেকে স্টীমারযোগে চাঁদপুর, সেখান থেকে ট্রেন যোগে ফেনী হয়ে চট্টগ্রামেও গিয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজ, শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি, আনজুমানে ইসলামিয়া প্রভৃতি সংগঠনের আমন্ত্রণে গিয়েছেন সিলেটে। এছাড়াও ময়মনসিংহ, নেত্রকোনায়ও গিয়েছেন।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আগমন, জমিদারী দেখাশুনা, সাহিত্য সৃষ্টি এবং অবস্থান কবির মনে এতটাই রেখাপাত করেছিল যে, কলকাতায় ফিরে যাবার পরও শান্তি নিকেতনে বসে ভেবেছেন বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের কথা এবং তিনি বাংলাদেশের মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। তাঁর উচ্চারণ-

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,/ আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়-/ এই হোক শেষ পরিচয়।'

তথ্যসূচি:

---

১. অতিথি, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্যোৎস্না পাবলিকেসন্স (ঢাকা-২০০৩) পৃ. ২২১
২. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্যোৎস্না পাবলিকেসন্স (ঢাকা-২০০৩) পৃ. ৬৩৮
৩. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্যোৎস্না পাবলিকেসন্স (ঢাকা-২০০৩) পৃ. ৬৩৯
৪. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্যোৎস্না পাবলিকেসন্স (ঢাকা-২০০৩) পৃ. ৬৪৩
৫. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্যোৎস্না পাবলিকেসন্স (ঢাকা-২০০৩) পৃ. ৬৪৮
৬. ছিন্নপত্রাবলী, ১১৫ সংখ্যক চিঠি।

গ্রন্থপঞ্জি:

* রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ (কলকাতা-১৩৬১)
* শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ (কলকাতা-১৯৭২)
* শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ-শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, মিত্র ও ঘোষ (কলকাতা-১৩৮০)
* সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ, মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান, বর্ণমিছিল (ঢাকা-১৯৭৪)
* শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ-নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (কলকাতা-১৩৮৬)
* রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে গ্রামীণ জীবন-তসিকুল ইসলাম, গতিধারা (ঢাকা-১৯৯৬)
* পতিসরে রবীন্দ্রনাথ-ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং (কলকাতা-২০০০)
* গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্যোৎস্না পাবলিকেসন্স (ঢাকা-২০০৩)
* কালি ও কলম-সপ্তমবর্ষ একাদশ সংখ্যা (ঢাকা-ডিসেম্বর-২০১০)
* কালি ও কলম অষ্টম বর্ষ- চতুর্থ সংখ্যা (ঢাকা-মে-২০১১)
* পথরেখা-পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা (ঢাকা-এপ্রিল-অক্টোবর-২০১১)

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্র গীতিনাট্য: প্রসঙ্গ নারী ভাবনা

ড. শিখা সরকার*

গান ও নৃত্যের সমন্বয়ে এক অভিনব নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথের গীতিনৃত্যনাট্য। 'শ্যামা', 'মায়ার খেলা,' 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা','তাসের দেশ', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'শাপমোচন', 'নটীরপূজা', রবীন্দ্রপ্রেমীদের কাছে অনির্বচনীয় রসাস্বাদনের আধার। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে অধিকাংশই এই গীতিনাট্যগুলোকে কেন্দ্র করে রচিত। রবীন্দ্র সংগীতের কিংবদন্তী শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগীত' গ্রন্থে বলেছেন- 'এই নাটকগুলি নাচের তাগিদে লেখা।[১] জীবনের গভীরতর আবেগকে ছন্দময় রূপ দেবার জন্য নৃত্য। নৃত্যের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে জীবনের আনন্দ আর মুক্তির প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই মুক্তি ও আনন্দ প্রকাশ করার জন্যই গীতিনৃত্যনাট্য রচনা করেছেন।[২] সংস্কৃতিমনা রুচিশীল দর্শকের কাছে নৃত্যকলাকে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনী'তে লিখেছেন- 'রবীন্দ্র নাথের প্রেরণায় আর্টের নামে সমাজ জীবনে নৃত্যকলা মর্যাদা লাভ করিল। নারী আত্মপ্রকাশের নূতন পথ পাইল।[৩] এ কথার সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের সবকটি নৃত্য নাট্যের মূলে নারীর আত্মপ্রকাশ। নৃত্যনাট্যগুলোতে নারী তার দেহাতীত সৌন্দর্যের পূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে তাঁর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উন্মোচন করেছেন। প্রসঙ্গত 'চিত্রা' কাব্যের 'বিজয়িনী' কবিতাটি স্মরণীয়। যেখানে অচ্ছদ সরসী নীরে স্নানরতা নারীকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করার জন্য কামদেব মদন অপেক্ষায় উদগ্রীব। কিন্তু স্নান শেষে রমণীর সৌন্দর্য মদন দেবকে কামনায় তাড়িত করে না বরং শ্রদ্ধায় অবনত হয়:

নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার/ সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূণ্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে/ চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।।

'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যে মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার বীরত্বে, তার ব্যক্তিত্বের জৌলুশে পাণ্ডু তনয় অর্জুন মুগ্ধ। মহাভারতে আছে যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণে অর্জুন দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাত্রা করেন। বাসস্থান পরিক্রমনের পর অর্জুন উপস্থিত হলেন মনিপুর রাজ্যে। মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তার পাণি প্রার্থী হন। চিত্রাঙ্গদার পুত্র মনিপুর রাজ্যের রাজা হবে মনিপুর রাজার এই শর্তে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তাদের এক সন্তান হয় ব্রভ্রুবাহন। সন্তানের জন্মের পর অর্জুন চলে যান। মহাভারতের এই কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ নতুনরূপ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার আজন্ম তপস্যা ছিল অর্জুনের সান্নিধ্য লাভ। মনিপুর রাজা একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে পুরুষের মত অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। পুরুষের ছদ্মবেশধারী চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রেম পাবার প্রত্যাশায় মদনদেবের কাছে নিজেকে গোপন করে নারীর সৌন্দর্য নারীর কমনীয়তা প্রার্থনা করলো। মদনদেব চিত্রাঙ্গদাকে রূপ দিলেন। এই রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হলো অর্জুন। কিন্তু এক সময় রূপজ মোহ ভেঙ্গে গিয়ে চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিত্ব তার বীর্যমত্তার প্রতি নতজানু হলো অর্জুন। এবার কোন রূপসী নারী নয়, অর্জুন সাক্ষাৎ প্রার্থী রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার। যার বীরত্বের কাহিনী লোকের মুখে মুখে। চিত্রাঙ্গদা এবার আত্মপরিচয় দিয়ে অর্জুনকে বললো-

"আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী।/ নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি, নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে:/ সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে"।

এ কথা আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারীর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে দেখা যায়, যখনই নারীর আত্মমর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তখনই নারী প্রতিবাদ জানিয়েছে। 'স্ত্রীর পত্রের'র মৃনালের চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রকাশ:

* লেখক সহযোগী অধ্যাপক, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।

"আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি .....তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়।" আত্মসম্মান বোধের কারণে অনিলা ঘর ছেড়েছে।[৪] 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমু স্বামী মধুসূদনের সব চাওয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেনি। প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন কুমুর কাছে ছিল অসহনীয়। প্রেম নর-নারীর জীবনে আনে পূর্ণতা। প্রেমের অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়। প্রেম মানবজীবনকে পার্থিব লোক থেকে অপার্থিব লোকে পৌঁছে দেয়। দেবতা আর প্রিয় সেখানে মিলে মিশে একাকার। 'সোনারতরী' কাব্যের 'বৈষ্ণব কবিতায়' কবি বলেছেন- "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা" রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রেম এক সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতিকে জাগিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব কে স্মরণ করছি, (যিনি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন) তিনি লিখেছেন:

> "রবীন্দ্রনাথেরই কবিতাতে গানে নাট্যকাব্যে আমাদের প্রেমীসত্তা জন্মলাভ করেছে, যৌবনে পৌঁছছে। প্রেম যে আমাদের জীবনকে কত উপরে তুলতে পারে অর্থ ও কামের এক ঘেয়ে গ্লানিমা থেকে বর্তমান যুগের (রেনেসাঁ পরবর্তী যুগের) আবিষ্কৃত ও পরিশীলিত এই পরমাশ্চর্য অনুভূতিতে যে কত বর্ণ কত গন্ধ, কত দেহলী কত অন্তঃপুর কত রবিকরোজ্জ্বল সোনালী রূপালী শিখর কত অন্ধকার ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষ, কত সমুদ্র, কত আকাশ লুকানো রয়েছে তা কি আমরা আগে জানতাম? মহাজন-পদাবলীতে তার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম, পূর্ণস্বাদ পাইনি। শৃঙ্গার এবং ভক্তি দুটো রসই বড় সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা; কিন্তু দুটোর যোগফল নয় প্রেম। শরীরকে বাদ দিলে প্রেম স্বধর্মচ্যুত হবে; এই রক্ত মাংসের পাত্রকে অনন্ত রহস্যে ভরপুর করে তোলাই প্রেমের ধর্ম। সে-রহস্য শুধু পার্থিব নয়, এক অপার্থিব ইঙ্গিত থাকে তাতে। সেই প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ।"[৫]

প্রেমের জীয়ন কাঠির পরশ লেগে 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী কিশোরী থেকে নারীতে পরিণত হয়েছে। আর চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতির জীবনে প্রেম তাকে রূপান্তরিত করেছে অন্য এক নারীতে। 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্যে চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতি ভদ্র সমাজে অস্পৃশ্য। তাই এক সময় সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাঁর মন হয়ে উঠে বিদ্রোহী:

"যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অন্ধকারে
পূজিবনা, পূজিবনা, পূজিব না সেই/ দেবতারে, পূজিব না।
কেন দেব ফুল, পূজিবনা।/ কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল,
যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই ধিকারে।"

হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার শিকার প্রকৃতি প্রথম মুক্তির মন্ত্র পেলো বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দর কাছে। পথক্লান্ত তৃষ্ণার্ত ভিক্ষু আনন্দ জল চেয়েছিল, তখন চণ্ডাল কন্যা বলে প্রকৃতি তাকে জল দিতে সঙ্কোচ বোধ করলে ভিক্ষু আনন্দ বললেন- "যে মানব আমি সেই মানব তুমি, কন্যা"। আনন্দর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ভগবান বুদ্ধের মানবতার বাণী। চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতি যেন নতুন ভাবে বাঁচার প্রেরণা পেল। ভিক্ষু আনন্দকে মনে মনে ভালবাসলো প্রকৃতি। তার প্রেম দেহজ কামনার উর্ধ্বে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত। এভাবেই প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় পার্থিব লোক থেকে অপার্থিব লোকে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে আছে চণ্ডালিকা পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষু হলো।[৬] এক অনার্য চণ্ডাল কন্যা প্রেমের স্পর্শে উদ্বুদ্ধ হলো আধ্যাত্মিক জীবন চেতনায়। কিন্তু তার এই পরিবর্তন এসেছে ধাপে ধাপে। আনন্দ প্রথমে ছিল তার কামনার ধন। প্রথমে সে মাকে মন্ত্র পড়ে ভিক্ষু আনন্দকে আনতে বলেছে। মন্ত্রের জোরেই হোক বা প্রকৃতির টানেই হোক আনন্দ যখন এসেছে তখনই প্রকৃতি বুঝেছে তার জীবনের সাথে আনন্দর জীবন কখনও বাধা পড়বার নয়। তার দেবতার স্থান প্রতিদিনের তুচ্ছতার মাঝে নয়, তার স্থান অন্তরে। সেজন্য প্রাত্যহিক জীবন থেকে উর্ধ্বলোকে। তাই ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সে জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছে-

"ক্ষমা করো, ক্ষমা করো-/ মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,/ ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পূণ্যলোকে।"

রবীন্দ্রনাথের গীতি-নৃত্যনাট্যের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় 'শ্যামা'। 'শ্যামা'র কাহিনীও বৌদ্ধ জাতক থেকে নিয়েছেন তিনি। বৌদ্ধ জাতকে শ্যামা একজন গণিকা। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা রাজ-নর্তকী কিন্তু আত্মসচেতন গরবিনী এক নারী। শ্যামার রূপে উন্মত্ত অধীর অনেক পুরুষ। কিন্তু 'মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি, উন্নত দর্শন' বজ্রসেন-ই কেবল শ্যামার হৃদয় জয় করলো। নগর কোটালের হাতে বন্দী বজ্রসেনকে পাবার জন্য শ্যামার রূপমুগ্ধ কিশোর উত্তীয়কে বলী হতে হলো। শ্যামার অনুরোধে উত্তীয় চুরির অপবাদ নিজ কাঁধে নিয়ে বজ্রসেনকে মুক্ত করলো। রাজ ভবনের সমাদর সম্মান

ছেড়ে বজ্রসেনের সঙ্গে অজানার পথে যাত্রা করলো শ্যামা। কিন্তু এতে শ্যামার প্রেম নিষ্কন্টক হয়নি। বজ্রসেন যেদিন জানলো উত্তীয়র কথা, সেদিনই সে শ্যামাকে ত্যাগ করলো। যদিও উত্তীয়র মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণরূপে শ্যামা দোষী নয়। দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে শ্যামা উত্তীয়কে বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু নগর কোটাল তাতে কর্ণপাত করেনি। বজ্রসেনের ঘৃণা শ্যামার কাছে মৃত্যুর সামিল। বজ্রসেনও ভেবেছে শ্যামা মারা গেছে। তাই পরক্ষণেই শ্যামাকে ফিরে পাবার জন্য তার আর্তনাদ:"এসো, এসো এসো প্রিয়ে/ মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে"

শ্যামা ফিরে এলে বজ্রসেন আবারও ধিক্কার জানিয়ে শ্যামাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু শ্যামার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে:

"জানিগো তুমি ক্ষমিবে তারে/ যে অভাগিনী পাপেরও ভারে চরণে তব বিনতা
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না। আমারও ক্ষমাহীনতা/ পাপীজন শরণও প্রভু।"

'আশোক মঞ্জুরীর মত সুন্দর শ্যামা রাজপুরী আলো করেছিল। তার রাজপুরী ছেড়ে চলে যাওয়ায় ফাল্গুনের অঙ্গন যেন শূন্য হয়ে যায়। শ্যামা সেই নারী যে জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী দান করে। গভীর বেদনা দুঃখ পরিতাপের মধ্য দিয়ে শ্যামার প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ বড় করে দেখিয়েছেন। তার হৃদয় ধর্মের কাছে হার মেনেছে তার স্বার্থপরতা। মহৎ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনও নারীকে ছলনারও আশ্রয় নিতে হয়েছে, 'ল্যাবরেটরী' গল্পের সোহিনী তার প্রমাণ। নৈতিকতা সাহস আর বুদ্ধিমত্তার গুণে সোহিনী এক আশ্চর্য সৃষ্টি। 'চৈতালী' কাব্যের মানসী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী-
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে"।

তবে সেই পুরুষের চোখে নারী অনন্যা, যিনি নারীকে দেখেছেন তাঁর শিল্পীত সত্তায়। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী পূর্ণতার প্রতীক। বদ্ধজীবনের মাঝে এনে দেয় মুক্তির আনন্দ। 'রক্তকরবী'র নন্দিনী মৃত পাষাণ পুরীতে সঞ্চার করে জীবনের ছন্দ। বিসর্জন নাটকের অপর্ণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন- "যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করেছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল মনে হয়, কার্যত তারই জয় হল।"[৭] নারীর অন্তর্নিহিত দেবী শক্তি রবীন্দ্র সাহিত্যে নবরূপে ব্যাঞ্জিত হয়েছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সরস্বতীর আবির্ভাবে রত্নাকর দস্যুর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে বাল্মীকির কবি প্রতিভা।

বৌদ্ধ জীবন দর্শনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। রবীন্দ্র সাহিত্যে তার প্রকাশ যেমন কবিতায়, গানে, নাটকে তেমনি নৃত্যনাট্যে। 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যে নর্তকী শ্রীমতীর অটল সাধনা, তার নিষ্ঠা ভগবান তথাগতের চরণতলে নিজেকে সমপর্ণের মধ্য দিয়ে সে কেড়ে নিয়েছে সবার শ্রদ্ধা; রাজানুগ্রহে চলেনি সে, নিজেই নিজের কর্তব্য স্থির করেছে। সেকালের নটীরা গণিকা হিসেবে গণ্য হতো। ভগবান বুদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে গণিকারাও হয়ে উঠেছিল সাধ্বী। বুদ্ধদেব যখন নৃপতি বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে (বর্তমানে বিহার রাজ্যের রাজগীর) আসেন তখন বিম্বিসার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধের পদনখকণা নিয়ে সেখানে নির্মাণ করেন বুদ্ধের পূজাবেদী। কিন্তু বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু ছিলেন বৈদিক ধর্মের অনুসারী। তিনি পিতাকে বন্দী করে বুদ্ধ পূজা নিষিদ্ধ করেন। অজাতশত্রুর ভয়ে প্রকাশ্যে বুদ্ধ পূজার সাহস কারো ছিল না। শ্রীমতি অসীম সাহসে অবিচল নিষ্ঠায় বুদ্ধের পূজাবেদীতে পূজা দিতে গেলে রাজমহিষীর আদেশে তাকে নাচতে হয়। শ্রীমতি নাচতে শুরু করলে সে নাচ হয়ে উঠল বুদ্ধের বন্দনা। নৃত্যরত অবস্থাতেই সে তার বসনভূষণ খুলে বেদীমূলে নিক্ষেপ করতে লাগলো। তার নটী বেশের ভেতর থেকে বের হলো ভিক্ষুণীর কায়ারবস্ত্র। অজাতশত্রুর আদেশে রক্ষীরা তাকে হত্যা করে। তার শান্ত সমাহিত দেবীমূর্তি দেখে সকলে অভিভূত হলো বিনম্র শ্রদ্ধায়। মহারাণী লোকেশ্বরী শ্রীমতিকে কোলে নিয়ে বসে তার ভিক্ষুণীর বস্ত্র মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'নটী তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি।'[৮] অনুতপ্ত হলো অজাতশত্রু। জয় হলো নটীর পূজার।

কর্তব্য কর্মের মাঝে আত্মানুসন্ধানে নারীর জীবন পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের নারীই প্রথম উপলব্ধি করে-আমি নারী, আমি মহীয়সী/ আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যা তারা ওঠা, মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।[৯] বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে এভাবেই নিজেকে অনুভব করার মানবিকতায় ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নারী। সংসারে শত উপেক্ষা, অনাদর অবহেলার মাঝেও নিজের মর্যাদাকে কখনও খাটো করেনি রবীন্দ্রনাথের নারীরা। 'নহি সামান্য নারী' -এই বোধটাই রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার মূল কথা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে নারী সম্পর্কিত এই ভাবনাটি নতুন মাত্রায় উচ্চকিত।

তথ্যসূচি

[১] বাংলার নাটকের ইতিহাস-অজিত কুমার ঘোষ, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ- ১৯৭০, পৃ. ৪২১।
[২] ঐ পৃ. ৪২১
[৩] রবীন্দ্র জীবনী-প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ২০৫
[৪] গল্প গুচ্ছ (পয়লা নম্বর) বিশ্ব ভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ. ৬২৪
[৫] পান্থজনের সখা- আবু সায়ীদ আইয়ুব, দে'জ পাবলিসিং, ১৯৭৩, পৃ. ১৩৬
[৬] রবি রশ্মি (২য় খণ্ড)-চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-কলেজষ্ট্রীট সংস্করণ, ১৯৩৬ পৃ. ৩১৯
[৭] বাংলা নাটকের ইতিহাস-ঐ পৃ. ৩৪০।
[৮] রবি রশ্মি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
[৯] 'মুক্তি', পলাতকা, সঞ্চায়িতা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ৫৫৫

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্র কাব্যে সামাজিক অসমতার রূপ

আমজাদ হোসেন*

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে বহুবিচিত্র বিষয় বিধৃত হয়েছে। সামাজিক বৈষম্যও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি আলোকিত অনুসন্ধান। তাঁর কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে–সীমার মাঝ অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।'[১] এই সীমার মাঝে অসীমের মিলন সাধনের পালা যে কবির অন্বিষ্ট, তাঁর কাব্যে সমাজবাস্তবতা এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রকাশ কম থাকবে সেটা আশা করাই সঙ্গত। তদুপরি সমস্ত রবীন্দ্র-কাব্য অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তাঁর কাব্যসম্ভারে সামাজিক বৈষম্যের প্রসঙ্গ নিতান্ত কম নয় এবং ভাবের গভীরতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ মমত্বে সে কবিতাগুলো মহিমান্বিত।

প্রস্তাবনা

মানবসমাজে কখন থেকে অসমতা বা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সহজসাধ্য নয়। দার্শনিক রুশো মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য ছিল না। প্রকৃতির রাজ্য ত্যাগ করার ফলেই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মনে করেন সমাজ-জীবনের জন্মলগ্ন বা সদ্যগঠিত সমাজ ছিল মানবেতিহাসের স্বর্ণযুগ। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ঈর্ষা-বিদ্বেষ দেখা দিল এবং প্রতিবেশীর সাথে নিজেকে তুলনা করতে শুরু করল, ফলে সৃষ্টি হল সামাজিক বৈষম্যের। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন সমাজই সম্পূর্ণরূপে বৈষম্যহীন নয়। আদিম সমাজে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল পুরুষরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মহিলাদের চেয়ে বেশি খাবার গ্রহণ করত। পরবর্তী স্তরে দাস ও মালিক শ্রেণি নিয়ে সামাজিক বৈষম্যমূলক দাস প্রথার উদ্ভব হয়। সামন্ততন্ত্রে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, পুঁজিবাদী সমাজে শোষক ও শোষিত, উৎপাদক এবং শ্রমিক সম্পর্কের সকল দিকই বৈষম্যমূলক। সামাজিক অসমতার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি অন্যতম প্রভাবক। সম্পত্তির মালিকানার বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন, যার ছাপ আদিম সমাজ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহমান।

দেশকাল নির্বিশেষে সকল সাহিত্যে সামাজিক বৈষম্যের নানান দিক অন্তর্বাহী ফল্গুধারার মত চিত্রিত হয়েছে। সাহিত্যিকগণ মানবতার উর্বর ভূমির উপর তাঁদের সাহিত্য কর্ষণ করেছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টিকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- এই চেতনাই যুগ যুগ ধরে লালন করে এসেছেন মহৎ শিল্পীগণ। ফলে তাঁদের সাহিত্যে সামাজিক বৈষম্য বিচিত্র রঙ-রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের অস্থিমজ্জায় লীন হয়েছে এটি।

এক

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিলগ্ন থেকে সামাজিক বৈষম্যের নগ্ন রূপটি চিত্রিত হয়েছে শিল্পিত সুষমায়। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ কর্তৃক নিচু শ্রেণির মানুষের শোষণ ও নির্যাতনের বর্ণনা কাব্যিক রসমণ্ডিত হয়ে যুগের বাধা অতিক্রম করে আমাদের হাতে এসেছে। অস্পৃশ্য নীচু অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের বাস ছিল নগরের বাইরে তারা উচ্চ ব্রাহ্মণ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হতো এবং তারাও উঁচু শ্রেণির মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখতো তারই ইঙ্গিত আছে *চর্যাগীতিকার* ১০ সংখ্যক পদে– 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ ছোই ছোই যাসি বামহণ নাড়িআ ॥[২] (ওগো ডোম্বি, তোমার কুঁড়েঘরখানি নগরের বাইরে। তুমি সে ব্রাহ্মণ নেড়াকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও।[৩])

এদেশের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য মানুষদের দারিদ্র্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নিরন্তর বেগে বয়ে চলেছে। তাদের ধন সম্পদ নেই, নেই মর্যাদাপূর্ণ কোন পেশা। চাঙারি বোনা, নৌকা বাওয়া, মদ চোলাই করা, এমন কি দেহ- ব্যবসাও তাদের পেশা ছিল। এ সমস্ত পেশার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা তিন বেলা পেট পুরে খেতে পর্যন্ত পারতো না, ৩৩ নং চর্যায় আছে– 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেসী।/ হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥[৪]/ (বস্তিতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, (অথচ) নিত্য প্রেমিক (অতিথি) ভিড় করে।[৫]) এরপরে মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ এবং অসম সমাজ বিন্যাসের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়েছে।

দুই

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

সামাজিক বৈষম্য নিয়ে সাহিত্য চর্চা আধুনিক যুগে আরও বিস্তৃত ও বলিষ্ঠ হয়েছে। বিশেষত আধুনিক কথাসাহিত্যে সামাজিক বৈষম্যের নগ্ন রূপটিকে উৎকট বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক রোমান্টিক কবিদের ফেনিলভাবোচ্ছ্বাস ও কল্পনার রাজ্যে বাস্তবতার প্রস্তরকাঠিন্য নেই জন্য সামাজিক বৈষম্যের বিস্তৃত রূপটিও তাঁদের কাব্যে যথার্থরূপে স্থান লাভ করতে পারে নি। তবে কিছু কবি সচেতনভাবে সামাজিক বৈষম্যকে তাঁদের কাব্যের প্রধান বাহন করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রধানতম কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে সামাজিক বৈষম্য বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও একেবারে দুর্নিরীক্ষ নয়। জীবনসত্যের সকল দিকটি যার কাব্যে বিচিত্র ভাবৈশ্বর্যে শিল্পিত রূপ লাভ করেছে, তাঁর কাব্যে সামাজিক বৈষম্যের উপস্থাপন থাকবে না তা কখনো হয় না। তবে ছোটগল্প ও প্রবন্ধে তা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল বিস্তৃত কাব্য-সৌধের সর্বত্র পূর্ণ করে আছে বিচিত্র ভাব-কল্পনা, দার্শনিকতা, তত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি। এসবের মধ্যে মিশে আছে সামাজিক বৈষম্যের ব্যাপারটিও। সাহিত্য রচনার শুরু থেকেই তিনি রাষ্ট্র, সমাজ এবং মানুষ নিয়ে লিখেছেন। তবে প্রথম দিকের কাব্যগুলোতে সমাজ বৈষম্যের চিন্তাগুলো প্রধান হয়ে ওঠে নি। গোধূলি পর্যায়ের কাব্যগুলোতে রবীন্দ্রচেতনার অন্যতম বাহন হয়ে আছে সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব দিকগুলো। শেষজীবনে তিনি মানবতার লাঞ্ছনার দিকটিকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন এবং তা সাহিত্যে রূপায়িত করেছিলেন।

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথার্থ স্থান নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। তাঁর অবদান সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন– 'রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলায় এক পরমবিস্ময়ের ব্যাপার। বাংলা ভাষার পক্ষে, বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে, বাঙালী জাতির পক্ষে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা আর কখনো ঘটে নাই। শুধু বাংলা কেন, পৃথিবীর ভাব, অনুভূতি ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান তাহার অনুপম বৈশিষ্ট্য লইয়া একদিক উজ্জ্বল করিয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি দেশ, কাল ও পাত্রের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক সার্বজনীন রূপ ধারণ করিয়াছে ও বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া আছে।'[৬] রবীন্দ্রনাথ দেশ-কাল নিরপেক্ষ সার্বজনীন যে সাহিত্য সৃজন করেছেন তা রোমান্টিক কবি কল্পনার গভীর অন্তর্মুখী ভাবানুভূতির প্রকাশ। রোমান্টিক কবি মানসের বৈশিষ্ট্য এই যে, চিরবাস্তব ও পরিচিত আবেষ্টনী, প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ-স্নেহ-প্রেম-প্রীতি সুদূরের ব্যঞ্জনা ও অসীমের স্পর্শ দ্বারা নতুন রূপে সুললিত হয়ে ওঠে। সকল ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা একটা বৃহতের পটভূমিকায় গৃহীত হয়। সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগ রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান সত্য। তাঁর কাব্যে জীবনের রূঢ় দিকটিকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এজন্য সামাজিক বৈষম্যের দিকটি বিস্তারিত শাখা প্রশাখা মেলে স্পষ্টরূপ ধারণ করতে পারে নি। একটি অলৌকিক সৌন্দর্য পিপাসা ও রসপিপাসার তৃপ্তির জন্য তিনি বাস্তব জগৎ হতে কল্পনার জগতে, নিকট হতে দূরে, জানা হতে অজানার দিকে, চেনা হতে অচেনার দিকে, বহির্জগত হতে মনোজগতের দিকে সর্বদা ধাবিত হয়েছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপ- সেখানে সমাজবাস্তবতা গৌণ; কিন্তু একেবারে অনুপস্থিত নয়। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানবতার কবি; তাই কাব্য জীবনের একদম শুরুর দিক থেকেই তিনি অবহেলিত বঞ্চিত মানুষদের কথা বলেছেন। *কড়ি ও কোমল* কাব্যের 'কাঙালিনী' কবিতায় দরিদ্র অনাথের প্রতি কবি-হৃদয়ের অসাধারণ মমতা ও দয়া প্রকাশ পেয়েছে। যে দেশের সমাজ বিভিন্নরকম সামাজিক বৈষম্যে আকীর্ণ, যেখানে মানুষের অবাধ অধিকার নেই, সেই দেশের ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা কবিকে ব্যথিত করেছিল। ধনীরা 'আনন্দময়ী মা' নাম দিয়ে যে প্রতিমা পূজা করে, তা তাদের ঐশ্বর্যের ও অহংকারের পূজা। তাদের উৎসব ধনগর্বের আড়ম্বর। তারা যদি প্রকৃত অর্থে আনন্দময়ীর পূজা করত, তা হলে তাদের দুয়ারে আগত কাঙালিনী মেয়ের করুণ মুখ দেখে তাদের বোধ জাগ্রত হত–'আনন্দময়ীর আগমনে/ আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।/ হেরো ওই ধনীর দুয়ারে/ দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।'[৭]/ কাঙালিনী বালিকা দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছে দেবীরূপী মায়ের এত রতনভূষণ সে যদি তার মেয়ে তবে তার নেই কেন? তার বসন মলিন কেন? ভেতর অঙ্গনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো আনন্দে নাচানাচি করছে কাঙালি বালিকা বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে ওদের কেউ নয়। কবি এই আনন্দ উৎসবকে বলছেন– 'দুয়ারে সজল নয়ন,/ এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।'[৮] কবির উপলব্ধি– 'মাতৃহারা মা যদি না পায়/ তবে আজ কিসের উৎসব!'[৯] প্রকৃতপক্ষে কাঙালিনী যদি আশ্রয় না পায়, মাতৃহারা যদি মা না পায় তবে সমস্ত উৎসব পণ্ড এবং মিছে 'মঙ্গলকলস'।

তিন

রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা যতই অন্তর্মুখী ও আত্ম-পরায়ণ হোক না কেন কবির অবচেতনমানস সামাজিক বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতে পারে নি। *মানসী* কাব্যের 'বধূ' কবিতায় কবি একজন গ্রাম্য নারীর মনোবেদনা তুলে ধরেছেন। নারী-পুরুষের বৈষম্য চিরকালীন। সে পুরুষ কর্তৃক শারীরিক বা মানসিকভাবে নিগৃহীত হয়ে আসছে। গ্রাম্য একটি মেয়ে শহরের স্নেহহীন পরিবেশে কীভাবে মর্মপীড়িত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ 'বধূ' কবিতায় তা চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন– 'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।/কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।/ইঁটের পর ইঁট, মাঝে মানুষ কীট-/নাইকো ভালোবাসা নাইকো মায়া।'[১০]

অন্তর্মুখী রবীন্দ্র কবি কল্পনার মধ্যে সমাজের রূঢ় বাস্তবতা কম, এ বিষয়টি কবিগুরু নিজেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন সমাজের সেই সমস্ত মানুষের কথা বলা প্রয়োজন যারা ম্লান, মূঢ়, নিরন্ন, অসহায়। কাব্য বিলাসিতায় নিরবচ্ছিন্ন জীবনে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে উপরতলা থেকে স্বপ্নচোখে দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করাকে তিনি বিলাসিতা মনে করছেন। তাই নিরন্ন খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে নেমে আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কল্পনার স্বপ্নসৌধ থেকে সরে কবি রঙ্গময়ী কাব্যলক্ষ্মীকে আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন–'এবার ফিরাও মোরে।' কবি তাঁর কল্পনাকে, তাঁর মানস সুন্দরীকে, তাঁর কবিতা প্রেয়সীকে সম্বোধন করে বললেন– 'এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে/ হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে/ তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।'[১১]

কবি ফিরে যেতে চান তাদের মাঝে, যারা মূক। ম্লান মুখে শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী কাঁধে নিয়ে যারা নতশীরে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। এ সমস্ত অসহায় মানুষেরা অদৃষ্টকে দোষ দেয় না, দেবতাদের নিন্দা করে না, এমন কি এ অবস্থার জন্য যারা দায়ী সেই সমস্ত অত্যাচারী মানুষদের পর্যন্ত দোষ দেয় না শুধু দুটি অন্ন খুঁটে কোনমতে কষ্ট, ক্লিষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে। কবি তাদের পাশে দাঁড়াতে চান– 'এই সব মূঢ় ম্লান মুখে/ দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে/ ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'[১২] তার বিশ্বাস বঞ্চিত ও নিরন্ন খেটে-খাওয়া মানুষেরা যদি সম্মিলিত প্রতিবাদী শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ায় তবে অত্যাচারী, অন্যায়কারী পথকুকুরের মতো সংকোচে, সত্রাসে সরে দাঁড়াবে। কারণ শোষণকারী অত্যাচারীরা সর্বদাই ভীতু হয়। সমাজের অসহায় মানুষদের আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এই আহ্বান রবীন্দ্রকাব্যে খুব বেশি পাওয়া যায় না। তবে এ কথা স্বীকার্য যেটুকু আছে তা বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মাধ্যমে কবি নিজেকে যেভাবে অসহায় মানুষের কবিরূপে কামনা করেছিলেন, সে চেতনায় খুব বেশি সময় নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি। সীমার মাঝে অসীমকে দেখার আকাঙ্ক্ষা যে কবির, তিনি বস্তুবিশ্বে বেশিক্ষণ মন নিবিষ্ট রাখতে পারেন না। তবে কবির এই চেতনার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় *চিত্রার* অপর দুটি কবিতায় 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'তে। এই দুটি কবিতায় শ্রেণিবৈষম্যের প্রকৃত দিকটিকে কবি উদ্ঘাটন করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণির প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটবেলা থেকে তিনি ভৃত্যদের মাঝে লালিত পালিত হয়েছেন। প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক তাঁর কাছে অতি পরিচিত ও ব্যবহার্য। তিনি জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করলেও ভৃত্য শ্রেণির প্রতি তাঁর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী কর্তৃক ভৃত্যদের নিগৃহীত হওয়া তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন– 'যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।/ উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে-/ যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।'[১৩]

আমাদের ভৃত্যরা এমনকি কুলি-মজুর মুটে যত বেত পায় তার চেয়ে যে বেতন কম পায় তা রবীন্দ্রনাথ নিজ চোখে দেখেছেন। সামাজিক বৈষম্যের এই চিত্রটি বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও সমানভাবে সত্য। আধুনিক সভ্য সমাজেও খেটে খাওয়া মানুষদের ঘামের পয়সা দিতে প্রভুরা কুণ্ঠাবোধ করে। কবিতায় বর্ণিত সেই অসহায় বঞ্চিত ভৃত্যই প্রভুর বিপদে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের জীবন রক্ষা করে। সামাজিক শ্রেণিবৈষ্যমের স্পষ্টতর বক্তব্য আছে 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়। এই কবিতায় জমিদার-জোতদার এবং ভূমিহীনদের সম্পর্ক অতি বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন কবি। জমিদারদের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের ভূমিগ্রাসী মনোবৃত্তিকে উলঙ্গ করে ছেড়েছেন এই কবিতায়। সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার যত সম্পদ সেই তত বেশি সম্পদ কামনা করছে, যার যত বেশি ভূমি সেই আরও ভূমি কামনা করছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণিবৈষম্যের এ দিকটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়। কবিতাটি প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে খুব বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াই কবিতাটির কিছু অংশ এখানে সংযোজন করা হলো– 'শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।/ বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'/ কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই-চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।.../ পরে মাস-দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে-করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।/ এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,/ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'[১৪]

ভূস্বামী কর্তৃক ভূমিহীনদের এরকম অত্যাচার লুণ্ঠনের কাহিনী বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। *চিত্রা* কাব্যের কবিতাগুলোর পরে অনেকদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে সামাজিক বৈষম্যের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টি নতুন মাত্রায় ও নতুন বোধে, শুরু হয়েছে *পরিশেষ* কাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষের জয়গান করেছেন। মানব বলতে তিনি বুঝতেন বৃহত্তর মানব, প্রকৃত মানব যে ব্যক্তিগত পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে দেশে কালে ব্যাপ্ত হয়ে মানবসভ্যতার চিরন্তন সম্পদ দানে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথের মানব দেশ-কালের অতীত বিশ্বমানব, জীবসংস্কারের উর্ধ্বগত চিরন্তন মানব। মানুষের প্রতি একরম দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হওয়াই মানবকল্যাণের একমাত্র পথ মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে কবির এ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বহু পূজিত এ মানব-মহিমা

সংসারের বাস্তবক্ষেত্রের স্বার্থপরতা দ্বারা পদদলিত হচ্ছে। মানুষের উপর অত্যাচার, অবিচার দেখে তিনি বিচলিত হয়েছেন। মানুষের সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছেন। মানবজীবনের সার্থকতার পথে যে বাধাবিঘ্ন, দ্বেষ, হিংসা, পীড়ন, শোষণ, অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে তিনি ঘোর প্রতিবাদ করেছেন। ইংরেজ জাতির ন্যায়বোধের উপর রবীন্দ্রনাথের একটা আস্থা ছিল। তিনি ভেবেছিলেন ক্রমবিবর্তনের পথে ভারতীয়দের ন্যায় অধিকার তারা দেবে। কিন্তু ক্রমেই দেখতে পেলেন, সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ সমস্ত ন্যায়ধর্ম ও মানবতাকে পদদলিত করে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে টুটি চেপে হত্যা করেছে; তখন তার আশাবাদী আদর্শ কবি মনে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংরেজদের অত্যাচারকে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে দেখলেন এবং তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিল ভগবান কি এই নির্মম অত্যাচারীকে ক্ষমা করবেন?–'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/ তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!'[১৫]

চার

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী সামাজিক বৈষম্য তার প্রবল থাবা বিস্তার করতে লাগল অধিকতর দৃঢ়তায়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত নখদন্ত বের হয়ে পড়ল। স্বার্থান্ধ, লোভোন্মত্ত জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হল, অত্যাচার নিপীড়নের উদ্ধত রথচক্রে মানুষ তখন পিষ্ট হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ *পরিশেষ* কাব্য থেকে ধীরে ধীরে বৈষম্যপীড়িত সাধারণ মানুষের কাছে আত্মীয়রূপে এসে হাজির হচ্ছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচয় ঘোষণা করতে গিয়ে আন্তরিকভাবেই বলেছেন যে, তিনি জনসাধারণের লেখক এই হোক তাঁর শেষ পরিচয়। আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে নয়, সৌন্দর্যের পূজারী হিসাবে তুরীয় মার্গের কবি বলেও নন, তিনি জনগণের কবি এই চিন্তাই এ পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'মানী' কবিতায় তিনি বলেছেন, যাঁরা গর্বোদ্ধত সাধারণ মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন তারা প্রাণহীন সম্মানে ভূষিত হন, রঙ করা নিস্প্রাণ পুতুলের মতোই পূজা পান, সত্য ও সজীবতার সাক্ষাৎ পান না।

মানব-মহত্ত্বে একান্ত বিশ্বাসী কবি মানবের অস্তিত্ব ধ্বংসকারী এই রক্তলোলুপ দানবদের শত ধিক্কার দিয়েছেন, আর মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টিকারী এই দানবদের প্রতিরোধ করবার জন্য সংগ্রামী জনগণের প্রস্তুতির ইঙ্গিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোধূলি পর্যায়ের কাব্যগুলোতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, বেদনা বিহ্বলতা, মান-অভিমান সবকিছুকেই বিশেষভাবে মর্যাদা দান করেছেন। বিশেষ করে *পুনশ্চ* কাব্যের কবিতাগুলোতে সামাজিক বৈষম্যপীড়িত অবহেলিত মানুষের বেদনার কথা তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। এ কাব্যে তিনি যে শুধু তুচ্ছ, অবহেলিত মানুষের বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন, শুধু যে মানব মহত্ত্বের কথাই ঘোষণা করেছেন তা নয়, হীন প্রাণীর প্রতিও তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই। ধর্মীয় বৈষম্য মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, উচ্চবর্ণশ্রেণির মানুষ নিম্নবর্ণশ্রেণির মানুষের স্পর্শকে এড়িয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ *পুনশ্চ* এর অনেকগুলো কবিতার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য মানুষদের অনুপ্রাণিত করেন।

সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি বিশেষভাবে তুচ্ছ, বিড়ম্বিত মানুষে প্রতি কবির দরদ যে কতখানি তা 'ছেলেটা' 'সহযাত্রী', 'শেষদান', 'সাধারণ মেয়ে', 'বালক', 'বাঁশি', 'একজন লোক', 'ঘরছাড়া', 'অপরাধী', 'অস্থানে' প্রভৃতি কবিতা থেকে বোঝা যায়। সামাাজিকভাবে অবহেলিত, তুচ্ছ মানুষদের প্রতি কবির সহমর্মিতা কবিতাগুলোকে মাহাত্ম্য দান করেছে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন, ঘুরেছেন পৃথিবীর নানা স্থানে–প্যারিস, জার্মানি, জেনেভা, সোভিয়েট রাশিয়া তারপর গিয়েছেন আমেরিকা, তারপর পারস্য ও ইরাক ভ্রমণের পর এই পর্বের ভ্রমণ শেষ হয়েছে। বিদেশে ও ভারতের নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অন্দোলন তুলেছে তাঁর মনে। গভীর দার্শনিক চিন্তা ও আত্মতত্ত্ব-সমস্যায় মগ্ন কবির মন চারদিকের বাস্তবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের লাঞ্ছনা ইত্যাদি দেখে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও ধ্যান ভেঙে গেছে। তিনি চারপাশের সাধারণ মানুষ ও দৃশ্যকে নতুন চোখে দেখেছেন। 'ছেলেটা' কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক দুরন্ত ছেলের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। বাল্যকালে ছেলেটির মা মারা যায়, অনাহূত ও স্নেহবঞ্চিত হয়ে সংসার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার ভয়ডর নেই, কোলা ব্যাঙ ধরে বাগানের খোঁটা পোতার গর্তে রেখে তাকে পুষতে থাকে, গুবরে পোকা এনে কাগজের বাক্সে রাখে। একটা দেশি কুকুর পুষতো সে, মনিবের মতো তারও অনাদরেই দিন কাটতো; পরের বাড়িতে চুরি করে খেতে গিয়ে চতুর্থ পা খোড়া হয়েছিল, ছেলেটার বিছানাতেই শুত সে, নইলে উভয়ের ঘুম হতো না। কুকুরটিকে মেরে ফেলা হলে সে লুকিয়ে কেঁদে বেড়াতো, অথচ কেউ কোন দিন তাকে কাঁদতে দেখে নি। মাস্টার মশায় এসে কবিকে জানিয়ে যায় শিশুপাঠে কবির লেখা কবিতাগুলো পর্যন্ত এ বাঁদরটা পড়ে না এমন নিরেট বুদ্ধি। কবি বললেন যে, সে ত্রুটি তাঁর। ওর নিজের জগতের কবি ওর জগৎকে রূপ দিতে পারলে ছেলেটি সেগুলো না পড়ে পারতো না। তিনি তো কোন দিনই ব্যাঙের খাঁটি কথা বা ওর নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডির রূপ দিতে পারেন নি। কবিগুরুর এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে একটি সত্য বেরিয়ে আসে তা হোল অতি

সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি খুব বেশি কবিতা লেখেন নি এবং সেই বোধ থেকেই *পুনশ্চ* কাব্যের কবিতাগুলো লিখেছিলেন। মা হারা অনাদরে বেড়ে ওঠা ছেলেটির কথা কবি গভীর মমত্ব দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

সামাজিক বৈষম্যের নিরিখে বিচার্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বাঁশি'। আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবনে হাজার বার দেখা সুপরিচিত এই হরিপদ কেরানি। শহুরে, সভ্য, শিক্ষিত, জীবন বিপর্যয়ের চাবুকে ঘা-খাওয়া আধমরা কেরানি গোষ্ঠীর তরুণ প্রতিভূ এই হরিপদ। কবি বর্তমান কালের অভাবগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত জীবনের বেদনাকে রূপদান করেছেন। হরিপদ কেরানির মেসের চুনকালি খসা একটি ঘরের বর্ণনা দিয়ে কবিতাটির আরম্ভ। এই পরিচিত ঘরটি আমাদের নিম্নবৃত্ত জীবনের একান্ত সত্য। কবি নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অধিকারী মানুষের আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বেদনা ও সুখ-দুঃখ এক কথায় জীবনের পূর্ণ অনুভব উদ্ঘাটিত করেছেন হরিপদ কেরানির মাধ্যমে। পঁচিশ টাকা মাইনের কনিষ্ঠ কেরানি, দত্তদের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে খেতে পায়। এই কেরানির মনেও বসন্তের ছোঁয়া লাগে, জীবনের পূর্ণতার হাতছানি আসে। পিসিমার দেওরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু নিজের দুরবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজ্ঞান বলেই হরিপদ বিয়ে করে নি, পালিয়ে এসেছে। তার মনের রাজ্যে তখন এই সুর ধ্বনিত হচ্ছে– 'মেয়েটা তো রক্ষা পেলে,/ আমি তথৈবচ।/ ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া-পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।'[১৬] তারপর কবি আবার বস্তুগত প্রত্যক্ষ সংসারে ফিরে এসেছেন। স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাশে স্যাঁৎসেঁতে ঘর, বৃষ্টি ভেজা পরিবেশ। সব মিলিয়ে দিনরাত মলিন, আধমরা জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে। কাব্যের শেষে কবি অবশ্য সামান্যের মধ্যে অসামান্যের স্পর্শ নিয়ে এসেছেন। তুচ্ছ অবহেলিত জীবনের অধিকারী হরিপদ কেরানির মধ্যেও আকবর বাদশার অনুভূতির সঞ্চার ঘটিয়েছেন।

সামাজিক বৈষম্য বিষয়ক এক অপূর্ব কবিতা 'শুচি' অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এখানে মানবপ্রেমের এক মহিমাময় মন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে। বৈষম্যহীন মানবসাম্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। জাতিগতভাবে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টিকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। সকল মানুষই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, সেদিক থেকে সকলেই সমান। কিন্তু সেই সত্য বিস্মৃত হয়ে মানুষ নানা শাসনের চোখরাঙানিতে বিভেদমূলক সমাজ তৈরি করে কাউকে ছোট, কাউকে বড়, কাউকে বা অশুচি বলে চিহ্নিত করেছে। এর দ্বারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি অমর্যাদা দেখানো হয়। এতে মানুষের অন্তর পাপে পূর্ণ হয়ে যায়। রামানন্দজীর মতো নিষ্ঠাবান সাধকও এই পাপ থেকে মুক্ত নন। তার মনে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার ছিল তীব্র, তিনি নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সমস্ত মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে একান্ত করে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন নি। বর্ণ ধর্মের কুসংস্কারে তিনি-আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে পারেন নি। সহসা তিনি অনুভব করেন বর্ণভেদের দ্বারা মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় তা পাপ এবং তা লোপ না করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। তখন তিনি শ্মশানচারী চণ্ডাল এবং অস্পৃশ্য মুসলমানকে আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নিলেন। তাদের বরণ করে, তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে তিনি শুচি হলেন।

উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পাশ্চাত্যের ধনী রাষ্ট্রগুলো এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রয়োগ করে অনেক রাষ্ট্রকেই উপনিবেশে পরিণত করে। তারা নিজদেশকে সমৃদ্ধশালী করেছে, আর পরাধীন দেশগুলো হয়েছে হতদরিদ্র। উপনিবেশবাদ পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। *পত্রপুট* কাব্যগ্রন্থের ষোলো সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যলোলুপতার হিংস্র দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইউরোপের সাম্রাজ্যলোলুপ জাতি কি করে বর্বর অত্যাচারে দলিত মথিত করে আফ্রিকাকে অধিকার করল তা এই কবিতাতে ব্যক্ত হয়েছে। ছায়াবৃত অপরিচিত আফ্রিকার দিন কাটছিল কালো ঘোমটার নিচে, সভ্যতার উপেক্ষিত দৃষ্টিতে সে ছিল অনাদৃত, কিন্তু তবু লোভী দস্যু নেকড়েসুলভ মনোবৃত্তির মানুষ যারা সভ্যতার গর্বে আফ্রিকার 'সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে বেশি অন্ধ'– তারা এল লোহার হাতকড়ি নিয়ে বন্দী করল আফ্রিকাকে, চললো শাসন, শোষণ। কবি বলেছেন– 'দস্যু পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায়/ বীভৎস কাদার পিণ্ড/ চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।'[১৭] অথচ এই সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গের দল সমুদ্রপারে নিজেদের দেশে সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে পুজো দেয়। কবিতাটিতে সভ্যতার- গর্বে উদ্ধত অত্যাচারী উপনিবেশবাদীদের প্রতি কবির আন্তরিক ঘৃণার তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। নেকড়ের চেয়ে তীব্রতর ধারালো নখের অধিকারী তারা, তারা পশু, গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ষিত করেছে আফ্রিকাকে। এই কবিতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবাসীর ব্যথিত মনোবেদনার ভাবটিকেও প্রকাশ করেছেন। *পত্রপুটের* সতের সংখ্যক কবিতাতেও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানিরা বুদ্ধের মন্দিরে যুদ্ধের সাফল্য কামনা করতে গিয়েছিল। ধর্মের নামে মানবকল্যাণের নামে তাদের এই অনাচার অত্যাচারকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন। কবির ভাষায়– 'ওরা শক্তির বান মারছে চীনকে, ভক্তির বান বুদ্ধকে।' তিনি জাপানিদের এই ভণ্ডামীকে বিদ্রুপ করেছেন– 'সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে/ নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ/ বেজে উঠেছে তুরী ভেরি গরগর শব্দে / কেঁপে উঠছে পৃথিবী।'[১৮]

রবীন্দ্রনাথ শুধু 'সীমার মাঝে অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, তাঁর সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্র বিপুল-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। রোমান্টিসিজম্ ও আধ্যাত্মিক সাধনা তাঁর কাব্য-সাধনার বহুলাংশে ব্যাপৃত হলেও সমাজ-বাস্তবতাও এখানে প্রতিফলিত। তদুপরি এই প্রবন্ধে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যসম্ভারে সামাজিক বৈষম্যের প্রসঙ্গ নিতান্ত কম নয় এবং ভাবের গভীরতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ মমত্বে তাঁর কবিতাগুলো মহিমান্বিত।

তথ্যসূচি:

---

১. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, (সপ্তদশ খণ্ড), প্রকাশকাল ১৯৬১, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৪১০

২. *চর্যাগীতিকা*, সম্পাদক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃষ্ঠা

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪২

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩

৬. *রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা*, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০৪, পৃষ্ঠা

৭. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, (দ্বিতীয় খণ্ড), *কড়ি ও কোমল*, 'কাঙালিনী', প্রকাশকাল ১৯৬৬, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৩৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

১০. *সঞ্চয়িতা*, *মানসী*, 'বধূ', বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পৌষ ১৪১৫, পৃষ্ঠা ৭৫

১১. প্রাগুক্ত, *চিত্রা*, 'এবার ফিরাও মোরে', পৃষ্ঠা ২২০

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২০

১৩. প্রাগুক্ত, 'পুরাতন ভৃত্য', পৃষ্ঠা ২৩৬

১৪. প্রাগুক্ত, 'দুই বিঘা জমি', পৃষ্ঠা ২৩৮, ২৩৯

১৫. প্রাগুক্ত, *পরিশেষ*, 'প্রশ্ন', পৃষ্ঠা ৬৪৬

১৬. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (ষোড়শ খণ্ড), *পুনশ্চ*, 'বাঁশি', প্রকাশকাল ১৯৬৬, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪

১৭. প্রাগুক্ত, (বিংশ খণ্ড), *পত্রপুট*, ষোল সংখ্যক কবিতা, পৃষ্ঠা ৫০

১৮. প্রাগুক্ত, ১৭ সংখ্যক কবিতা, পৃষ্ঠা ৫২

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

কুমুদিনীর ক্রমবিকাশ এবং রবীন্দ্র ভাবনায় নারী

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী*

নুরনগরে চাটুজ্যে পরিবারে বেড়ে ওঠে কুমুদিনী। কুমুদিনীর পিতা-মাতার সান্নিধ্য, স্নেহ ততটা মনে রেখাপাত করেনি। গ্রামের আকাশ-বাতাস, পুজোবাড়ি, শস্যক্ষেত, মানুষজন, ঘনবন, বিস্তৃত মাঠ, বেতের ঝাড়, জেলে-নৌকো এসবের সাথে কুমুর আত্মীয়তা। পিতার মৃত্যুর পর কলকাতার বাগবাজারে এসে ভাই-বোনের সম্পর্ক আরো নিবিড় হলো বটে, কিন্তু কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন অনম্র জগতে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ ঠেকলো। 'পবর্ত-বাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস সরোবরের কূলে।'[১] বিপ্রদাস কুমুকে বোঝে। তাই দাবা খেলা, ফোটোগ্রাফ তোলা, এসরাজ বাজানো এমনকি ব্যাকরণের পাঠ শেখাতে শুরু করলো। বিপ্রদাস কুমুকে মানুষ হতে শেখাতে চাইলো। কুমুদিনী দাদার শিক্ষায় চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করলেও সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। 'যখন কুমার সম্ভব পড়লে তখন থেকে শিবপূজায় সে শিবকে দেখতে পেলে।..... কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদভাসিত দেখা দিলে।'[২]

পুরুষের বেলায় বিবাহ একটি ঘটনা মাত্র। অথচ মেয়েদের বেলায় বিবাহ জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। এই বদ্ধমূল ধারণাকেই আর দশজনের মতো কুমুদিনীও বিশ্বাস করে। বিবাহের সম্বন্ধ চলাকালে কুমুদিনীর বাঁ চোখ নাচল। কুমুর মনে শঙ্কার উদয় হলেও সে নিশ্চিত হয়েছে এই ভেবে যে, কিনু আচার্যির কুষ্ঠি অনুযায়ী তার তো রাজরানী হবার কথা। ঘরে গিয়ে পাঁজি দেখলো আজ 'মনোরথ-দ্বিতীয়া' অর্থাৎ মনোবাসনা পূর্ণ হবার শুভতিথি। ব্রাহ্মণ ভোজন আর দক্ষিণা দান করে কুমুদিনী আশীর্বাদ পুষ্ট হলো। 'ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক'[৩]- ব্রাহ্মণের আশীর্বচন বৃথা যায়নি। সে রাজরানীও হয়েছে, ধন এবং পুত্র অর্থাৎ সন্তানবতীও হয়েছে। বঙ্গ সমাজের দাম্পত্য জীবনে এর চেয়ে বেশি ভাবাটাই অন্যায়।

বিপ্রদাস চাট্যুজ্যে আর মধুসূদন ঘোষালের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন নিয়ে বিপ্রদাসের মনে সংশয় ছিলো প্রথম থেকেই। কুমুদিনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হলে বিপ্রদাস ভেবেছে: 'এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের নাকি?'[৪] অন্যদিকে কুমুর মনে চাপা উন্মাদনা। 'তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।'[৫]

বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের মধ্যে বিবাহের প্রথম দিনেই যে বেসুরো ঝনঝনানি উঠলো, তাতে কুমুর এত দিনের বিশ্বাস-সংস্কারে লাগলো প্রবল ধাক্কা। 'ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?'[৬] কুমুদিনীর মধুপ্রাসাদে এসে নতুন জন্ম হলো। যে চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-আদর্শে, বিশ্বাস-সংস্কারে সে বেড়ে উঠেছে, তার সাথে এ প্রাসাদের এবং প্রাসাদের অধিকারীর মাঝে বিশাল বৈপরীত্য। মধুসূদন ঘোষালের প্রাসাদে সে মহারানী বটে, কিন্তু তার স্বতন্ত্র কোনো অধিকার নেই। মধুসূদনের কাছে 'স্ত্রী' শব্দটি একেবারেই গতানুগতিক। 'তারা ঘরকন্নার কাজ করে। কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। ... দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবেনি।'[৭] 'দুর্গম, দুর্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য'[৮]- মধুসূদনের মতো ব্যক্তির সাহচর্য কুমুদিনীর কাছে করুণা আর কৃত্রিম মনে হয়েছে। 'যো ভর্তা সা স্মৃতাঙ্গনা'[৯] অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী এক অভিন্ন সত্তা কিম্বা 'শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্তাশু তৎকুলম্/ ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।'[১০]

অর্থাৎ যে পরিবারে পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতি দুঃখিত হয়ে থাকে এবং পরিতাপ করে। সেই পরিবার অল্পকাল মধ্যেই ধবংসপ্রাপ্ত হয়।

এসবই পুঁথিগত শ্লোকমাত্র। সামাজিক বিধি-বিধান ও অনুশাসনের কাছে একেবারেই নিরর্থক। যুগে যুগে পুরুষ বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত। পিতা, পতি, পুত্র দ্বারা নারীর জীবন শাসিত। কুমুদিনী নিজেকে অপয়া মনে করেছে। 'সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে। মেয়েরা লক্ষ্মীকে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে।'[১১] বিধি-বাম কিম্বা 'ললাট-লিখন' বলে কপালে করাঘাত করা ছাড়া যেন কিছুই থাকেনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমুর হয়ে বলেছেন: 'উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি।'[১২] ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি-কর্তা বিধাতার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন: 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেন নাহি দেবে অধিকার/ হে বিধাতা?'[১৩]

রবীন্দ্রনাথের নারীরা কম-বেশি বাক্ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কুমুদিনীর উচ্চারণও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ়। কুমুদিনী ভাবে; 'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ দাসের জাতের মানুষ?'[১৪] 'মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন'[১৫] লাভালাভের দাস সে। 'পুরোনো জমিদারের জমিদারি নতুন ধনী

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ে জ্বালা ধরে।'[১৬] বিপ্রদাস-মধুসূদন সম্পর্কের ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে। নববিবাহিতা স্ত্রীর আঙুল হতে বিপ্রদাসের দেয়া নীলার আংটি খুলে নেয়ার মধ্যেও রয়েছে সেই জ্বালা, সেই ঈর্ষা।

রোগশয্যায় শুয়ে বিপ্রদাস বড়ো আদরের কুমুদিনীকে মধুসূদনের হাতে সম্প্রদান করেছে এবং কুমুদিনীকে এই বলে আশীর্বাদ করেছে যে, 'কুমু পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এসব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইছে। মেঘের মতোই অমনি সহজে এটাকে মেনে নিস দিদি।"[১৭] দাদার আশীর্বাদে শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও মধুপ্রাসাদে লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে থাকার চেষ্টা করতো কুমদিনী কিন্তু দাদার অপমান তাকে করেছে কঠোর। রুগ্ন দাদাকে দেখতে যাবার সৌজন্যবোধটুকুও যার নেই, তার গৃহে অবস্থান দাদার শিক্ষা আদর্শের অপমান বৈ তো নয়। কুমুদিনী তার অন্তর্যামীকে উপলক্ষ্য করে বলেছে: 'আমার বুক নিংড়িয়ে তুমি পুজো চাও, তাই দেব আমি, কিছুতেই হার মানব না, হার মানব না।'[১৮] দাম্পত্য জীবনে মেনে নেয়াটাই যেন স্ত্রীর ধর্ম। নারীর প্রতি সমাজের ঔদাসীন্য ও নিগ্রহ দেখে রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর যে ভূমিকা পালন করেছিলেন; স্ত্রীর-পত্র গল্পের মৃণালের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ভূমিকাই রেখেছেন। তবে অগ্রজদ্বয়ের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্থক্য–তাঁরা সমাজ-সংস্কারের ভূমিকায় নারীদের অধিকার আদায়ের বিধান করতে চেয়েছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে বলেছেন, অধিকার অন্যের কাছে দানস্বরূপ হাত পেতে নেয়ার বস্তু নয়। আপন অন্তরের শৌর্যে তাকে আয়ত্ত করতে হয়। পুরুষের দম্ভ, দণ্ড আর ত্রাসনের প্রশ্নে রবীন্দ্র-কবিচিত্তের সবটুকু ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে মৃণাল, অনীলা, গিরিবালা, কল্যাণী, চিত্রাঙ্গদা-এদের চরিত্রে। 'কুমুদিনী' ওদের চেয়ে অনেকখানি স্বতন্ত্র। অধিকার আদায়ের কথা কুমু ভাবতেই পারেনি। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব তাকে পীড়িত করেছে। মধুসূদন যখন কুমুদিনীকে প্রশ্ন করেছে 'আমাকে তোমার ভালো লাগছে না?'[১৯] কুমুদিনী নির্দ্বিধায় উত্তর দিতে পারেনি। সে ভেবেছে: 'কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়।'[২০]

রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*, *চতুরঙ্গ*, *ঘরে-বাইরে*, *শেষের কবিতা*, *চার অধ্যায়*, *গোরা* প্রভৃতি উপন্যাসের পুরুষেরা প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়েও নারীর কাছে নিজেকে নিবেদন করেছে শেষাবধি। মধুসূদনের ঘরে কুমুদিনীর আগমনে ব্যবসায় লাভের বিষয়টি কুমুদিনীকে পয়মন্ত করে তোলে। 'স্ত্রীভাগ্যে ধন' মধুসূদনকে আহলাদিত করলেও তার বুঝতে বেশি সময় লাগেনি, কুমু আর দশ জন থেকে স্বতন্ত্র। 'ও যেনো ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে।'[২১] দাম্ভিক মধুসূদনও মনে মনে কুমুদিনীকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছে। কুমুদিনীর শান্ত, সংহত, সংযত অথচ অনমনীয়তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মহত্ত্বকে বড়ো করে তুলেছেন, সেখানেই ধনবাদী মধুসূদন ঘোষালের পরাজয়। স্ত্রীর চারিত্রিক দৃঢ়তা স্বীকার করে সে হীনমন্যতায় ভুগেছে। কিন্তু তা বাহ্যত প্রকাশে কুণ্ঠিত মধুসূদন, কারণ এতে চাটুজ্যে পরিবারের কাছে ঘোষাল পরিবারের দাম্ভিকতার বিসর্জন ঘটবে।

কুমুদিনী *চতুরঙ্গ*-এর দামিনীর মতো কিম্বা *ঘরে-বাইরের* বিমলার মতো সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। যদিও দামিনী, বিমলা, বিনোদিনী সংস্কার মুক্ত হয়েও জীবন জটিলতার কোনো সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পায়নি। সমস্যাপীড়িত জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাত সর্বদা তাদের আন্দোলিত করেছে। '*রবিবার*' গল্পের 'বিভা' যে কথা সহজে উচ্চারণ করেছে, সে কথা কুমুদিনীও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে কিন্তু সেভাবে প্রকাশ করেনা। বিভা বলেছে, 'মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতির প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।'[২২] কুমুদিনীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই এভাবে উপস্থাপন করেছেন, 'রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দু'খানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব।'[২৩] কুমুদিনী যখন প্রথম পতিগৃহে এসেছিল তখন তার মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং ভক্তি। শ্যামাসুন্দরীর আচরণটাও কুমদিনীর বুঝতে সময় লাগেনি। একদিকে মধুসূদনের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দেহজ ভালোবাসর হাতছানি, অন্যদিকে শ্যামাসুন্দরীর 'বিস্বাদ' জাগানো কথা। স্বামী সুদর্শন নয় কিম্বা বয়সের পার্থক্যের জন্য স্বামীকে ভালোবাসতে পারবে না, এমন কথা চিন্তাও করেনি কখনো। 'এযে ইতর মেয়েদের কথা।'[২৪] 'যে ভালবাসা নিয়ে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপ গুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমু ভাবেওনি।'[২৫] কিন্তু ঘোষাল পরিবারে কুমুর অবস্থান, স্বামীর অন্তরে কুমুর আধিপত্য, দাম্পত্য প্রেমের নশ্বরতা, চাটুজ্যে-ঘোষাল পরিবারের দ্বন্দ্ব সব মিলিয়ে কুমুকে ভাবতে বাধ্য করে- 'সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?'[২৬] কুমু এও বুঝেছে ভালোবাসা সহজ নয়, ভালোবাসতে পারাটাই দুর্লভ। জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় তা সম্ভব হতে পারে। কুমুদিনী 'মোতির মা'দের মতো সাধারণ নয় তাই অতি সহজেই সংসার বিষয়টাকে কেবলই 'ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন'[২৭]- এর মধ্যেই খুঁজে পায়নি। অন্তরের অধিকার যেখানে থাকে না সেখানে বাইরের জিনিসের অধিকারে কুমুর লোভ নেই এতটুকু। সংসারে ফেরা না ফেরার প্রসঙ্গে আলাপকালে কুমুদিনী সহজভাবে বলেছে, 'কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।'[২৮] *স্ত্রীর পত্র*-এর মৃণালের মতো স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। মৃণাল

বলেছে, 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।'[২৯] 'রূপের অতীত রূপ' দেখার মতো জীবনদেবতা না পেয়েও কুমুদিনীর প্রার্থনা-

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং/ প্রসাদয়ে ত্বাম অহমীশমীডং

পিতেপ পুত্রস্য সখের সখ্যুঃ/ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।[৩০]

অর্থাৎ হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমন করে সইতে পার। রবীন্দ্র সাহিত্যের নারীরা ব্যক্তিত্বশালিনী হয়েও সমাজ-সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। দু'একজন ছাড়া। কুমদিনীও তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত হয়েও মধুসূদনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। যদিও তাতে নেই আত্মিক-উচ্ছ্বাস। কুমুদিনীর অবিচল মূর্তি মধুসূদনের মতো পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর মনকেও শঙ্কিত করে তোলে। কারণ মধুসূদন বুঝেছে, 'ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জন করে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না।'[৩১] এ যেন রবীন্দ্রনাথেরই মনোগত উক্তি। কুমুদিনীর ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল, প্রকাশ ভিন্ন। কুমুদিনীর স্বপ্নের 'রাজপুত্তর' যখন 'রাজদণ্ডধারী' হয়ে উঠেছে, তখন তার সাথে মানিয়ে চলা কুমুর পক্ষে সহজ নয়। ভালোবাসাহীন ঘরের অনুকম্পার জন্য তার মনে কোনো অনুতাপ নেই। 'নুরনগরি চাল'-কেই সে অন্তরে ধারণ করেছে। এ যে তার 'গুরু' দাদার শিক্ষা। সহজ, সরল, প্রকৃতির মত স্বার্থহীন কুমুদিনীর কাছে নিজের অপমান অতি তুচ্ছ, কিন্তু বিপ্রদাসের অপমান সইবার মতো ধীশক্তি তার নেই। কুমুদিনী ক্রমশ হয়ে ওঠে সিদ্ধান্তে অটল। মধুসূদনের ভারী গলার আওয়াজও কুমুকে আর বিচলিত করেনা। 'যে বাধা সূক্ষ্ম, যা মর্মগত, বিশ্লেষণ করে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন তারই শক্তি যে প্রবলতম'[৩২] তা সাধারণ গৃহিণীদের বোধগম্য নয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহংকার নয়, এমনকি ,এইটে নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জয় বিরোধ, সাধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেয়া কঠিন। বিপ্রদাস যেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছায়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *নারী* এবং *পঞ্চভূত* প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, তাই বিপ্রদাসের মুখে *যোগাযোগে* উচ্চারিত হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের মধ্যেও দুটো সত্তা। একদিকে বিপ্রদাসেরা, অন্যদিকে মধুসূদনেরা। বিপ্রদাসেরা উপলব্ধি করে, উপায় পায় না। মধুসূদনেরাই শেষ পর্যন্ত প্রবলতম হয়ে ওঠে।

বিপ্রদাসের কাছে কুমুদিনী ফিরে এলে, বিপ্রদাসের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের বঙ্গসমাজচৈতন্যেরই প্রকাশ ঘটেছে। 'স্ত্রীকে নিরূপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি। ... সতীত্ব গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর।'[৩৩]

শাস্ত্রজ্ঞ সমাজবিদেরা বলেছেন :'যো ভর্তা সা স্মৃতাঙ্গনা'[৩৪] অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী এক অভিন্ন সত্তা। বাস্তবে এ কতখানি মিথ্যে তা বলাই বাহুল্য। বিপ্রদাস তাই কুমুদিনীকে বলেছে, 'অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়।'[৩৫] স্বামীর কাছে স্ত্রীর অপমানের জন্য বিপ্রদাস 'আমাদের ধর্মবুদ্ধিহীন সমাজ'[৩৬] -কেই দায়ী করেছে। বিপ্রদাস তার মাকে অপমানিত হতে দেখেছে, আজ কুমুর অপমান দেখে বিপ্রদাস কুমুকে বলেছে, 'আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তাই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতেই হার মানবি নে।'[৩৭] মধুসূদনের 'স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সংকুচিত করে তুলেছে।' [৩৮] যে কুমু একসময় ভেবেছিলো, 'সমাজে মেয়েদের জন্য খাঁচাকল তৈরি করেছে, সেখানে একবার ঢুকলে জীবনান্তকাল পর্যন্ত আর বেরোবার জো নেই।'[৩৯] সেই কুমুর ভাবান্তর হয়েছে বিপ্রদাসের শিক্ষায় আর জীবনাভিজ্ঞতায়। এখন কুমু বলছে, 'আমি শুধু মেয়ে মানুষ নই; আমি মানুষ।'[৪০] যে কুমু একদিন মধুসূদনের কাছে নিজেকে 'দাসী' বলতে দ্বিধা করেনি, সেই কুমুদিনীই নির্দ্বিধায় বলেছে, 'আমার মনকে শ্রদ্ধা করে যদি না পাও তবে অপমান করে কিছুতেই পাবে না। কারাগারের দরজা বানিয়েছিল আমার আপন মনের অন্ধবিশ্বাস, আজ ভেঙেছে আমার সেই বিশ্বাস, আজ আমি মুক্ত।'[৪১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *পঞ্চভূত*-এ বলেছেন, 'আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।'[৪২] তিনি আরো বলেছেন, 'পুরুষ সম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নিলর্জ্জভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি।'[৪৩]

মধুসূদনের গৃহে ফিরে না যাওয়ার সঙ্কল্প কুমুদিনীকে ভাঙতে হয়েছে শুধুই গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভেবে। 'মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই জমেছে, ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেছে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এ সংসারে তার কর্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাবে।'[৪৪] মধুসূদনের যোগ্যতা কম বলেই আস্ফালন অধিক। মধুসূদন জানে, বিপ্রদাস, যত বড় দর্পীই হোক, এবারে তার স্ত্রীকে পাঠাতে বাধ্য হবে।

'প্রজানার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবা।'[৪৫]-অর্থাৎ বিবাহেই নারীর সার্থকতা এবং মাতৃত্বেই তার চরিতার্থতা। লক্ষ্মীস্বরূপা কুমুদিনী সন্তানসম্ভবা বলেই মির্জাপুরের প্রাসাদে বেজে উঠলো নহবত, চললো ব্রাহ্মণভোজন আর ব্রাহ্মণ বিদায়ের আয়োজন। '*নারী*' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'সর্বত্রই সীমানা ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না- তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।'[৪৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরুষদের 'একেশ্বর শাসনকর্তা' বলেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, নবযুগে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা কেবল পুরুষ নির্ভর হতে পারে না। নারীরা নবযুগের মানসসন্তান। 'আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে। ... তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়-যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসেছে।'[৪৭] কবিগুরু আশা করেছেন, 'তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।'[৪৮] কারণ অন্ধরক্ষণশীলতাই সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ সালে। *যোগাযোগ* উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৯ সালে। অনেক পরের এই অভিব্যক্তির আভাস কুমুদিনী চরিত্রে বেশ স্পষ্ট হয়েছে। কুমুদিনীরও 'নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।'[৪৯] কুমুদিনীর অভিনব ঘোষণাই প্রমাণ করেছে- মুখের ওপরের ঘোমটাই শুধু নয়, মনের ঘোমটাও খসেছে। জননী হওয়াই জীবনের সারকথা নয়, তাই তার সুস্পষ্ট ঘোষণা-'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।'[৫০] শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাঙালির জীবনেও এ ঘোষণা অভিনব। 'স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে'- বলেই কুমুদিনীর নির্বিকার উচ্চারণ 'মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। ... আমি মুক্তি চাই'।[৫১]

নারীমুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রভাবনা সুদৃঢ় হলেও 'মুক্তি' বিষয়টি কিছুটা অধরাই থেকে গেছে তাঁর লেখায়। 'ভর্তুং পত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধন্তু ভর্তরি'-[৫২] অর্থাৎ স্বামীর দ্বারা উৎপাদিত পুত্র স্বামীরই হয়ে থাকে। নিজেকে স্বামীর অন্যায় - অনুচিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য কুমুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াটা নিশ্চয় প্রশংসনীয় কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান কি শুধু শ্বশুরবাড়ী বা স্বামীর সংসারের অধিকারের বস্তু? এতো সেই প্রাচীন সংস্কার! এ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের মুক্তি দিতে পারলেন কই? 'এমন কিছু আছে যা সন্তানের জন্য খোয়ানো যায় না'- এতে আপাত গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জননীর গৌরবের বিষয় হলো- সন্তানকে নিজের কাছে রেখে স্বামীর অনধিকার চর্চার প্রতিবাদ করা। জননীর কাছে সংসার, স্বামী, ঐশ্বর্য, অধিকার অতি তুচ্ছ, আত্মজকে ত্যাগের মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই। 'প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে ইউরিপিদেস রচিত 'মিডিয়া'তে দেখা গেছে, মিডিয়ার স্বনির্বাচিত সঙ্গী জ্যাসনের সঙ্গে দশ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের পরে ঘটে অনভিপ্রেত ঘটনা। জ্যাসন পুনরায় থিবিসের রাজা ক্রেয়নের কন্যাকে বিবাহ করে। এতে ক্রুদ্ধ যাদুবিদ্যাধারী 'মিডিয়া' কন্যাকে এবং ক্রেয়নকে হত্যা করে যাদুবিদ্যাবলে। শুধু তাই নয় স্বামীর কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ জ্যাসনের ঔরসজাত নিজের দুই পুত্রকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। এরপর সে নিজেকে মুক্ত, স্বাধীন ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।'[৫৩] স্ত্রী হিসেবে স্বামীর অন্যায়ের প্রতি ঘৃণায়, ক্ষোভে অপমানে স্বামীগৃহত্যাগ সঠিক সিদ্ধান্ত হলেও সন্তানকে পরিত্যাগ করা কিংবা প্রতিহিংসাবশত হত্যা করা মাতৃত্বের অপমান। স্বামীর সংসারে থেকে যে কুমু নিজের অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলো, গর্ভস্থ সন্তান এবং সংসার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কি সে নিজের ব্যক্তিত্বকে, নিজের অধিকারকে ধরে রাখতে পারবে? এও তো এক ধরনের পরাজয় স্বীকার করা। এর মধ্যে মুক্তি কোথায়? মধুসূদন ঘোষালের ঠোঁটের কোণে বঙ্কিম হাসি, নহবত বাজিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন আর ব্রাহ্মণ বিদায়ের আয়োজনের কাছে কুমুদিনী নিতান্তই অসহায়।

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নিরুপমা, হৈমন্তী, চন্দরা, শশী এরা ছিলো প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তথাপি এরা পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, নীরবতা, অবিচারের জবাব দিয়েছে নিজেকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এদের জয় দেখানো হয়েছে আত্মবিলুপ্তির মধ্যে, আত্মনিগ্রহের মধ্যে। 'ধর্মপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের গুণে স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'- একথাই প্রতিপন্ন হয়েছে ওদের চরিত্রে কিন্তু প্রকারান্তরে পুরুষের শক্তিতেই নিবেদিত ওরা সবাই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন অধিকার দান গ্রহণের বিষয় নয়, অন্তরের শৌর্যে তাকে আয়ত্ত করতে হয়। কুমুদিনীর চরিত্রে তাঁর একথার প্রতিফলন ঘটেনি। কুমুদিনী সহজেই অধিকার ছেড়ে দিয়ে আত্মমুক্তি লাভের প্রত্যাশা করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সময়ে এই চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন সে সময়ে নারীদের

সংস্কারকে অস্বীকার করা অভাবনীয় ছিল। সমাজ-সংসার, সংস্কার সবসময় নারীদের মানসিক দৃঢ়তাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। কুমুদিনী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও ভেবেছে, মা ধৈর্য হারিয়ে ভুল করেছিলেন। 'কুমু কখনো সে ভুল করবেনা।'[৫৪] বাল্যকালে পতিকামনায় মহাতপস্বী শিবের আরাধনা করেছে। এও বিশ্বাস করতো, স্বামী যত অযোগ্য হোক, যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ। বিবাহ অনুষ্ঠানে মঙ্গলধ্বনি বাজলো না, সপ্তর্ষিদের আশীর্বাদমন্ত্র শুনতে পেলোনা এমনকি 'জগত ঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বারৌ' [৫৫] অর্থাৎ যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও শব্দের মতো একত্রে মিলিত হয় সেই বন্দনাগীতও উচ্চারিত হলো না, তখন কুমুর হৃদয়ে লালিত সংস্কারের ভিত কিছুটা নড়ে উঠলো। এক সময় মোতির মায়ের কথাই সত্যি বলে মনে হলো-'কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, সে গাছ পায় না, কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখতে জানে। সে পায় ফুল, পায় ফল। তুমি পড়েছ কাঠুরের হাতে, ও যে ব্যবসাদার ওর মনে দরদ নেই কোথাও।'[৫৬]

মধুসূদন ব্যবসাদার হলেও অন্তরে পুরো ব্যবসায়ী নয়। কারণ মধুসূদন মনে মনে স্বীকার করে কুমুদিনীর 'দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও যেন ওর অলংকার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে- ওকে ধনের দাম কষতে হয় না। হিসেব রাখতে হয় না- মধুসূদন ও কে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে।'[৫৭] মধুসূদন এও বুঝেছিল- কুমুদিনীর মতো স্ত্রীকে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একমাত্র উপায় মাতৃত্বের বন্ধনে জড়ানো। কুমুর শুচিতা, শুভ্রতা 'যেন নির্জন তুষার শিখরের উপর নির্মল ঊষা।'[৫৮] মধুসূদন কুমুদিনীকে ভালবাসেনা এটাও যেমন সত্য নয়, আবার ভালোবাসে এটাও একেবারে মিথ্যে নয়। মধুসূদনের অন্তরের সবচেয়ে সত্য হলো- চাটুজ্যে আর ঘোষাল পরিবারের মধ্যেকার চিরদ্বন্দ্ব। কুমুদিনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে মধুসূদন মনে করে বিপ্রদাসের কাছে হেরে যাওয়া। এই পরাজয়ের গ্লানিবোধ মধুসূদনকে কঠোর করেছে। অন্যদিকে কুমুদিনীকে করেছে ক্ষুব্ধ, সিদ্ধান্তে অবিচল। মধুসূদনের হৃদয়ের ভাষা আর মুখের ভাষা এক হতে পারেনি। কিন্তু কুমুদিনীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানসিক স্থিরতার কাছে মধুসূদন নিজেকে হীন বোধ করেছে। এখানেই কুমুদিনীর শ্রেষ্ঠত্ব। রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের চির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত নারীকে জয়ী করেন, কারণ নারী সৃষ্টি, প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

তথ্যসূচি

---

১. রবীন্দ্র- রচনাবলী, জয় প্রকাশনী, ঢাকা-১৪১০, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩।

২. ঐ, পৃ: ৩৩৩।

৩. ঐ. পৃ: ৩২৭।

৪. ঐ. পৃ: ৩৪০।

৫. ঐ. পৃ: ৩৪১।

৬. ঐ. পৃ: ৩৪৬।

৭. ঐ. পৃ: ৩৫১।

৮. ঐ. পৃ: ৩৫২।

৯. মনুসংহিতা ড. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত কলিকাতা-১৪১০, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক-৪৫

১০. ঐ. ৩য় অধ্যায়, শ্লোক-৫৭

১১. রবীন্দ্র- রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২৬।

১২. ঐ. পৃ: ৩২৭

১৩. সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা-১৪০২, পৃ: ৪৪৬

১৪. রবীন্দ্র- রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬১।

১৫. ঐ. ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫।

১৬. ঐ. পৃ: ৩৫৩।

১৭. ঐ. পৃ: ৩৪৭।

১৮. ঐ. ১৮তম খণ্ড, পৃ: ১৭৯।

১৯. ঐ. ৫ম খণ্ড পৃ: ৩৮৮

২০. ঐ, পৃ: ৩৮৮।

২১. ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫০।

২২. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঢাকা, রবিবার গল্প পৃ: ৭৯১।

২৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২৬।

২৪. ঐ. পৃ: ৩৫৬।

২৫. ঐ. পৃ: ৩৫৬।

২৬. ঐ. ১৮তম খণ্ড, পৃ: ১৯০।

২৭. ঐ. পৃ: ২১৩।

২৮. ঐ. পৃ: ২১৩।

২৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ: ৩৩৭।

৩০. ঐ. ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৭।

৩১. ঐ. পৃ: ৩৮৮।

৩২. ঐ. পৃ: ৪২১।

৩৩. ঐ. পৃ: ৪৩৫।

৩৪. মনুসংহিতা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।

৩৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৫।

৩৬. ঐ. পৃ: ৪৩৫।

৩৭. ঐ. পৃ: ৪৩৫।

৩৮. ঐ. পৃ: ৪৫১।

৩৯. ঐ. ১৮তম খণ্ড পৃ: ২২৭।

৪০. ঐ. পৃ: ২২৭।

৪১. ঐ. পৃ: ২২৮।

৪২. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৯৭।

৪৩. ঐ. পৃ: ৮৯৯।

৪৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২।

৪৫. মনুসংহিতা, প্রাগুক্ত, নবম অধ্যায়, শ্লোক ৯৬।

৪৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড পৃ: ৬২১।

৪৭. ঐ. পৃ: ৬২১।

৪৮. ঐ. পৃ: ৬২১।

৪৯. ঐ. পৃ: ৬২১।

৫০. রবীন্দ্র রচনাবলী ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৩।

৫১. ঐ. পৃ: ৪৫৩।

৫২. মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক ৩২

৫৩. প্রতীচ্য পুরাণ, ফরহাদ খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪ পৃ: ৩৬, ৮৩, ১৭৩।

৫৪. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭।

৫৫. ঐ. পৃ: ৩৫৪।

৫৬. ঐ. পৃ: ৩৬২।

৫৭. ঐ. পৃ: ৩৮৯।

৫৮. ঐ. পৃ: ৩৮৭।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্রকাব্যে গতিতত্ত্ব: প্রসঙ্গ বলাকা

মো: ইকবাল হোসেন*

রবীন্দ্রকাব্য ধারায় 'বলাকা' গীতাঞ্জলি পর্বের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরে। 'গীতালি'র গান তখনও কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরই মাঝে কবি লেখা শুরু করেন 'বলাকা'র কবিতাগুলো। 'বলাকা' শুধু ভাবের দিক থেকে নয়; নতুন ছন্দ ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন জীবন ও প্রাণের জয়গান যা রবীন্দ্র কাব্যের এক নতুন বাণী, নতুন সুর। গতিই যার মূলকথা। কবি বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুর মাঝেই এই গতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং 'বলাকা'র প্রায় সবগুলো কবিতায় এই গতিবাদকে সত্যরূপে উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মতে- "নিরবচ্ছিন্ন স্থান বা কাল বলিয়া কিছু নাই, কেবল বস্তুর গতিতেই আমাদের মনে স্থান ও কালের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব গতিই একমাত্র সত্য।"[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গতিকে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং 'বলাকা'য় তা নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'র আত্মমগ্নতা, 'গীতালি'র গানের আচ্ছন্নতার মাঝেও 'বলাকা'য় কবির নতুন চিন্তা ও ভাবের বিকাশ বিস্ময়করও বটে।

'বলাকা' ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। কবি দু'বছরে 'বলাকা'র পঁয়তাল্লিশটি কবিতা লিখেছিলেন। এর মধ্যে ৮ টি কবিতার নাম কবি নিজেই দিয়েছিলেন, বাকিগুলোর কোন নাম দেননি। প্রথম চৌত্রিশটি কবিতা ১৩২১-এ এবং শেষের এগারটি ১৩২২-এর কার্তিক হতে বৈশাখের মধ্যে রচিত। এই পঁয়তাল্লিশটি কবিতার দশটি সমশ্লোক, একটি সনেটে এবং বাকি চৌত্রিশটি বিষমশ্লোকে রচিত; এই শ্লোক পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বলাকার ছন্দ নামে পরিচিত।

'বলাকা' রচনার পূর্বে প্রায় সতের মাস কবি বিলেত ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সে সময় ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের দামামা, হিংসা, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৃহৎ জীবনের সংঘাত কবিচিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু সে সবের প্রকাশ ও প্রভাব কবির কাব্যে তেমনভাবে প্রকটিত হয় নি। বরং গোটা ইউরোপ জুড়ে মানবতার মুক্তি, চিত্তের বিকাশ, উদ্ভাবনের সাফল্য ও উন্নতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

> "মানুষের তিনি কবি; মানবতার যে ধারাটা আমাদের দেশে প্রবাহিত, যাঁহার কূলে তিনি মানুষ, তাহা ক্ষীণস্রোত, প্রাণরস-বেগ তাহাতে অতি মন্থর; একদিন যাহা মহানন্দ ছিল, ইহা তাহার শুষ্কাবেশ মাত্র। এই মানবতার প্রবলতম ধারাটা আজ ইউরামেরিকায় বহিতেছে; সেই বিরাট বেগবান স্রোত কবি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলেন, তাহার প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁহার শিরা-উপশিরাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল।"[২]

নোবেল পুরস্কার অর্জন কবির সামনে বিশ্বের বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বৃহত্তর মানবসমাজের সাথে সম্পৃক্ততা, ইউরোপিয় সভ্যতার সংস্পর্শ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস কবিচিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। 'বলাকা'র প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলো এসময়েই রচিত। সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং কবি নিজেই 'বলাকা'র কবিতাগুলো সম্পর্কে আলাচনা করেছেন—

> "এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে চার পাঁচটি রামগড় থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এন্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়ত এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এজন্যই একে বলাকা বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতোনই তারা মানসলোকে থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।"[৩]

নিরন্তর গতির মাঝেই প্রাণশক্তির যথার্থ প্রকাশ। 'বলাকা'য় কবি দেখালেন যৌবনের গতিবেগের মাঝেই মানবজীবনের সত্যিকার বিকাশ। 'কাঁচা', 'অবুঝ', 'সবুজ', 'দুরন্ত', 'জীবন্ত', 'অশান্ত', 'প্রচণ্ড', 'প্রমত্ত', 'অমর' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্রকাব্যে অভিনব এবং নতুন সুরের উন্মেষ। বাংলা সাহিত্যেও 'বলাকা'র সুর নতুন সুর বলে পাঠক মহলে বেশ হৈচৈ পড়ে গেল—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, / ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। / রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

আজকে যে যা বলে বলুক তোরে, / সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। / আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।[৪]

পুরাতন, মিথ্যা আর অর্থহীনকে ভাঙাই যৌবনের কাজ। বচন-বুলি কিংবা শাস্ত্রকথা দিয়ে যৌবনকে বাঁধা যায় না। যৌবন সবকিছু ভেঙে ভেতরের সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। কবি যৌবনকে আহবান জানিয়েছেন—

শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী / চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি। / ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে, / ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা। / আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।[৫]

প্রবীণরা চায় নিরাপদ জীবন। পরের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের জীবনের ব্যথা-বেদনা বা ঝঞ্ঝাকে এড়িয়ে চলতে চায় আবার এর প্রবহমানতা পরবর্তী প্রজন্ম পরম্পরায় রেখে যেতে চায়। কিন্তু পরের অভিজ্ঞতাকে জীবনের কর্ণধার করতে যৌবন রাজি নয়। কাজেই নবীন ও প্রবীণের পথ এক নয়। কবিতার শেষাংশে কবি সব জীর্ণতার অবসানে যৌবনকে আহবান জানিয়েছেন। "তুই চিরযুবা। সব জীর্ণতাকে ভেঙে ফেলে অফুরন্ত প্রাণ লুটিয়ে দে। নব-জীবনের উন্মত্ততায় তুই মাতিয়ে দিবি। বজ্র-বিদ্যুতে ভরা ঝড়ের মেঘই তোর জয় পতাকা। নবীনবসন্তই তোর চিরদিনের বন্ধু। তারই মতন তুই চিরনবীন, তুই অমর।"[৬]

১ নং কবিতার যে সুর তার প্রবহমানতা পরবর্তী কবিতাগুলোতেও সহজে ধরা পড়ে। ৩নং কবিতায় কবি যৌবনের জয়গান করেছেন—

আমরা চলি সমুখপানে, / কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে / কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত-পায়ে, / চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে / কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।[৭]

নবীনের ধর্ম ছুটে চলা। রুদ্র তাকে ডাক দিয়েছে। আলোর তেজোদীপ্ত আভাতে তার আহবান। যারা নিজেকে বদ্ধ রেখে আলোর দীপ্ত আহবানকে উপেক্ষা করে তাদের কে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে। তাইতো কবির বর্ণনায়—

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে / বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে / মধ্য দিনের সূর্য।
মন ছড়ালো আকাশ ব্যেপে, / আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে- / চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।[৮]

এই গতিতত্ত্ব কবিচিত্তকে অধিকার করে কবির অন্তরে গভীর এক অজানার রহস্য জাগিয়ে তোলে। 'বলাকা'র এই গতিতত্ত্ব কবির মনোজগতে রূপলাভ করেছে কখনো জড়বস্তুকে আশ্রয় করে আবার কখনও চঞ্চল ও গতিময় বস্তুকে আশ্রয় করে।

জড়বস্তুকে আশ্রয় করে গতির এক চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে 'ছবি' ও 'তাজমহল' কবিতায়। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন- " 'ছবি' (৬নং) কবিতা হইতেই 'বলাকা'র মূলসুরটির সূত্রপাত। একটি ছবির রূপবস্তুকে আশ্রয় করিয়া কবি গতিতত্ত্বের চিন্তাতন্তুটিকে উপভোগ করিয়াছেন। এই গতিতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনও সন্দেহ নাই; সত্যে তিনি আগেই পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি যে চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া লাভ করিয়াছেন, সেই চিন্তাধারাটিকে রূপাভিব্যক্তি দান করিয়াছেন এই কবিতায়।"[৯] কবি ফ্রেমে বাঁধানো ছবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা?/ ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় / আকাশের নীড়
ওই যারা দিনরাত্রি / আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি, / তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও?

হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?[১০]

ফ্রেমে বাঁধানো ছবি আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চল, স্থির। কিন্তু কবির কাছে তা মনে হয় নি। কবি ছবিকে প্রশ্ন করেছেন- তুমি কী কেবলি মানুষের হাতে কৃত্রিমভাবে তৈরি। কোন আত্মীয়ের বাসায় পত্নীর ছবি দেখে কবি মনের ভাবনা ও আবেগের প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে। কবিপত্নী আজ নিশ্চল ছবি, কিন্তু একদিন সেও জগৎসংসারে সবার সাথে গতিশীল ছিল। মৃত্যুতে কবিপত্নীর জীবন স্তব্ধ, চিরদিনের মতো নিশ্চল—

অজানার সুরে / চলিয়াছি দূর হতে দূরে—

মেতেছি পথের প্রেমে। / তুমি পথ হতে নেমে

যেখানে দাঁড়ালে / সেখানেই আছ থেমে।

এই তৃণ, এই ধূলি-ওই তারা, ওই শশী-রবি, / সবার আড়ালে

তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।[১১]

এ পর্যন্ত আসার পর কবির ভাবনায় পরিবর্তন দেখা যায়। কবির মনে হল পটে আঁকা ছবিকে জড় বলে মনে করা এটা ত মায়া, মিথ্যা। কেননা পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু নিজস্ব গতিতে ছুটে চলেছে। এই গতিই জগতকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন-

কী প্রলাপ কহে কবি! / তুমি ছবি?

নহে, নহে, নও শুধু ছবি। / কে বলে রয়েছে স্থির রেখার বন্ধনে

নিস্তব্ধ ক্রন্দনে। / মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি

এই নদী / হারাত তরঙ্গ বেগ,

এই মেঘ / মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।[১২]

কবির স্ত্রী আজ কবির সামনে নিশ্চলভাবে ফ্রেমের ভেতর বন্দি। কিন্তু কবি মনে করেছেন আপাতনয়নের সম্মুখে না থাকলেও তার স্ত্রী জগতের নিয়ত ছুটে চলা প্রতিটি বস্তুর সাথে মিশে আছে—

নয়নসমুখে তুমি নাই,/ নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;

আজি তাই/ শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

আমার নিখিল/ তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।[১৩]

শাজাহানের স্ত্রী বিয়োগ-ব্যথার রূপ ফুটে উঠেছে 'তাজমহল' কবিতায়। পৃথিবীর কোন কিছুই থেমে থাকে না। গতিই সেখানে মূল সত্য। গতির কারণেই পৃথিবী সজীব ও প্রাণবন্ত, কোথাও কোন ময়লা জমতে পারে না। ময়লা জমলেই মৃত্যু এসে সবকিছু ধূয়ে মুছে দিয়ে যায়। কাজেই মৃত্যু অপরিহার্য—

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই / ভুবনের ঘাটে ঘাটে—

এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে। / দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে

তব কুঞ্জবনে / বসন্তের মাধবীমঞ্জরী

যেই ক্ষণে দেয়-ভরি / মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,

বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।[১৪]

শাজাহান আজ নেই, তাঁর সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য কিছুই নেই। "সম্রাট শা-জাহান জানিতেন যে তাঁহার দোর্দণ্ড রাজশক্তি, অতুল ঐশ্বর্য, দুর্লভ যশমান সবই কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, কিছুই চিরকাল থাকিবে না, এ সমস্ত তাহার কাছে কোন বিশেষ মূল্য বহন করে না। কিন্তু তাঁহার পত্নীপ্রেম ও পত্নীর বিয়োগ-বেদনা যে তাঁহার জীবনে সত্যরূপে দেখা দিয়াছে, এই প্রেমের স্মৃতি ও তাঁহার অন্তর বেদনাকে তিনি চিরন্তন করিয়া রাখিয়া যাইতে চাহেন, তাই অপূর্বসুন্দর স্মৃতিসৌধ তাজমহলের সৃষ্টি।"[১৫] কিন্তু তার অমর সৃষ্টি তাজমহল কালের রুক্ষতাকে বক্ষে ধারণ করে আজও টিকে আছে। তার সৃষ্টির মাঝে বেঁচে আছে তার প্রিয়ার স্মৃতি, ভালবাসার আকর—

তবুও তোমার দূত অমলিন,/ শ্রান্তিক্লান্তিহীন,

তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,/ তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,

যুগ যুগান্তরে/ কহিতেছে একস্বরে

চিরবিরহীর বাণী নিয়া-/ 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'।[১৬]

সম্রাট শাজাহান 'ভুলি নাই, ভুলি নাই'- এর মাধ্যমে তার প্রিয়ার স্মৃতিকে চির অমলিন করে রেখেছেন।

৮ নং কবিতায় নদীর নিঃশব্দ জলরাশি অবিরাম ছুটে চলা কবির কাছে মনে হয়েছে এর আদি-অন্ত কিছুই নেই। নদীর স্রোত দেখে কবির মনে নিজের জীবনের স্রোতের কথা মনে হয়েছে। কবি প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছেন রূপ থেকে রূপে, প্রাণ থেকে প্রাণে। কবির ভাষায়—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও / উদ্দাম উধাও;

ফিরে নাহি চাও, / যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লওনা কিছু, করনা সঞ্চয়; / নাই শোক, নাই ভয়,

পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়- [১৭]

এ ভাবধারার আরও একটি কবিতা ১৬ নং। কবি এ কবিতায় গতিতত্ত্বের এক নতুন রূপ নির্ণয় করেছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন- "কবি অনুভব করিতেছেন, বিশ্বের সমস্ত বস্তুরাশি যেন প্রকাশের মত্ততায় নৃত্য করিতেছে। মানুষের কামনা-বাসনাগুলিও রূপলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের ভাবনা, চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশই তো নগর-নগরী। আর এমন কামনা-ভাবনা আছে, যাহারা এখনো রূপ পায় নাই, তাহারা কেবলমাত্র আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চিত্তে উদিত হইয়াছিল; তাহারা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাণীরূপ পাইবার জন্য তাহারা লোকালয়ের তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা সব আঁধারের যাত্রী, প্রকাশের জন্য আলোক-তীর্থের অভিমুখে চলিয়াছে।"[১৮] কবির ভাষায়-

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি/ উঠে অট্টহাসি;

ধুলা বালি/ দিয়ে করতালি

নিত্য নিত্য/ করে নৃত্য

দিকে দিকে দলে দলে/ আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।[১৯]

প্রকৃতির মত কবি মানবজীবনেও গতির বৈশিষ্ট্য অনুভব করেছেন।"বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে এই গতিবেগের সঙ্গে কবি বিশেষ করিয়া মানব-জীবনের মধ্যে গতির বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। বিশ্বধারার সঙ্গে মানুষও ভাসিয়া চলিয়াছে মৃত্যুর মধ্য দিয়া জন্ম হইতে জন্মে। কেবল জন্মে-জন্মে নয়, একই জীবনে তাহার কত রূপান্তর হইতেছে, কতো পরিবর্তন হইতেছে, গতির স্রোতে কত নব নব অবস্থার উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। এই স্রোত পুরাতন সঞ্চয় নিশ্চল অবস্থাকে ভাসাইয়া দিয়া নূতন জীবন ও যৌবনের পথ প্রশস্ত করিতেছে।"[২৮] কবির বর্ণনায়—

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে / বিশ্বের আঘাত লেগে

আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়, / বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়

হতে থাকে ক্ষয়। / পুণ্য হই সে চলার স্নানে।

চলার অমৃতপানে / নবীন যৌবন

বিকশিয়া উঠে প্রতিক্ষণ।[২০]

প্রকৃতিতে প্রাণের গতিবেগই সবচেয়ে বেশি দীপ্যমান হয়ে ওঠে। বসন্তের মাতাল হাওয়া যেন যৌবনের বিজয়-কেতন নিয়ে কবির সামনে উপস্থিত হয়েছে। প্রকৃতিতে পৌষের পাতা ঝরা বনভূমি, আর কবির অন্তরে বিগত কালের জীবন-যৌবন; বসন্তের নব হাওয়া যেন কবির সেই বিগত যৌবনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে—

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল/ লয়ে দলবল

আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে/ দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে;

নবীন পল্লবে বনে বনে/ বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে;

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;[২১]

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'বলাকা'র (৩৬ নং) মূলসুরটি সমগ্র 'বলাকা' কাব্যে প্রবাহিত। হংসবলাকার উন্মুক্ত ডানার যাত্রাধ্বনি কবিচিত্তকে সচকিত করে তোলে। এই অনুভূতির অপূর্ব প্রয়াস ও প্রকাশ কবির কাব্যকে বিশেষভাবে শিল্পসফল করেছে। উপযুক্ত পরিবেশের সন্নিবেশ, কল্পনার রঙ, মননের গতি, ভাব ও ব্যঞ্জনার নিখুঁত প্রকাশ 'বলাকা'র আর কোন কবিতায় দেখা যায় না। নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনায়- "শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর নৌকায় কবি তখন বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্ধকার জলের উপর তারায় খচিত আকাশের ছায়া পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তারাকুল ভাসিতেছে। নিস্তব্ধ দুই তীরে পর্বতশ্রেণী, তাহারই পাদমূলে সারি সারি দেওদার বন। মনে হইল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে কথা কহিতে চাহিতেছে, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না, শুধু অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। এমন সময় এমনই পরিবেশের মধ্যে একঝাঁক হংসবলাকা স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিয়া অন্ধকারের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া মাথার উপর দিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূর হতে দূরান্তরে শূন্যতা হইতে শূন্যতায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দেওদার বন, তিমির মগ্ন গিরিশ্রেণী শিহরিয়া উঠিল। শিহরিয়া উঠিল কবির অন্তর, শিহরিয়া উঠিল চিন্তা ও কল্পনা; হংসবলাকার শব্দায়মান উন্মুক্তপক্ষ স্পর্শ করিল কবি চিত্তের গভীরতম স্তর, এক মুহূর্তে কবির অনুভূতি সচকিতে জাগিয়া উঠিল"[২২] -

মনে হল, এ পাখার বাণী/ দিল আনি
শুধু পলকের তরে/ পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।/ পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি/ মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,/ আকাশের খুঁজিতে কিনারা।[২৩]

চারিদিকে সন্ধ্যার স্তব্ধতার মধ্যে এ পাখার বাণী এক পলকের মধ্যে চারদিকে বেগের আবেগ জাগিয়ে দিল। গতির মোহে বিরাটাকার পাহাড়ও কালবৈশাখী ঝড়ের মেঘের মত উড়ে যেতে চায়। তরুশ্রেণি চায় সেই গতির সাথে মিশে যেতে । কিন্তু হায়, তার পা যে মাটিতে বাঁধা। তাই সে সেখানেই ডানা ঝাপটাতে লাগল-

শুনিলাম আপন অন্তরে/ অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে/ এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো- অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।/ ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে-
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!' [২৪]

বয়সের সীমারেখায় যৌবন বন্দি থাকে না। যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন যৌবনের বিজয়ডঙ্কা বাজবে। "সূর্যের আলোক যেমন শাণিত খড়্গের মত কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনি তোর প্রাণশক্তি জরার কুহেলিকাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক্। শুষ্ক খসখসে পুষ্পাবরণকে বিদীর্ণ করে যেমন সুন্দর সুকুমার জীবন্ত নবমুকুল ফুটে ওঠে, তেমনি জরার বক্ষ বিদীর্ণ করে লোক-লোকান্তরের অপার ক্ষেত্র অনন্ত আলোকে নিত্য নবরূপে তোর অমর কুসুম ফুটে উঠুক। চির নবীন তোর অমর স্বরূপ।"[২৫] কবির ভাষায়—

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে?/ বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।/ খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,/ জীর্ণতারই বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরকাল প্রেম, সৌন্দর্য আর যৌবনের পূজারি। 'বলাকা'য় কবি যৌবনকে প্রকাশ করেছেন রুদ্রের মত।"যে–যৌবন রুদ্রের প্রসাদ সেই যৌবন দেশবাসীর চিত্তকে অধিকার করুক, ইহাই হইল কবির প্রার্থনা।"[২৭] সুদীর্ঘ কাব্য সাধনায় শক্তি ও আনন্দে কবিমন যখন পরিপূর্ণ তখন কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হল যৌবনের আহবান। যে যৌবন অবুঝ, জীবন্ত আর অশান্ত, যে যৌবন প্রচণ্ড আর অমর; কবি সেই যৌবনের জয়গান করলেন। ভাব ও ব্যঞ্জনার বলিষ্ঠ প্রয়োগ 'বলাকা'কে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১। সম্পাদক, প্রণব চৌধুরী, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা, বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, পৃ.-৩৭০

২। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭, পৃ.-২০১।

৩। তদেব, পৃ.-২০৩

৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৪৩

৫। তদেব, পৃ.-২৪৪

৬। শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ৭ম সংস্করন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ.-৯৮।

৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৪৬

৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৪৬

৯। সম্পাদক, প্রণব চৌধুরী, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা, বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯,পৃ.-৪০৭

১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৫০

১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৫১

১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৫২

১৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৫২

১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৫৩

১৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা পঞ্চম সংস্করণ : ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩, পৃ. ৫৬৮

১৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ুরি-২০০৪, পৃ.-২৫৫

১৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ুরি-২০০৪, পৃ.-২৫৮

১৮। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা পঞ্চম সংস্করণ : ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩,পৃ.-৫৭২

১৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৬৮

২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৭০

২১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৭৬

২২। সম্পাদক, প্রণব চৌধুরী, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা, বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, পৃ.-৪১২

২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৮৪

২৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৮৫

২৫। শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭ম সংস্করন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ.-২১৫

২৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.-২৯৬

২৭। সম্পাদক, প্রণব চৌধুরী, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা, বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, পৃ.-৪০৪

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্র ছোটগল্পে কিশোর চরিত্র

আহম্মদ শরীফ*

গুরুদেব, কবিগুরু, বিশ্বকবি প্রভৃতি অভিধায় যাকে ভূষিত করা যায় তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে, ১৮৬১-৭ আগস্ট, ১৯৪১)। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও তিনি তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্যে নোবেলবিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী, দার্শনিক এবং সমাজসংস্কারক। 'রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডার: কাব্যগ্রন্থ ৫৬, গীতিপুস্তক ৪, ছোটগল্প ১১৯, উপন্যাস ১২, ভ্রমণকাহিনী ৯, নাটক ২৯, কাব্যনাট্য ১৯, চিঠিপত্রের বই ১৩, গানের সংখ্যা ২,২৩২ এবং অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রায় দু'হাজার।'[১]

রবীন্দ্রসৃষ্টিভাণ্ডারে গান এবং কবিতাগুলো বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই গান ও কবিতাগুলোর পরেই তাঁর ছোটগল্পগুলোর স্থান। রবীন্দ্রপ্রতিভার এ এক বিশেষ স্বাক্ষর। তিনি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবনের সাতান্ন বছর পর্যন্ত ছোটগল্প লিখেছেন। এই কাল পরিধিতে লিখিত গল্পের সংখ্যা ১১৯টি। '*ঘাটের কথা*' (১৮৮৪) দিয়ে তাঁর গল্পকথা শুরু। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। অনন্য ছোটগল্প লেখার জন্য তিনি আখ্যায়িত হয়েছেন ছোটগল্পের জনক হিসেবে। '*ভিখারিণী*' গল্পটি ছেড়ে দিলে তার আগে তিনটি মাত্র গল্প তিনি লিখেছিলেন, '*ঘাটের কথা*' (১৮৮৪) ও '*রাজপথের কথা*' (১৮৮৪) এবং '*মুকুট*' (১৮৮৫)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ মূলত *হিতবাদী*, *সাধনা*, *ভারতী*, *সবুজপত্র* প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলোর চাহিদাতেই তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলো রচনা করেছিলেন। আর এই গল্পগুলোর রসসুধা তিনি পেয়েছিলেন পূর্ববাংলার অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীর পথে প্রান্তরে। পূর্ববঙ্গে আসার পরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের ভুবনে প্রবেশ। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জমিদারী দেখাশোনার জন্য পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে আসেন। 'বাংলাদেশের এই অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগুলিই ভূতলের স্বর্গখণ্ড। ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে অমৃত নিয়ে অপেক্ষা করছিল এই জনপদ, কবি সেখানে এসে পৌঁছতেই তাঁর ভালে অঙ্কিত করে দিল অমৃতের টীকা।'[২]

কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, নওগাঁর পতিসর এবং পাবনার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) সাজাদপুরে ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশাল জমিদারী। 'ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্য বয়সের দশটি বছর তাঁর কেটেছে জলময় মধ্যবঙ্গে-নদীতে খালেবিলে, আর যত দিন বাড়িতে থেকেছেন তার চেয়ে বোধ করি বেশি থেকেছেন বজরায়।'[৩] পূর্ববঙ্গে আসার আগে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর পরিচয় তেমন করে ঘটেনি বলা চলে। এখানে এসে তিনি পদ্মানদী, নদী তীরবর্তী জনজীবন, পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতির সাথে পরিচিত হলেন, আর পল্লীজীবন এবং পল্লীবাসীদের জীবন গাথাই হয়ে উঠল তাঁর 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা'র বিষয়বস্তু। 'মানব চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সব সময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না, মানুষের সেই দুর্জ্ঞেয় অন্তস্তল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে।'[৪]

'সাহিত্যের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। তাই, সাহিত্যিকের রচনায় অনিবার্যভাবেই সমাজের রূপায়ণ ঘটে। মানুষের জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ, শৈল্পিক উপস্থাপন ও প্রকাশ কৌশলের মধ্যে নিহিত থাকে সাহিত্যের সাফল্য।'[৫] রবীন্দ্রসাহিত্যেও সমাজ, সমাজের মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক বিষয় ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক। বিশেষ করে তাঁর কিছু ছোটগল্পের মধ্যে কিশোর চরিত্রের বয়ঃসন্ধিকাল ঘটিত নানা বিষয়, কিশোর চরিত্রের দুরন্তপনা, মান-অভিমান, প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে মানব শিশুর বেড়ে ওঠা এমনই অনেক বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। এ পর্যায়ের গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য '*সম্পত্তি-সমর্পণ*,' '*ছুটি*,' '*আপদ*,' '*অতিথি*,' '*বলাই*' প্রভৃতি।

'*সম্পত্তি সমর্পণ*' (১২৯৮) এর গোকুলচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কৈশোরিক চাপল্য, দুরন্তপনা প্রভৃতি স্বল্পপরিসরে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বৃন্দাবন কুণ্ডের স্ত্রীর অসুখের সময় কবিরাজ বহু ব্যয়সাধ্য ঔষুধের ব্যবস্থাপত্র করেন। এতে কৃপণ বাবা যজ্ঞনাথ কুণ্ডের সাথে তার মনোমালিন্য ঘটে। অবশেষে পত্নীর মৃত্যুর পর বৃন্দাবন কুণ্ড একমাত্র ছেলে গোকুলচন্দ্রের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। তখন 'শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে' যজ্ঞনাথের পক্ষে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, যজ্ঞনাথের মনে হল 'মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে।'

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

বালকের নানা উপদ্রব বিশেষত কাঁথায় ছিদ্র করা, মাদুরে শিল্প চর্চা করা, ধুতি নষ্ট করা প্রভৃতি দুষ্টুমির কথাই তার মনে পড়তে লাগল বার বার। একদিন পথ চলতে গিয়ে বাড়ি পালানো বালক সর্দার নিতাই 'যজ্ঞনাথের গায়ের চাদর ঝাড়া' দিলে একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি লাফিয়ে পড়ে এবং কিছুদূর যেতে না যেতেই যজ্ঞনাথের 'স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য' হয়ে নিতাইয়ের মাথায় শোভা পেতে থাকে। সম্ভবত বৃদ্ধ পৌত্রের অভাব পূরণ করার জন্যই ঘরপালানো, স্কুলবিমুখ নিতাইকে (গোকুলচন্দ্র) 'নানামত আশ্বাস' দিয়ে বৃদ্ধ ঘরে নিয়ে আসে এবং তাকে সমাদরে লালন-পালন করতে থাকে। কিন্তু এত কাছে থেকেও বৃদ্ধ তার নাতিকে চিনতে পারে না।

'*ছুটি*' (১২৯৯) গল্পে গ্রাম্য পরিবেশে অবাধে বেড়ে ওঠা 'বালক সর্দার' ফটিকের বয়ঃসন্ধিকালজনিত পরিবর্তন, গ্রামের মাঠে মাঠে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ছোটাছুটি এবং সেই পরিবেশ থেকে নতুন পরিবেশ কলকাতার জীবনে পদার্পণ ও সেখানে গিয়ে ফটিকের বন্দি জীবনের চিত্রই গল্পকার অঙ্কন করেছেন। ফটিকের নানা দুষ্টুমিতে তার মা দিশেহারা হয়ে পড়লে এমন সময় তার মামা বিশ্বম্ভরবাবু আসেন এবং ফটিকের মা তার সাথে ফটিককে পাঠিয়ে দেয় কলকাতায় লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে। পল্লীপ্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা বালক কলকাতার ইট-পাথুরে জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। 'মানসী কাব্যের বধূ তার পল্লী মধুর কোলে যেতে না-পারার বেদনায় বিমূঢ় হয়েছিল, ফটিক পল্লী জীবনের আকুলতায় মারা গেছে।'[৬] নগর জীবনে অনভ্যস্ত ও পল্লী প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত ফটিকের মনের ভাবনা:

> প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।[৭]

প্রসঙ্গত এখানে স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রপরবর্তী বিভূতিভূষণের লেখা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপু চরিত্রের কথা। অপু কাশি গিয়ে ইট পাথরের তৈরি শহর তার ভালো লাগে নি। সব সময়ই নিশ্চিন্দিপুরের শাখারি পুকুর, বাঁশবন, সোনাডাঙ্গার মাঠ, দেবী বিশালাক্ষী তাকে ডাক দেয়। এবং বালক অপু ভাবে 'আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়-ভগবান-তুমি এই কোরো ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়-নৈলে বাঁচবো না।' অপু শেষ পর্যন্ত গ্রামে ফিরে যেতে পারলেও ফটিক তা পারে নি। কিন্তু ফটিকের ছুটি না হওয়ায় সেই অতৃপ্ত বাসনা, মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া আর হয়ে উঠে নি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই ফটিকের করুণ উক্তি: 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

পাশ্চাত্য সাহিত্য বা দর্শনে প্রকৃতির কাছে শিক্ষা গ্রহণের কথা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতেই দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও আমাদের সাহিত্যে এই প্রকৃতির কথা এসেছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। প্রকৃতির কাছে শিক্ষা নিতে হবে এ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন- অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দার্শনিক জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। রুশোর বক্তব্য ছিল-স্বভাবগত শিক্ষাই হবে আদর্শ শিক্ষার বাহন। কোন কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রকৃতিই হবে শিশুর শিক্ষক। তাঁর মতে বার বছর পর্যন্ত শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির কাছ থেকেই সে স্বাভাবিকভাবে শিখবে। তাই শিশুর শিক্ষার জন্য কোন বইয়ের সাহায্য নেওয়া চলবে না। শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। শুধু রুশো নন, ইংরেজ কবি Wordsworth (৭ এপ্রিল, ১৭৭০- ২৩ এপ্রিল, ১৮৫০) তার 'Prelude' কাব্যগ্রন্থেও প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা শিশুকে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেই না। কোমলমতি শিশুর মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেই হাজার তথ্যের মালা। আর তাই প্রতিযোগিতার মাঠে দৌড়াতে দৌড়াতে শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফটিকের মতো ঝরে যায় অনেক তরুণ প্রাণ। ফটিক চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে কবি কিছুটা কল্পনা এবং কিছুটা বাস্তবতার আশ্রয় নিয়েছেন। কবি ছিন্নপত্রে জানিয়েছেন, 'একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমিতে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হলো তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে।'[৮]

আমাদের সংসারে আজন্ম স্নেহ-বঞ্চিত লক্ষ্মীছাড়া, ঘরছাড়া এমন কিছু কিছু বালক দেখা যায় যারা পথের পথিক। পথই তাদের ঠিকানা। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তারা। কিন্তু ঘরছাড়া এ সমস্ত বালকের হৃদয়ে স্নেহ-স্পর্শে জাগ্রত হয়ে ওঠে ভালোবাসা। তেমনি এক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে '*আপদ*'(১৩০১) গল্পে। ভবঘুরে এক বালক নীলকান্ত। যাত্রার দলের 'রাধিকা দময়ন্তী সীতা এবং বিদ্যার সখী' সাজা এই তার নিয়তি। হঠাৎ করেই সেই নীলকান্তের আশ্রয় ঘটে কিরণময়ীর সংসারে। কিরণময়ী হাওয়া বদলে চন্দননগরে গেলে নৌকা ডুবি হওয়া আশ্রয়হীন বালক নীলকান্ত আশ্রয় পায় কিরণময়ীর সংসারে । নীলকান্তের 'লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই।' নতুন সংসারে আশ্রয় পাওয়া নীলকান্ত কিছুদিনের মধ্যেই তার 'চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশু-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।'[৯] কিরণময়ী তাকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করতেন। কিন্তু কিরণময়ীর স্বামী 'শরতের কাছ

হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত।' অবশ্য এটা নীলকান্তের কাছে অপমান বা বেদনার বোধ হত না। কেননা তার ধারণা ছিল 'পৃথিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানব জন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।'

সকল বেদনার মাঝেও নীলকান্ত কিরণময়ীর হৃদয়ে তার স্নেহের রাজ্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে সতীশের হঠাৎ আগমন তার কাছে উপদ্রব মনে হয়েছে। তার স্নেহের ভাগ সে সতীশকে দিতে চায় নি। তাই যখন সতীশের আগমনে তার উপর কিরণময়ীর স্নেহের রাজ্যে ভাটা পড়েছে তখন তার একান্ত কামনা 'আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।' পরিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী সতীশের শৌখিন দোয়াতদান লুকিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছে নীলকান্ত। অবশেষে চুরির আত্মগ্লানিতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় নীলকান্ত। 'সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী! কেমন করিয়া বলিবে সে কী।' নীলকান্ত কাউকে বোঝাতে পারেনি কেন সে সতীশের দোয়াতদান চুরি করেছে। অথচ ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় কাতর হয়েছে। আর কিরণময়ী যখন নীলকান্তের বাক্সের ভেতর চুরি যাওয়া দোয়াতদানটি আবিষ্কার করে তখন কিরণময়ী 'একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সের ভিতর রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই, লাটিম, ঝিনুক, কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।'[১০] কিন্তু পরে বালকের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। হঠাৎ করে নীলকান্তের আগমন ঘটেছিল, প্রস্থানও ঘটল তেমনিভাবে। 'নীলকান্ত ও কিরণময়ীর মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক- তা সে শ্রদ্ধা, বাৎসল্য, ভালবাসা, স্নেহ-যে নামেই অভিহিত করি তার মহিমা ক্ষুণ্ন হোক অন্তত তা উভয়ের কেউ চান নি।'[১১]

'*অতিথি*'(১৮৯৫) গল্পে আর এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে বালকের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পল্লী বাংলায় এমন ঘরছাড়া বালক হয়ত কখনও রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে থাকতে পারে। গল্পের ভবঘুরে নায়ক তারাপদ আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দূরে থাকে। মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা কিংবা ভাইয়ের আদর কোন কিছুই তারাপদকে ঘরমুখী করতে পারেনি। আর তাই সে ঘুরে বেড়ায় যাত্রার দলের সাথে। দেশ বিদেশে। 'তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।' যাত্রার গান তাকে ঘর থেকে বিবাগী করেছে। গানের সুর তার প্রতিটি শিরার মধ্যে শিহরণ জাগায়। তাই সে গৃহহারা, লক্ষ্মীছাড়া। জন্মনক্ষত্র যেন তাকে গৃহহীন করে দিয়েছে। 'সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।'[১২] একদিন নন্দীগাঁয়ে যাওয়ার সময় কাঁঠালবাড়িয়ার জমিদার মতিলাল বাবুর নৌকায় আশ্রয় লাভ করে বালক তারাপদ। সেই পরিবারে আস্তে আস্তে সে সকলেরই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণার ইচ্ছাতেই এক পর্যায়ে জমিদার তনয়া চারুশশীর সাথে তার বিয়ের বন্দোবস্ত হল। কিন্তু এমন সময় একদিন 'পিতৃগ্রহপ্রত্যাগত পার্বতীর' মতো নদীতে জলের জোয়ার দেখা দিল। সেই জলে নৌকা পাল তুলে দূরদেশে যেতে শুরু করল। 'কুড়ুলকাটায়' নাগবাবুদের এলাকায় রথের মেলা উপলক্ষ্যে নদীপথে নৌকায় 'যাত্রার দল', 'কনসার্টের' দল প্রভৃতির আগমন তারাপদকে আবার ঘরছাড়ার ডাক দিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তারাপদ কাউকে কিছু না বলে 'আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর' কাছে চলে গেল। শিশুচিত্তের ভাব-রহস্য, মোহমুক্ত চিত্তের গোপন কামনারাশি বোঝা অনেক সময়ই কঠিন। 'তারাপদ রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মানসের সুদূর আসক্তির প্রতিচ্ছবি। সে '*ডাকঘর*'(১৯২১)-এর অমলের সহোদর- তাদের উভয়ের সর্বসত্তায় সুদূরের পিপাসা।'[১৩]

প্রকৃতি মানুষকে আকর্ষণ করে। শিশু যুবক বৃদ্ধ সবাইকে আকর্ষণ করে। '*বলাই*' গল্পে শিশু মনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গল্পকার প্রয়াসী। কল্পনার রথে চড়ে তার মন পাড়ি জমায় বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের সীমাহীন পারে। শিশু জানাতে চায় তার ভাবনাকে, জানতে চায় তার চারপাশের জগৎকে। চার পাশে যা কিছু দেখে সবকিছুতেই তার কৌতূহল জাগে। আর তাই সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আশে পাশের মানুষকে। বলাইয়ের প্রকৃতির প্রতি বিশেষ টান। 'ছেলেবলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়েচ'ড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ।'[১৪] সে যেন 'প্রকাণ্ড গাছের' ভেতরকার মানুষকে দেখতে পায়। আর তাই অনেক সময় বাগানে মাটির ভেতরে সে কী যেন খোঁজে। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে বলাই একদিন আবিষ্কার করে একটি শিমুল গাছের চারা। সেই চারাকে নিয়ে তার যত চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা। গাছটার গোড়ায় পানি দেওয়া, তার যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই করে বলাই। আস্তে আস্তে গাছটি বেড়ে ওঠতে থাকে। তার কাকা গাছটিকে উপড়িয়ে ফেলতে চাইলে সে অনুরোধ করে সেটাকে তুলে না ফেলার জন্য। এহেন বৃক্ষপ্রেমিক বলাইকে তার পিতা নিয়ে গেলেন সিমলায় পড়াশোনার জন্য। বছর দুয়েক পরে সিমলা থেকে বলাই তার বন্ধু গাছের ছবি চেয়ে পাঠায় কিন্তু ছবি পাঠানো সম্ভব হয় না। কেননা ততদিনে অবাধ্য শিমুল গাছটাকে

কেটে ফেলা হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য গাছপালা, বন সবকিছুকেই আমরা ধ্বংস করে চলেছি আমাদের সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আমরা আমাদের পৃথিবীকেই যেন ধ্বংস করে চলেছি। প্রকৃতিপ্রেমী বলাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেই দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছে।

শিশু ও বালক-বালিকার জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৌতূহল ও সমবেদনা ছিল অসীম। ফটিকের মৃত্যু নীলকান্ত কিংবা তারাপদের ঘরছাড়া হয়ে প্রকৃতি তথা জীবনের বিস্ময় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন শিশুর অনুকূল পরিবেশের অনিবার্য প্রয়োজনের কথা। সেই সাথে শিশুমনের অন্তঃরহস্য উদ্‌ঘাটনে এ গল্পগুলো সহায়ক হয়েছে এ কথা বলা যায়।

তথ্যসূচি:

---

১. বাংলা একাডেমী, চরিতাভিধান, সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১০/এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৪৩।

২. প্রমথনাথ বিশী, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৪, পৃ. ৩৫।

৩. তদেব, পৃ. ১৬।

৪. সৈয়দ মুজতবা আলী, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪০২, পৃ. ৪৯।

৫. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, ভূমিকা অংশ।

৬. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, গল্পগুচ্ছের সমাজ ও জীবন, বাংলা একাডেমী , ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৪, পৃ. ৪৯।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৮৪।

৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, ঢাকা, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।

১১. মো: হারুন-অর-রশীদ, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবসম্পর্ক: প্রসঙ্গ গল্প প্রথমার্ধ, শোভা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুলাই ২০০৪, পৃ. ১৭৭।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩।

১৩. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮০।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান: প্রেমের মানবিক উদ্ভাস

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন*

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির কাছে এক বিশেষ আবেগের নাম। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখে, শোকে ও সন্তাপে তাঁর গান আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান নিয়ে এই রচনাটি এক অর্থে মৌলিক। কেননা আলোচনা অংশে লেখকের ভাবনাটিই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের মত বর্ষার গানও যেন আমাদের আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো অন্য একটি গানের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়; কিন্তু এই লেখাটিতে সেই নৈর্ব্যক্তিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে ধরার চেষ্টা করা হয় নি, এখানে প্রেমের মানবীয় অংশটিতে ঈষৎ আলোকসম্পাত করে দেখবার প্রয়াসই বরং উচ্চকিত।

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে

উত্তর কলকাতার নিমতলা শ্মশানঘাটে সন্ধ্যা-বিগত রাতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রজ্জ্বলিত মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে বেদনাহত তরুণ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শোককাতর হয়ে বলে উঠেছিলেন, আজ থেকে সবকিছু পাল্টে যাবে; আর সেটাই হয়, এই একজন মাত্র মানুষের প্রয়াণে এখানে, বাংলাদেশে সবকিছু পাল্টে যায়। বাংলাদেশের মানুষ তার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জেঠে ওঠে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াই। শুরু হয় বাঙালির রবীন্দ্রনাথবিহীন জীবনযাপন। মৃত্যু কেবল একজন ব্যক্তিকেই ছিনিয়ে নেয় জীবন থেকে এবং তখন যে শূন্যতা নেমে আসে সেই শূন্যতা হয়তো কখনো কখনো ব্যক্তি ছাড়িয়ে পরিবারে বিস্তৃত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু একজন ব্যক্তি মাত্র নন, তাই তাঁর মৃত্যু কেবল একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারকে শোকগ্রস্ত করে রাখে না, তাঁর মৃত্যু সমগ্র বাঙালি-জীবনকেই শূন্যতায় ভাসায়। এর কারণ যে, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সকল কীর্তি ও গৌরব নিয়ে দূরবর্তী একজন হয়ে যান নি। জীবনকালের আশি বছরে সৃষ্টি ও কীর্তিতে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন আমাদের নিবিড় আপনজন। তাঁর জীবন যাপনার বহুমাত্রিক সারল্য রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙালি জীবনের মর্মমূলে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন, কিংবা 'পেরেছিলেন' জাতীয় অতীত কাল প্রকাশক শব্দ তাঁর জন্য বেমানান। তাই নিমতলা শ্মশানঘাটে, ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণের রাতে, তখন আকাশে শ্রাবণের ক্ষয়া চাঁদের পূর্ণিমা ছিল কিনা কে জানে; একদিকে যখন রবীন্দ্রনাথের পার্থিব দেহখানা উজ্জ্বল আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল তখন, 'নিমতলা ঘাটের বাইরে উদ্ভ্রান্ত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হিরণকুমার সান্যালকে বলেছিলেন, হাবুল, Its going to make a defference. আর আজও আমার মনে হয়, And what a defference[১] সত্যি সত্যি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই সুদূরদর্শী উচ্চারণ ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ রাতের পর থেকে যত দিন গেছে সমগ্র বাঙালি-জীবন আরও বেশি করে অনুভব করেছে। তবে এটাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথবিহীন বিগত প্রতিটি দিনরাতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনার সঙ্গে আরও বেশিভাবে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠেছেন।

১

যখন কেউ গায় না, তখনো সে গীত হয়। শ্রুত হয়।/ অনেক দূরে কোথাও গিয়ে হয়তো বা থামে এই গান,
কিন্তু আমার মন থামে না। আমার প্রাণ থামে না।/ মনে হয় একটি গান আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো
অন্য একটি গানের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে যায়।[২]–*নির্মলেন্দু গুণ*

বিপুল মেঘদল ও তুমুল বৃষ্টিসম্ভাবনা নিয়ে প্রতিবছর বাংলাদেশে বর্ষা আসে; কালিদাসকে, বিদ্যাপতিকে, রবীন্দ্রনাথকে চেতনার প্লুতপ্রদেশে সংগুপ্ত তীব্রতম অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে আমরাও সেইসব বাদলমুখর দিনগুলোকে ভালোবেসে ফেলি। আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের চালে বৃষ্টিপতনের সুরের ঐকতান সাঙ্গীতিক মূর্ছনা জাগিয়ে দেয়। তবে এই সুরদ্যোতনাই হয়তো সব নয়, বাংলাদেশে বর্ষার দিন কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আমাদের বর্ষাপ্রীতিকে উপহাস করে; তবু কালিদাসের যক্ষ যখন 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' রামগিরির উপত্যকায় দাঁড়িয়ে মেঘের কাছে তার আকুতি নিবেদন করে প্রিয়াকে পৌঁছে দেবার জন্য, বস্তুত সেদিনই বর্ষার সঙ্গে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের সম্প্রীতির ইতিহাস রচিত হয়ে যায়। এ যেন আমাদের অনিবার্য নিয়তি; মানবিক যাপনার সঙ্গে জৈব উপলব্ধির রসায়ন, প্রেম ও বিরহপ্রিয়তার যে চিরকালীন ঐতিহ্য আমরা সংগোপনে লালন করি তা বহুদিন আগের কোন এক ভাদ্রমাসে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি টের পেয়ে যান; হয়তো সেদিন খুব বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিতে ভেসে

যায় চারদিক, ঘর থেকে বাইরে যাওয়া তাঁর স্ত্রী আটকা পড়ে মন্দিরে বা তখন যে গোপন প্রেমিকার আসবার কথা তার ঘরে, বৃষ্টি সে গোপন অভিসারিকার পথের বাধা হয়; কবি একা ঘরে বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে বিরহবোধের শূন্যতার মধ্যে নিপতিত হন; তখন তাঁর নিজের সঙ্গে শ্রীরাধিকা বা শ্রীকৃষ্ণের কোন ভেদ থাকে না; তিনি লেখেন–'এ সখি হামাক দুখক নাহি ওর/ এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' বৃষ্টিদিনের এই শূন্যতাবোধ এরপর থেকে আমাদেরকে বিরহকাতর ও রোমান্টিকতায় ধারাবাহিকভাবে নিমজ্জমান করে রাখে। বিদ্যাপতির শূন্য ঘরের বা হৃদয়মন্দিরের শূন্যতাপোলব্ধির অনেক বছর পরে হারিয়ে যাওয়া বা দূরে থাকা বঁধুর জন্য অতুলপ্রসাদ সেন ব্যাকুলতার যে বেহাগ সংরচন করেন তাঁর গানে–'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা!' এই অতলান্ত বেদনাবোধের হাহাকার সেই চিরায়ত বিরহপ্রিয়তারই ধারাবাহিকতা। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় ও গানে বর্ষা এক বিশেষ মাত্রা নিয়ে উপস্থাপিত হয় এবং সেই মাত্রাকে উত্তুঙ্গে পৌছে দেন একমেবাদ্বিতীয়াম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একথা আজকের আগে হয়তো অযুত-নিযুতবার বলা হয় যে, সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাফল্যের প্রমাণ রাখেন নি; কি উপন্যাসে, কি ছোটগল্পে, কি কবিতায়, গানে, সুর সৃষ্টিতে, নাটকে, ছবি আঁকায়, সব শাখায় রবীন্দ্রনাথ শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছেন; আমরা রবীন্দ্রনাথের এমত কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ, মধুরতম বিরক্তি ও ঈর্ষা স্বীকার করি; মনে হয় এ ঋণ, বিরক্তি ও ঈর্ষা আমাদের বংশ পরম্পরায় বয়ে যেতে হবে। যদি শুধু গানের কথা বলি এবং শুধু বর্ষার গানের কথা তবুও আমরা একসময় বিহ্বল হয়ে পড়বো এই ভেবে, আমাদের মনের সবচেয়ে গোপন কথা এই লোকটি/মানুষটি কিভাবে বহু আগেই জেনে যায়! হয়তো এজন্যেই তিনি ক্রমে আমাদের প্রিয়তম বিরক্তিকর ঈর্ষিত রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন। যখন বৃষ্টির দিনে বাদলধারা বৃক্ষসমূহের নূতন পাতায় এসে লুটিয়ে পড়ে তখন আমাদের মনের ময়ুরটিও কেন জানি অকারণে নেচে ওঠে। সেই বৃষ্টিপাতের অবিরল ধারার মোহাবেশে যে কথাটি মনের মধ্যে সংগোপনে স্পন্দিত হতে থাকে, সেই কথাটি আমাদের মুখে গান হয়ে গীত হয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ুরের মতো নাচে রে/ শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ, আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।'[৩] হয়তো তেমনই এক শ্রাবণদিনে আমাদের প্রাণ যখন শ্রাবণবর্ষণসঙ্গীতে আকুল হয়, পূর্বসমুদ্র থেকে বায়ু এসে মাঠে মাঠে ধানখেতে, বৃক্ষে ও জলে ঢেউয়ের দোলায় উচ্ছল ছলো ছলো করে, তাল তমালের অরণ্যে ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে মত্ত হয়, তখনও আমাদের মন মেঘের সঙ্গী হয়ে দিগ্‌দিগন্তের পানে উড়ে যায়। সেই মুহূর্তটিকে বাঙ্ময় করে চিরকালীন রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ–'মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে/কৃচিৎ কৃচিৎ চকিত তড়িত-আলোকে/ ঝঞ্ঝনমঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে/ কলো-কলো কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী/ ডাক দেয় প্রলয়-আহবানে।'[৪] তখন হংসবলাকার পাখায় ভর করে আমাদের মন কোথায় যে হারায়, উড়ন্ত ও পথভ্রান্ত সে মন হয়তো অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম বাংলাদেশে প্রিয়তমের কাছে পৌঁছতে পারে। কিন্তু তখন আমাদের মনের মধ্যে মুহূর্তে যে সৌধ বিগঠিত হয়, সেই সৌধের এপিটাফ লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–'পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যুথীর মালা/ সকরুণ-নিবেদনের-গন্ধ-ঢালা–/ লজ্জা দিয়ো না তারে॥ সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে/ পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে/ দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতলে নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে–/ আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।'[৫] এ গান হয়তো এলিজিই, কেননা যেখানে পথ খুঁজে পাওয়ার আনন্দের চেয়ে পথ হারানোর বেদনাই বেশি করে বাজে, সকরুণ হয়ে বাতাসে বাতাসে গীত হয়; তারচেয়ে নিবিড়ঘন শোকগীতি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে আমাদের শোনাতে পারেন! আবার এতে হয়তো শুধুই শোক হয় না. শোকের অন্তরতলে একধরনের আনন্দ মিশে থাকে, সুরের ভেতর দিয়ে তার ক্যাথারসিস হয়। তখন যেন অনেকদূর থেকে আমরা বৃষ্টির আগমনীসঙ্গীত শুনতে পাই, যে, লালনশাহের দেশে আসে লালনের বেশে–'বাদল বাউল বাজায় রে একতারা–/ সারা বেলা ধরে ঝরোঝরো ঝরো ধারা॥/ জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে / নেচে নেচে হল সারা॥/ ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,/ পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।/ ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে/ পুবে হাওয়া গৃহহারা॥'[৬] বর্ষার দিনে বৃষ্টির গানে আজ যেমন আমরা এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন বহুধা বিখণ্ড হয়ে ঘুরে বেড়াই; মনে হয়তোবা গান আসে, কিন্তু কী গান, কী তার সুর বা সেই গান বা সুরের অন্তরালে কার মুখের ছবি আমাদের মনের গভীরে আঁকা হয়ে থাকে তার কিছুই আর বোধিগম্য থাকে না, তখন রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যেতে হয়–'আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই–/ মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই॥/ বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাষা ভাষাহারা নাচে–/ মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে,/ সারাদিন বিরামহীন ফিরি যে তাই॥/ আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান,/ রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।/ কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে/ স্বপ্নপ্রদোষে–আমি তারে যে চাই।'[৭] মেঘ ও বৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রিয়মুখটি ক্রমে অন্তরাল থেকে আলোয় আসতে থাকলে আমরা আনন্দ ও উল্লাসে মেতে আমাদের ভাবনাসমূহকে উদ্ভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে দিই, সে প্রিয়জনের নূপুরধ্বনির

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

তরঙ্গহিল্লোলে তখন আপনা আপনিই বুকের ভেতর হারমনিকায় সুর বাজে–'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,/ দোলে মন দোলে অকারণ হরষে/ হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘের রসের ধারাবরষে॥/ তাহারে দেখি না যে দেখি না,/ শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়/ বাজে অলখিত তারি চরণে/ রুনুরুনু রুনুরুনু নূপুরধ্বনি॥/ গোপন স্বপনে ছাইল/ অপরশ আঁচলের নবনীলিমা।/ উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে/ তার ছায়াময় এলোকেশ আকাশে।/ সে যে মন মোর দিল আকুলি/ জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে॥'[৮] যে অদেখা প্রিয়, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে রুনুরুনু নুপুর বাজায়, যার মুখচ্ছবি আমাদের দেখাই হয়ে ওঠে না, তবু তার অস্পর্শিত নীল আঁচলখানিই ব্যক্তিগত কল্পলোক রাঙিয়ে দেয় বা ঘুমঘোরেও আমরা তার কথাই ভাবি; অথচ সে যখন আমাদের বন্ধ দরজায় করাঘাত করে, আমরা নিঃসাড়ে পড়ে ঘুমাই, ঘুম ভেঙে গেলে যখন বুঝতে পারি সে এসেছিল, আমাদের হাহাকার তখন আকাশে আকাশে ছড়িয়ে যায়; উপলব্ধির এই মাত্রায় 'স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়'[৯] বলে রবীন্দ্রনাথ হাহাকারের ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত করেন; বলেন–'আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,/ তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়॥/ অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,/ কাঁপিল বনের ছায়া ঝিল্লিঝঙ্কারে।/ আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে॥'[১০] তখন আমাদের আর্তির সঙ্গে প্রিয়তমের বেদনাও একীভূত হয়ে পাতায় পাতায় অশ্রুকণার সঞ্চার করে; প্রিয়তম যে ঘাসে ঘাসে চঞ্চল চরণ ফেলে চলে যায়, সে ঘাসের ডগায় বেদনা লিপিবদ্ধ হয়; শ্যামল বনান্তভূমি জুড়ে এই বিষাদগীতি ছলোছলো সুরে বেজে যায়–'এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে/ সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে॥...তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে সিক্ত সমীরে,/ পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে॥'[১১]

২

ধারাবাহিকভাবে আমরা আগত বর্ষার প্রতীক্ষায় থেকে নিশিদিন যাপনা করি। যক্ষ যেমন একদিন প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আটমাসের নির্বাসন শেষে যক্ষপ্রিয়ার কাছে যাবার আনন্দ পেয়েছিল, তেমনি যেদিন বাংলাদেশের প্রকৃতি বর্ষাকে আবাহন করে, আমাদের মনও সেদিন বিমূঢ় ও উল্লসিত হয়; এই বিমূঢ় উল্লাসের ভাষা অনূদিত হয় রবীন্দ্রনাথের গানে–'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল দিন বয়ে।/ বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে॥/ একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন-মনে,/ সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে॥/ হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল–/ সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।'[১২] আষাঢ়সন্ধ্যার বাঁধনহারা বৃষ্টি হৃদয়ে যে ঢেউ দেয়, সে ঢেউয়ের দোলায় আমাদের দেহলতা থরথর করে কাঁপে; বুকের ভেতর লুকায়িত বেদনার ভারে বা অসহ্য আনন্দের আতিসহ্যে জলে চোখ ভিজে ওঠে–'বাদল নিশীথেরই ঝরঝর/ তোমারি আঁখি-পরে ভরভর॥/ যে কথা ছিল তব মনে মনে/ চমকে অধরের কোণে কোণে॥'[১৩] তখন বাদলনিশীথের বৃষ্টি আর প্রিয়তমের চোখের জল এক অভিন্ন জলধারার সৃষ্টি করে, যে জলধারার উৎসস্থল হয়তো একই যমুনা, যেখানে সম্রাট শাহজাহান মর্মর পাথরে প্রেমের সমাধি বানান–'নীরব হিয়া তব দিল ভরি কী মায়া স্বপনে যে, মরি মরি,/ আঁধার কাননের মরমর/ বাদল-নিশীথের ঝরঝর॥'[১৪] অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গানে এবং বর্ষার গানে দূরস্থিত যে প্রিয়তম আমাদের ভেতরে মানবিক প্রেম জাগিয়ে দেয়, সবসময় সে হয়তো রক্তমাংসের মানবী নয়, মেঘের মধ্যেই, বৃষ্টির মধ্যেই হয়তো সে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে; মেঘ ও বৃষ্টির যৌথ যোজনায় যে নীরব শিল্পের নির্মিতি ঘটে দৃশ্যত সেখানে নারী রূপেরই উদ্ভাসন হয়–'ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে/ বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে॥/ ওরই গানের তালে তালে আমে জামে শিরিষ শালে/ নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে॥'[১৫]; বা পুব হাওয়াতে মালতীলতা দুললে রবীন্দ্রনাথের হৃৎস্পন্দন দুলতে দুলতে আমাদের বুকের মধ্যে এসে দোলায়িত হয়–'মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপনভোলা–/ মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে॥'[১৬] কিন্তু বিগত যেসব দিন মেঘের মতন চলে যায়, এই চলে যাওয়া শাদামেঘের মতো হালকা ও পেলব নয়, জলভরা মেঘের মতো সেইসব দিন চোখের জলে ভেসে যায়-'সে দিন যে রাগিণী গেছে থেমে, অতল বিরহে নেমে গেছে থেমে/ আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে কাঁপন ভেসে চলে॥'[১৭]; তবে– 'নিবিড় সুখে মধুর দুখে জড়িত ছিল সেই দিন–/ দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীন।'[১৮] তবু শুধু বিগত দিনেই আমাদের সুখের বা দুখের দিনের অবসান ঘটে না, বহতা জীবনে আজ এবং আগামীকালে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখ বহমান থাকে; আবার কখনো কখনো অতীতের সুখের বা দুঃখের প্রতিক্রিয়ার রেশ একেবারে ফুরিয়ে যায় না, বুকের মধ্যে নিভৃতে ঘুমায়; তবে সে অন্তর্লীন ঘুমন্ত সুখ বা দুঃখ কোন এক বৃষ্টিদিনে লুকোনো কাঁটার মতো ব্যথা দিয়ে জানান দেয়, গোপন কাঙ্ক্ষিত সুখে মন ভরে ওঠে। বৃষ্টির অবিরল ধারা আমাদেরকে সামূহিক উদ্ভ্রান্তির জগতে সমর্পণ করে, সেই বিপর্যস্ত প্রতিকূলতায় আমরা প্রিয়তমকে কত কি যে বলতে চাই, সেই অব্যক্ত অন্তর্বেদনা যখন বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে মরে তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের সে বেদনাভার লাঘব করেন তাঁর গানে –'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে/ যে কথা শুনায়েছি বারে বারে॥ আমার পরানে আজি যে বাণী উঠিছে বাজি/ অবিরাম বর্ষণধারে। কারণ শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার,/ সুরের সঙ্কেত জাগে পুঞ্জিত বেদনার।'[১৯] বস্তুত এই গানে বেদনাভার লাঘবের যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়, তা হয়তো শেষপর্যন্ত একটা সান্ত্বনাই; অর্থাৎ বেদনার কথা বলতে গিয়ে যাতনার উপশম হয় না, বরং তা আরও মন্দীভূত হয়–'স্বপ্নে যে বাণী মনে মনে ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে / কানে কানে

গুঞ্জরিব তাই/ বাদলের অন্ধকারে॥'[২০] তাহলে বাদলের অন্ধকার বেদনা লুকোনোর একটা উপলক্ষ হয় মাত্র! বাদলঅন্ধকারের নিরাপত্তাবেষ্টনীর বিষাদগ্রস্থ সময়ের স্থায়ীত্বকাল হয়তো বেশি নয়, কেননা বৃষ্টির গান আমাদের কখনো কখনো বলাকার মতো উড়িয়ে নিয়ে কোথায় যায় চঞ্চল সজল পবন বেগে, তা আমরা জানি না, মনের মধ্যে তখন–'মেঘমল্লারে সারা দিনমান/ বাজে ঝরনার গান।'[২১] আর অবচেতনে আঁকা প্রিয়তমের কথা মনে পড়লে আমাদের হৃদয়খানি তখন সেদিকে ধাবিত হয়–'মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা-মন চায়/ মন আয় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে।'[২২]

৩

আমরা যখন শৈশব কৈশোর করে বালকবেলায় উত্তীর্ণ হই, আমাদের মনের পালকগুলি একে একে ডানা মেলতে শুরু করে, তখন বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধহীন অঞ্চলে প্রথাগত বর্ষা এসে মাঠঘাট ভাসিয়ে নেয়, সারাদিন থেকে থেকে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হয়, আমরা বর্ষার নূতন জল দেখতে বিলে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করি, অকারণে হৈহৈ চিৎকার করি, গান গাই; সেইসব গানের কথা নাই, সুর নাই, শুধু কী এক ভাব থাকে, কিন্তু সেই ভাবের ব্যাপারটাই তখনও আমাদের জানা হয় না। এই ভাব যে মূলত শূন্যতাবোধ এবং এ শূন্যতাবোধের উৎসমূলে প্রিয়তমের অধিষ্ঠান, যখন তা আমরা বুঝি, সেই উপলব্ধির ভাষা কেমন মুগ্ধকর হতে পারে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও সুরে গমন না করলে সহজে তা অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে না–'এমন দিনে তারে বলা যায়/ এমন ঘনঘোর বরিষায়।/ এমন দিনে মন খোলা যায়–/ এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরোঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়॥'[২৩] এই 'তারে' দূরে থাকলে তখন আর আমাদের ভালো লাগে না, তার সঙ্গে নির্জনে, নিভৃতে মুখোমুখি বসে মনের দুটো গোপন কথা বলতে চাই-'দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি/ আকাশে জল ঝরে অনিবার–/ জগতে কেহ যেন আর॥'[২৪] তাকে সঙ্গে নিয়ে তেমনই আবহের কল্পনা আমরা করি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে প্রান্তর, মনে হবে পৃথিবীতে কেবল আমরা দুজন আছি। সেরকম বাদলমুখর অভিসারের দিনে সমাজ সংসারের নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে হৃদয়ের দাবিকে মেনে নেবার মতো সাহসী হতে আমাদের প্রণোদনার কমতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রেম পর্যায়ের একটা গানে যেমন বলেন-'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি/ তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি'[২৫] সেরকম মনের কথা বলবার জন্য ভাষা হয়তো সবসময় সর্বোত্তম মাধ্যম নয়–'কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় হৃদি অনুভব–/ আঁধারে মিশে গেছে আর সব॥'[২৬] মনের সবচেয়ে গোপন কথাটি, যা কোনদিন কাউকে বলা হয় নাই, সেই কথা বলবার জন্য অবধারিতভাবে তাই আমাদের ঘন বরষার দরকার পড়ে, যেদিন-'ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,/ বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।/ যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে/ সে কথা আজি যেন বলা যায়–/ এমন ঘনঘোর বরিষায়।'[২৭] কিন্তু চিরকালীন বিরহপ্রিয়তা আমাদের মুগ্ধ করে রাখে, রবীন্দ্রনাথই যেমন বলেন-'বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।'[২৮] যে 'তারে' দুটো কথা জানাবার জন্য মন আকুল হয়, তার সাথে হয়তো সুদূর অতীতকালে কোন এক ঘনঘোর বরষার রাতে একটা নিবিড় ঘন আনন্দমুখর দুঃখরজনী কাটিয়ে আসি; সেই রাতের স্মৃতিই তখন আমাদের সারাজীবনের বিরহকে জাগিয়ে রাখে। আবার কোন এক শ্রাবণের রাতে, যখন ধুমল বৃষ্টি হয়, তার কথা ভেবে আমাদের আঁধার ঘরের দরজা হাট খুলে রাখি–'আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতি,/ স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি॥ আজি কোন ভুলে ভুলি আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি,/ মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখরজনীর সাথি॥'[২৯] হোক সে দুখরজনীর সাথি অথবা হোক বিরহযাপনার আনন্দ, সে ব্যাপক বন্ধুকে সমগ্র জীবন ব্যেপে আমরা সঙ্গে করে ফিরি; এই প্রগাঢ় অবিচ্ছিন্নতায় আমাদের অনুভূতির অনুবাদে শ্রীযুক্ত ঋষি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আমাদের সঙ্গে আছেন, থাকবেন। আসুন, এই অন্তরবন্ধুটিকে আমাদের প্রাণের গভীর থেকে একবার প্রণতি জানাই–নমস্কার; আর বলি–

বন্ধু, রহো রহো সাথে/ আজি এ সঘন শ্রাবণরাতে[৩০]

৪

'যখন কেউ গায় না, তখনো সে গীত হয়। শ্রুত হয়।/ অনেক দূরে কোথাও গিয়ে হয়তো বা থামে এই গান,/ কিন্তু আমার মন থামে না। আমার প্রাণ থামে না।/ মনে হয় একটি গান আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো/ অন্য একটি গানের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে যায়।'–কবি নির্মলেন্দু গুণের এই অসাধারণ কবিতাটির কাছে না ফিরে আমাদের উপায় থাকে না। রবীন্দ্রনাথের গান তো এমনই, কেউ না গাইলেও আপনা আপনিই তা অনিবার গীত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানও আমাদের আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো অন্য একটি গানের কাছে নিশ্চিত পৌঁছে দিয়ে যায়; কিন্তু এই লেখাটিতে সেই নৈর্ব্যক্তিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে ধরবার চেষ্টা করা হয় নি, এখানে প্রেমের মানবীয় অংশটিতে ঈষৎ আলোকসম্পাত করে দেখবার প্রয়াসই বরং উচ্চকিত।

৫

'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো, সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো'[৩১]- এই গানে রবীন্দ্রনাথ বিশুষ্ক জীবনে নিশ্চিত করেই বৃষ্টিকে আহ্বান করেন নি। কেননা যাতনায় ও শোকে যখন আমাদের জীবন শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়, চিত্ত সকল মাধুরীশূন্য হয়ে পড়ে, সেখানে বৃষ্টির সামান্য জল তার প্রলেপ হয় না; তখন চাতকের মতো যে ধারাবারির জন্য আমরা যাচনা করি এবং অদৃশ্যলোক থেকে যা করুণাধারায় প্রবল বেগে নেমে আসে, তার চেয়ে বিপুল বর্ষা বাংলাদেশের মাটিতে কবে আর হয়!

তথ্যসূচি:

---

১. *প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, সুশোভন সরকার, কলকাতা, ১৯৮২; পৃষ্ঠা. ২৬

২. *নির্বাচিতা*: নির্মলেন্দু গুণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০৩, পৃষ্ঠা ২৪৩

৩. *গীতবিতান*: রবীন্দ্রনাথ, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৩, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১১৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩২৮

৪. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১২২ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা. ৩৩০

৫. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১১৫ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা. ৩২৯

৬. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ৭২ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা. ৩১৮

৭. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১২০ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা. ৩৩০

৮. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১২৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩১

৯. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১৩১ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩৩

১০. *প্রাগুক্ত*

১১. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১৩৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩৪

১২. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ৩৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩০৮

১৩. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ৩৫ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩০৮

১৪. *প্রাগুক্ত*

১৫. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ৬৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩১৬

১৬. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১১১ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩২৮

১৭. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১৩৬ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩৫

১৮. *প্রাগুক্ত*

১৯. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১২৭ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩২

২০. *প্রাগুক্ত*

২১. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১২৯ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩৩

২২. *প্রাগুক্ত*

২৩. *প্রাগুক্ত*, প্রেম পর্যায়, ২৪৮ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ২৫৯

২৪. *প্রাগুক্ত*

২৫. *প্রাগুক্ত*, প্রেম পর্যায়, ১৪৭ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ২৩০

২৬. *প্রাগুক্ত*, প্রেম পর্যায়, ২৪৮ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ২৫৯

২৭. *প্রাগুক্ত*

২৮. *প্রাগুক্ত*, প্রেম পর্যায়, ২৬২ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ২৬৩

২৯. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ১১৮ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩৩০

৩০. *প্রাগুক্ত*, প্রকৃতি পর্যায়, বর্ষা, ৮৫ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩২০

৩১. *প্রাগুক্ত*, পূজা পর্যায়, ৯৫ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৩০

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধঃ প্রকৃতি ও প্রবহমান জীবন

মো: রবিউল ইসলাম*

রবীন্দ্র সৃষ্টিবৈচিত্র্য বাঙালি মানসকে যেভাবে অভিভূত করেছে, পৃথিবীর অন্যকোনো জাতির ইতিহাসে এমন নজির বিরল। কাজেই বাঙালির ভাগ্যাকাশে মহান রবির উদয় বাঙালিকে বিরাট মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। একজন কবির সাধনায় প্রাদেশিক ভাষা বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেল, ইউরোপে দান্তের জীবনে আমরা তার দৃষ্টান্ত পাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দান্তের চেয়েও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একেবারে নিজে চালকের আসনে বসে থেকেই। রবীন্দ্র প্রতিভার দীপ্তি আজও এত প্রখর যে সমসাময়িক মানস তাতে বিস্মিত হতে বাধ্য। বিশেষত তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যগুলো কি ভাষার প্রখরতায়, কি যুক্তির প্রাবল্যে , কি ভাবের মাধুর্যে বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ বৈভব। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার সেটি হলো, প্রথাগত সমালোচনার সূত্র দিয়ে তাঁর প্রবন্ধের ভাবৈশ্বর্যকে ধরা যায় না। তাড়াহুড়ো করে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যায়ন চলে না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থে বলেন:

> রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়বার পর তাঁর বক্তব্যের অসঙ্গতিগুলোকে বুঝতে যার কয়েক মাস সময় না লাগে, আমার বিশ্বাস, সে রবীন্দ্র প্রতিভার দীপ্ত শক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে নি।[১]

তিনি যথার্থই বলেছেন কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাষা আপাত দৃষ্টিতে সরল ও প্রাঞ্জল মনে হলেও তাঁর বক্তব্যের একটা গভীরতা আছে। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষার ব্যঞ্জনাকে আত্মস্থ করতে হলে পাঠককে একটু ঘাম ঝরাতেই হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যতীত এই কাজটি দুঃসাধ্য। কাজেই এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা তাঁর রচনার গুণাগুণ বিচারে প্রয়াসী হবো।

জীবন একটা বহতা নদীর মতো। যে নদীতে যত বাঁক, সে নদীর ইতিহাস তত বিচিত্র। নদীর চলার পথে পথে লুকিয়ে আছে মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনার বহুবর্ণিল ইতিহাস। জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথ জীবনকে অবলোকন করেছেন প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাজমান বিচিত্র রূপ রঙ এর প্রতিরূপ হিসেবে। নদীর এগিয়ে চলা মানে শুধুই সামনে ধাবিত হওয়া নয়। পালতোলা নৌকার অপরূপ চিত্র, ঝুপ করে নদীর বুকে মাছরাঙার লাফিয়ে পড়ার দৃশ্য, মাঝির হাকাহাকি, বাঙলার দুরন্ত শিশুদের অবিরাম নদীর বুকে লাফালাফি, নদীর দু'ধারে সবুজ ফসলের হাতছানি, পল্লীবধূর লজ্জামিশ্রিত হাসি, গোসলরত রমণীদের কল-কোলাহল, যাত্রী ও মালবাহী লঞ্চ স্টিমারের অবিরাম ছুটে চলা– সব মিলিয়ে প্রবহমান জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি যেন। যে চঞ্চলপ্রাণ, দুরন্ত, অশান্ত শিশুগুলি পাড় হতে নদীর স্নিগ্ধ জলে লাফিয়ে পড়ছে, প্রাণ যেন খেলা করছে ওদের দুরন্তপনায়। ওদের চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে তারুণ্যের আলো। এই আলোই তাদের পথের সন্ধান দেয়, জীবনকে সমৃদ্ধ করে নব নব পত্রপুষ্পে।

মানুষের ছুটে চলাতে আছে বহুমাত্রিক বন্ধুরতা। তারপরেও থেমে নেই পথ চলা, এক জায়গাতে স্থির নেই মানুষের জীবন। জীবনের জরাজীর্ণতাকে পদদলিত, মথিত করে নদীর মতোই প্রতিনিয়ত প্রবহমান মানবজীবন।

বিচিত্র প্রবন্ধে বলাকার রবীন্দ্রনাথকে আমরা নতুন আঙ্গিকে খুঁজে পাই। 'গতিই জীবন, স্থিতিতেই মৃত্যু' ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁ এর এই দার্শনিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ *বিচিত্র প্রবন্ধে* উদ্ভাসিত করেছেন ভিন্ন আলোয়। প্রকৃতির সাথে মানবজীবনের নিবিড় সম্পর্ক অতি পরিচিত এবং চিরকালীন ব্যাপার। বিশেষত গ্রাম বাঙলার মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড়তা অপরিসীম। প্রকৃতি এখানে কথা বলে, হাসে, কাঁদে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়, বিরহে বেদনাসিক্ত হয়। *বিচিত্র প্রবন্ধের* জীবনচিত্র তাই মনোলোভা আর বিচিত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত।

জীবন আর প্রকৃতি এখানে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতির রক্তসঞ্চালনের ধারাপাতে জীবনপ্রবাহের চমৎকার গতিধারা পরিস্ফুট। *বিচিত্র প্রবন্ধে'র* 'নানা কথা' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন-প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন অতি নিপুণভাবে:

* লেখক প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

> চারিদিকে জেলে-ডিঙি ও পালতোলা নৌকা । বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে । এখন বেলা পড়িয়া অসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে। রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুরবন, আমবাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও আঙ্গুল নানা ভঙ্গিতে আস্ফালনপূর্বক একটি বড়ো স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব সন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন, যে চর্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার বেশি পোশাক পরা আবশ্যক বিবেচনা মনে করেন নাই।[২]

জীবনপ্রবাহের এমন বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে আঁকতে পারেন? জীবনের প্রকৃত স্ফুরণ পরিস্ফুট হয় নিরন্তর প্রবহমানতার মাঝে। উদ্দাম উধাও ছুটে চলার মাঝে নিটোল এক সৌন্দর্য আছে। সে সৌন্দর্য সাধারণের দৃষ্টিতে গোচরিভূত নয়। দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে হয়, জীবনের গভীর থেকে রস বের করে আনতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> গঙ্গার মাঝে মাঝে এক একবার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য গতির সৌন্দর্য ।[৩]

রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবন মানে গতি। আর এই গতিই জীবনের একমাত্র সৌন্দর্য। সংসারের সুদৃঢ় বন্ধনের মাঝেই জীবন সুগঠিত হয়, পত্রপুষ্পে সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। কবির নিকট জীবন কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, বিচ্ছিন্নতার মাঝে জীবন বিকশিতও হয় না। অবারিত মুক্তিকে আলিঙ্গন করতে হয় অসংখ্য মানববন্ধনের মাঝে থেকেই। কাজেই বন্ধনের বিধিকে লঙ্ঘন করতে গেলেই ঘটে বিপত্তি। এই জন্য 'মুক্তি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়/ অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়/ লভিব মুক্তির স্বাদ।'[৪]

রবীন্দ্রনাথই একমাত্র বাঙালি কবি যিনি তাঁর কবিতা, গান ও ছোটগল্পে প্রকৃতিকে জীবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মানবজীবন ও প্রকৃতির মাঝে কোনো পার্থক্য করেন নি। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতির সজীবতার মাঝেই মানবজীবনের প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জীবন সজ্জিত হয় প্রকৃতির সাজে।

বিচিত্র প্রবন্ধে সেই সত্যটির প্রতিফলন ঘটেছে। প্রকৃতির রাজ্যে ছড়ানো ছিটানো মানুষের হৃদয়। অতীতকালের অসংখ্য গানে ছড়িয়ে আছে মানুষের জীবনসংস্কৃতি। বাতাসে বিরাজমান অক্সিজেনের মতোই পৃথিবীতে প্রবহমান মানবজীবন। প্রকৃতি ও প্রবহমান মানবজীবনের নিবিড় সম্পর্কের পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে আলোচ্য গ্রন্থের 'নানা কথা' প্রবন্ধের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে:

> সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা দিয়ে থাকে। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর থেকে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে, একবার জাল ছিঁড়লে দেখতে দেখতে আবার শত শত বন্ধন গাঁথতে বসি ।[৫]

তিনি বন্ধনকে সংহতির সমষ্টিরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অসংখ্য টুকরো অভিজ্ঞান জোড়া লাগিয়ে পরিপূর্ণ জীবনস্মৃতি নির্মিত হয়। টুকরো কাহিনীর সুবিন্যস্ত মিল বিন্যাসেই পরিপূর্ণ মানবজীবন বিকশিত হয়। সংহত জীবনই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত। টুকরো টুকরো মেঘ একত্রে সংহত হলেই জলকণায় পরিণত হয়। সেই জলকণা স্নিগ্ধ শীতল বারিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। মানবজীবনও তেমনি বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের সংহত রূপ। সংহতির সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে:

> ব্যাপ্ত হলে যা অন্ধকার, সংহত হলে তা আলোক; আরো সংহত হলে তা অগ্নি। সংহতিই প্রাণ। সংহত হলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।[৬]

এই সংহতির জন্য সাধনা দরকার; দরকার আন্তরিকতা ও একাগ্রতার। অন্তরে বৃহৎ কোনো শক্তির উৎস না থাকলে এই একাগ্রতা অর্জন করা যায় না। কবিগুরু এই কথাটি অন্যত্র বলেছেন ভিন্নভাবে:

> সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। হু হু করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ, আমরা তেমনি সুদৃঢ় আকর্ষণ শক্তি না থাকলে আপন হয়ে আমরা পর হয়ে যাই।[৭]

জীবনের গতি সব সময় একরকম হয় না। কখনও দ্রুত গতিশীল, কখনও মন্থর, কখনও গাছের ছায়ার মতো স্থির দণ্ডায়মান। বিশ্বকবি তাঁর *বিচিত্র প্রবন্ধ-এ* জীবন প্রবাহের বিচিত্র গতি প্রকৃতি এঁকেছেন অতি নিখুঁতভাবে। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ জীবনের গভীরে আলোক নিক্ষেপ করে স্বচ্ছ

জীবনচিত্র তুলে এনেছেন স্বকীয় জীবনচেতনার নিরিখে। এখানে তিনি কবি নন, সাহিত্যিক বা প্রাবন্ধিক নন; শিল্পীর সার্থক মহিমায় আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভাষায় বলা যায়:

> এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁস ফাঁস করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে। গাছের তলা দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় কুল্ কুল্ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে।[৮]

রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবন মধুর ও মায়াময়। এটা শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, জীবনবাদী প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে একথা সমান প্রযোজ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবনচেতনা আর অন্য পাঁচজন মানুষের দৃষ্টিতে জীবন এক নয়। জীবন আর মৃত্যুর খেলার মাঝেই জীবনের প্রকৃত সত্য নিহিত। মৃত্যু না থাকলে জীবন এতো মহান আর মূল্যবান হতো না। কাজেই মৃত্যু এখানে জীবনের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখর জীবন সচেতন যা প্রতিটি মানুষকে প্রাণিত করে প্রবহমান জীবনকে গভীর মমত্ববোধ দিয়ে লালন করতে। নিচের মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

> রোগশয্যায় অসুস্থ অবস্থার আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির আগ্রহে আলোকের আবাহন অন্তর তাগিদেই একাগ্র। চেতনার আচ্ছন্নতাকে দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দেখতে চান সেই জীবন সত্যকে; জীবনের সেই পূর্ণ রূপকে, যে রূপে সৃষ্টির পথ জুড়ে থাকা ছলনাজালই শেষ কথা নয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সে ছলনা যদি সত্যও হয়, তাকে ছাড়িয়ে আরো কিছু জানবার আছে মন বুদ্ধি অহংকার আর চিত্তের সম্পদ দিয়ে। মানুষের জয় সেইখানে । মৃত্যু নয় জীবন, ছলনা নয় প্রেমই তার বল- অহংকারের সম্বল।[৯]

মানষের জীবন শুধু ষাট সত্তর বছরের সময়কালের একটা স্তূপ নয়। জীবনের তাৎপর্য অনেক গভীর এবং ব্যঞ্জনাদীপ্ত। আর জীবনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছাড়া জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। জীবনের সংকটাকীর্ণ পথে চলা কিংবা জীবনসত্যকে আলিঙ্গন করা তখনই সম্ভব, যখন প্রবহমান মানবজীবন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নিয়ে জীবন পথের যাত্রী হওয়া যায়। মানবজীবনের রয়েছে নিখুঁত কর্ম পরিধি। নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মাঝে থেকেও মানুষকে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে যেতে হয়। জীবনের সৃষ্টি শুধু বেদনার বোবা অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, শ্রম ও সাধনার দ্বারা সার্থকরূপে বিকশিত করার জন্য। এ প্রসঙ্গে নিচের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> মানুষের সাধনা শুধু শিল্পের সাধনা নয়, জ্ঞান ও কর্মের সাধনা। সেই সাধনার সিদ্ধিসমূহ অতীত কাল থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে সঞ্চালিত। ইতিহাসের যে সাধন ধন আমরা পেয়েছি, তা বর্তমানের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলেছে পরবর্তীকালের দিকে। এই মানব সম্পদের মৃত্যু নেই, এর প্রবাহ নিত্য এবং অনিবার। এর ধারা সীমাকে অতিক্রম করে চলে। দেশ-কাল পাত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে এর অগ্রগতি। এই নিত্য প্রবাহে মিলে মিশে আছে সকল কালের মানুষ।[১০]

জীবনের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্র প্রবন্ধ* গ্রন্থের 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে। চলার মাঝেই জীবনের অনুপম ছন্দ, থমকে দাঁড়ালেই ঘটে ছন্দপতন। জীবনের এই ছন্দ খোঁজাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রম ও সাধনাকে নিয়োজিত করেছেন। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুকে ভয়ানক এবং প্রাণহরণকারী মনে হলেও এর মাঝে প্রাণের লক্ষণ পরিস্ফুট। গতিশীল মৃত্যুরও জীবন আছে। কারণ, মৃত্যু আছে বলেই প্রাণের প্রবাহ স্বাভাবিক আর সুন্দর হয়ে ওঠে। জীবন ও মৃত্যু দুই সহোদর। এরা পরস্পর হাত ধরে চলে। যখন একটি আরেকটি হতে দূরে সরে যায় কিংবা দূরত্বের আড়ালে এদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে তখনই বিপর্যয় দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মর্তব্য:

> এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপর দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।[১১]

কাজেই জীবনের অসীম সম্ভাবনার স্রোতে মৃত্যুর বিভীষিকা ভেসে যায়। সুতরাং মৃত্যু এখানে যন্ত্রণার অবগাহন নয়, বেদনার বালুচরে বিষণ্ন মনের বিচরণ; মৃত্যু জীবনের প্রবাহকে নির্বিঘ্ন করে, জীবনকে করে উপভোগ্য ও বৈচিত্র্যময়। জীবনের এই স্বাভাবিক প্রবাহ আছে বলেই পৃথিবীকে সুন্দর মনে হয়। মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত মহান ও মূল্যবান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো আলো ছায়ার মতো জীবনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অবস্থা। আর জীবনের এই প্রবহমানতাই জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করে।

বিচিত্র প্রবন্ধে জীবনের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অসুন্দর যদি কিছু থাকে সেটা তুলে ধরা আমাদের মতো নামগোত্রহীন লেখকের পক্ষে বড় রকমের দুঃসাহসের পর্যায়ে পড়ে। তবে রবীন্দ্রনাথের সাহসী মূল্যায়ন করেছেন বিশিষ্ট গবেষক আহমদ শরীফ। 'সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি তাই নির্ভীক কণ্ঠে বলেছেন:

> আমি বলেছি রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় প্রতিভা গ্যাটে, শেক্সপিয়র, টলস্টয়, ভিকতর য়্যুগো, দস্তভয়স্কি প্রমুখ।[১২]

আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথকে মন-মগজ-মনন-মনীষার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ রূপে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন দোষে গুণে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। কোনো আধ্যাত্মিকতার তকমা কিংবা পৌরহিত্যের প্রলেপ দিতে চান নি। রবীন্দ্রনাথের সেন্টিমেন্ট মেনে তিনি সমালোচনা করেন নি। অন্যান্য সমালোচকদের মতো তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন না, ছিলেন না কোনো প্রকার স্তাবকতায় বিশ্বাসী। তাই ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধের অন্যত্র বলিষ্ঠভাবে মন্তব্য করেন:

> জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন, পায়ে দলেছেন দেবেন ঠাকুর।[১৩]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে ভক্তির দৃষ্টিতে নয়, যুক্তির দৃষ্টিতে মূল্যায়নই হবে সঠিক মূল্যায়ন। ভক্তিবাদী মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে না। কাজেই রবীন্দ্র মূল্যায়নও হওয়া উচিত যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে।

'বিচিত্র প্রবন্ধ' পাঠের সময় আমার মনে হয়েছে এমন বর্ণনা ছিন্নপত্রের অনেক জায়গাতে আছে। এমনও মনে হয়েছে যে, প্রবন্ধের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গল্পগুচ্ছের জীবন। সোনারতরী, চিত্রা, বলাকা প্রভৃতি কাব্যেও লেখকের এমন বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে এ কথাটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, *বিচিত্র প্রবন্ধে* বর্ণিত জীবনে বৈচিত্র্য আছে, আছে নানামুখি বাঁক। এ কারণে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মতো গুণীজনের সমালোচনা এককৌণিক কোনো ব্যাপার নয়, বহুমাত্রিক চিন্তানির্ভর। যার কারণে আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরেক জায়গায় বলেছেন:

> গ্যাটে, শেক্সপিয়ার, টলস্টয় সবারই মানস বিচরণক্ষেত্র সীমিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সর্বক্ষেত্র অনায়াস আত্মবিস্তার এবং সমান পারদর্শিতা অলভ্য। এমন প্রতিভা ইউরোপে জন্মায় নি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে 'versatality' তাঁর বহুগামিতা, বিচিত্রগামিতা, সর্বশাখায় প্রায় সমান নৈপুণ্য ও দক্ষতা, যা আর কারো মধ্যে ছিলো না । তাই তিনি অনন্য, অসামান্য, অতুল আশ্চর্য শক্তিধর ব্যক্তি।[১৪]

রবীন্দ্রনাথকে জানার এবং রবীন্দ্রনাথকে অধ্যয়নের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আজও মানুষের মধ্যে প্রবল তার অন্যতম কারণ রচনার বিচিত্রতা। বার বার পড়েও যেন তার ব্যঞ্জনা নিঃশেষ হয় না। ব্যঞ্জনার বহুমাত্রিক ও বহুবর্ণিল বহিঃপ্রকাশ *বিচিত্র প্রবন্ধ*। রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যের শৈলীগত দিকটি *কালি ও কলম* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাবন্ধিক জুলফিকার মতিনের একটি নিবন্ধের মন্তব্যে ফুটে উঠেছে:

> অনেকেই তাকে বলেন দ্বিতীয় ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে যে সৃজনশীলতা রয়েছে, তাই তাঁকে এ অভিধায় চিহ্নিত করতে প্ররোচিত করে। যে সৃষ্টি কবি করেন, তাও ঈশ্বরের সৃষ্টির মতোই বিশাল। বৈচিত্র্যময়।[১৫]

বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। বৈচিত্র্যহীন একমুখীনতার আচ্ছাদনে জীবন তার মাধুর্য হারায়। আর মাধুর্যহীন জীবন বিরক্তিকর। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে জীবনের নানা গতি প্রকৃতির যে ছবি এঁকেছেন তার মনোরমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। পৃথিবীর পথে আমরা সবাই পথিক। শুধু পথিক বললে ভুল হবে। আমরা সতর্ক পথিক। পথের দু পাশে বিচিত্র দৃশ্যের সমাহার। এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পথিকের পথ চলা। শুধু তাই নয়, পথকে একান্ত আপন করে নিয়ে পথে চলতে হয়। তা না হলে পথের ক্লান্তি অবসাদে চলার গতি মন্থর হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পথিকের স্বচ্ছন্দ গতি থাকে ততক্ষণ পথে প্রবাহিত হয় জীবনের স্বাভাবিক স্রোত। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন:

> আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি; অনন্ত শক্তিমান যদি এই অনন্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র বলপূর্বক লইয়া যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত তবে আমরা দুর্বলেরা কী করিতে পারিতাম। কিন্তু যাত্রার আরম্ভে শাসনের বজ্রধ্বনি শুনিতেছি না, প্রভাতের আশ্বাসবাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি।[১৬]

'বলাকা' কাব্যের গতিবাদের চিত্র আমরা দেখতে পাই *বিচিত্র প্রবন্ধের* অনেক এলাকা জুড়ে।

তবে তার বৈচিত্র্য আছে রচনা রসের সম্ভোগে, প্রকাশের ব্যঞ্জনায়। লেখক এই গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন: 'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুর গৌরবে নয়; রচনারস সম্ভোগে।'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করেছেন জীবনের অকেজো, ব্যর্থ দিকটির অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটি। যারা কাজ করে তারা নিঃসন্দেহে জীবনকে ভালোপথে পরিচালিত করে। কিন্তু শুধুই কাজের মাঝে জীবন কাটানোই মানুষের একমাত্র অভীষ্ট হতে পারে না। পরিপূর্ণ জীবনের বিকাশের জন্য কর্মহীন অবসর একান্ত জরুরি। কর্মহীন জীবনের মধ্যেই কর্মময় জীবনের শিকড় প্রোথিত। সবাই কেজো মানুষে পরিণত হলে, জীবন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো। অনেক মানুষ আছে যারা জীবন বৃথা গেল বলে অনুতাপ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে এসব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অবলোকন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজের অকেজো মানুষগুলোর কারণেই পরিশ্রমী মানুষেরা প্রকৃত মূল্যায়ন পায়, ব্যর্থ মানুষগুলোর অস্তিত্বের জন্যই সফল মানুষের জীবন প্রোজ্জ্বলিত। সার্থক মানুষের চেয়ে ব্যর্থ মানুষের মূল্য বেশি এই কারণে যে, প্রাণের প্রবাহ, জীবনের স্বাভাবিক স্রোত বজায় আছে তাদের কারণেই। কারণ, সমাজের পনেরো আনাই ব্যর্থ মানুষ,অকেজো মানুষ। হরিণের যতটুকু শিঙ আছে তার পনেরো আনাই বৃথা, অকেজো। কিন্তু এই পনেরো আনা অতিরিক্ত শিঙের সৌন্দর্যে মানুষ বিমুগ্ধ হয়, একআনার কর্মনৈপুণ্যে নয়।

সমাজের এই বেকার মানুষগুলোর বিক্ষিপ্ত চলাচল, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, হাসি, উল্লাস, অহেতুক ছুটাছুটি প্রভৃতি কারণে পরিবেশ মুখরিত। জীবনপ্রবাহ স্বাভাবিক রেখেছে সমাজের পনেরো আনা বাহুল্য মানুষগুলো। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাহার জীবন ভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থ প্রাণ আমরাই অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরাণ অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশি যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনের আনা ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি।[১৮]

জীবনের সর্বকৌণিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ জীবনবাস্তবতার এই মহৎ সত্যটিকে উদঘাটন করেছেন এখানেই তিনি অসাধারণ, আর পাঁচজনের থেকে তিনি ভিন্ন। জীবনপ্রবাহকে তিনি অবলোকন করেছেন জীবন অভিজ্ঞতা দিয়েই।

> আর কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহ রক্ষা করিবার একটা বৃহত সার্থকতা আছে।[১৯]

সুতরাং পৃথিবীর সকল মানুষ পৃথিবীর কল্যাণে আসে না। তাই বলে অদরকারী মানুষদের তুচ্ছ জ্ঞান করার কোনো কারণ নেই। নদীর সবটুকু জলই মানুষের উপকারে আসে না। নদীর অতিরিক্ত জলই নদীতে জোয়ার আনে, স্রোতের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। জলাশয়ের জীবন হল জল। তেমনি পৃথিবীর প্রাণবন্ত উপাদান হলো মানুষ। নদী, সাগর, পুকুর, খাল-বিলের পানি পানের উপযোগী নয়; জীবনের জন্য অনিরাপদ । কিন্তু পৃথিবীর শীতলীকরণের জন্য অপরিহার্য। তেমনি পৃথিবীর অকাজের মানুষগুলি পৃথিবীর প্রাণপ্রবাহে গতি সঞ্চারের জন্য অতি দরকারী। এদের কারণেই পৃথিবীতে প্রাণের গতি আছে, জীবনের ছন্দ আছে।

কথার মাঝেও জীবনকে স্পর্শ করা যায়। সব সময় নিয়ম মেনে প্রয়োজন মাফিক কথা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ছকে বাঁধা জীবন প্রকৃত অর্থে কোনো জীবন নয়। মানুষও তেমনি কথা বলার সময় মেপে মেপে প্রয়োজন অনুসারে কথা বলে না। আবশ্যক-অনাবশ্যক বহু প্রসঙ্গ কথার মাঝে চলে আসে। কাজের চেয়ে বাজেকথাই পৃথিবীতে বেশি হয়। আর এই বাজেকথাতেই একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, বাজেকথাতেই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বাজেকথাতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় পরিস্ফুট। প্রয়োজনের তাগিদে কথা বলার সময় মানুষ থাকে সাবধানী, মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এতে পরিব্যাপ্ত নয়। এ প্রসঙ্গে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ:

> অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়মে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।[২০]

বিচিত্র প্রবন্ধে জীবন চেতনার কথা রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন বিচিত্রভাবে। জীবনকে নিয়ে তিনি মেতেছেন নানা খেলায়। জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পদ্মার বিস্ফারিত জলরাশিতে বোটে করে নির্ভিক ভ্রমণ করেছেন। মৃত্যু বার বার এসে তার সামনে ফণা তুলেছে। কিন্তু কোনো প্রকার ভয়ে তিনি ভীত হন নি। ভীত হওয়ার কথাও নয়। কারণ, জীবনের মুল্যায়ন তিনি এভাবেই করেন :

> ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন/ ঝলমল প্রাণ করিস যাপন

ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।/ মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে।[২১]

জীবন থেকে আনন্দ সিঞ্চন করাই মহৎ কবির কাজ। বৈচিত্র্যময় জীবনকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে তলদেশে আলোক নিক্ষেপ করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, অসংখ্য মানুষ এই বিশেষ প্রসঙ্গটি গভীরভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবন নিয়ে যত জল্পনা, কল্পনা, গবেষণা হয়েছে আর অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে এত আলোচনা হয় নি, হবেও না। জীবন নিয়ে মানুষের এই অদম্য অনুসন্ধিৎসা ফুরাবার নয়। এর কারণ সম্ভবত জীবনের বৈচিত্র্য। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি:

> জীবন একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি।[২২]

এই প্রবন্ধে জীবনের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন বিচিত্রভাবে, বিচিত্র মোড়কের আড়ালে। জীবনকে জানতে হলে এই মোড়কের ভেতর থেকে তাকে টেনে বের করতে হয়। তা না হলে জীবনের জটিল রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। জীবন মানে রুটিন অনুযায়ী যন্ত্রের মত কাজ করে যাওয়া নয়। যেসব কাজকর্ম তালিকায় নেই সেসব কাজ মানুষ করে মনের তাগিদে। যে কাজের পেছনে বাধ্যবাধকতা আছে, তাতে আনন্দ নেই। দায়বদ্ধতার বন্ধনমুক্ত কাজেই মানবমনের মুক্তির আনন্দ প্রতিভাত হয়। নির্দিষ্ট পথে পথিক হাঁটে, তারপর পৌঁছায় গন্তব্যে; দায়ভারে পথিকের পথচলা বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে পাগলের পথচলা দায়িত্বের ভারে আক্রান্ত নয়। গন্তব্যে পৌঁছার তাগিদ তাকে তাড়া করে না। পাগল যা কিছু করে মনের আনন্দে করে। পাগলের কর্মে জীবনের প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ 'পাগল' প্রবন্ধে জীবনের এই বিশেষ দিকটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

> শুধু পাগল নয়, প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর প্রকৃতির মধ্যে জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ-আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়।[২৩]

মাঝে মাঝে এমন পাগল দিনের আবির্ভাব ছাড়া জীবনকে উপভোগ করা যায়না। জীবনকে যদি লাটাইয়ের সুতো কল্পনা করি, তাহলে মাঝে মাঝে লাটাইয়ের অবাধ্য না হলে অন্তত উচ্চতায় ওঠা সম্ভব হয় না। কখনো কখনো লাটাইয়ের অধীনতা অস্বীকার করে উন্মুক্ত আকাশের নীলিমায় সুতো যখন ঘুড়ি নিয়ে ছুটে যায় তখন এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিনের বাঁধাধরা নিয়মভঙ্গ করে মানুষ যখন অনিয়মের অধীন হয়, জীবন তখন আনন্দে রঙিন হয়ে ওঠে। তখন জীবনের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> প্রতিদিন যাহাকে দেখি নাই আজ তাহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা-আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। [২৪]

অসাধারণ একটি প্রবন্ধ 'পাগল'। জীবনের বৈচিত্র্য এখানে বিশেষ আলোয় উদ্ভাসিত। যে কোনো প্রতিভাবানের পেছনে এক ধরনের পাগলামি আছে। পাগলামি ছাড়া প্রতিভা বড় হতে পারে না। জীবনের জ্যোতি 'পাগল' প্রবন্ধে অসাধারণ আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে।

জীবনের এমন কোন দিক নেই যা রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ণিত হয় নি। স্বল্প পরিসরে হলেও *বিচিত্র প্রবন্ধ* জীবনের বহুরূপতাকে শৈল্পিক আঙ্গিকে উজ্জ্বল করেছে, অতৃপ্ত চিত্তকে তৃপ্তি দিয়েছে, অপূর্ণতার মাঝে পূর্ণতা এনেছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে নিচের বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়:

> সংসারে তথা জীবনসংগ্রামে আমরা সকলেই এক একজন কমবেশি ব্যর্থ। সমাজ সংসার হতে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বঞ্চিত। হৃদয়, মন যা চায়, নিজেকে আমরা যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে গড়ে তুলতে চাই, বাস্তবে তা সবগুলো আমরা মনের মত করে পাই নে। জীবন খাতার চাওয়া পাওয়া আর লেনদেনের হিসাব মেলে না। জীবনের এ না পাওয়ার অভাববোধটা আর হিসেব না মিলার শূন্যতাটা আমরা সাহিত্য ও শিল্পকলা হতে মিটিয়ে নিই।[২৫]

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা উপেক্ষিত থেকেছে। শুধু প্রেম, সৌন্দর্য আর আনন্দের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত নন রবীন্দ্রনাথ– শূন্যতা, রিক্ততা, হতাশা, ব্যর্থতা সবকিছুরই আলোচনা আছে রবীন্দ্রপ্রবন্ধে। বিশেষত *বিচিত্র প্রবন্ধে* জীবনচেতনার পাশপাশি মৃত্যুকেও তিনি উপস্থাপন করেছেন জীবনের সহযাত্রী হিসেবে। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন:

> জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই, জীবনকে সে পায়নি।[২৬]

ভাবের গভীরতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, বাণীবিন্যাস, শিল্প-সৌকর্যের উজ্জ্বলতা এবং বৈশ্বিক, দৈশিক ও চিরন্তন আবেগ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অনন্য। এ কারণে তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছর পরেও রবীন্দ্র-ভক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি অতিমাত্রায় জীবনবাদী। আমরা আশাবাদী হতে চাই, ব্যর্থতা চাই না, হতাশা চাই না, সাফল্য চাই। সফল হওয়ার অন্যতম উপায় জীবনবাদী হওয়া। যার কারণে রবীন্দ্র কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প কিংবা নাটক সবখানেই প্রাণের স্বাভাবিক প্রবাহ মূর্তিমান। *বিচিত্র প্রবন্ধ* এর অনন্যতা এখানেই। মনুষ্যত্বের শক্তিশালী নিশান এখানে উড্ডীয়মান বিচিত্র বাণীবিন্যাসে। এই প্রবন্ধে ছোটছোট বিচিত্র ঢেউ একত্রিত হয়ে জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বজায় রেখেছে। অথচ কোনো একটি ঢেউকে নগন্য ভাবার অবকাশ নেই। কারণ:

> যেখানেই আমরা জীবনের প্রতিপদক্ষেপকে যাচাই করে মূল্য সম্পর্কে সচেতন হতে যাই সেখানেই অশান্তি; কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি পাওয়াকেই একটা বড়ো লাভ ধরে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে তারপর যেটা আসছে তার জন্য প্রস্তুত হতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে।[২৭]

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই স্বাভাবিক আবেদনকে অস্বীকার করতে পারেন নি। জীবনের এই সহজাত অনুষঙ্গকে সাহিত্যে ধারণ করা প্রগতিশীলতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ দিক থেকে তাঁর মতো প্রগতিশীল কবি মেলা ভার। রবীন্দ্র প্রগতিশীলতার উৎকর্ষ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে বলেছেন:

> রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্প সাহিত্যে তো বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি, মানবজীবন ও কর্মের আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত।[২৮]

বিশ্বকবির যৌবনের দিন কেটেছে পূর্ব বাংলার গ্রামে ও পদ্মার চরে, সেখানে তিনি যে জীবনধারার স্বাদ পেয়েছেন তা বাংলার আদিম ও শাশ্বত প্রাণধারা। দেশের জীবনস্রোতের সঙ্গে তাঁর যোগ তাই কোনোদিন ছিন্ন হয় নি। সেই প্রাণশক্তি এনেছে তাঁর মনন ও মানসলোকে অফুরন্ত উদ্দীপনা ও তেজের প্রদীপ্ত শিখা। তাই তাঁর মানসে সংস্কৃতির যে বিচরণ তা কেবল আকস্মিকতার স্ফুলিঙ্গ নয়, জাতির অন্তঃশীলা জীবনের বিচিত্র প্রকাশরঞ্জিত। নতুনকে তিনি গ্রহণ করেছেন অতি সহজে, সাবলীল ভঙ্গিতে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শুদ্ধতম প্রগতিশীল। *বিচিত্র প্রবন্ধের* গতিভঙ্গি বিচিত্র ও তার প্রসার বহুদূরব্যাপী। 'সোনার কাঠি' প্রবন্ধে জীবনের প্রবহমানতাকে গতিময়তার অন্তরালে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজকন্যা যত সুন্দরীই হোক না কেন যদি সে নিদ্রিত থাকে, তবে তার সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষে আবদ্ধ থাকে। গতিহীনতার মাঝে প্রাণপ্রবাহের সৌন্দর্য পরিস্ফুট নয়। নিচের উদ্ধৃতিটি এখানে স্মর্তব্য:

> কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য থাক, তার গতিশক্তি যদি না থাকে তা হলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না।[২৯]

সুতরাং জীবনের প্রবাহ মানে গতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। গতির টানে ছুটে চলা সেটা অনর্থকই হোক আর সার্থক হোক তাতে জীবনের জয়গান বেজে ওঠে। জীবনের জয়গানের আরও একটি প্রবন্ধ হলো 'বসন্তযাপন'। মানুষের জীবনে বসন্তের আগমনকে প্রসংশা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। শীতের রিক্ততা মানুষের কাম্য নয়। বসন্তের বাউরি বাতাস মানুষের মনে যে দোলা দেয়, আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই বসন্তযাপনের অপেক্ষায় থাকি। বসন্তের আগমনে শুধু প্রকৃতি নয়, মানব মনেও জীবনের জোয়ার আসে। সেই জোয়ারে পরিপূর্ণতা পায় মানব জীবন। কাজেই বিচিত্র প্রবন্ধে প্রকৃতির যে প্রবহমানতা তা আসলে চলমান জীবনেরই প্রতিরূপ। আলোচ্য গ্রন্থের 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়টিই ব্যক্ত করেছেন:

> সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যখন হুহু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি না দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি। তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো, মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি, আমাদের সর্বাঙ্গ ঝরঝর মরমর করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে, আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রস প্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।[৩০]

সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের প্রকাশ, প্রাণের স্ফুরণ আবিষ্কার করা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাণবন্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের চারপাশে বিরাজমান উজ্জ্বল প্রকৃতির স্পর্শ, সরসপ্রাণের দীপ্তি, কণ্ঠস্বরের আবেগময় উপস্থিতি, সাগরের ঢেউ, চাঁদের রূপালি আলো সবকিছু মিলে পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ আমাদের চেতনাকে সচকিত করে। তাঁর *বিচিত্র প্রবন্ধ* গ্রন্থটিকে প্রাণপ্রবাহের একটি জীবন্ত দলিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। অসাধারণ প্রাণ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলো রবীন্দ্রনাথের জীবন। সবসময় তিনি যেন টগবগ করতেন প্রাণের আবেগে। যার কারণে তাঁর প্রতিটি কথা, শব্দ,

কবিতা, গান অপরিমেয় আনন্দের উৎস। রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে কতটা প্রাণের আবেগ ধরে রাখতেন তার পরিচয় পাই মৈত্রেয়ী দেবীর একটি গ্রন্থে। তিনি সেই গ্রন্থের সূচনা অংশে লিখেছেন:

> যে আনন্দ-প্রবাহ তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে অবগাহন করে জেনেছি জীবনে কত খুশি হওয়া সম্ভব। তিনি যদি এমন পূর্ণ প্রাণের উৎস নিয়ে, এমন সহাস্য প্রশান্তি নিয়ে, আমাদের মাঝখানে না দাঁড়াতেন আমরা কখনো জানতেই পারতুম না যে, এত আনন্দিত হবার, এত অকারণ খুশি হবার ক্ষমতা আমাদেরও আছে।[৩১]

বিচিত্র প্রবন্ধের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধেই কোথাও সরাসরি, কখনো পরোক্ষে জীবনের প্রবাহ পরিব্যাপ্ত। সরোজিনী প্রয়াণ, নানা কথা, ছোটো নাগপুর, রুদ্ধ গৃহ, পথ প্রান্তে, নববর্ষা, কেকা ধ্বনি, বাজে কথা, পরনিন্দা, রঙ্গমঞ্চ, পনেরো আনা, বসন্তযাপন, পাগল, আষাঢ়, সোনার কাঠি প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রবহমান জীবন আমাদের চমৎকৃত করে। প্রকৃতি আর মানবজীবনের মাঝে রয়েছে গভীর সাযুজ্য। তাই বিচিত্র প্রবন্ধের জীবন প্রবাহিত হয়েছে প্রকৃতির প্রবহমানতার ভেতর দিয়ে। বিশেষ করে নদী আর মানবজীবনের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সাদৃশ্য। আর সেটি হলো প্রবহমানতা। নদী প্রকৃতির অন্যতম ও শক্তিশালী উপাদান। নদীর প্রবাহে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'বলাকা' কাব্যে। কবির ভাষায়:

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও/ উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও,/ যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;/ নাই শোক নাই ভয়–
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।[৩২]

এই পথের আনন্দবেগে অবাধে ছুটে চলাতেই জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এই বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছেন একটু অন্যভাবে। তাঁর মতে জীবন মানে জলবতী ধারা। তাঁর জীবন রবীন্দ্রনাথের মতো ধারালো নয়, উদ্দাম উধাও নয় তাঁর জীবনের ধারা। ধীর, মন্থর কিন্তু অবিরাম ছুটে চলে জীবন, ঠিক যেন প্রবহমান নদী। বহমান জীবন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি এইরকম:

> নদীর বয়ে চলার কোন নিয়ম থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আপাত চোখে দেখলে মনে হয় সে এক মনে নিজের খেয়ালে বয়ে চলেছে। এই বয়ে চলার ব্যাপারটা পুরোপুরি তার নিজের-এর জন্য কারো কাছে জবাবদিহিতা নেই, কারো কাছ থেকে অনুমোদনও সে নেয় না হয়ত নিজেও জানে না কেন, কোন পথে, কোন উদ্দেশ্যে সে এগিয়ে চলেছে। মানুষের জীবনও এমনি।[৩৩]

মাঝে মাঝে জীবনের নিত্যকর্মে ছেদ পড়লে তা অধিকতর বিচিত্রতা লাভ করে। জীবনের বৈচিত্র্য প্রায় সবার আরাধ্য। ঋতুবৈচিত্র্যহীন প্রকৃতি একঘেয়ে। প্রকৃতিতে ছয়টি ঋতুর প্রতিটি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ বর্ষার যে স্বাতন্ত্র্য *বিচিত্র প্রবন্ধে* তুলে ধরেছেন তা রীতিমতো আমাদের ভাবনার করিডোরে অন্তত কিছুক্ষণ বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়। ক্ষণিকের জন্য হলেও বর্ষার প্রথাগত আচরণ আর পাঁচটা দিনের মতো হয় না। বর্ষা আমাদের নিত্য কর্মের চাকায় পিষ্ট করা থেকে ছুটি দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> এই জন্য বর্ষা ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ভুলে গেছেন। তাহার কর্মেও অধিকার নাই, ফলেও অধিকার নাই; তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে; কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।[৩৪]

লেখকের বহু রচনাতে প্রাণের আবেগ প্রবাহিত হয়েছে অবারিত ধারায়। ড. ক্ষুদিরাম দাস তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> মহাকাশব্যাপী এই যে অকল্পনীয় শক্তি স্ফুরণের খেলা চলছে, যার অতি নগণ্য অংশেই আমাদের প্রাণ প্রবাহ চরিতার্থ হচ্ছে, তার বাকি বিরাট অংশ যাচ্ছে কোথায়, কী কাজে লাগছে, কবির এই প্রশ্ন।[৩৫]

গতিময় জীবনের সৌন্দর্য কবিগুরু দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁর পারিবারিক জীবন থেকেই। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারটিই ছিলো এক বিরাট জ্ঞানসমুদ্র। জীবনের খুটিনাটি দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন তাঁর পরিবার থেকেই। দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে কোন বিষয় বস্তুকে মূল্যায়ন করা একজন সমালোচকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ এই দায়িত্ববোধের ব্যাপারটিও আয়ত্ত্ব করেছিলেন তাঁর পরিবার থেকেই। তিনি তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন:

> "সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে গতি বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল।"[৩৬]

সভ্যতার অগ্রগতিতে যান্ত্রিকতার প্রাচুর্য একদিকে মানুষকে করে তুলেছে গতিশীল, অন্যদিকে মানুষ অবসরহীন ও কর্মমুখর প্রতিবেশের প্রভাবে ক্রমাগতই হয়ে উঠছে জটিল আর রহস্যময়। প্রত্যেক শিল্পীই হচ্ছে সময়ের সোনালি সন্তান। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। জীবনকে তিনি বিচার করেছেন আকর হিসেবে। তাই জীবন ছেঁকে আনন্দ বের করার অবিরাম প্রচেষ্টায় লিপ্ত রবীন্দ্রনাথ শুধু ভূভারতেই নয়, সারা বিশ্বেও বিমুগ্ধ বিস্ময়। প্রকৃতি ও জীবনকে আলোচ্য হিসেবে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই দু'য়ের মাঝেই জীবনের পরিপূর্ণতা। আর রবীন্দ্রনাথের মত জীবনরসিক ও জীবনপ্রেমিক কবি খুব কমই আছেন। এ প্রসঙ্গে আবুল কাশেম ফজলুল হক তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "জীবন সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাকাব্যের নায়কের মতো অবিচল, স্থিতধী, সুস্থ সবল, স্বাভাবিক। বিশ্বাসে ও নৈতিক সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন বলেই মানসিক স্থৈর্যে ব্যত্যয় ঘটেনি তার। কবিসুলভ ভাবালুতা, অস্থিরচিত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তার জীবনে কখনো ছিল না।"[৩৭]

সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবজীবনকে কেন্দ্র করে আলোচনার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যেই ধরা পড়বে মানবজীবনের গতিবৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রকৃতি ও প্রবহমান মানবজীবনের এক সুন্দর আলেখ্য। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই এই অনুষঙ্গটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ সাহিত্যাঙ্গনের সর্বত্রই তাঁর সম্রাটসুলভ দৃপ্ত পদচারণায় পাঠক অভিভূত না হয়ে পারে কি? রবি ঠাকুর তাঁর *বিচিত্র প্রবন্ধ* রচনা করেন জীবনকে প্রকৃতির পটভূমে রাঙিয়ে তা পাঠকের আত্মার সম্পদে পরিণত করার এক মহান আদর্শ নিয়ে। *বিচিত্র প্রবন্ধ* এর প্রকৃতি পটভূমি ও পরিবেশ মাত্র, জীবনের প্রবাহই সেখানে মুখ্য ও প্রবল। এই প্রবন্ধে বিধৃত জীবনপ্রবাহের এই গতিসৌন্দর্য নতুন সাজে, নতুন আঙ্গিকে অদূর ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকচিত্তকে করবে আনন্দে উদ্বেল-সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূচি:

১। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৫, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ৩০

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী প্রয়াণ, বিচিত্র প্রবন্ধ, জুলাই ২০০৮, সুচয়নী পাবলিশার্স-ঢাকা, পৃ. ২০

৩। তদেব, পৃ. ১৯

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুক্তি, সঞ্চয়িতা, কাকলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৫, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ২৪০

৫। তদেব, নানা কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ. ২১

৬। তদেব, পৃ. ২২

৭। তদেব, পৃ. ২২

৮। তদেব, ছোট নাগপুর। পৃ. ২৬।

৯। সন্‌জীদা খাতুন, খুলে দাও তার, রবীন্দ্রনাথ: বিবিধ সন্ধান, জুন ১৯৯৪,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮৩

১০। তদেব, রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম', পৃ. ১১

১১। তদেব, রুদ্ধ গৃহ, বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ. ২৭

১২। আহমদ শরীফ, সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ, বিদ্যা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ৩৯৬

১৩। তদেব, পৃ. ৩৯৭।

১৪। তদেব, পৃ. ৩৯৬।

১৫। জুলফিকার মতিন, বাঁচবেন তিনি, বাঁচাবেন, কালি ও কলম, সপ্তম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ৩৭

১৬। তদেব, পথ প্রান্তে , বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ. ৩১

১৭। তদেব, বিচিত্র প্রবন্ধ, ভূমিকা, পৃ. ১০

১৮। তদেব, পনেরো আনা, পৃ. ৫৭

১৯। তদেব, পৃ. ৫৭

২০। তদেব, বাজে কথা, পৃ. ৪৩

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উদবোধন, ক্ষণিকা, সঞ্চয়িতা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ২২০

২২। প্রমথ চৌধুরী, প্রাণের কথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০১, পৃ. ৪৮৭

২৩। তদেব, পাগল, বিচিত্র প্রবন্ধ। পৃ.৭০

২৪। তদেব, পৃ. ৭১

২৫। ড.সফিউদ্দিন আহমদ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষা চিন্তা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ১৭

২৬। আত্ম পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৭, পৃ. ২৩৭

২৭। আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। ফাল্গুণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২

২৮। বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার কাঠি, বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ. ৭৮

৩০। তদেব, বসন্ত যাপন, পৃ. ৬০

৩১। মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মুক্তধারা, ঢাকা-২০১০, স্ত ১৬

৩২। রবীন্দ্রনাথ, চঞ্চলা, বলাকা, সঞ্চয়িতা। পৃ. ৩১০।

৩৩। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ভূমিকা, বহে জলবতী ধারা, সময় প্রকাশন ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আষাঢ়, বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ. ৭৪

৩৫। ড. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা। সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, পৃ. ৪১৭

৩৬। রবীন্দ্রনাথ, জীবন স্মৃতি, আজকাল প্রকাশনী, জুলাই ২০০৯, পৃ. ১৩১

৩৭। মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমাত্রিক মূল্যায়ন, আবুল কাশেম ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথের জীবনজগৎদৃষ্টি, বৈশাখী প্রকাশ, জুলাই-২০১১, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫১৬

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

নজরুল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন মানবপ্রীতি

ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ*

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বা তাঁদের শিল্প কিংবা সাহিত্যকর্মের মর্মব্যঞ্জনা যথার্থ অর্থে উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব উক্তি প্রভূত সাহায্য করে। এ কারণেই 'রবীন্দ্র কাব্যের রবীন্দ্র ব্যাখ্যা' জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের তাগিদ বোধ করেন কেউ কেউ। আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনার ক্ষেত্রে নজরুলের একটি সবিশেষ খ্যাত উক্তি উল্লেখ করার তাগিদবোধ করছি। উক্তিটি করেছিলেন নজরুল-প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর একটি পত্রের উত্তরে। উক্তিটি এমন:

> কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। ... ... যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এইদেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।[১]

আমরা প্রবন্ধে নজরুলের এই শেষোক্ত বাক্যটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। চাই এ কারণে যে, এই উক্তির মধ্য দিয়ে নজরুল ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন মানবতার কাতারে নিজেকে সম্পৃক্ত করার অপরিসীম ঔদার্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। 'মানুষ মানুষের জন্য,'-এ সত্যের সারবত্তা উপর্যুক্ত অভিমতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা / প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'–এই শাশ্বত অসাম্প্রাদায়িক মানবপ্রীতি কথা বলে উঠেছে নজরুল সাহিত্যের মূলীভূত দর্শনে।

অর্থাৎ 'কুল' ধর্মের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ঔদার্যই নজরুলের কবি ধর্ম। তাঁর ব্যক্তি ধর্মও সর্বজনীন মানবতাবাদের ধর্ম। 'ছোয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিলে যে ধর্ম খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে সে ধর্মে আস্থা নেই নজরুলের। বিশ্বাস নেই 'ম্লেচ্ছ', 'যবনে'; ঘৃণা আছে বরং। তাঁর ভাষায়,

> ভারতে যেদিন হইতে এই 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার উৎপত্তি, সে দিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান পবিত্র পূজা!"[২]

অন্যদিকে 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটাকেই নজরুল উপমিত করেছেন 'ন্যাজের' সাথে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বরাত দিয়ে বলেছেন, 'দেখ, যে ন্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভেতরের ন্যাজকে কাটবে কে?' এই যে ভেতরের ন্যাজ, 'এর উদ্ভব কোথায়?' নজরুল বলেছেন, "আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়িস্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দুরন্ত ইচ্ছা! ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।"[৩]

কথাগুলোর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুলের ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার মত 'আদিম' 'দুরন্ত ইচ্ছার কাছে মানুষের প্রণতি লজ্জাজনকই শুধু নয়, মানবতারও পরাজয়। শুভ্র মনুষ্যত্ববোধের অভাব থেকে ওর জন্ম। এ কারণেই বোধটা মানবেতর। ধর্মহীন। মানবতা পরিপন্থী। নজরুল মানব ধর্মের কবি। সর্বজনীনতা তাঁর কবি ধর্ম। মহৎ প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্যই সর্বজনীনতা। কুল-ধর্ম তাঁদের ক্ষেত্রে দৈব এবং দৈবকে অতিক্রম করতে পারেন বলেই তাঁরা মহৎ।নজরুল এক দিকে মানুষকে মনে করিয়ে দেন-

> ১.'যে জাত ধর্ম ঠুনকো এত,/ আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো,
> যাক না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ নাই পরোয়া'। (*'জাতের বজ্জাতি', "বিষের বাঁশী"*)
>
> ২."নারায়ণের জাত যদি নাই/ তোদের কেন জাতের বালাই?

* লেখক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে/ মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া। ('জাতের বজ্জাতি', "বিষের বাঁশী")

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যখন দেখা যায়, জাতিগত দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্পে কোন দেশ বা জনপদ বাসানুপোযোগী হয়ে পড়ে, তখন মানুষকে আর মানুষ মনে হয় না, মনে হয় দ্বিপদ বিশিষ্ট মানবেতর কোন প্রাণী। ধর্মগত বিভাজনের বৈরীতার ক্ষেত্রে নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ-অভেদ ধর্ম জাতি। এ কারণেই মানুষকে ধর্মের আলখেল্লা থেকে বের করে নিয়ে এসে মনুষ্যত্বের মুক্ত গগন তলে দাঁড় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন কবি। নজরুলের ভাষায়:

> "হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায় কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়তো পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িও ইসলামত্বও নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোঁকাঠুঁকি বাধবে না, কারণ তাঁরা দুজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম মিশে গেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামরির মধ্যে এইটুকু ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'।[৪]

আল্লাহ-ভগবান সম্পর্কে ব্যক্ত এ কথা ঈশা, মুসা, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি হিন্দু-শিখ পৃথিবীর তাবত ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। কেননা, নজরুল মনে করেন, "অবতার পয়গম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি- আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষ, কিন্তু গরুছাগল নিয়ে করে।"[৫]

কিন্তু যাঁরা মানুষ, প্রকৃত মানুষ, তাঁরা কখনও সত্যকে চিনতে ভুল করে না। আলোকে চিনতে ভুল করে না। ভুল করে না মানুষকে চিনতেও। মানুষের কল্যাণকামিতাই তাঁর আদর্শ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আত্মগত দর্শন; ধর্ম। মানুষই ধর্ম। নজরুলের ভাষায়, "চিনেছিলেন খ্রিস্ট বুদ্ধ/ কৃষ্ণ-মুহম্মদ ও রাম/ মানুষ কী আর কী তার দাম।" ('সত্যমন্ত্র', "বিষের বাঁশী")। মানুষের মূল্য নজরুলের কাছে এত বেশি যে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তিনি নির্দ্বিধায় নবি, অবতার ও ধর্মবেত্তাদের একই কবিতায় পাশাপাশি ব্যবহারের ঔদার্য দেখিয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন কৃষ্ণ-মুহম্মদ-রাম-খ্রিস্ট-বুদ্ধ ধর্মবিশেষের উদগাতা ও ভাষ্যকার হলেও ব্যাপকার্থে তাঁরা মানুষের বন্ধু। রাহবর। 'স্বর্গীয় দূত মিকাইলের আতসী পাখা' আর 'দুর্বাসার হিংসাক্রোধ তাই উপমিত হয় একই তাৎপর্যে, মানুষরূপ কবির ব্যক্তিত্ব শনাক্ত করতে। নরকের 'নার' আর সূর্যের হাম্মামে নেয়ে ওঠেন কবি। "বাসুকি-মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধুতট ভরে ফেনা থুকে।" ('ঝড়', "বিষের বাঁশী")। মসজিদ-মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করে কিন্তু অন্ধ পূজারিরা বিভ্রান্তির চোরাবলিতে পথ হারায়। পরিণামে দাঙ্গা বাধে হিন্দু-মুসলমানে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মনের দুঃখে নজরুলকে লিখতে হয় ['গণ-বাণীতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র, শুক্রবারের কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে] 'মন্দির ও মসজিদ' শীর্ষক প্রবন্ধ:

> "মারো শালা যবনদের!" "মারে শালা কাফেরদের"! আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর–মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতে ছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম–তখন আর তাহারা আল্লামিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, –"বাবা গো, মা গো!"–মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!
>
> দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল। মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্ত কলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে বীর?[৬]

অন্য কেউ মোছার চেষ্টা করুন বা না করুন, নজরুল করেছেন সারাজীবন। সমস্ত শক্তি দিয়ে। প্রতিভা দিয়ে। কাব্যপূজার নৈবেদ্য সাজিয়েছেন হিন্দুর জন্য। মুসলমানদের জন্য। উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য। তাঁর চেয়ে প্রতিভাবান হয়ত আছেন, হয়ত কেন আছেনই মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের মত, কিন্তু ঔদার্যে নেই কেউ তাঁর সমান। বাঙালির খাঁটি কবি এই অর্থে নজরুলই একমাত্র। হিন্দু-মুসলমানের কবি তিনি। কবি সর্বজনীন মানবতার। ঈদের চাঁদের পাশে বিজয়াদশমীর আনন্দোৎসব একমাত্র নজরুল কাব্যেই দীপ্যমান। হিন্দুর দেবতা আর মুসলমানের পয়গম্বর একইসঙ্গে গৌরাবান্বিত, সম্মানিত। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের পীর একই চরিত্রে দৃষ্ট, সাঙ্গীভূত (বাংলার আজিজ কবিতায়)। উপমিত হন যেমন নবীনচন্দ্র চাঁদের সাথে। সর্বজনীন চাঁদ।

ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে মানুষকে, মানুষের মনুষ্যত্বকে এবং মানবতাবোধের চেতনাকে নজরুল উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁর জীবন-ভর কাব্য ও সাহিত্য চর্চায়। শুদ্ধ হিন্দু ঐতিহ্যবাহী 'আগমনী' কবিতার ভাষায় নজরুল ঘোষণা করেন:

মহামাতা ঐ সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসিনীকে
শাশ্বত নহে দানব শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর নাই দানব
নাই অসুর চাই না সুর/ চাই মানব।

এই যে মানুষের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে তাকানো- সুর চান না, অসুরও চান না, মানুষ চান, মানব কল্যাণ চান, চান মানবপ্রীতি- এটিই নজরুলের কবি চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য; অন্যতম ব্যঞ্জনা। অনুরূপভাবে *'চিরঞ্জীব জগলুল'* কবিতায় ইসরাইল সম্প্রদায়ের উদ্ধারকর্তা মুসার চিত্রকল্পে জগলুল পাশা চিত্রিত হয়েছে নজরুলের হাতে। ধর্মের বাণী বাহক মুসা যত না নজরুলের প্রিয় তার চেয়েও প্রিয় মজলুমের বন্ধু বলে। জগলুল এ কারণেই নজরুলের নমস্য। মুসাকে না দেখার দুঃখ তাই নজরুল পুষিয়ে নেন জগলুলকে দেখে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদানকে নজরুল দেখেন জীবন-প্রেরণার উপাদান রূপে। জাগৃতির প্রতীক এগুলো। মানুষের জাগৃতি। নজরুলের মতে, 'মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্ব শক্তিমান।' কিন্তু মনুষ্যত্বের বড় অভাব কবির ভারতবর্ষে, এমন কি বিশ্বের সকল দেশে। অথচ নজরুলের অনুভবে ভারতবর্ষে তো বটেই, সারা বিশ্বেই বিরাজমান শুধু 'গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্ম কলহ অজাযুদ্ধের মেলা।' অথচ 'ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,/ রামছাগল আর ব্রহ্মছাগল আরেক ছাগল পাতি।' *'চিরঞ্জীব জগলুল'* কবিতার মত *'আমানুল্লাহ'* কবিতাতেও কবির সিদ্ধান্ত স্পষ্ট। 'নাই সে ভারত মানুষের দেশ।/ এ শুধু পশুর কতল-গাহ।' অর্থাৎ জগলুল আমানুল্লায় মর্মগত মিল আছে। সাদৃশ্য আছে চিন্তা চেতনায়। দু'জনেই মানুষের বন্ধু। দেশ হিতৈষণা চারিত্র্য উভয়ের। মানুষ আমানুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা কবির। কাবুলেশ্বর আমানুল্লায় আস্থা নেই তাঁর। 'আমানুল্লারে করি বন্দনা, কাবুল রাজার গাহিনা গান।'

আর একটি কারণেও আমানুল্লাহ প্রিয় নজরুলের। মানব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি। নজরুলও তাই। সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা নেই নজরুলে-আমানুল্লায়। 'কাফের' বলে হিন্দুদেরকে কতলে আমের নির্দেশ দেন না আমানুল্লাহ। কিংবা ছোট করেও দেখেন না কিছুমাত্র। নাগরিক অধিকার উভয়ের সমান। নজরুলের ভাষায়-

তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ, নয় কাফের
প্রতিমা তাদের ভাঙোনি, ভাঙোনি একখানি ইট মন্দিরের। ('আমানুল্লাহ', "জিঞ্জীর")

প্রতিমা ভাঙার ব্রত ছিল না খলিফা উমর ফারুকেরও। তাঁরও দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ ছিল;

ইসলামের এ নহে ক' ধর্ম, নহে খোদার বিধান
কারো মন্দির গির্জারে করে ম'জিদ মুসলমান। ('উমর ফারুক', "জিঞ্জীর")

সঙ্গত কারণেই উমর ফারুক সম্পর্কে নজরুলের স্পষ্ট উচ্চারণ-'প্রিয় হয়ে তুমি আছ হতমান মানুষ জাতির বুকে।'

মানব সেবক রূপেই উমরের স্থান মানুষের হৃদয়ে। অবরুদ্ধ জেরুজালেমে আটকে পড়া শত্রুদের বিশ্বাসও ছিল একই রকম। 'খলিফা আসেনি এসেছে মানুষ জেরুজালেমে।'চোখের জলে উমরকে স্মরণ করার কারণও এখানেই নজরুলের। তাঁর ভাষায়:

মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই। ('উমর ফারুক', "জিঞ্জীর")

ধর্মের ক্ষেত্রে উমরের যত অবদানই থাক না কেন এবং তিনি যত নন্দিতই হন না কেন, নজরুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি অন্য কারণে। 'মানুষের কল্যাণ লাগি তারি শুভ আগমন'-বলে উমর নজরুলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ইসলামী সাম্যবাদের অন্যতম ভাষ্যকার উমরের রাজ্যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। ইহুদি-মুসলমানের সমান অধিকার। তাদের জানমাল সমান পবিত্র। উমরের মত নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং বীরশ্রেষ্ঠ খলিফার অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও মানবতাবোধ থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত প্রতিটি মানুষের–হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের। শুভ্র-চারিত্র্য শক্তি সর্ববিধ কল্যাণের উৎস- এই হল 'উমর ফারুক' কবিতার মূল তাৎপর্য। কবিতাটির অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্যও এখানেই এবং কবি হিসেবে নজরুলের স্থানও হওয়া উচিত এই মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উমরের মত উপর্যুক্ত চারিত্র্য শক্তি যাদের–অপরিমেয় কবি তাদেরই গান গেয়েছেন, নান্দিপাঠ করেছেন এবং পাঠকদেরও হতে বলেছেন সে শক্তিতে শক্তিমান। অতএব, নজরুল যখন বলেন–'যারা ভেঙে চলে অপদেবতার মন্দির আস্তানা/ বক ধার্মিক নীতি বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।' তখন সে কালের এবং এ কালেরও সর্ব প্রকার অপশক্তি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিগত বিভেদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় নজরুলের মানবতাবাদের পবিত্রতা, মননশীলতা, কল্যাণকামিতা এবং বড় হয়ে ওঠে এ কথা যে, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই/ নহে কিছু মহিয়ান।' 'আজাদ' কবিতায় কবির তাই প্রার্থনা 'রবে না ধর্ম জাতির ভেদ/ রবে না আত্মকলহ-ক্লেদ।' শুধু তাই নয়,

অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হতে ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ? ('আজাদ', *"নতুন চাঁদ"*)

আলোচনার এ পর্যায়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে, পরস্পর সংঘর্ষমুখর বর্তমান বিশ্বে বিভেদকামী, জঙ্গীবাদী মানবমণ্ডলী তাঁদের হারানো পথ এবং প্রকৃত উদ্দীষ্ট শান্তি অর্জনের অন্যতম আলোকবর্তিকা হতে পারে নজরুলের জীবনাদর্শ সর্বজনীন মানবপ্রীতি এবং নজরুল-সাহিত্যের পবিত্র শিক্ষা আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে পালন করতে পারে সহায়ক ভূমিকা।

তথ্যসূচিঃ

---

১. নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ:১৯৯৩, পৃ. ৯১
২. *ছুৎমার্গ*, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২২
৩. *হিন্দু-মুসলমান*, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৩-৮৮৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৪
৬. *মন্দির ও মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৯

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

নজরুলের প্রবন্ধঃ কালের কণ্ঠস্বর

আল-ফারুক চৌধুরী*

'প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলো, স্বীকার করলো। তাঁর বই রাজরোষ ও প্রজানুরাগ লাভ করে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি।[১] নজরুল জীবিতকালেই জনপ্রিয়তার কিংবদন্তী পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক সচেতনতা, সাম্যবাদী দর্শন তাকে রাজরোষে পতিত করেছিল। আর পাঠক সাধারণ তাঁকে বুকে করে তুলে নিয়েছিল। এই গ্রাহ্যতা, জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করবার ক্ষমতা সামান্য নয়। অমরত্বের অভিলাষী ছিলেন না তিনি; ভাবীকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা, এ নিয়েও মাথা ব্যথা ছিল না তাঁর। স্বভাবসূলভ সপ্রতিভতায় বলেও ছিলেন,

"পরোয়া করিনা বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার উপর জ্বলিছেন রবি রয়েছে সোনার শত ছেলে"।[২]

এই যে পরোয়া না করা বিপুল প্রাণবেগ, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এ এক ধরনের নিজস্ব প্রাপ্তি, এক নতুন অর্জন। তাঁর প্রতিভার ভিতরে দরদ ছিল বিপর্য্যস্ত মানুষদের জন্য, তার আস্বাদ বাঙালি অনুভূতিশীল পাঠক কি কোনদিন ভুলবে? যখন নজরুল বলেছেন "ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন"।[৩] এসব কথার ভিতরে বহমান সুগভীর দরদই আমাদের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। নজরুলের মধ্যে ছিল চাঞ্চল্য, স্বতঃস্ফূর্ত এক অস্থির আবেগ, এই আবেগেই তাঁর রচনার বড় গুণ, আবার এই আবেগের বাড়াবাড়ি কোন কোন রচনার শিল্পমূল্য ক্ষুণ্ন করেছে। সেই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "ধনী কিন্তু গৃহিনী নয়"।[৪]- নজরুল প্রতিভা সম্পর্কে একথা অনেকখানি সত্য। গৃহিনীপনা, ঠিকঠাক পরিবেশন করার ক্ষমতা, পরিমিতি বোধ তাঁর প্রকৃতিতে তেমন ছিল না, ফলে এলোমেলো খরচ করে তাঁর প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছে।

নজরুল প্রাবন্ধিক ছিলেন না। যুক্তি তর্কে, বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, আনুষঙ্গিক বইপত্র নিয়ে গুছিয়ে বসা তাঁর স্বভাবে ছিল না। এর থেকে বিধ্বংসী কবিতা, গজল লেখা তার কাছে সহজসাধ্য। ধূমকেতুর যেমন গ্রহ থাকে না, নজরুলেরও তেমনি সমগ্র জীবনে অধ্যাপকীয় নিভৃতি বা বিশ্লেষণধর্মী মননের বালাই ছিল না। সত্যি সত্যি তিনি ছিলেন মূর্তিমান এক নৃত্যপাগল ছন্দ, মুক্ত জীবনানন্দ। তাঁর সৃষ্টিসুখের উল্লাসে যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে তত্ত্বসন্ধান অসম্ভব ছিল।

১৯২০ সালে বেঙলি রেজিমেন্ট ভেঙে যাবার পর নজরুল চলে আসেন কলকাতায়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে থেকে ১২ জুলাই মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে যুগ্মসম্পাদনায় শুরু করেন সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ"। প্রলয় ঘটে গেল নবযুগকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে তিনি সম্পাদকীয় লেখতে লাগলেন। খোলামেলা ভাষায় ব্রিটিশ শাসনকে ধিক্কার দিলেন। কাগজের চাহিদা আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল দেশ জুড়ে। নবযুগ বন্ধ হয়ে গেল। এই প্রবন্ধগুলো যুগবাণী নামে প্রকাশিত হল গ্রন্থাকারে। ১৯২২ সালে সেটিও নিষিদ্ধ হল।

নজরুলের প্রবন্ধ বলতে বুঝতে হবে সর্বপ্রথম এই সম্পাদকীয়গুলোই, যার মধ্যে ছিল বিদেশি শাসকদের উদ্দেশ্যে অশনিপাত। সেই নীরব শব্দতরঙ্গ পরাধীনতার বন্ধনে লাঞ্ছিত মানুষদের উদ্দীপ্ত করে তুলল।

২. যুগবাণীঃ প্রথম প্রকাশ ১৯২২ (১৩২৯ কার্তিক)। ঐ বছরই সরকার কর্তৃক নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ। প্রকাশক-আর্য্য পাবলিশিং হাউস। প্রবন্ধ সংখ্যা-১১

'নবযুগ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে নজরুল লিখলেন 'দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার। একবার দাঁড়াও। যেদিন সমস্ত বাধা-বন্ধন মুক্ত, মহামহীয়সী বেশে স্বাধীন পানে সঙ্কোচে- দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ ঝাঁঝরাপারা বক্ষ, সুত-শোনিত লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না।.... সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো।'[৫] ভাষার এই গুণে নজরুল প্রথম দিন থেকেই মানুষের মন জয় করেছিলেন। এর উৎস নির্ভেজাল দেশপ্রেম, যা ভাষাকে কুঠারের মতো শাণিত করেছে। ভারতের বুক থেকে বিদেশী শাসন উৎখাত করতে প্রেরণা স্বরূপ স্মরণ করেছেন লেনিনকে, তুর্কীর কামাল পাশাকে, আয়ারল্যান্ডের সংগ্রামী ডি-ভ্যালেরাকে। নজরুলের এসব লেখার মধ্যেই ভারতের বিপ্লবীরা পেল নবযুগের আশ্বাস।

* লেখক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

'ডায়ারের স্মৃতি স্তম্ভ'- নাম দিয়ে নজরুল জালিয়ান ওয়ালাবাগে ডায়ারের পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিলেন। মনুষ্যত্বের এ অবমাননা ও লাঞ্ছনা ভিক্ষুকের জাতিরাই হাসিমুখে বরণ করে। আত্মসম্মান জ্ঞান যাদের অসাড়-হিম হয়ে গেছে, তাদের তিনি জাগিয়ে তুলতে চান। ডায়ার এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ভারতবাসীর মঙ্গল করেছেন। এর ফলে ভারতবাসী মহাসাগরের তীরে জেগে উঠেছে। জালিয়ান ওয়ালাবাগের হতভাগাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান গলাগলি করে কেঁদেছে। দুঃখের দিনেই প্রাণের মিলন সত্যিকারের মিলন। আমাদের প্রীতি-বন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এ মহামিলন চিরন্তন হোক, এ আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন,

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে/ এমন ঘরের হয়ে পরের মতন/ ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।'[৬]

'যে এল চষে সে রইল বসে, নাড়া কাটাকে ভাত দাও এক থালা কষে'।[৭] এই প্রবাদের বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন **'ধর্মঘট'** প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন এই নাড়া কাটাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুললেই হলো ধর্মঘট। চাষী সারা বছর হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। অথচ তারই ফসল নিয়ে মহাজনেরা ১২ মাসে তেত্রিশ পার্বন করে। শ্রমিকেরা কায়িক পরিশ্রম করে ৪০ বছরের বেশি বাঁচে না। কোম্পানী তাঁদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে, কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে না। পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলিতে শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করে তাদের দাবী আদায় করেছে। সেই বিদ্রোহ- গণতন্ত্রের দাবানল এ দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ধর্মঘট তাই মুমূর্ষু জাতির শেষ কামড়। ধর্মঘট নাম দিয়ে এ দেশের চাষী মজুর সরকার ও মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘটে সমর্থন জানালেন।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে দেশের 'ছোটলোকদের' নিয়ে নজরুল লিখলেন, "মানুষের প্রতি এই যে হিংসা, দ্বেষ, তোমার দেশের, গাঁয়ের প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি এই যে আচরণ ঘৃণা, আক্রোশ, ইহাই তোমার মুখের বর্ম কালো করিয়া দিয়াছে- তোমার চেহারায় কালি ছড়াইয়া দিয়াছে। মরিতে ত বসিয়াছ, যদি এখনও এই মৃত হতভাগ্যদের হাত ধরিয়া না একা উঠিতে যাও, তবে আরো মার খাইয়া মরিবে। কিসের পতিত ইহারা? ইহাদের প্রাণ যত উন্মুক্ত-ইহাদের অন্তর যেমন সরল, তুমি কি সেরকম হইতে পার? হইতে পারে অশিক্ষিত সে, কিন্তু প্রাণ তোমার চেয়ে অনেক বড়, সে প্রাণে বিরাট বিপুল শক্তি-সিংহ, সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে- যদি পার সেই শক্তিকে জাগাও।"[৮]

আতঙ্কিত ইংরেজ সরকার এসব লেখার জন্য বারবার সতর্ক করছিল নবযুগ কর্তৃপক্ষকে। মুজাফফর আহমেদ লিখেছেন 'শেষ সতর্ক করেছিল **"মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?'** শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি নজরুলের লেখা। সরকারী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায় আঠারো হাজার মুসলমান ভারত ছেড়ে আফগানিস্থানে চলে গিয়েছিল, মুহাজিরিন শব্দের অর্থ স্বেচ্ছানির্বাসিত। এদের উপর নির্বিচার গুলিবর্ষণে কিছু লোক নিহত হয়। নজরুল লেখেন, 'স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মমভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যা বুনিয়াদে খাড়া তোমাদের ঘর- মনে কর কি, চিরদিন খাড়া থাকিবে?"[৯] তিনি বলেছেন বিবেকের দংশন হতে তোমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবেনা। এই অপকর্মের পাপের শাস্তি তোমরা পাবেই।

স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার করতে আত্মশক্তিতে অনাস্থা ও হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলার আহবান জানিয়ে লিখলেন **'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!'** নামে প্রবন্ধ। 'এয়সা দিন নেহি রেহেগা,' চিরদিন কারো সমান যায় না।[১০] অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে। যারা পশুশক্তির ব্যবহার করে এত দুর্বার দুর্জয়, অন্তরে তারা অতি দীন। নীল শৃগালের ধূর্তামি বেশি দিন টিকবে না। বাইরের স্বাধীনতা গেছে বলে অন্তরের স্বাধীনতা আমরা বিসর্জন দিইনি। ত্যাগ, বিসর্জন, উৎসর্গ বলিদান ছাড়া কি কখনো দেশ উদ্ধার হয়েছে? মাতা সরলা দেবী বাংলার কন্যা রূপে পাঞ্জাব থেকে এসেছেন। এমন ডাকে সাড়া না দিলে জানব, তোমরা মরেছ। ধুতুরার বিষ দিয়ে পাগল করে দাও,- 'মানুষের মতো জাগিবে না, কিন্তু তবু জাগিবে।'[১১]

বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে নেয়ায় আশাতীত এ উন্নতিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন **'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান'** প্রবন্ধে। তিনি মুসলমান তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করতে বললেন, 'যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা, ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতে ছিল না। এই রূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সর্বজনীনতা।"[১২] এই বিশ্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না তা স্থায়ী সাহিত্য নয়। এই মহাশক্তি আমাদের তরুণ লেখকদের অর্জনে ব্রতী হতে বলেছেন।

হিন্দু সমাজের **'ছুঁৎমার্গ'** বিষয়ে প্রবন্ধে বাঙালি ঐতিহ্যকে স্মরণ করে লিখলেন, 'হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপে কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যে দিন হইতে 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাই হউক ধর্ম নয়।"[১৩] তিনি বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান নয়, মানুষ হয়ে আকাশতলে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির আদিম বাণী মনে করি। মানবতার এই মহাযুগে এই গণ্ডি অতিক্রম করতে হবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতারকের মতো 'ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।' বললে শুনে শুধু হাসি পায়। বরং কালা পাহাড়ের মতো দল গঠন করে ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গঠনের কাজে নেমে পড়ি।

নন-কো-অপারেশন হচ্ছে বিছুটি আর আমলতন্ত্র হচ্ছে ছাগল। ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটাছুটি করে আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতার জ্বালায় ছুটাছুটি করে। সে কারণে গায়ের জোর খাটিয়ে দুর্বলদের **"মুখবন্ধ"** করতে চায়। যুক্তিতে না পারলে 'চুপ রও' বলে রেগে গায়ের জোর দেখায়। মনের জোর নেই, সত্যের জোর নেই। অন্তরে ভীরু বলেই এই গদাই-লশকরি চাল দেখায়। তিনি বললেন, 'এতদিন মোয়া দেখাইয়া ভুলাইয়াছ,..... আমাদের বড় ভয় হয়, এ মুখবন্ধ আমাদের নয়, তোমাদের।' [১৪]

'বাঙালির ব্যবসাদারি' প্রবন্ধে নজরুল লিখলেন 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী কথাটা যেমন দিনের মতো সত্য, বাণিজ্যে বসতে মিথ্যা-কথাটা তেমনি রাতের মতোই অন্ধকার'।[১৫] জাতির উন্নতি যেমন শিল্প-বাণিজ্যে-তেমনি তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে পতন অবশ্যম্ভাবী। মদকে মদ বলে খাওয়ানোতে দোষ নেই, যত দোষ দুধ বলে খাওয়ানোতে। বিশ্বস্ততা বাণিজ্যের একটা শর্ত। আত্ম প্রবঞ্চনা নয়। প্রতারণা নয়। তিনি লিখলেন, "মুচি, ডোম, হাড়ি, যেই হউন যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, 'আমি সূত পুত্রই হই, আর যেই হই, আমার পুরুষাকারই আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ।'[১৬]

বাঙালির চাকরি প্রিয়তা দেখে অধীনতা, দাসত্বকে বরণ করা বুঝিয়েছেন। কারণ যে জাতির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প যত বেশি, সে জাতির মধ্যে স্বাধীন চিত্ত লোকের সংখ্যা তত বেশি। স্বাধীন চিত্ত না হলে মনুষ্যত্ববোধ স্থায়ী হবে না। **'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?"**-প্রবন্ধে এর উত্তর এভাবেই দিয়েছেন।

বিহারের দেশীয় শাসনকর্তা লর্ড-সিংহ বাহাদুরের বেসামাল অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন **'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'** প্রবন্ধে। যতক্ষণ দেশ পরাধীন থাকে, ততক্ষণ দেশীয় শাসনকর্তারা জনতাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। তাঁকে অনেক সময় বিবেক বর্জিত কাজ করতে হবে। দেশীয় বা নেটিভদের একই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করবে না। 'এক যাত্রায় পৃথক ফল'- সব সময় দেখা যাবে।

'লাট প্রেমিক আলি ইমামের' তোষণনীতির ফলাফল ব্যক্ত হয়েছে নাম শীর্ষক প্রবন্ধে। **"লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্যে"** তিনি অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীককে খুঁজে পেয়েছেন। কারণ মানব প্রেমিক নজরুল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- ভাব জিনিসটা মদের নেশার চেয়ে গাঢ়। 'মদ খাও, কিন্তু তোমায় যেন মদে না খায়।'[১৭] ভাবের দাস নয়, ভাবকে নিজের দাস বানাও। কাজে শক্তি আনার জন্য ভাবের সাধনা কর। অন্ধের মতো না বুঝে ভেড়ার মতো পেছন ধরে যেও না। নিজের বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তোল। ভাবের ঘরে চুরি করো না। নিজের 'স্পিরিট' বা শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করার অধিকার করো নেই।

"জাগো পুরবাসি! দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে।'[১৮] তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা, সবুজের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শোভাযাত্রা। বিজাতির বিষাক্ত ছোঁয়া নয়, জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করে জীবন-পুষ্প বিকশিত হবে। তারা শিখবে দেশের কাহিনী জাতির বীরত্ব, ভাইএর পৌরুষ, সত্য-শিক্ষা। দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হবে। শুধু হুজুগ নয়, চাই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। **"সত্য-শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়"** এই তিনটি প্রবন্ধে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মতামত এমনি করে ব্যক্ত করেছেন। 'টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুল তলে বাসা'[১৯] বাঁধলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হবে। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্যবসায়ীরা বিদেশী জিনিসের গায়ে দেশী লেবেল লাগিয়ে দিব্যি ব্যবসা করছেন। তিনি মৌলিকতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। বিদেশী মেমকে শাড়ি পরিয়ে বিবি সাজাতে চান না। ভারতী-বীণাপানির মঙ্গলালোক জ্বালাতে চান। এভাবেই বিদেশী অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার হুজুগে শিক্ষার সমালোচনা করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক

নিয়োগ, কারিকুলাম, লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন 'আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।"[২০]

নজরুল সাহিত্যে যুগভাবনা এমনি করে আলো ছড়িয়েছে। যুগের যন্ত্রণা ও বুকের বিষজ্বালা তাঁকে শিল্পী করেছে। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বিপিন পালের উক্তি একান্তই সার্থক: "নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়েছেন জানি না, কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের গন্ধ পাই, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নতুন ভাব আসিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ নাই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।" [২১] আলোচকের একথা তাঁর প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আরও বেশী সার্থক। যুগবাণী গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ **জাগরণীতে** কবি নজরুলের তাই সরল স্বীকারোক্তি "জাগো বকুল, জাগো। তুমি যেখানে ফোটো, সেই পল্লীতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙলা, -বাঙ্গালীর আসল প্রাণ।"[২২]

খিলাফৎ কমিটির একটি ইস্তাহার ছাপানোর দায়ে পত্রিকার জামানত জব্দ হল। দ্বিগুণ অর্থে নতুন জামানত দেওয়া হল। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে নজরুল তখন বিপজ্জনক। ফলে নজরুল কাজ থেকে সরে যান। নজরুলের লেখা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের বিক্রি এতটাই কমে যায় যে কিছুদিন পর পত্রিকাটি বন্ধই হয়ে গেল।

৩. রাজবন্দীর জবানবন্দী ॥ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯২৩ (মাঘ ১৩২৯) প্রকাশক-ডি.এম লাইব্রেরী।

'ধুমকেতু' পত্রিকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশের সাথে সাথেই রাজদ্রোহের অভিযোগে কবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা বের হয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। বিচারের দিন আদালতে বিচারক ও অসংখ্য জনতার সম্মুখে কবি এক লিখিত জবানবন্দী পাঠ করেন। এই লিখিত জবানবন্দী পরে **'রাজবন্দীর জবানবন্দী'** শিরোনামে 'ধুমকেতু' পত্রিকার '১ম বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, শনিবার (১৩ মাঘ ১৩২৯) প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে দেশ প্রেম, শিল্পী সত্তা ও শিল্পীর দায়িত্ব এবং সামাজিক অঙ্গীকার প্রসঙ্গেও কবির অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

কবি তাঁর শিল্পীসত্তা সম্বন্ধে রাজবন্দীর জবানবন্দীতে বলেছেন- "আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সেই বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যরূপ। .... আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারী তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ..... এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধি। "[২৩]

দেশের জন্য, আর্তপীড়িত মানুষের জন্য এবং সত্য প্রকাশের জন্য কবির প্রাণ দিতে একটুও দ্বিধা নেই। তাই কবির উচ্চারণ 'আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশপীড়া নিরুদ্ধ হবে না। ..... কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব।

আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি অমৃতস্য পুত্রঃ। আমি জানি-

ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন/ আছে তার আছে ক্ষয়,
সেই সত্য আমার ভাগ্যবিধাতা/ যার হাতে শুধু রয়।"[২৪]

দেশকে ও সত্যকে ভালবাসায় নজরুলের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব নেই। আছে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস। কারণ ভগবান তার পেছনে আছেন। বাঁশির সুর যেমন বংশীবাদকের। তেমনি তাঁর কণ্ঠের বাণী ভগবানের। সুতরাং রাজদ্রোহী তিনি নন, রাজবিদ্রোহী বীণাবাদক ভগবান। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নজরুলের এই অনবদ্য জবানবন্দী অমিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক, সত্যানুরাগী কবি সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠে। বিচারে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় নজরুলের।

৪. রুদ্র মঙ্গল : প্রথম প্রকাশ ১৯২৬, বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রবন্ধ সংখ্যা-৮।

নবযুগ বন্ধ হওয়ার বছর দেড়েক বাদে সম্পাদক হিসেবে নজরুলের দ্বিতীয় আবির্ভাব 'ধূমকেতু' পত্রিকায়। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট এর উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানালেন 'অলক্ষণের তিলকরেখায়' ধূমকেতু যেন দেশের অর্ধচেতন মানুষদের চমক মেরে জাগিয়ে দেয়। সে কাজটি নজরুল করলেন প্রথম সংখ্যা থেকেই।

'জয় প্রলয়ঙ্কর'! হাঁক দিয়ে **'আমার পথ'** প্রবন্ধে ঘোষণা করলেন- 'রাজভয়- লোকভয় কোন ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না।' **'ধূমকেতুর পথ'** প্রবন্ধে খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন : 'সর্বপ্রথম, "ধূমকেতু" ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লি করতে চায় তাদের সাবধান করে বললেন, যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে সকল -কিছু নিয়মকানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।'[২৫]

'ক্ষুদিরামের মা' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, 'ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে। তোমরা চিনতে পারছ না, তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে- তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের- আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের। ওরা মায়েদের নয়, ওরা ঘরের নয়, ওরা বনের। ওরা হাসির নয়, ফাঁসির। ঐ যে-কণ্ঠ হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরছে ঐ কণ্ঠে ফাঁসির নীল দাগ লুকানো আছে। ওরা তোমার নয়, আমার নয়; ওরা দেশের, ওরা বলিদানের, ওরা পূজার!'[২৬]

'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধে ভারতের বুক থেকে বিদেশীদের সমূলে উৎখাত করবার জন্য হাঁক দিলেন : 'জাগো জনশক্তি। হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক- উলটে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ- ধূলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আন। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থপিশাচ যক্ষগুলিকে। তোমাদের পিতৃপুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ঐ লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও!"[২৭]

একই বৃন্তে হিন্দু-মুসলমান দুটি কুসুম ফোটানোর আকাঙ্ক্ষায় নজরুল ১৯২৪ সালে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তানের নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণ-মহম্মদ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সন্তান কয়েক মাসের বেশি বাঁচেনি। খিলাফৎকে কেন্দ্র করে ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমানে হৃদ্যতার যে-বন্যা এসেছিল সেটিও বছর চারেকের বেশি টেকেনি। ভারতের কয়েকটি শহরে বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরিণামে ১৯২৫ সালের ৩ জুলাই কলকাতায় দাঙ্গা লেগে যায় গোহত্যা উপলক্ষ্য করে। কিছুকাল বাদে আর্যসমাজীদের উপর মুসলমানদের হামলা থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িকতার আগুনে কলকাতায় ১৯২৬ সালে তিন দফায় দাঙ্গা গুরুতর হয়। নজরুল সে-সময় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। তাঁর 'কাণ্ডারী হুশিয়ারী' গানটি রচিত হয় ঐ-পটভূমিতে এবং তা কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত রূপে গাওয়া হয়। কবি স্বয়ং গানটি গান।

২৬ আগস্টের গণবাণীতে **'মন্দির ও মস্‌জিদ'** নামক প্রবন্ধে লেখেন, 'যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে মস্‌জিদের জিন্দা খানায়, গির্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা পুরুত পাদরী ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডারের মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে!..... সে নাম ভাড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পর টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে! উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বুনো বাঁদরের মত লাল!..... মানুষের পশুপ্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্মান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল!

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাঙলার তরুণেল দল- ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা! ঐ দেশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

'তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এসে এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে!'[২৮]

পরের সপ্তাহে ঐ পত্রিকাতেই **'হিন্দু-মুসলমান'** নামক প্রবন্ধে ফের লিখলেন, 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ, কেন না ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িও ইস্‌লামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত মোল্লায় মারামারি, হিন্দু মুসলমানে মারামারি নয়। .....টিকি দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।'[২৯]

ধূমকেতুতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পরে 'রুদ্রমঙ্গল' এবং দুর্দিনের যাত্রী' নামে দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয় এবং বলা বাহুল্য দুটিই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

৫. " দুর্দিনের যাত্রী'। প্রথম প্রকাশ ১৯২৬, গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত, প্রবন্ধ সংখ্যা-৭

"বেরিয়ে এস পথের সাথীরা।এস আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল।"[৩০] এভাবেই পথে বেরিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন **"আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল"** প্রবন্ধে। কারণ দুর্দিনে ঘরের মমতায় তাদের কেউ ডাক দেয়নি। আজ তাদের ডাক দিয়েছে উতল হাওয়া আর মাটির মায়ের কোল। তাদের দ্বারায় সৃষ্টি হবে নতুন জগত। রক্তের তিলক কেটে-রৌদ্রের করুণায় সিক্ত হয়ে এই পথের সাথীরা নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু করবে। তারা সূর্যতাপস। তাই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্রচুল্লির মধ্যে বসে তাদের তপস্যার স্পর্শে নরকের অগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

"তুবড়ি বাঁশির ডাক" প্রবন্ধে অগ্নিবরণ নাগনাগিনীকে নিযুত ফণা দুলিয়ে আসাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বাঁশির সুরে বিবরের অন্ধকার হতে রৌদ্র-তপ্ত দিবালোকে আহবান করেছেন। বিষের জ্বালায় জর্জরিত করতে বলেছেন বসুমতিকে। বসুমতি আর্তনাদ করে জেগে উঠুক। জ্বালা দিয়ে জ্বালাতে বলেছেন বিধি ও নিয়মকে। ভাসান উৎসবের দিনে মনসার পূজা বেদীতে বিষের উদ্‌গীরণে ধূমকেতু -ধুম আরো ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

"মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা" প্রবন্ধে স্বাধীনবোধে জাগ্রত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা। এ ভাবনা মনে জেগে উঠলে ভয়মুক্ত হবে। কারণ বীরেরা কারো অধীন নয়। সে শুধু স্বাধীন ,মুক্ত স্বাধীন। কারো দাসত্ব নয়, গোলামী নয়। কারো অধীনতা নয়,স্বদেশীরও না বিদেশীরও না যে অপমান সয় সে কাপুরুষ। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে উঠলে পৃথিবীর দানবশক্তি পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। অতএব "জাগো অচেতন জাগো। যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায় পিষে দিয়ে যাও তাকে।"[৩১]

"স্বাগত হে দেশবন্ধু। হে বীরেন্দ্র"- এভাবেই বীরোচিত প্রণাম জানিয়েছেন, স্বাগত জানিয়েছেন জেল থেকে মুক্তি পাওয়া চিত্তরঞ্জন ও বীরেন্দ্র শাসমলকে। জাহান্নামের মধ্যে বসে পুষ্পের হাসি হাসতে বলেছেন। শিব ও অন্নপূর্ণাকে এই মরার মূল্লুকে আহবান জানিয়েছেন। এ দেশের মায়ের কোন স্নেহ নেই, পিতার মঙ্গল হাত নেই, এখানে কল্যাণীর মঙ্গলদ্বীপ জ্বলে না। এমনি মরার দেশে তিনি মঙ্গলবার্তা নিয়ে আসতে বলেছেন।

"বাজে রে বাজে ডমরু বাজে -হৃদয় মাঝে, ডমরু বাজে।"[৩২] অন্তরের এই আহবানে তারুণ্যের মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। অন্নে তার রুচি নেই। সে এখন রক্ত চায়। পাগলি তাই কেঁদে ওঠে "মেয় ভূখা হুঁ।"পাগলি এখানে দেশ মাতা। রূপকের অন্তরালে দস্যি ছেলে, লক্ষ্মীছাড়ার দলকে দেশের সমৃদ্ধির জন্য, দেশমাতৃকার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে বলেছেন **"মেয় ভূখা হুঁ "** -প্রবন্ধে। দেশ এখন ভৈরবী মূর্তিতে আচ্ছন্ন। রক্ত পেলেই সেই মুখোশটা ফেলে সে অন্নপূর্ণা রূপ লাভ করবে।

"পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ ?"- বনানী-কুন্তলা ষোড়শী বনের বুকচিরে বেরিয়ে এসে পথহারা পথিককে জিজ্ঞাসা করেছিল। সেদিন দিশেহারা পথিকের মুখে উত্তর ছিল না। সুন্দরের আঘাতে পথিকের মুখে কথা ফোটেনি। কিন্তু আমাদের তরুণদল পথ হারায় না। কারণ এপথ তাদের চিরচেনা। এ চিরচেনা পথেই তারা আত্মবলিদানের জন্য এগিয়ে আসে। আর এ প্রক্রিয়ার জন্য মায়ের কল্যাণরূপ নেমে আসে।

'আমি সৈনিক' প্রবন্ধে নজরুল লিখলেন, দেশের এখন চাই মহাপুরুষ নয়, চাই এমন সব সৈনিক যারা বিদেশী শাসন উৎখাত করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেবে। লিখলেন, 'এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল করে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় কান্নায় এদের অলস আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে। এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আন, হিংসা আন, যুদ্ধ আন, এদের আবার জাগাও, কান্না কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না। আমরা যে আশা করে আছি কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে, যার ইঙ্গিতে আমাদের মত শত কোটি সৈনিক বহ্নি-মুখ পতঙ্গের মত তার ছত্রতলে গিয়ে 'হাজির হাজির' বলে হাজির হবে। হে আমার অজানা প্রলয়ঙ্কর মহা সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য বাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি।'[৩৩]

লালবাজারের পুলিশ তো বটেই, প্রাদেশিক বঙ্গ-সরকারের স্বরাষ্ট্র দফ্তরেরও অনুবাদকেরা নজরুলের প্রতিটি রচনার অনুবাদ করত। এ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'শুনেছি এমন দেশীয় অফিসাররাও সেখানে ছিলেন যাঁরা নজরুলের কবিতাগুলিকে বাজেয়াপ্ত হওয়ার হাত হতে বাঁচাতে চাইতেন। ধূমকেতু-র লেখা নিয়ে নজরুলের কি হবে, না হবে, সে কথা নাকি তাঁরা ভাবতেন না।"[৩৪]

প্রবন্ধ রচনায় নজরুলকে এরপর পাই 'লাঙল' ও 'গণবাণী' সাপ্তাহিকপত্রে। জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত 'লেবার স্বরাজ পার্টি-র মুখপত্র রূপে সাপ্তাহিক লাঙল আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩২ সনের ১ পৌষ (১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর) ১৯২৬-এর ১২ আগস্ট (১৩৩৩ সনের ২৭ শ্রাবণ) থেকে এরই পরিবর্তিত নাম গণবাণী।

এছাড়া সভাসমিতিতে যে সব ভাষণ তিনি দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন সেগুলি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সওগাত, আত্মশক্তি, প্রাতিকা, বুলবুল, নয়া জামানা, দৈনিক কৃষক, জয়ন্তী, মোহাম্মদী, ভোরের আলো ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিষয় গৌরবে উল্লেখযোগ্য ১৩৩৯ সালে প্রাতিকা পত্রিকায় প্রকাশিত **"বর্তমান বিশ্বসাহিত্য"** নামক প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দুই বিপরীতধর্মী লেখকদের কথা তুলে ধরেছেন। একদিকে স্বপনচারী নোগুচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে বাস্তববাদী ও দু:খসন্ধানী গোর্কি, যোয়ান বোয়ার, বর্নার্ড শ প্রমুখ। মধ্যবর্তী আর একদল আছেন যাঁরা "হলাহল পান করে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদগার করেননি"[৩৫] তাঁরা হলেন- লিওনিদ আঁদ্রিভ, ন্যুট হাসসুন, ওয়াদিশল রেমঁদ প্রমুখ।

ধর্মীয় জিগির তোলা মৌলবাদীদের এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতির **অভিভাষণে** তিনি বলেন, আমাদের পথে মোল্লারা হচ্ছে বিন্ধ্যাচল, তারা বাংলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের একেবারে শ্বাসরোধ করে ধরেছেন। এই কাঠমোল্লাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র তরুণরা।

সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে সে সময় কল্লোল, প্রগতি, উত্তরা ও কালিকলমে যে আলোড়ন উঠেছিল সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধ লিখলে ভুলবুঝে এরই জবাবে নজরুল ১৯২৭ সালে দ্বিতীয় বর্ষ ৩৭ সংখ্যা আত্মশক্তিতে **"বড়র পীরিত বালির বাঁধ"** নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যা লেখেন তাতে আছে খোলা মনের সরলতা। তিনি লেখেন "কি ভীষণ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে, অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়-লক্ষ্মীর কৃপায়-কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন তাঁকে যেন জানতে না হয়। নৈলে দেখতে পেতেন আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ!"[৩৬]

১৯৪১ সালের ৬ এপ্রিল কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতির রজত জুবিলি উৎসবে তিনি যে ভাষণ দেন তা **"যদি আর বাঁশী না বাজে"** নামে প্রকাশিত। বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসায় পত্নীকে সুস্থ করতে না পেরে কবি তখন বিষণ্ন। সমস্ত গান তখন তিনি বন্ধক দিয়ে দেন হাইকোর্টের অ্যাটর্নি অসীমকৃষ্ণ দত্তের কাছে। ঐ ভাষণে তাঁর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন, "আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি –আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন –আমায় ভুলে যাবেন।..... হিন্দু মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব–অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তুপের মত জমা হয়ে আছে –এই অসাম্য , এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।"[৩৭]

৬. বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমোট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, আত্মশক্তির অসাড়তা তেমনি। তাই দুঃখে, বিপদে, বিপ্লবে মানুষ অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের মধ্যে এই আবেগ দেখেছিলেন। সে কারণে তিনি নজরুলকে অন্তরের প্রীতি ও প্রশ্রয় ডোরে বেঁধে নিলেন। জীবনস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে তিনি লিখেছিলেন,

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন"।

কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ পেয়ে গিয়েছিলেন সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে, যে তার কবি স্বভাবের অপূরণকে ঢেকে দেওয়ার আশ্বাসবাণী নিয়ে আর্বিভূত হয়েছিল। হাফিজের কাব্যরসে মগ্ন থাকা কবি বিদ্রোহী কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়ে দিলেন,

"আমি বেদুঈন...আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ"!

কবি নিজের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক হিসেবেই নজরুলকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। **ঐক্যতান** কবিতায় কবির তাই আত্মস্বীকারোক্তি ঃ

".... সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে"।

সে শক্তি নিয়ে নজরুল ভিতরে প্রবেশ করলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে তার আয়ু দীর্ঘ হয়নি। এই ঘাটতির কৈফিয়ত নিজেই তিনি দিয়েছেন: "বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী।" [৩৮]

সে-সময় বাংলাসাহিত্যের কীর্তিমানরা কেউ তাঁর সহযাত্রী হননি। সে অভিমানে নজরুল লিখেছেন,

" বন্ধু! তোমরা দিলে নাক' দান/ রাজসরকার রেখেছেন মান/ যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন।"[৩৯]

নজরুল ছিলেন পরম আত্মবিশ্বাসী। অন্যায়কে অন্যায় বলেছেন, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছেন, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছেন। কারো তোষামোদ করেন নি। প্রশংসার বা প্রসাদের লোভে কারো পেছনে যান নি। তিনি শুধু রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেন নি- সমাজের , জাতির, দেশের বিরুদ্ধে তাঁর সত্য তরবারি তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন-

প্রার্থনা করো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ![৪০]

নজরুলের এই উচ্চারণ, এই অনুভূতি বর্তমানেও ধ্বনিত হচ্ছে - 'হে মহাকাল, আজ আবার এই এক ক্রান্তিকালে,আমরা যারা কেবলই এই পৃথিবীকে নানাভারে বিনষ্ট করছি, নানা স্তরে, তাদের তুমি ধ্বংস কর। করে-আমাদের সন্ততিদের জন্য অন্ততঃ এই পৃথিবীতে ন্যায়, নীতি, সত্য, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে দাও।

সর্ব পাপ দূর হো-ক,/ আকাশ নির্মল হোক,
বায়ু পবিত্র হোক,/ এই পৃথিবী গ্লানিমুক্ত হোক।'[৪১]

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কবির স্মৃতিবিলুপ্তির রোগ ধরা পড়ার পর বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির উচ্চমার্গীয় বুদ্ধিজীবীদের উচ্চাঙ্গের উন্নাসিকতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের আগ্রহে-উচ্ছ্বাসে তিনি **"নবযুগ রবি"** হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রজয়ন্তীর মতোই নজরুলজয়ন্তীও হয়ে ওঠে বাঙালির জাতীয় উৎসব। নজরুল বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশের দশকে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে সাহিত্যে স্বনামখ্যাত অন্তত একটি কলমও যে তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল তার সাক্ষী এই প্রবন্ধগুলো।

তথ্যসূচি:

১.বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম সংস্করণ, পৃ.১২৫

২.কৃষ্ণা বসু,কাজী নজরুল ইসলাম: একটি মূল্যায়ন প্রয়াস, কোরক সাহিত্য পত্রিকা,১৪০৫,প্-৩৩৯

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৩৯

৪.বাঁধন সেন গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল, ১৯৯৮, পৃ-৮৬

৫.নজরুল রচনাালী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৭৯

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৮২

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৯৫

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৮৬

১০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৭৫

১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৭৫

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৮৮

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৯১

১৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৯৮

১৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪০৫

১৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪০৫

১৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪১৮

১৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২১

১৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২৩

২০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২৫

২১. রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল,বিশ্বনাথ রায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা,১৪০৫,পৃ-২৯

২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২৭

২৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২৯

২৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪৩১

২৫. নজরুল রচনাালী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩,পৃ-৪২৮

২৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২৭

২৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪২০

২৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪৩২-৪৩৬

২৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪৩৭

৩০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪০৪

৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪০৭

৩২. রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল,বিশ্বনাথ রায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ-২৭

৩৩. নজরুল রচনাবলী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪১৪

৩৪. নিষিদ্ধ গ্রন্থ তালিকায় নজরুল ও তাঁর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বাঁধন সেনগুপ্ত, কোরক, ১৪০৫, পৃ-১৩০

৩৫. নজরুলের প্রবন্ধ, সত্যপ্রিয় ঘোষ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ-১০৪

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, বিশ্বনাথ রায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ-২২

৩৭. নজরুলের প্রবন্ধ, সত্যপ্রিয় ঘোষ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ-১১১

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, বিশ্বনাথ রায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ-২৫

৩৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১৩

৪০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১৩

৪১. শাঁওলী মিত্র, কথা অমৃত সমান, পৃষ্ঠা-১২৪

গ্রন্থ ঋণ:

১. কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১, ভারতীয় সংস্করণ।

২. বাংলা সাময়িকপত্রে প্রগতি চেতনা, ড. মো. ইব্রাহীম আলী। ২০০৮।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতি কথা, মুজফ্ফর আহমেদ, ১৯৩৯।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

নজরুলের গানে নারী

আমিনুল ইসলাম*

নজরুল সামগ্রিক অর্থেই সাম্যের কবি। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী-লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদের বিপক্ষের মানুষ তিনি। তিনি তাঁর এক কবিতায় বলেছেন, 'সাম্যের গান গাই/আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।' তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন যে নারী-পুরুষের সম্মিলিত কর্মপ্রবাহেই চলমান রয়েছে মানবসভ্যতা। একজনকে বাদ দিলে আরেকজন অসম্পূর্ণ ও অচল। সে-কথার স্বীকৃতি রয়েছে তাঁরই সুবিখ্যাত 'নারী' কবিতায়:

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'[১]

নজরুল তাঁর সময়ের ভারতীয় নারীর শোচনীয় আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নারী শুধু পুরুষেরই অধীন নয়, তারা ছিল সার্বিক অর্থেই শৃঙ্খলিত। সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বাধা নিষেধের বেড়াজাল, অশিক্ষা, হীনমন্যতা তাদের চার-দেয়ালে-বন্দী মানবেতর জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছিল। নারীর তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার ছিল না। সম্পদের মালিকানা পুরোটাই ছিল পুরুষের হাতে। শিক্ষার অধিকার ছিল শুধুই পুরুষের। পারিবারিক চৌহদ্দির/ ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না নারীর। খেলাধুলা-গানসহ সব রকম চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে সে ছিল পুরোপুরি বঞ্চিত। রাজা রামমহোন রায়ের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা উঠে গেলেও বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, যৌতুক প্রথা, অকালমৃত্যু, স্বামীগৃহে চতুর্মুখী নির্যাতন নারীর নিত্যসঙ্গী ছিল। বাল্যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, স্বামীসহ পতিগৃহের সকলের সেবাকরণ, পুরুষের যৌনচাহিদা পূরণকরণ, সন্তান উৎপাদন, রান্নাবান্না এসব কাজে আবদ্ধ থেকে চারদেয়ালের মধ্যে ঘরকন্না করাই ছিল নারীর অপরিহার্য নিয়তি। নারীও যে পুরুষের মতোই পুরোপুরি মানুষ, নারীও যে সকল কাজে পুরুষের সমান উপযুক্ত, নারীরও যে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাধীন পেশার অধিকার থাকা প্রয়োজন, নারীরও যে সমান আত্মমর্যাদার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকা দরকার, পুরুষজাতির মগজে ও ইচ্ছায় এসব ঠাঁই পেতো না। সামাজিক-পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। মুসলমান নারীর অবস্থা ছিল আরো করুণ। ভয়ংকর পর্দাপ্রথা নারীকে অবরোধবাসিনীর মানবেতর বন্দী জীবনে আটকে রেখেছিল। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বর্ণনা করেছেন: "নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডবৎ করে রেখেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। ... তাদের বাংলা শিক্ষাদান ছিল সমাজ ও ধর্মবিরুদ্ধ। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ...গুরুতর রূপে অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হত না পর্দা নষ্ট হওয়ার ও দোজখে যাওয়ার ভয়ে।...খান্দানী এবং অর্থশালী লোকের পত্নীরা ছিল তাদের ভোগের বস্তু। .... আর গরীব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীরও অধম।"[২]

অবশ্য ততোদিনে সমাজে নারীদের শিক্ষা, অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে কিছু সমাজ সংস্কারক ও লেখক কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিলোপ আন্দোলন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমাজে নারীর পক্ষে সহানুভূতি আদায়ে সক্ষম হয়েছিল আরও আগেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ ইসমাইল হোসনে সিরাজী, ডাক্তার লুৎফর রহমান, বেগম রোকেয়া প্রমুখ লেখক-চিন্তক নারীর পক্ষে কলম ধরেছিলেন। তবে প্রকৃত নারীস্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন শুধু বেগম রোকেয়া। অন্যেরা তাঁদের নারীভাবনাকেন্দ্রিক লেখায় নারীর প্রতি কিছুটা উদারতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিলেও প্রকৃত নারীস্বাধীনতার রেখা স্পর্শ করেনি। এমন পটভূমিতে ধর্মীয়-সামাজিক কুসংস্কার-বিরোধী মুক্তজীবনের প্রবক্তা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্য-সংগীতের ভুবনে আশীর্বাদের মতো আবির্ভাব। তিনি তাঁর কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প-গানে তৎকালীন নারীর জীবনের নানা দিক ফুটিয়ে তোলেন এবং নারীর মুক্তজীবনের পক্ষ অবলম্বন করেন।

নজরুলের গানে প্রকৃতি আর নারীর প্রাধান্য প্রবল। তাঁর প্রেমের গানগুলোতে বঙ্গনারীর প্রেমভালোবাসার ছবিই বেশি। সে সব গানে নারীর রাগ-অনুরাগ, আবদার-অভিমান, প্রত্যাশা-হাতাশা, মিলনের আনন্দ, বিচ্ছেদের বেদনা এবং নানামুখী আকাঙ্ক্ষার কথা বিধৃত হয়েছে। অবশ্য তাঁর বেশকিছু নারীজাগরণমূলক গান রয়েছে। আবার ইতিহাসখ্যাত কিছু নারীকে নিয়ে বেশকিছু অনবদ্য গানও রয়েছে তাঁর।

* পরিচালক, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।

অবরোধ প্রথা নারীর আত্মবিকাশ, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটতে দেয়নি। নারীরা ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী এবং তাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তাদের নিজস্ব সত্তার স্বীকৃতি ছিল না। নজরুলের একটি ব্যঙ্গ লেখায় আছে:

এ দেশের নারী বেজায় আনাড়ী / পুরুষের হাতে তবলা

তবলাতে চাটি মারিলে সে কাঁদে / ইহারা কাঁদে না, অবলা।

জরিশাড়িমোড়া চকলেট ওরা / বন্দী হেরেম বাক্সে

বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ / কাজেই বাক্সে থাক সে।[৩]

তখন নারীরা ছিল অবরোধবাসিনী। স্বামী পরবাসে গেলেও নারীর ঘরের বাইরে আসার সুযোগ হতো না। ঘরের ভেতর কর্মহীন অবস্থায় অথবা রান্নার কাজে কাটাতে হতো সময়। পুরুষ বাইরে কাজ করে। তার পক্ষে স্ত্রীকে ভুলে থাকা সহজ। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

তোমার কাজের মাঝে আমায় ভোলা / সহজ হবে স্বামী

কেমন করে একলা ঘরে / থাকবো ভুলে আমি।[৪]

তখন ছিল যৌথ পরিবার প্রথা। সংসারে নারীকে পুরুষ ছাড়াও স্বগোত্রীয় শাশুড়ী-ননদীদের জ্বালা সহ্য করতে হতো। এ জ্বালা ছিল আরো নির্মম। সমাজে/ পরিবারে নারীর প্রেম-ভালোবাসার কোন মূল্য ছিল না। বরং নারীর প্রেমকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে দেখা হতো। ফলে নারীকে তার প্রেমের কথা আপনার অন্তরে লুকিয়ে রাখতে হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুকের খাঁচাতেই অকালমৃত্যু ঘটতো প্রেম-পাখিটার।

সখি সাপের মণি বুকে করে / কেঁদে নিশি যায়

কাল নাগিনী ননদিনী / দেখতে পাছে পায় লো সখি

দেখতে পাছে পায়।। / সই প্রাণের গোপন কথা মম

পিঞ্জিরারি পাখী সম / পাখা ঝাপটিয়া কাঁদে/ বাহির হতে চায়।[৫]

এমনকি প্রেমের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের বৈষম্য ঘুঁচতো না। প্রেম করে পুরুষ আনন্দের ভাগীদার হলেও কলঙ্কের লাঞ্ছনা জুটতো শুধু নারীর কপালে। প্রেমের নামে প্রতারণা করে পুরুষ পালিয়ে গেলেও তার শাস্তি হতো না। উল্টো নির্দোষ নারীর জুটতো পরিবার ও সমাজের লাঞ্ছনা। রাধার নিয়তি সকল নারীকেই বরণ করতে হতো। নজরুলের একটি গানে আমরা রাধারূপী নারীর মুখে নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং অসহায় নারীর প্রতিশোধ গ্রহণে পুরুষ হয়ে জন্মানোর আকাঙ্ক্ষার ছবি দেখতে পাই:

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম / আমারি মতন দিবসনিশি

জপিতে শ্যামনাম।।

.....

তুমি যে কাঁদনে কাঁদায়েছ মোরে / আমি কাঁদাতাম তেমনি করে

বুঝিতে, কেমন লাগে এই গুরু গঞ্জনা / এ প্রাণ-পোড়ানি অবিরাম।।[৬]

তবে তখনো উপজাতি-আদিবাসী নারীরা অনেকটা পুরুষের মতো মুক্ত জীবন যাপন করতো। তারা পুরুষের সঙ্গে মাঠেঘাটে কারখানায় কাজ করতো। নজরুলের ঝুমুর-ঝাপান গানগুলোতে উপজাতি-আদিবাসীর নারীর মুক্তজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। এসব জনগোষ্ঠীর উৎসব-পার্বণে হাড়িয়া/ মহুয়া মদ পান, ঢোল মাদল, বাঁশের বাঁশি সহকারে নৃত্যগান পরিবেশন করার রেওয়াজ ছিল। অবশ্য সে সব প্রথা এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। মদ্যপান ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান অধিকার ভোগ করতো। নজরুলের অনেক গানে অমন ছবি দেখতে পাওয়া যায়:

চুড়ির তালে নুড়ির মালা / রিনিঝিনি বাজে লো

খোঁপায় দোলে বুনোফুলের কুড়ি।। / কালো ছোঁড়ার কাঁকাল ধরে

নাচে মাতাল ছুঁড়ি লো / খোঁপায় দোলে বনোফুলের কুঁড়ি।।

মহুয়া মদের নেশা পিয়ে / বুদ হয়েছে বৌয়ে ঝিয়ে

চাঁদ ছুটেছে মনকে নিয়ে / ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ি যেন

ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ি লো।।[৭]

সেই সময়ও দরিদ্র শ্রেণির নারীশ্রমিক ছিল। বিত্তবান ঘরের নারীরা ঘরের বাইরে কাজ না করলেও গরীব নারীরা পেটের দায়ে পুরুষের মতো ঘরের বাইরে কাজ করতো। কিন্তু বিনিময়ে পেটপুরে খাবার পেতো না। তাদের মজুরী ছিল কম। ঘরে সন্তানেরা থাকতো পথ চেয়ে। যৌথ পরিবারের কারণে ছিল শাশুড়ী-ননদীদের গঞ্জনা । নজরুলের একটি গানে অমন করুণ ছবি ছাদপেটা নারীশ্রমিকদের মুখে ফুটে উঠেছে:

সমবেত: সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো/ পাত ভরে ভাত পাই না ধরে আসে হাত গো।।

১ম: তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে ?/ ২য়: ছেলে দুটোভাত পায়নি, পথ চেয়ে রয়েছে।

৩য়: আমিও ভাত রাঁধিনি দেখ্না চুল বাঁধিনি/ শাশুড়ি মাদ্ধাতার বুড়ি মন্দ কথা কয়েছে।

৪র্থ: আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো।।[৮]

তবে এ ছিল তথাকথিত মুষ্টিমেয় নিম্নশ্রেণির নারীর জীবনকথা। অধিকাংশ নারী ঘরের বাইরে যেতে পারতো না। তারা ছিল চারদেয়ালের বন্দিনী। কাজ বলতে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় চোখ কচলিয়ে রান্নাবান্না আর থালাবাসন-ঘরদোর-কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা। কিন্তু নারী কি পুরুষের সমকক্ষ হয়ে তার সাথে কাজ করেনি? নারী কি রাজ্য জয় করে সম্রাজ্ঞী হয়নি? নারী কি যুদ্ধ করেনি? নারী কি অবরোধ ভেঙ্গে প্রেমের পথে পা বাড়ায়নি কখনো? পুরুষ কি কখনো নারীর রূপ-গুণ-ক্ষমতার কাছে মুগ্ধ হয়ে পরাজয় স্বীকার করেনি? সবকটি প্রশ্নের ঐতিহাসিক উত্তর হাঁ। নারীর অতীত কীর্তির জয়গান রয়েছে নজরুলের গানে:

রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়/ শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়

জেবুন্নেসার তুলনা কোথায়, জ্ঞানের তপস্যায়।।[৯]

তাহলে মুসলিম নারীদের আজকের অবস্থা এমন শোচনীয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আছে ঐ গানেই: 'সেই গৌরবের গোর হয়ে গেছে আঁধারের বোরকায়।।'[১০]

এই বোরকা, এই অবরোধ নারীর সকল অতীত কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে, আর বর্তমান নারীকে বন্দী করেছে কুসংস্কার আর পুরুষরচিত বেড়াজালে। তিনি বর্তমান নারীর কাছে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে ইতিহাসের বিখ্যাত নারীদের জয়গানগাঁথা উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাদের সমানে হাজির করেছেন নুরজাহান, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, আনারকলি, মমতাজ, লাইলি, খাদিজা, ফাতিমাকে। নুরজাহান ছিলেন পারস্যের নারী; যুবরাজ সেলিম নুরজাহানের প্রণয়প্রার্থী হন। পরিবার আর স্বামীর বাঁধা ডিঙিয়ে সাড়া দেন নুরজাহান। পরবর্তীতে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান সিংহাসনের আড়ালে থেকে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে ওঠেন । তিনি রাজকার্য পরিচালনায় পরোক্ষে যে দক্ষ ও দূরদর্শী ভূমিকা রাখেন তা ঐতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন করে। নজরুল তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধামিশ্রিত সুরে রচনা করেন এক অমর গান:

নূরজাহান ! নূরজাহান!/ সিন্ধু নদীতে ভেসে

এলে মেঘলামতির দেশে/ ইরানী গুলিস্তান!!

তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম/ সে যে রাজাধিরাজ

চন্দনসম মাখিল অঙ্গে/ কলঙ্ক লোকলাজ.

সে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ/ নীল আকাশে

যাহা লেখা থাকে শুধু/ প্রেমিকের ইতিহাসে

দিবে চিরদিন নন্দন লোকচারী/ তব সেই কলঙ্ক/ সে প্রেমের সম্মান।।[১১]

তেমনি তিনি আদর্শ প্রেমিকা হিসেবে লাইলিকে উপস্থাপন করেছেন। লাইলির প্রেমে পড়ে কায়েস দিওয়ানা বা মজনু হয়েছিল। কিন্তু লাইলিকে বন্দি করে রেখেছিল তার ক্ষমতাবান গোষ্ঠীপ্রধান পিতা। শেষপর্যন্ত মজনুর প্রেমের টানে সকল বাঁধন ছিন্ন করে সকল বাধা ডিঙিয়ে সকল শাসন উপেক্ষা করে লাইলি বের হয়ে এসেছে প্রেমের যথাযোগ্য সম্মান দিতে। প্রেমিকা হিসেবে লাইলির সাহসী ভূমিকার কথা নজরুল তুলে ধরেছেন তাঁর গানে:

লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া/ মজনু গো আঁখি খোলো।।

...../ মজনু তোমার কাঁদন শুনিয়া

মরু নদী পর্বতে/ বন্দিনী আজ ভেঙেছে পিঞ্জর/ বাহির হয়েছে পথে।[১২]

একইভাবে তিনি আনারকলি ও মমতাজকে নিয়ে গান লিখেছেন। আনারকলির প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুবরাজ (পরবর্তীতে মোগল সম্রাট) সেলিমের নাম। সম্রাট আকবরের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আর রাজা-প্রজার ভেদাভেদকে অস্বীকার করে আনারকলি সেলিমের সঙ্গে প্রেম করে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসে কিংবদন্তীর মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। তেমনি সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের প্রেমে মুগ্ধ মোগলসম্রাট শাহজাহান মমতাজের প্রেমকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে নির্মাণ করেন বিশ্বের বিস্ময় প্রেমের স্মৃতিসৌধ অমর তাজমহল। তাজমহল আজ বিশ্বের প্রেমিকদের সঙ্গে সকল শ্রেণির মানুষের প্রিয় তীর্থকেন্দ্র। নজরুল সে কথা স্মরণ করে গান লিখেছেন:

মমতাজ! মমতাজ! তোমার তাজমহল/ (যেন) বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম,

ফিরদৌসের একমুঠো প্রেম/ আজো করে ঝলমল।।[১৩]

নজরুল নারীর মধ্যে প্রেমরূপ, মহিমামণ্ডিত কল্যাণময়ী রূপ এবং বীরভার্যা রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। নারীর তখনকার অবস্থা শোচনীয় হলেও নারী যে পূর্বকালে অনেক গৌরবময় ও স্বাধীন ভূমিকার অধিকারিণী ছিলেন, সে-কথা নজরুল তাঁর গানে গানে তুলে ধরেছেন এ কারণে যে এতে করে নারীরা তাদের হীন আবস্থান থেকে উঠে আসতে অনুপ্রেরণা পাবে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। সে উদ্দেশ্যেই তিনি নুরজাহান, চাঁদ সুলতানা, খাদিজা, ফাতেমা, মমতাজকে তাঁর গানে উপস্থাপন করেছেন বারবার। তিনি যুদ্ধ সংগ্রামে জয়ী চাঁদ সুলতানাকে সম্বোধন করে বলেছেন:

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা চাঁদের চেয়েও জ্যোতি

তুমি দেখাইলে, মহিমান্বিতা নারী কি শক্তিমতী।।

.....

তাই গোলককুণ্ডার কোহিনুর হীরাসম/ আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছে নিরুপম

রণরঙ্গিনী ফিরে এসো/ তুমি ফিরিয়া আসিলে ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।।[১৪]

নারীর বর্তমান দুরাবস্থার কারণ কি? মূলতঃ ধর্মের নামে পুরুষ আরোপিত অবরোধ প্রথা। এই অবরোধ প্রথার কারণে নারী চারদেয়ালের ভেতর আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছে। ফলে তার মেধা ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। যে ইসলাম নারীকে সমান মর্যাদাদানের পথে অনেকখানি এগিয়ে এসেছিল, সেই ইসলামের নামেই পুরুষেরা নারীকে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অন্যায় ফতোয়া নারীকে করেছে গৃহবন্দী এবং হেরেমের মানবেতর জীবনের অধিকারিণী।

আঁধার হেরেমে বন্দী হলো সহসা আলোর মেয়ে

সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।[১৫]

আর এই যে বোরকা প্রথা সেও নারীর পূর্বগৌরবকে ভূলুণ্ঠিত করেছে:"সেই গৌরবের গোর হয়ে গেছে আঁধারের বোরকায়।" এবং যদি নারীরা এই অন্যায় অবরোধ আর বোরকার অন্ধকার জীবন থেকে মুক্তি পায়, তবে তারা আবার জেগে উঠবে । আবার তারা হবে রিজিয়া, খালেদা, চাঁদ সুলতানা:" লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।"

মূলত ধর্মের নামেই নারীদের অমানবিক অবরোধ প্রথার দাসী করে রাখা হয়েছে। আর সহসাই ধর্মের ফতোয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলে কাজ হবে না এটা নজরুল বুঝেছিলেন। আর তাই তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো, শিকল পরেই শিকলকে বিকল করার মতো মুসলিম নারীর অতীত উদাহরণ এনে বর্তমান মুসলিম নারীজাগতকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি রহিমা, ফাতেমা, খাদিজা , খালেদাকে গানে গানে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মনে আছে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্মীয় শাস্ত্র থেকেই সমর্থন সংগ্রহ করে ধর্মের বাধাকে অতিক্রম করেছিলেন। নজরুল মুসলিম নারীর ধর্মশাস্ত্রজনিত দুরবস্থার কাহিনী তুলে ধরে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর কাছে এসবের প্রতিকার চাওয়ার ঢঙে গান লিখেছেন:

হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে/ তুমি শুনিতে কি পাও?

আখেরী নবী প্রিয় আল আরবী/ বারেক ফিরে চাও।।

পিঁজরার পাখিসম অন্ধকারায়/ বন্ধ থাকি এ জীবন কেটে যায়

চাহে ছুটে যেতে তব মদিনায়/ চরণের এই জিঞ্জির খুলে দাও।।

ঝুটা এই বোরকার হোক অবসান/ আঁধার হেরেমে আশার আলোক দেখাও।।[১৬]

নজরুল শুধু নারীর অতীত ইতিহাস উপস্থাপন করেই শেষ করেননি। এ দেশের নারীর ভেতর যে কল্যাণময়ী, মমতাময়ী, প্রেমময়ী রূপ আছে এবং তার অবদানেই সংসার যে এত মধুময়, এত মায়াময়, তা তিনি তুলে ধরেছেন। পৃথিবী এতটা মমতাময়, এতটা মায়াময় হওয়ার পেছনে যে নারীর অবদানই বেশি সে কথার স্বীকৃতি আছে নজরুলের গানে। নারীই যে সকল উৎসব পার্বণের আনন্দের মূল চালিকাশক্তি সে কথাও এসেছে নারীর মুখের গানে:

আমি পূরব দেশের পুরনারী/ গাগরী ভরিয়া এনেছি গো অমৃত বারি।।

পদ্মকুলের আমি পদ্মিনী-বধূ/ এনেছি শাপলা পদ্মের মধু

ঘনবন ছায়ায় শ্যামলী মায়ায়/ শান্তি আনিয়াছি ভরি হেমঝারি।।[১৭]

তিনি মুসলিম নারীকে উৎসাহ দিতে গান রচেছেন:"আমি গরবিনী মুসলিম বালা/ সংসার সাহারাতে আমি গুলে লালা।"[১৮]

নারীর মধ্যে যে মঙ্গলময়ী শক্তি আছে, সেই যে সকল শুভকাজের মূলচালিকা শক্তি, সে কথা বিশ্বাস করতেন নজরুল। যুদ্ধবিগ্রহ, লোভ, খুন, হত্যা, দলাদলি ভেদাভেদ সমাজ পৃথিবীকে অশান্তিপূর্ণ করে তোলে, আর সেখানে নারীই পারে শান্তি নিশ্চিত করতে। নারীই পারে সকল অশুভ অন্ধকারের বিরুদ্ধে মঙ্গলের আলো জ্বালাতে। নারীই পারে পুরুষকে অপ্রেমের পথ থেকে প্রেমের পথে ফিরিয়ে আনতে। নজরুল নারীর এই মঙ্গলময়ী শক্তির উদ্বোধন দেখতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে কারো সহায়তা ছাড়াই একাই আপন রূপে আবির্ভূত হতে নারীকে আহবান জানিয়েছেন নজরুল:

এসো কল্যাণী, চির-আয়ুষ্মতী/ তব নির্মল করে জ্বালো ভবন-দীপ

জ্বালো জ্বালো জ্বালো সতী।।/ মঙ্গল শঙ্খ বাজাও বাজাও অয়ি অয়ি সুমঙ্গলা

সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল কর দূর শুভ সমুজ্জ্বলা

এসো মাটির কুটিরে দূর আকাশের অরুন্ধতি।।[১৯]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে নজরুলের অনেক প্রেমের গানে নারীর যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তা বিচিত্রতর হলেও অনেকটাই গতানুগতিক এবং নারী সম্পর্কে পুরুষের প্রচলিত যে দৃষ্টিভঙ্গি তা তারই প্রতিফলন। এগুলো তাঁর সুচিন্তিত নারীভাবনার পরিচয়বাহী নয়। এসবই বিরহ-মিলন, আবদার-অভিমানসহ প্রেমের নানা দিক ফুটিয়ে তুলতেই পুরুষ নারীর পারস্পারিক সম্পর্ক, মিলন-দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানের বর্ণনার অনুষঙ্গ মাত্র। পুরুষের চোখে নারী কখনো খাঁটি প্রেমিকা, কখনো ছলনাময়ী, কখনো প্রেমময়ী, কখনো বা প্রেমহীনা। তখনকার বাঙালি সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণাও এসবের পেছনে কাজ করেছে।

"এসব গানে নারীর প্রেমিকা রূপই প্রধান হয়ে উঠেছে। নারী কখনো বিরহবিধুর প্রিয়া, কখনো চারু-হাসিনী, বিজন-বাসিনী, মধুভাষিণী, উদাসিনী, কখনো স্নিগ্ধা-শ্যাম-বেণী-বর্ণা, হংসমিথুন আঁকা ঝিলমিল শাড়ি পরা দিগবালিকা, আবার কখনো শ্যামতন্বী-মেঘবরণা, সকরুণ ললিত গোপাললনা।"[২০]

মূলে নজরুলের নারীভাবনা তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন এবং জানতেন যে নারী ও পুরুষ একই উপাদানে তৈরি; উভয়ই সকল প্রকার কাজের জন্য সমানভাবে উপযুক্ত। নজরুলের নারীভাবনা তাঁর সৌন্দর্যচেতনারও একটা অংশ। "(পুরুষ) কবি-শিল্পীর একটি প্রিয় বিষয় নারীর রূপ বর্ণনা। কবি-শিল্পীগণ যুগে যুগে নারী ও প্রকৃতির রূপ সমানভাবেই উন্মোচন ও অঙ্কন করে এসেছেন। নারীর মধ্যে কেউ যৌনাবেদনময়ী রূপ, কেউবা দেবীরূপ দেখেছেন। কিন্তু নজরুল গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে নারীর মধ্যে মূলতঃ আদিশক্তি ও মানবসত্তার নিবিড় সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছেন। তিনি নারীর মধ্যে দেবীর সৌন্দর্য দেখেন নি, তেমনি দেখেন নি সালংকরা পুতুল সৌন্দর্য। তিনি নারীকে অলঙ্কারবিহীনা, নিরাভূষণা দেখতে পছন্দ করেছেন। তাঁর কাছে নারীর সৌন্দর্য ছিল তার ব্যক্তিত্বে, শক্তি ও মানুষী রূপের দীপ্ত প্রকাশে। তিনি নারীর স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারকে দাসত্বের চিহ্ন হিসেবে বর্ণনা করে সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলতে

বলেছেন। তিনি তাঁর কবিতা গানে যেসব নারীর প্রশস্তি রচনা করেছেন (চাঁদ সুলতানা, নুরজাহান, মমতাজ, খালেদা, এমনকি– দেবী শ্যামা, দুর্গা প্রভৃতি) তা তাঁদের ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে, সাহস ও শৌর্যবীর্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই করেছেন, স্থূল দৈহিক সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে নয়। তিনি তাঁর কবিতা গানে তন্বী নারীকে গতানুগতিকভাবে দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে না দেখে তাকে ক্ষুরধার তরবারি (অর্থাৎ শক্তি)-এর প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। নারীর দেবীরূপ বলতে তার রূপযৌবনের নগ্নপ্রকাশ বুঝানো হতো (এখনও হয়), তিনি তা অস্বীকার করে তাঁর অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি রূপ উন্মোচন করেছেন। --------এমনকি তিনি নারীকে সাজাতে যে সব উপকরণ বেছে নিয়েছেন তাও গতানুগতিক নয়। তারার ফুল, রামধনুর সাতরঙের আলতা, চৈতী চাঁদের দুল এসবই নারীর রূপ আর প্রকৃতির রূপকে একাকার করে দেখার গভীর দৃষ্টি বৈ আর কিছু নয়। নজরুল নারীর সৌন্দর্যকে যৌনসম্ভোগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেননি যা দেখেছেন সে সময়ের এবং পরের অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর একটি কবিতায় নারীকে দেবী ও লোভী এবং একজনে তৃপ্ত নয়, যাচে বহুজন বলে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন। তবে সেটা তাঁর আবেগ উৎসারিত বিক্ষিপ্ত খেয়ালী মন্তব্য, তাঁর মূল নারীভাবনার অংশ নয়। 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' আর 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার' ইত্যকার গতানুগতিক পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর সৌন্দর্য বিচারে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কোনটাই তাঁর ছিল না। নজরুল ঐ সোনার কাঁকনকে দাসত্বের চিহ্ন, নারীর ব্যক্তিত্বের অপমান ও নারীর নিজস্ব সৌন্দর্যকে বিদ্রুপ করার সামিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেজন্য নজরুলের কবিতা-গানে নারীর যৌনাত্মক বা সুড়সুড়ি দেয়া দৈহিক সৌন্দর্যের নির্মিতি নেই বললেই চলে। প্রচলিত দৈহিক সৌন্দর্যের বাইরে নজরুলের নারী সৌন্দর্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ফলে নারীর নিবিড় ও অন্তর্নিহিত রূপ-সৌন্দর্যের ব্যতিক্রমী ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর গানে। নারী চিরাচরিত পেলব রমণীয় সৌন্দর্যের পাশে তিনি উন্মোচন করলেন তাঁর 'বহ্নিশিখা' রূপ; সে রূপের তেজে ও পরশে পুড়ে ছাই হতে পারে নারীর বিপক্ষে বৈষম্যমূলকভাবে পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট ও আরোপিত অসাম্য, সংস্কার, আর বিধিনিষেধের আড়ালবেষ্টিত অন্ধকার। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানটি নারীর শক্তিময়ী সৌন্দর্যের শৈল্পিক উদ্ভাসন। অধিকন্তু তিনি বাঙালি নারীর সৌন্দর্য অঙ্কন করতে গিয়ে তার ভেতরের মাধুর্যময়ী, শান্তিময়ী ও সৃষ্টিময়ী রূপের উদঘাটন করেছেন, গতানুগতিক পিনোন্নত বক্ষ, গম্ভীর নিতম্ব, সরু কটিদেশ ইত্যকার স্থূল অঙ্গশোভায় দৃষ্টি আসক্ত করেননি।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের নারীর দুরবস্থাকে পুরুষের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ না দেখে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেহ নাহি দিবে অধিকার।" দুঃখজনক হলেও সত্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার মন্ত্র দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। নারী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুখ্যত গতানুগতিকতার অনুসারী। কিন্তু নজরুল আর সব ক্ষেত্রের মতোই এখানেও চিন্তাচেতনায় বৈপ্লবিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এ থেকে উত্তরণের পথ আছে এবং নারীকেই সে পথ ধরে দৃপ্ত পায়ে এগুতে হবে। তাই তিনি নারীকে পুরুষ-রচিত সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির আগুন জ্বেলে পুরুষ-রচিত নারীবৈরী সকল বিধিবিধানের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এক গানে বলেছেন যে ধর্মের নামে নারীর গায়ে যে বোরকা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তা ঝুটা এবং তার অবসান হতে হবে। তিনি নারীকে তার অবরোধবাসিনীর চিহ্ন মাথার ঘোমটাকে ছিঁড়ে ফেলতে প্রণোদনা দান করেছেন। কারণ, ঐ ঘোমটা নারীর পরাধীনতার শেকল। তিনি নারীকে গায়ের অলঙ্কার-জড়োয়া খুলে ফেলতে বলেছেন। কারণ, ঐ গুলো দাসত্বের শৃঙ্খল।

মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী ভেঙে ফেল ও শিকল
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।[২২]

নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার কেউ দেবে না বলে হা-হুতাশ করে বসে থাকলে তো নারীর চলবে না। আসলে অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। যে অধিকার পুরুষ যুগ যুগ ধরে কেড়ে রেখেছে, যার সাথে জড়িত পুরুষজাতির কায়েমী স্বার্থ, নারী চাইলেই তা পুরুষ ফিরিয়ে দেবে না। নারীর কান্নায় পুরুষের মন গলবে না। অতএব নারীকে জাগতে হবে। তাকে তার আপন শক্তিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হবে যে সে আর পুরুষের দাসী হয়ে থাকবে না। নারীর ভেতরে যে শক্তি আছে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। অশুভকে অন্যায়কে পুড়িয়ে ফেলার যে আগুন আছে নারীর ভেতরে, তাকে দীপ্ত তেজে বিশ্বব্যাপী প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। নারীজাগরণের প্রবল স্রোতে ভেসে যাবে নারীর বিপক্ষে পুরুষসৃজিত বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর বিধিবিধানের যুগসঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ, শাস্ত্রের বাঁধ। পুরুষ-রচিত যে শাস্ত্র, অনুশাসন ও কুপ্রথা নারীকে দাবিয়ে রেখেছে, কল্যাণের নামে, ধর্মের নামে, প্রেমের নামে, সংসারের সুখের বাহানায়, মিষ্টি কথায় নারীকে করে রেখেছে পুরুষের অধীনস্থ ও ভোগের সামগ্রী, সেসবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এগুলো মানবিকতার দাবিও পূরণ করে না। এ সবের মধ্যে রয়েছে মস্ত ফাঁক ও ফাঁকি। সেটা হচ্ছে

পুরুষের বিবেকহীন চালাকি ও গোষ্ঠীস্বার্থপরতা। নারী যদি জানতে পারে আড়ালের সত্যটা, যদি বুঝতে পারে যে তারা জেগে উঠে এসব মানতে সমবেতভাবে অস্বীকৃতি জানালে পুরোনো খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে এসব, তবেই ঘটতে পারে বিপ্লব । নদী আর নারীর প্রকৃতি এক। জহ্নুকন্যা জাহ্নবী বা গঙ্গানদী একদিন তার প্রবল স্রোতের তোড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল দেবতার (সেও পুরুষ) যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ । নদীর (যে নারীও) কাছে পুরুষ ও শাস্ত্রের যুগপৎ পরাজিত হওয়ার এ ঘটনা বা কিংবদন্তী থেকে নারীকে অনুপ্রেরণা নিতে বলেছেন নজরুল। নারীর মধ্যে শাস্ত্রের অন্ধকারকে ভেদ করে সত্যকে দৃশ্যমান করার বিদ্যুৎ শক্তি আছে। নারীকে তার এ সমস্ত ছাইচাপা আগুন ও শক্তির উন্মোচনা ঘটাতে হবে। নারীকে এই লক্ষ্যে চালিত ও অনুপ্রাণিত করতে জ্বালাময়ী বাণী আর তীব্রগতির সুর সহযোগে নজরুল রচনা করেন নারীজাগরণের শ্রেষ্ঠতম বাংলা গানটি, তিনি যার নাম দিয়েছিলেন জাতীয় সংগীত:

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা/ জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টিকা।।
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা/ নেচে চল উন্মাদিনী দিগবসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী/ বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা।।
ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি/ জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী।
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা/ জাহ্নবীসম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা/ চির-বিজয়িনী ওগো জয়ন্তিকা।।[২৩]

নজরুল নারীর ভেতরে অবরুদ্ধ গঙ্গার-স্রোতসম-শক্তির উন্মোচন ঘটাতে আর ছাইচাপা আগুনকে উস্কে দিতে চেয়েছেন এই গানে। তিনি হয়েছেন নারী জাগরণের অগ্নিমন্ত্রদাতা। নজরুলের নারী-জাগরণমূলক ভাবনা এই গানেই শিখরস্পর্শী মহিমা লাভ করেছে।

তথ্যসূচি:

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম: 'নারী', সাম্যবাদী, কবিতাসংগ্রহ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা,
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৬০-১৬২
২. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন: সওগাতের প্রতিষ্ঠাযুগে মুসলিম, নারীর অবস্থা, নারীর কথা, সম্পাদনায়:
আনিসুজ্জামান ও মালেকা বেগম, মুদ্রক,ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ.১৩৪-১৩৫
৩. কাজী নজরুল ইসলাম: 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট', শাহনাজ মুন্নীর 'নারী জাগরণ ও নজরুল -
সাহিত্যে নারী' গ্রন্থে উদ্ধৃত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৭, পৃ.৪৬
৪. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬, গান নং ১৭৬
৫. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ১৯০
৬. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৬৬
৭. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৬৫৮
৮. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৯৯৭
৯. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৩৭
১০. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৩৭
১১. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৫৪১
১২. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ২৮১
১৩. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৫৩২
১৪. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ২৩১৩
১৫. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৩৭
১৬. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ২৯৯
১৭. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৮৫
১৮. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ৯০২

১৯. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ গান নং ১১৬৭

২০. শাহনাজ মুন্নী, 'নারী জাগরণ ও নজরুল -সাহিত্যে নারী' , নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৪৮।

২১. আমিনুল ইসলাম: 'নজরুলের সৌন্দর্যচেতনা: প্রসঙ্গ গান', বিশ্বায়ন বাংলা কবিতা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.৫৫-৪৬

২২. কাজী নজরুল ইসলাম: 'নারী', সাম্যবাদী, কবিতাসংগ্রহ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ.১৬০-১৬২

২৩. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনায়: রশিদুন্ নবী নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬, গান নং ৩৬০

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

‘বিদ্রোহী’ কবিতা: নব্বই পেরিয়ে

মোঃ কামরুজ্জামান*

একটি কবিতার এত উত্তাপ, এত তেজ, এত বিস্ফোরণ, এত নিনাদ, এত দর্পিত অহংকার, এত শক্তি, প্রলয় সৃষ্টির মন্থন, উল্লাস, দ্রোহ, স্পর্ধা, অহম কত প্রসঙ্গ থাকতে পারে বিশ্ব সাহিত্যে এর আগে সম্ভবত এমনটা কেউ দেখেনি। অজস্র বিশেষণের প্লাবন যে কবিতার দিকে ধেয়ে আসে সে কবিতাটির নাম ‘বিদ্রোহী’। কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী নিয়ে যত যুদ্ধ-জঙ্গ, বাদ-বিবাদ, বিসংবাদ, নিন্দা-প্রশংসা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, বিপত্তি হয়েছে, যত প্রিয়তা বিরূপতা হয়েছে আর কোন কবিতার কপালে এত কিছু জোটেনি। নজরুলের সমস্ত সৃষ্টি কর্ম অস্বীকার বা বিনাশ করে ‘বিদ্রোহী’কেই যদি একমাত্র কবিতা হিসেবে স্বীকার করি তবুও নজরুল চির ভাস্বর, পরিপূর্ণ ও চিরন্তন অস্তিত্বে বিরাজ করবেন। এক ‘বিদ্রোহীকে বিনাশ বা অস্বীকার করলে নজরুল হবেন ম্লান, অসম্পূর্ণ, ক্ষণকালের গৌণ অস্তিত্ব। এ কারণে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিয়ে, এর জন্ম মুহূর্ত নিয়ে এর কাব্যমূল্য নিয়ে নানা রকম বিতণ্ডা, বাঙালির আবেগ ও চেতনাকে যতটা আলোড়িত, জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও উৎসুক করে তোলে নজরুলের অন্য সৃষ্টি সম্পর্কে ততটা নয়। ‘বিদ্রোহী’ রচনার পর নব্বই বছর পেরিয়ে গেলেও কবিতাটি তার সৃজন মুহূর্তের আবেদন ও মূল্যমান এতটুকুও কমেনি বরং সময় যত গড়িয়েছে ততই যেন এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদী শক্তির শোষণ নির্যাতন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেওয়া এবং তাদের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নিতে থাকে ঔপনিবেশিক দেশগুলো। তাদের মধ্যেও এক ভয়ংকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নতুন নতুন ভূখণ্ড দখল করে কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশীয় দালাল শ্রেণিরও ব্যাপক প্রসারণ হয় এ যুগেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে দেশীয় ধনিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরই পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকে উপনিবেশের কিছু সংখ্যক মানুষ। তাদের মাধ্যমেই স্বাধীনতার স্পৃহা, অন্যায়-অত্যাচার, উৎপীড়ন-শোষণ, শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান চেতনা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই অনিবার্য দ্রোহ সত্তা লাভ করে। অভিসন্ধিমূলক নানা আইন বিধির নিগড়কে অস্বীকার করে ভারতবর্ষেও অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন সমাজ মানসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। এরই পাশাপাশি অক্টোবর বিপ্লবের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণি সচেতন দলগুলো সশস্ত্র আন্দোলন ও বিপ্লবের ডাকে যারা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ সবই প্রবল আত্মস্বীকরণ শক্তির অধিকারী নজরুলের সত্তাকে উজ্জীবিত করেছিল। নজরুল নিজে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন আজন্ম। সে কারণে দারিদ্র্যের কারণ, অবস্থা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে সোচ্চার ছিলেন। এ ছাড়া নজরুলের দ্রোহসত্তার সৃষ্টিতে জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। আধুনিক বংশগতিবিদ্যা বা জিনতত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে মানুষের জিনের মধ্যে বিন্যস্ত থাকে এমন কিছু চাবিকাঠি যা মানুষের আচরণ ও চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নজরুলের ভেতরেও এটি প্রবলভাবেই ছিল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা অনেক মানুষই তার পারিপার্শ্ব, পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও সবার আচরণের বহিঃপ্রকাশ এক রকম নয়। বিপ্লব সফল করে ফিদেল ক্যাস্ট্রো ক্ষমতায় বসলেন কিন্তু চে গুয়েভারা মন্ত্রিত্ব ছেড়ে মানবমুক্তির মন্ত্রে বিপ্লবের পথকেই বেছে নিলেন। নজরুলে ‘না মানা’ চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর অন্তর্গত জীবসত্তারই বহিঃপ্রকাশ। এ সমস্ত কিছুর সন্নিবেশেই এক সময় মহাবিস্ফোরণের মতই এক অস্থির রাতের কোন এক সময় সৃষ্টি হল ‘বিদ্রোহী’ কবিতা। অগ্নিস্ফূরণের শৈল্পিক সমুন্নতি ঘটেছে কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়। এর মধ্যে দ্রোহ, যন্ত্রণা, প্রেম, সৌন্দর্যবোধ প্রায় সকল মানবিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাঠককে অভূতপূর্ব স্বাদ এনে দেয়।

‘বিদ্রোহী’ কবিতা লেখার নির্দিষ্ট কোন তারিখ পাওয়া সম্ভব হয়নি। কেননা কবিতাটিতে কোন তারিখ লিখিত নাই। এ কবিতাটি সৃজন সময়ের সাক্ষী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেন নি। তবে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রচিত হয়েছিল বলে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। “আসলে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, সব হিসাব খতিয়ে এবং সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে বেরিয়ে আসছে যে এটাই ছিল কবিতাটির রচনার সময়।”[১] তবে তিনি পূর্বে তাঁর ‘কাজী নজরুল প্রসঙ্গে’ গ্রন্থে খানিকটা ভুল

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি ভুলের কারণ এবং এতে যে বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছিল তার দায় ও কষ্ট নিজে কাঁধে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহী লেখার সময় বৃষ্টি হয়েছিল। এ ঘটনা তাঁর স্মৃতিকে প্রতারিত করেছিল। কেননা ডিসেম্বরে সাধারণত বৃষ্টি হয় না। দুর্গাপূজার সময় বৃষ্টি হয়ে থাকে বলে তিনি বলেছিলেন দুর্গাপূজার আগে বা পরে এটি লিখিত হতে পারে। তিনি নজরুলের সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন বলে অন্যান্য লেখক ও জীবনীকার প্রথমে এই ভুল তথ্যকেই সর্বান্তকরণে বিনা সন্দেহে গ্রহণ করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সঠিক সময়টি গ্রহণ করেছেন। "শুধু একটি ঘটনাকে আমি নজরে রেখেছিলাম বলেই আমার এই ভুলটা হয়েছিল। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক কাগজে। সেই সময়ে বৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃষ্টিটাই আমার স্মৃতিতে আটকে ছিল। তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে মনে এসেছিল যে বৃষ্টি হওয়া সম্ভব তো শরৎকালেই। এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গাপূজার আগের কিংবা পরের মাসের কথা উদয় হয়েছিল। সেই সময়ে পুরনো *'বিজলী'* হাতের কাছে পেতাম তবে আমার ভুলটা কিছুতেই হতো না।"[২]

'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিত হয়েছিল ৩/৪ তালতলা লেনের বাড়িতে। ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁ এর নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর দৌহিত্ররা পুরো বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। নিচের দুটি কক্ষ ও উপরে দুটি কক্ষ বাড়িটির। প্রথমে (১৯২১ সালের জুলাই মাসের শেষে অথবা আগস্ট মাসের শুরুতে) নিচের দুটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে কবি ও মুজফ্ফর আহ্মদ থাকতেন। পরে একটি কক্ষ ছেড়ে দিয়ে নিচের তলার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটিতে মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম এক সাথে থাকতেন।

মুজফ্ফর আহ্মদের জবানিতে আমরা জেনেছি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোণের ঘরটিতে রাতে কোন এক সময় লিখেছিলেন। সকালে নজরুল তাঁকে কবিতা শুনিয়েছিলেন। কবির কণ্ঠে তিনিই প্রথম শ্রোতা। কবিতাটি দোয়াত কলমে না লিখে প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিলেন।

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। *মোসলেম ভারতের* কার্তিক (১৩২৮)-সংখ্যায় কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। *'বিজলী'তে* ছাপা হয়েছিল ২২ পৌষ (১৩২৮) -সংখ্যায়। এ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে *মোসলেম ভারতেই* 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়। কিন্তু কার্তিক মাসে কবিতাটি লেখাই হয়নি। লেখা হয়েছিল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অর্থাৎ পৌষের মাঝামাঝি সময়ে। *মোসলেম ভারতের* জন্য পূর্বাহ্নে আফজালুল হক 'বিদ্রোহী' শুনে নজরুলকে দিয়ে কপি করিয়ে নিয়ে যান। পরে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যও একটি কপি নিয়ে যান *বিজলীর* জন্য। অনিয়মিত ও বিলম্বে প্রকাশিত *মোসলেম ভারতের* সেই সংখ্যা প্রকাশিত হয় *'বিজলী'* প্রকাশিত হওয়ার পরে মাঘ মাসে। এরপর যেসব পত্রিকায় এই জনপ্রিয় বিদ্রোহী কবিতা পুনর্মুদ্রণ হয়েছে তার মধ্যে 'প্রবাসী' (মাঘ ১৩২৮), 'সাধনা' (বৈশাখ ১৩২৯), *'দৈনিক বসুমতী'* অন্যতম।

'বিদ্রোহী' কবিতার প্রসঙ্গ এলেই আসে মোহিতলাল মজুমদার ও তাঁর 'আমি' প্রবন্ধের কথা। মোহিতলাল রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় আধুনিকতার নান্দি পাঠ করেছিলেন। সে সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যগত প্রভাব ব্যাপকভাবেই ছিল। কলকাতার সুধী সমাজে তাঁর কর্তৃত্ব বেশ গভীর ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক, কবি এবং প্রধান শিক্ষক। নজরুলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল। স্বভাবগত ভাবেই তিনি অন্যের খুঁত ধরে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, সমালোচনা করতেন কিন্তু অন্যের সমালোচনা সহ্য করতেন না। তাঁর প্রভাব বলয় থেকে কেউ বেরিয়ে গেলেও তিনি সহ্য করতেন না। নজরুলের সাথে তাঁর সখ্যের গভীরতা ভালই ছিল। কিন্তু নজরুল কারো কর্তৃত্বকে পছন্দ করতেন না। 'বিদ্রোহী' কবিতার অসম্ভব জনপ্রিয়তা মোহিতলালের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল। তিনি বলে বেড়াতে শুরু করেছিলেন নজরুল তাঁর 'আমি'র ভাব নিয়ে 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। "পরে তিনি বলা শুরু করেছিলেন যে নজরুল তাঁর লেখার ভাব 'চুরি' করেছে।"[৩] অথচ মোহিতলাল তাঁর 'আমি'র বীজ গ্রহণ করেছিলেন ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' গ্রন্থ থেকে। কিন্তু কখনই তা স্বীকার করেননি। 'অভয়ের কথা', 'আমি' ও 'বিদ্রোহী' এদের মধ্যে ভাবের দিক থেকে বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা গেলেও 'বিদ্রোহী'র প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে বাঙালির ঝঞ্ঝা-রহিত জীবন চেতনায়, কাজী নজরুল ইসলামই অগ্নিদহন সঞ্জাত উত্তাল যৌবন শক্তির সংরাগ স্পন্দিত দ্রোহ শক্তির উদ্বোধন করেছিলেন। শুধু উদ্বোধনই নয় যে উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শী স্পর্ধায় বাঙালিকে সাহস ও শক্তি দিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত তাঁর সমস্পর্ধী হবার বিপুল ব্যাপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় বাংলা সাহিত্যে আর আসেনি। কবির যৌবনকালে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাত ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কারণে রাষ্ট্রে, সমাজে ও ব্যক্তির মধ্যে যে অগ্নিদহনের সূচনা হয়েছিল তার পুরোটাকেই নিজের মধ্যে ধারণ করে সহসাই তিনি আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ঘটিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম সব কিছুর উপরে মানুষকে, মানুষের শুভ, কল্যাণ, প্রেমকে স্থান দিতে পেরেছিলেন বলেই কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা, মূঢ়তা, ভীরুতাকে পদাঘাত করতে,

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। নজরুলের 'বিদ্রোহী'র সাথে অন্য দুটির চেতনাগত দিক থেকেও পার্থক্য প্রকট। সেই সাথে কাব্যিক আবহের যে প্রভাব তা অন্য দুটিতে ছিলই না।

'বিদ্রোহী' কবিতার রচনা ও প্রকাশের পূর্বে বেশ কিছু অসাধারণ কবিতা নজরুলকে পাঠকপ্রিয় করেছিল। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতাই তাঁকে খ্যাতির মধ্যগগনে নিয়ে আসে। তাঁর সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক তাঁকে অন্তর থেকে অভিবাদন করেছেন। তাঁরা আলোড়িত উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত হয়েছিলেন 'বিদ্রোহী' পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নজরুল প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন-

> 'বিদ্রোহী' পড়লুম, ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যে বাণী। .....আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় খ্যাতি অন্য কোন কবি অর্জন করেন নি।[৪]

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখছেন-

> মনে আছে বন্ধুবর কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি কাগজ কোথা থেকে কিনে নিয়ে অস্থির উত্তেজনার সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিলেন। কাগজটা সামনে মেলে দিয়ে বলেছিলেন, পড়। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। রাস্তায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এ কাগজ নিয়ে।"
>
> পড়লাম, কবিতার নাম 'বিদ্রোহী'।
>
> সেদিন ঘরে বাইরে, মাঠে ঘাটে, রাজপথে সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চ কণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে যে কবিতার জ্বলন্ত দীপ্তি এমন তীব্র যে ছাপার অক্ষরেই যেন আগুন ধরিয়ে দেবে।[৫]

নজরুল তখন বাইশ বছরের যুবক। তরুণ সমাজকে 'বিদ্রোহী' দারুণভাবে আলোড়িত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। বিদ্রোহী কবিতা সেদিন নামেই জনপ্রিয় হয়নি। মানুষের অন্তর চেতনায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষী মানুষ সেদিন নিজেদের চিন্তা, সংগ্রামের যথার্থ ভাষা পেয়েছিল 'বিদ্রোহী'র মাধ্যমে। জনগণ পথে ঘাটে মিছিলে মিটিং-এ নজরুলের ওজস্বী ভাষার 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রবল উচ্ছ্বাসে আবৃত্তি করেছে। তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। ১৯৩৪ এর ১৭ আগস্ট তারিখে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, তোমার মেয়ে হয়তো আমার কবিতার চেয়ে নজরুলের কবিতা ঢের বেশি পছন্দ করে সে কারণে আমি তাকে বিন্দুমাত্র কম স্নেহ করিনে।[৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠের প্রতিক্রিয়ায় বললেন —

> তাঁর কবিতা তখন আমাদের বেদমন্ত্র হয়ে উঠেছিল, স্বপ্ন দেখতাম আমাদের রক্ত রাঙানো দুঃখের যাত্রায় তিনি চলেছেন অগ্রগামী যাত্রিক, হাতে তাঁর উদিগ্ন মশাল। বুকের আগুনটাকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখবার অফুরন্ত ইন্ধন যেন পেয়ে গেলাম আমরা।[৭]

'বিদ্রোহী' কবিতার ভাগ্যে স্তুতিবাক্য, প্রশংসাই শুধু জুটেনি। নিন্দা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ, আক্রমণাত্মক কথার শেলও নজরুলকে হজম করতে হয়েছে। *শনিবারের চিঠির* মাধ্যমে সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা নজরুল নিন্দায় বিশেষ অপবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। *'ইসলাম দর্শন'* পত্রিকায় আব্দুল হাকিম, গোলাম হোসেন, সৈয়দ এমদাদ হোসেন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ নজরুলের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

শনিবারের চিঠি'তে নজরুলের 'গাজী আব্বাস বিটকেল' নাম দিয়েছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। এ নামকে উদ্দেশ্য করেই সজনীকান্ত দাস 'ভবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে নজরুলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাকে ব্যঙ্গ করে 'ব্যাঙ' কবিতা লেখেন —

"আমি ব্যাঙ/ লম্বা আমার ঠ্যাং/ ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ।
আমি নাগ শিশু, আমি ফণি মনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরু সাহারার আঁধি।"[৮]

শনিবারের চিঠি বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা (১৩৩১, ৮ই কার্তিক, দ্বাদশ সংখ্যা) বের করে। উদ্দেশ্য নজরুলকে তুলোধুনো করা। এ সংখ্যাতেও 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডির যৌথ রচয়িতা ছিলেন সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু লেখক হিসেবে নাম ছিল শ্রী অবলানলিনীকান্ত হাঁ এম,এ, জেড। তাঁরা লিখলেন —

"আমি বীর ! আমি বীর !!/ ভাবী শ্বশুরের হিসাব খতিয়া
তরুণ বাঙ্গালী-সাগর মথিয়া/ উঠেছি যে আমি নিছক শুদ্ধ ক্ষীর
আমি বীর ! আমি বীর !!/ আমি ভাঙ্গি বেঞ্চি ও চেয়ার
আমি করিনা কারেও কেয়ার/ হৃদি নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলি
লাখ লাখ তরুণীর/ আমি বীর।"

বহুদিন ধরে চলেছিল নজরুলের বিরুদ্ধে *শনিবারের চিঠির* আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা। এতে করে তারা নজরুলের প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির বদলে নজরুলকে আরো গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তুললেন।

ইসলাম দর্শন কার্তিক ১৩২৯ সংখ্যায় আব্দুল হাকিম যতটা সম্ভব অশ্লীলভাবে 'বিদ্রোহী'র প্যারডি 'বিদ্রোহী দমন' নামে প্রকাশ করেন–

"ওগো বীর–/ অসংযত বিদ্রোহী অধীর/ তুমি বেল্লিক বেঈমান
তুমি নমরুদ, তুমি ফেরাউন, তুমি খোদাদ্রোহী শয়তান/ তুমি কুলবধূর বস্ত্রাপহারী– দুর্নীতি দুঃশাসন
তুমি দেশের লাঞ্ছনা জাতির গঞ্জনা সমাজের অপমান/ ওরে বিদ্রোহী বেঈমান।"[৯]

ইসলাম দর্শনের অগ্রহায়ণ ১৩২৯ এ মো: গোলাম হোসেনের প্রলয়ের ভেরী নামে প্যারডি প্রকাশিত হয়। নিম্নে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল–

"তুমি অহংকার মত্ত ইবলিস।/ তুমি রুদ্র পিশাচ শয়তান খাবিস।
তাই আপনারে ছাড়া কাহারে তুমি কর না কুর্নিশ।/ .....
তুমি শত্রুর সাথে গলাগলি করে মৃত্যুর সঙ্গে ধর পাঞ্জা।/ বলি মাঝে মাঝে অভ্যাস আছে খাওয়া কি গাঞ্জা?
তাই নেশার জোরে, মহাঘোরে, হও সাইক্লোন ঝঞ্ঝা।"[১০]

এভাবে নানাদিক থেকে নজরুলকে আক্রমণ করা হয়। তার কারণ প্রায় হঠাৎ করেই অতি-তরুণ একজন কবি অসম্ভব জনপ্রিয় হওয়াতে অনেকেই ঈর্ষাতুর হয়েছিলেন- কেউ ব্যক্তিগত কারণে, কেউ কোন কবির অনুসারী হওয়ার কারণে, কেউবা গোষ্ঠীগত কারণে। তারপরেও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা ক্রমোজ্জ্বল হয়ে সকল প্রকার রাহুমুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্য গগনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃজন প্রকৃতির বৈভব ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জীবন ও প্রাণ শক্তির উল্লাস, আত্ম সমুন্নতির স্পর্ধা, সমস্ত জগতের উপরে ব্যক্তি মানুষের অধিষ্ঠান, সারা জীবন কবি তারই জয় ঘোষণা করেছেন। মানবতার বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর বিপক্ষে তিনি দ্রোহসত্তা নিয়ে লড়াই করেছেন জীবনব্যাপী। দারিদ্র্য, ভেদবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, অন্যায়, শোষণ, শাসন, পরাধীনতা, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কবি শত প্রহরণহস্ত। সমস্ত অপশক্তির বিনাশ ঘটিয়েই প্রেম, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, স্বাধীনতার মানবিক জগৎ সৃজনে তিনি সৃষ্টিমত্ত হয়েছিলেন।

'বিদ্রোহী' কবিতা উপর্যুক্ত ভাষ্যেরই যেন সংহত রূপ। তাঁর সৃজন প্রতিভা যত বিচিত্র ও দিক প্রসারী হয়েছে তারই অগ্নিবীজ নিহিত রয়েছে বিদ্রোহী কবিতায়, আর সে কারণেই নজরুল ও 'বিদ্রোহী' কবিতা বাঙালির কাছে প্রায় সমার্থক।

'বিদ্রোহী' কবিতাটির মধ্যে বিদ্রোহাত্মক বৈশিষ্ট্য নেই বলে অনেকেরই ধারণা। অনেক সমালোচকই বলে থাকেন কবিতাটি কবি চিত্তের উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ। "বিদ্রোহী কবিতাটি প্রধানতঃ কবিচিত্তের উল্লাসের প্রকাশমূলক কবিতা। এই কবিতায় নানা ভাবনা রূপায়িত হইলেও ইহার অনেকটা অংশ জুড়িয়া কবির চিত্তের উল্লাসের দিকটি বিরাজিত।"[১১] প্রাবন্ধিক সমালোচক কাজী আব্দুল ওদুদ বলেন, "কবির প্রায় ২৩ বৎসরের বিপুল সাহিত্য সাধনার উপর চোখ বুলিয়ে মনে হয়েছে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকৃতই কোন বিদ্রোহীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনা এক অভূতপূর্ব আত্মবোধ– সেই আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় কবি উচ্চকিত প্রায় দিশাহারা। এর মনে যে ভাব সেটি এক সুপ্রাচীন তত্ত্ব, ভারতীয় 'সোহম', 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'যত্রজীব তত্রশিব' প্রভৃতি বাণীতেও তা ব্যক্ত হয়েছে, সুফীর 'আনাল হক' বাণীতেও সে তত্ত্ব রয়েছে।[১২]

কিন্তু আত্মজাগরণ ছাড়া, আত্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রবল বেগ সঞ্চারিত না হলে দ্রোহসত্তা লাভ করা যায় না। সাদামাটা অর্থে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলোকে ধরলে নানা অসংগতি চোখে সহজেই পড়ে। আত্মবোধ বা আত্মউল্লাস চিরনিপীড়িত বঞ্চিত সুপ্ত ব্যক্তিত্বেরই আত্মবিদ্রোহ। আধুনিক মানুষের আত্মিক বিদ্রোহ বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর বিদ্রোহের অনিবার্য প্রকাশ।

হাজার বছরের দাসত্ব শৃঙ্খলে উৎপীড়িত মানব জাতির ক্রান্তিকালের আত্মঘোষণার বাণী উৎসারণই বিশেষ অর্থে প্রবল বিদ্রোহ। নিজেকে শক্তিমান মানুষ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারা, প্রবলভাবে নিষ্পেষিত আগ্নেয় গিরির মত চৈতন্যের উদগীরণ বিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হুইটম্যানের Song of Myself-এর আমির ব্যাপ্তি উচ্চতর মতই বিশ্বমানবের জাগরিত দ্রোহ বিদ্রোহী কবিতার প্রাণশক্তি, কবিতাটি ১৩৯টি পঙক্তির মধ্যে 'বিদ্রোহী' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে 'আমি' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে ১৪৪ বার। এই 'আমি'ই দ্রোহের মূল উৎস। "আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।"[১৩] ঐশ্বর্যের কারণে যারা ঈশ্বরতুল্য, যারা শোক-তাপ হেনেছে মানুষের বুকে সেই বিধির বক্ষ ছিন্নভিন্ন করতে যে বলিষ্ঠ নবজাগ্রত, বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তা-ই 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট।

'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার অব্যবহিত সময়ের নিন্দা-প্রশংসা, আক্রমণ–উচ্ছ্বাসের উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ নব্বই বছর পরে আপন শক্তি ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এর বক্তব্য বিষয়, আবেগের সংরাগ ও শৈল্পিক আবেদন শুধু অক্ষুণ্নই থাকেনি তা আরো প্রথিত ও ঋদ্ধ হয়েছে। সর্বশ্রেণির পাঠকের চেতনায় অগ্নিমশাল হয়ে প্রজ্বলিত ও দীপ্যমান। মানব মুক্তির জন্য জীবন, যৌবন, ব্যক্তিত্বের যে বলিষ্ঠতা, যে আতিশয্য, গ্রহণযোগ্য 'অহম' বোধের আস্থা, চিত্তের যে উল্লাস বর্তমান ও অনাগত মানুষ এখান থেকেই তার আগুন ও আলো দুই-ই নিচ্ছে এবং নেবে। দীর্ঘ নয় দশক পেরিয়ে গেলেও পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ফিরে ফিরে আসতে হবে 'বিদ্রোহী' কবিতার কাছে, তার সমস্ত মানবিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য, দিক নির্দেশনার জন্য।

তথ্যসূচি :

---

[১] কাজী নজরুল ইসলা: স্মৃতিকথা- মুজফ্ফর আহমদ, সেপ্টেম্বর- ২০০৯, এন,বি,এ, পৃ. ১২২।
[২] পূর্বোক্ত পৃ. ১২২।
[৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।
[৪] কালের পুতুল, পৃ. ১৫০, ১৯৪৬। বাংলা সাহিত্যে নজরুল- আজহার উদ্দীন খান, সুপ্রিম পাবলিশার্স- ২০০৪।
[৫] নজরুল প্রসঙ্গে: নজরুল সন্ধ্যা ১৯৬৯। বাংলা সাহিত্যে নজরুল- আজহার উদ্দীন খান, সুপ্রিম পাবলিশার্স- ২০০৪, পৃ. ৮৩।
[৬] চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, পত্র ১৪৭, পৃ. ২৫৯। বিশ্বভারতী।
[৭] জৈষ্ঠ্যের ঝড়, ১৩৭৬, বাংলা সাহিত্যে নজরুল- আজহার উদ্দীন খান, সুপ্রিম পাবলিশার্স- ২০০৪, পৃ.৮৪।
[৮] বাংলা সাহিত্যে নজরুল, । বাংলা সাহিত্যে নজরুল- আজহার উদ্দীন খান, সুপ্রিম পাবলিশার্স- ২০০৪, পৃ. ৮৬
[৯] বাংলা সাহিত্যে নজরুল আজহার উদ্দীন খান। ২০০৪, সুপ্রীম পাবলিসার্স, পৃ. ৮৭-৮৮।
[১০] বাংলা সাহিত্যে নজরুল আজহার উদ্দীন খান। ২০০৪, সুপ্রীম পাবলিসার্স, পৃ. ৮৭-৮৮।
[১১] নজরুল কাব্য পরিচয়, শ্রীমধুসূদন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪২
[১২] কবি নজরুল, কাজী আব্দুল ওদুদ, সংস্কৃতি পরিষদ, ইণ্ডিয়ানা ১৯৫৭, পৃ. ২৩।
[১৩] নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১০।

গ্রন্থপঞ্জি:

ক. নজরুল-চর্চা, নারায়ণ চৌধুরী, মুক্তধারা, ২০০৭।
খ. নজরুলের অগ্নিবীণা, আবুল কাশেম চৌধুরী, সিটি লাইব্রেরী, ১৯৬৮।
গ. কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহমদ, এন, বি,এ, ২০০৯।
ঘ. বাংলা সাহিত্যে নজরুল, আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিসার্স, ২০০৪।
ঙ. নজরুল কাব্য পরিচয়, শ্রীমধুসূদন বসু, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪২।
চ. নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১০।
ছ. নজরুল ইসলাম: কবিমানস ও কবিতা, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১৯৯৩।
জ. শতকথায় নজরুল, সম্পাদনায় কল্যাণী কাজী, সাহিত্যম, ২০০৭।
ঝ. নজরুল স্মৃতি, বিশ্বনাথ দে সম্পদিত, সাহিত্যম, ১৯৮৭।
ঞ. কলকাতা নজরুল, ডা. শঙ্কর কুমার নাথ ও তারকনাথ ঘোষ, কলোরাডো বুক হাউস, ২০০৫।
ট. নজরুল- সাহিত্য বিচার, শাহাবুদ্দীন আহমদ, মুক্তধারা, ১৯৭৬।
ঠ. নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, সম্পা: মনিরুজ্জামান, ত্রয়োদশ সংকলন, পৌষ, ১৩৯৮।
ড. নজরুল নির্দেশিকা, রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
ঢ. নজরুল ইসলামের কবিতা, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৩।
ণ. নজরুল-চরিতমালা, ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।
ত. নজরুল কাব্যসমীক্ষা, আতাউর রহমান, শুভ্রা প্রকাশনী, ১৯৯৭

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

নজরুলের মৃত্যুক্ষুধাঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী*

সারসংক্ষেপঃ বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল। পরাধীন ভারতবর্ষে বাঙালির জাতীয় জাগরণে তাঁর অবিসংবাদিত ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও গান সমকালে মুক্তিকামী জনতার নিকট ছিল প্রেরণার উৎস। শুধু তাই নয় নজরুলের প্রবন্ধ-সাহিত্যের কষাঘাতেও ইংরেজ শাসকের ভিত কেঁপে ওঠে। কিন্তু অনেক সমালোচক তাঁর কথা-সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমরা জানি, যে কোন শিল্পের গাঠনিক কাঠামো আলোচনার দ্বারা ঐ শিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের গঠন কাঠামো আলোচনার মাধ্যমে এর শিল্প-সফলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানই প্রতিপাদ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

পরাধীন ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব। সমকালে শাসক ইংরেজের দুঃশাসন-শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন–প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীজির অহিংস-আন্দোলনের প্রবর্তন, জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ড, স্বদেশী আন্দোলন, খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন–প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ। সেই সাথে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার, অসাম্য, সংস্কার-কুসংস্কার, ঘৃণা-লোভ-হিংসা প্রভৃতিতে বিপর্যস্ত যখন সাধারণ বাঙালি সমাজ, তখন বাংলা কাব্যে নজরুলের আবির্ভাব প্রমিথিয়ূসের মত। তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে আখ্যাত। ওই-বিদ্রোহী কবি-সত্তার সূত্র ধরেই তিনি আবার নিপীড়িত-শোষিত জনের বন্ধু, বাংলা কবিতায় প্রথম সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার পথ-প্রদর্শক, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের একজন সার্থক বাণীবাহক, দেশপ্রেমের এক প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা, সর্বোপরি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এক অকৃত্রিম উদ্গাতা।[১] শুধু কাব্য ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা গদ্য-সাহিত্যেও নজরুলের প্রতিভা অসাধারণ। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি শিল্প-আঙ্গিকেও তাঁর দক্ষতা ও পারদর্শিতা বিশেষভাবে স্বীকার্য।

নজরুল রচিত উপন্যাসের সংখ্যা তিনটি—*বাঁধনহারা* (১৩৩৪), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৩৩৭) ও *কুহেলিকা* (১৩৩৮)। *বাঁধনহারা* পত্র উপন্যাস। কাব্যের ন্যায় *মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা* উপন্যাসেও নজরুলের সাহিত্য-মানসের সার্থক প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট। কাহিনীর সুবিন্যস্ত বিনির্মাণ কৌশল, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা, ভাষাশৈলী ব্যবহারের পারঙ্গমতা, সমাজের ক্লেদাক্ত রূপ ও সমকালীন রাজনীতির বিশেষ খণ্ড-চিত্র অঙ্কন, নামকরণ, দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্য প্রভৃতিক্ষেত্রে নজরুলের প্রতিভা নিরূপণের মাধ্যমে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের শিল্পমান নির্ণয় করা সম্ভব। প্রতিপাদ্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আলোকপাত করে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

এক.

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায়, কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে বাস করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মুসলমান আর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দেশি কনভার্ট ক্রিশ্চান। হিন্দুও আছে কয়েক ঘর। মাথার ওপরে টেরির মত এদের মাঝে দু'চার জন 'ভদ্দর নুকও' আছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এরা দিনমজুর খাটে। বিধাতার দেয়া ছেলে-মেয়ে বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে এরা নাক ডেকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয়। সামান্য ছুঁয়া-ছুঁয়িতেই এদের ঝগড়া বাধে। মুসলমান পক্ষে গজালের মা আর ক্রিশ্চান পক্ষে হিড়িম্বা, মূলত দু'জন দুপক্ষ লীড করে। আবার বন্ধুত্বও এদের পাকা রকমের। রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে এরা ঝগড়া করে আবার একের বিপদে অপরে সাহায্য করে, চোখের জলও ফেলে।

গজালের মায়ের সংসারে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অভাব-মৃত্যু যেন চিরসাথী। তার তিন সন্তানের মৃত্যু তাকে করেছে চরম দুর্দশাগ্রস্ত। ছেলেরা নেই, আছে বিধবা বড়-বৌ, মেজ-বৌ ও সেজ-বৌ; আরও আছে বেশ কয়েক জন নাতি-নাতনি। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছোটছেলে প্যাঁকালে। সামান্য আয়ে গজালের মায়ের সংসার চলে না, তাই নিজে এবং বউরাও ঢেঁকিতে চালভানাসহ বিভিন্ন রকম কাজ করে সামান্য উপার্জন করে। তাতেও সংসার চলে না তার। এ বাড়ির মেজ-বৌ সমস্ত সংসার যেন আগলে রাখে। সেজবৌ ও তার সদ্য প্রসূত সন্তান চরম অসুস্থ। অথচ তার জন্য ঔষধ কেনার সামর্থ্য নেই তার। মেজ-বৌ-এর চরিত্র রহস্যময়, চরম অভাব ও দুঃখ-কষ্টেও সে হাসতে পারে। দেখতে সুন্দরী, তাই শাশুড়ির আশঙ্কা একদিন মেজ-বৌ নিকে করবে।

গজালের মায়ের ছোট ছেলে প্যাঁকালে থিয়েটারে সখি সাজে, নাচ ও গান করে। সে সামান্য আয় করে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। টেরি করে চুল কাটে। কিন্তু চার আনা দামের একটি আয়না কেনার সামর্থ্য নেই তার। একে সমস্ত সংসারের ব্যয় তার উপর, পরন্তু গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার মত সন্তানসম্ভবা ছোট বোন পাঁচিও তাদের সংসারে এসে আশ্রয় নেয়। পাঁচির প্রসব বেদনা উঠলে পাড়ার খ্রিস্টান দাই হিড়িম্বাকে ডাকতে বাধ্য হয় গজালের মা। হিড়িম্বাও পূর্বের ঝগড়া ভুলে তার ডাকে সাড়া দেয়। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে সমস্ত সংসারটা আকুলি-বিকুলি করে কিন্তু গজালের মা, বড়-বৌ, মেজ-বৌ কেউ তাদের মনোবল হারায় না। পাশের দারোগা বাবুর বাড়ি থেকে প্রাপ্ত বিড়াল খাওয়া দুধ ও সামান্য খুদকুড়া দিয়ে ক্ষীর রান্না করে মেজ-বৌ বড়ির সদস্যদের খাইয়ে বাঁচাতে চায়। এদিকে সেজবৌ-এর অসুস্থতা চরম রূপ লাভ করে। তার কোলের শিশুটির অবস্থা আরও করুণ। মায়ের হাড়জিরজিরে স্তন থেকে এক ফুটা দুধ পায় না মৃতপ্রায় শিশুটি। আবার দুধ কিনে খাওয়ানোর মত পয়সাও নেই তাদের। সেজবৌর অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হলে পাড়ার ন'কড়ি ডাক্তারকে তার বাড়িতে বিনা পয়সায় চুনকাম করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্যাঁকালে তাকে ডেকে আনে। কিন্তু চিকিৎসায় মনোযোগের চেয়ে মেজবৌর প্রতি তার দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ হয়। সেজবৌর অবস্থার উন্নতি হয় না। মেজ-বৌ-এর প্রতি পাড়ার ডেকরা তরুণদেরসহ নজর পড়ে তার ভগ্নিপতি ঘাসু মিঞার। সে চামড়ার ব্যবসা করে অনেক টাকার মালিক হয়েছে। বড় বউ বেঁচে থাকতেই সে বিয়ে করতে চায় মেজ-বৌকে। কিন্তু সে সুকৌশলে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এতে শাশুড়ি খুশি হয়। মেজ-বৌকে সে কিছুতেই অন্যের ঘরে যেতে দিতে চায় না। প্যাঁকালের সাথে বিয়ে দিয়ে তাকে এ বাড়িতেই রাখতে চায়। কিন্তু প্যাঁকালে এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয় না। কারণ সে ভালবাসে কুর্শিকে। পুকুর ঘাটে পাড়ার খ্রিস্টান মেয়ে কুর্শির নিকট স্পষ্ট করে ভালবাসার কথা ব্যক্ত করে প্যাঁকালে। সেও তার ভালবাসায় সাড়া দেয়। কিন্তু রোতোর সাথে কুর্শির রহস্যময় আচরণ ও মেজ-বৌ-এর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবের ফলেই সম্ভবত প্যাঁকালে নিরুদ্দেশ হয়। ঘরে-বাইরে মেজ-বৌ ও কুর্শির হৃদয়ে ওঠে আত্মক্রন্দন। একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানের নিরুদ্দেশ হওয়ার ফলে গজালের মায়ের সংসারে নেমে আসে গভীর সংকট ও হতাশা।

বেশ কিছুদিন আগেই খ্রিস্টান মিশনারি থেকে সেজবৌকে চিকিৎসা দিতে এগিয়ে আসে পাদরি সাহেব ও মিস্ জোন্স। তারা যত্নের সাথে চিকিৎসা করে, মেজ-বৌও প্রাণপণ তাকে ও তার সন্তানের সেবা করতে থাকে, কিন্তু ঔষধ ও পথ্য দিতে পারে না ঠিক মত। শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় না সেজবৌ ও তার সন্তানকে। মেজবৌ আর এই পরিবারটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এগিয়ে আসে মিস্ জোন্স। কষ্ট-বেদনা আর হতাশায় লীন মেজ-বৌকে লেখাপড়া শেখানোর প্রস্তাব দেয় মিস্ জোন্স। প্রস্তাবে রাজি হয় মেজ-বৌ, কিন্তু সন্তানদের নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। মিস্ জোন্স সন্তানদের নিয়ে মিশনারিতে গমনের অনুমতি দিলে শুরু হয় মেজ-বৌ-এর জীবনের নতুন অধ্যায়। সকলের মধ্যে কানাঘুসা শুরু হয়। একদিন মেজ-বৌ তার সন্তানদের নিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। পাড়ায় প্রচণ্ড হৈচৈ পড়ে যায় ।

চাঁদ-সড়কের নতুন আগন্তুক বিপ্লবী আনসার। সরকারি চাকুরে নাজির সাহেবের বাসায় উঠেছে সে। নাজির সাহেবের স্ত্রী লতিফার খালাতো ভাই আনসার। দীর্ঘ পনের বছর পর আনসারকে পেয়ে ভীষণ খুশি লতিফা। আনসারের এক অনিশ্চিত জীবন। আত্মীয়-পরিজন ও নিশ্চিত সুখ ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সে বেছে নিয়েছে বিপ্লবী জীবন। শুধু তাই নয়, সে তার একান্ত প্রিয়জন রুবির ভালবাসা ত্যাগ করে দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আনসার কৃষ্ণনগরের গাড়োয়ান-কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রি, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণি-পেশার মানুষের মুক্তির ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়। মেজ-বৌ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে চাঁদ-সড়কে সৃষ্ট হৈচৈ-এ আনসারও আলোড়িত হয়, তার মধ্যেও দেখা দেয় অস্থিরতা। মসজিদের মোল্লা সাহেবেও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তিনি রীতিমত বাহাসের আয়োজন করেন। আর ঐ বাহাসের খরচ যোগাতে গজালের মায়ের শেষ সম্বল ছাগলগুলো বিক্রি করতে হয়। আনসার মেজ-বৌ-এর সাথে দেখা করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, সে নিজে খ্রিস্টান হতে চায় নি, বরং সমাজ তাকে খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেছে। মেজবৌ-এর সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বে বিস্মিত, মুগ্ধ আনসার। তাকে মেজবৌ আগেই দেখেছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে, বাড়ির পাশ দিয়ে দৃপ্ত পায়ে হাঁটার সময়। তখন থেকেই এই আগন্তুকের প্রতি অনুভূত হয় বিশেষ আকর্ষণ। আজ তাকে দেখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও বেড়ে যায়। তাই সে অসঙ্কোচে আনসারকে জানায় যে কোন প্রয়োজনে যেন তাকে কাজে লাগানো হয়। মেজ-বৌ-এর সাথে সাক্ষাতের পর আনসারের মনে এক ধরনের বেদনাবোধের জন্ম নেয়। 'এ-বেদনবোধ শুধু ভাবের নয়, আইডিয়ার নয়, এ-বোধ প্রেমের, ভলোবাসার।'[২]

পরদিন মেজ-বৌ লতিফার বাড়িতে এসে আনসারকে জানায়, তাকে বরিশাল মিশনারিতে পাঠানো হবে। আনসার তাকে আবার মুসলমান হয়ে স্বধর্মে ফেরার ইঙ্গিত করে আলাদা ঘর করে দিতে চাইলে মেজ-বৌ রাজি হয় না। অবশ্য তার পরদিনই আনসারকে ধরার জন্য নাজির সাহেবের বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। সমস্ত কৃষ্ণনগরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গাড়োয়ান-কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রি, কুলি-মজুর, মেথর, মুচি, কামার-কুমোর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দলে দলে ভিড় করে নাজির সাহেবের বাড়ির সামনে। কারণ আনসার তাদের বাবা, মুক্তির ত্রাণকর্তা। তারা তাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না। এ হেন পরিস্থিতিতে পুলিশ আনসারকেই দায়িত্ব দেয় তাদেরকে শান্ত করতে। সে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে শান্ত করে এবং পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানায়। জনগণ মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলে গেলে পুলিশ তাকে নিয়ে যায়। পরদিন প্রত্যূষে রানাঘাট স্টেশনে ট্রেন বদলের সময় আনসার মিস্ জোন্সের নিকট জানতে পারে প্যাঁকালে খ্রিস্টান হয়ে কুর্শিকে বিয়ে করেছে এবং মেজ-বৌসহ তাদের বরিশাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মেজবৌ ও প্যাঁকালে চলে যাবার পর গজালের মায়ের সংসারে ঘনিয়ে আসে মহাদুর্যোগ। তার নাতি-নাতনি আর বড়বৌকে নিয়ে গভীর সংকটে নিপতিত হয় সে। তার ক্ষুধার্ত নাতি-নাতনিদের মুখে সে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে ব্যর্থ হয়। নিজেও অনাহারে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। আবার মেজ-বৌ-এর ছেলে প্রচণ্ড টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা ও পথ্যের যোগান দিতে পারে না। ফলে প্যাঁকালের ঠিকানায় মেজ-বৌ-এর নিকট চিঠি লেখা হয়। এদিকে আনসারের প্রেমিকা রুবির বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হামিদ সাহেব কৃষ্ণনগরে বদলি হয়ে আসে। দীর্ঘদিন পর রুবিকে কাছে পেয়ে লতিফা ভীষণ খুশি। বাবা-মায়ের সম্মান রক্ষার্থে রুবি বিয়ে করে জনৈক মোয়াজ্জেম হোসেন নামক একজন আই.সি.এস পরীক্ষার্থীকে। কিন্তু বিয়ের রাতে গাঁথা মালা সে বিধবা হওয়ার পরেও আনসারকেই দান করেছে। আবার লতিফার নিকট আরও দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে রুবি আনসারকে তখনও গভীরভাবে ভালবাসে। আনসারও তাকে ভালবাসে এ সত্যটি লতিফার নিকট জেনে 'রুবির বুক ভরে উঠল। শুধু এই একবিন্দু শিশিরের প্রতীক্ষাতেই যেন সে তার তৃষ্ণার্ত মুখ তুলে অনির্দ্দেশ শূন্যের পানে তাকিয়ে ছিল।'[৩]

এদিকে বাড়ি থেকে পাওয়া চিঠি পড়ে মেজবৌ বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। প্যাঁকালে ও কুর্শিসহ সে কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে চলে আসে। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়। মেজবৌ-এর ছেলে ও শাশুড়ি অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়। পাড়ার লোকের নিকট মেজ-বৌ রাক্ষুসী। শোকে-দুঃখে পাথর, সে কাঁদতে পারে না। লালপেড়ে শাড়ি পরে সে, কপালে টিপ দেয় এবং পান খেয়ে পাড়া বেড়ায়। কেউ বলে মেজ-বৌ পাগল হয়েছে, কেউ বলে রসের পাগল। ছেলের মৃত্যুর চল্লিশ দিনের দিন মেজ-বৌ পাড়ার ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে চায়। কিন্তু সে যে খ্রিস্টান, তার হাতের রান্না খাবে কে? তাই পাড়ার মোড়ল সাহেব তাকে পুনরায় মুসলমান হতে ইঙ্গিত করে। মেজ-বৌ তার খোকার আত্মার শান্তির জন্য, তার চিরকালীন ক্ষুধা নিবারণের আশায় যে কোন মূল্যে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবেই। তাই আবার সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারপর 'পাড়ার প্রায় শতাধিক ক্ষুধাতুর শিশুকে পরিপাটি করে মেজ-বৌ খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় করে যখন লতিফার বাড়ি এসে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে রুবির প্রকাণ্ড মোটরকার দাঁড়িয়ে।'[৪]

লতিফা ও রুবির সাথে মেজ-বৌ আলাপকালে তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে। রুবি বোঝে এ এক অন্যরকম মেজ-বৌ। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা যেন মৃত খোকাকে ঘিরে। পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের সে পড়ালেখা শেখাতে চায়। তাই সহযোগিতা কামনা করে রুবির বাবার। রুবি নিজেও সহযোগিতা করতে চায়। রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল থেকে আনসার পত্র লিখেছে লতিফাকে। মেজ-বৌ তার পত্রপাঠে জানতে পারে, সে 'টিউবার কিউলসিসের জার্ম্' দ্বারা আক্রান্ত। এ রোগে নিশ্চিত মৃত্যু। তাই ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুক্তির পর সে ওয়ালটেয়ার সমুদ্রসৈকতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে। এ খবরে মেজ-বৌ-এর ফ্যাকাসে মুখ দেখে রুবি ঈর্ষায় জ্বলে উঠে জানতে চায়, সে তার সাথে সেখানে যাবে কি-না। দু-মাস আগে হলে মেজ-বৌ কি করতো জানে না, কিন্তু এখন সে নিজের খোকাকে হারিয়ে খোকাদের পেয়েছে, এখন তার সে ইচ্ছে নেই। রুবি তার কথায় ওয়ালটেয়ারে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ওয়ালটেয়ার থেকে লতিফার নিকট পাঠানো রুবির পত্র থেকে জানা যায়-সর্বস্ব ত্যাগী, কঠোর-সংযমী, দৃঢ়-প্রত্যয়ী, দেশ-প্রেমিক, বিপ্লবী আনসার মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে প্রহর গুনছে। এর আগে তার আবেদনে সাড়া দিয়ে রুবিও মৃত্যু জীবাণু ধারণ করে। কারণ সেও মৃত্যুর মাধ্যমে তারার দেশে, 'নতুন প্রেমে, নতুন জীবন' লাভ করতে চায় তার বন্ধুর সাথে। চিঠির শেষ প্রান্তে আনসার সম্পর্কে সে বলে, 'কত বড়, কত বিপুল জীবন নিয়ে সে জন্মেছিল-আর কি দুঃখ নিয়েই না গেল! রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে সে এসেছিল-সে গেল ভিখারির মত,-নিরণ্ন, নিঃসহায়, নির্বন্ধু-একা।'[৫] সাগরের মত যার প্রাণ-তার ইচ্ছাতেই তাকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিবে রুবি।

দুই.

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার চরিত্রের সমন্বয়ে *মৃত্যুক্ষুধার* কাহিনী আবর্তিত। গজালের মা, হিড়িম্বা, পুটের মা, খাতুনের মা, প্যাঁকালে, মেজ-বৌ (হেলেন), বড়-বৌ, সেজ-বৌ, পাঁচি, কুর্শি, ন'কড়ি ডাক্তার, ঘাসু মিঞা ওরফে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ, ক্রিশ্চান পাদরি, মিস জোন্স, নার্স, রোতো, নাজির সাহেব, আনসার, লতিফা (বুঁচি), রুবি, মিনতি প্রভৃতি নিম্ন ও উচ্চবিত্ত চরিত্রের দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্য, উত্থান-পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতে বিনির্মিত *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের জীবনভাষ্য। উপন্যাসের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলো কাহিনীর গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে উজ্জ্বলন্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে মেজ-বৌ, আনসার, রুবি ও লতিফা উল্লেখ্যযোগ্য। বিশেষ করে মেজ-বৌ চরিত্রটি উপন্যাসের দীর্ঘ পরিসরে পরিব্যাপ্ত। মেজ-বৌ গজালের মায়ের মেজ ছেলে সোভানের বিধবা স্ত্রী। গজালের মায়ের চরম দারিদ্র্যের সংসারে এক মমতাময়ী দুঃখী নারী মেজ-বৌ। নিজের ক্ষুধা-যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে সে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়, সেবা করে। বাড়ির সবার প্রিয় মেজ-বৌ-এর উপর সবাই ভরসা করে, ভয়ও পায়। দারোগা মির্জা সাহেবের বেড়ালে খাওয়া দুধ এবং মুরগির বাচ্চার খুদগুড়া দিয়ে চিনি বিহীন ক্ষীর রান্না করে মেজ-বৌ বাড়ির সবাইকে খাওয়ায়, কিন্তু নিজের ভাগে কিছুই রাখে না। তার ছোট ছেলে ক্ষীররাতে তার বাবা আসবে কিনা জানাতে চাইলে মেজ-বৌ কেঁদে অস্থির হয়। আবার শাশুড়ির সান্ত্বনায় মেজ-বৌ গুনগুনিয়ে গান করে। "শাশুড়ি বলে, আ মলো যা! ছুঁড়ি যেন দিনকে দিন কচি হয়ে উঠছে। যখনই কান্না, তখনই হাসি।"[৬] মেজ-বৌ অপূর্ব সুন্দরী অথচ রহস্যময়ী এক নারী চরিত্র।

বাড়ির সেজ-বৌর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হলে পাড়ার ন'কড়ি ডাক্তার বৈঠকখানায় বিনা পয়সায় চুনকাম করে দেয়ার শর্তে প্যাঁকালের ডাকে তাদের বাড়িতে আসে। কিন্তু মেজ-বৌকে দেখে তার নাড়ি চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাক্তারের এহেন অবস্থায় মেজ-বৌও রহস্যময় হাসি হাসে। "মেজ-বৌর রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও-সোনা যেন এতটুকু মলিন হয় নি। বর্ষা-ধোয়া চাঁদনির মত আজও ঠিকরে পড়ছে রূপ।"[৭] মেজ-বৌ গান করে, কিন্তু তা যেন গান নয়, বুক ফাটা কান্না:

"কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম/ মানিক পাবার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল/ অভাগিনীর কপাল দোষে।"[৮]

রহস্যময় আচরণের পাশাপাশি এক অপূর্ব মমতাময়ী নারীর স্বরূপ ফুটে উঠেছে তার চরিত্রে। তাই সে অসুস্থ সেজ-বৌ ও তার সদ্যপ্রসূত শিশুকে বোনের আদরে ও মায়ের মমতায় সেবা করে, সান্ত্বনা দেয়।

শাশুড়ির ভয় মেজ-বৌ নিকে করতে পারে। কারণ তার যে রূপ, তাতে পাড়ার 'মাগনেড়ে হতচ্ছড়ারা' মেজ-বৌ এর পানে তাকিয়ে হা-পিত্যেশ করে। আবার তার ভগ্নিপতি ঘাসু মিঞা যে কিনা চামড়ার ব্যবসা করে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ নাম ধারণ করেছে, সেও নিকা করতে চায় মেজ-বৌকে। তাই কলকাতা থেকে মাঝে মধ্যেই আগমন ঘটে ঘাসু মিঞার-এই চাঁদসড়কে। কিন্তু সে ভিন্নধাচে গড়া, মিষ্টি কথার জালে ঘায়েল করে মেজ-বৌ কৌশলে ভগ্নিপতিকে বুঝিয়ে দেয় সে কিছুতেই নিকা করবে না। আবার শাশুড়ি ও পাঁচি মিলে প্যাঁকালের সাথে মেজ-বৌ-এর নিকে দিতে চাইলেও সে কিছুতেই

রাজি হয় না। কারণ প্যাঁকালে ভালবাসে কুর্শিকে। অন্যদিকে বড়-বৌ এর আশঙ্কা মেজ-বৌ এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হবে না। মেজ-বৌ শাশুড়িকে স্মরণ করিয়ে দেয় এক বোন বেঁচে থাকলে আর এক বোনকে নিকে করা যায় না। এতে শাশুড়ি ও বড়-বৌ খুশি হয়। কারণ মেজ-বৌ জীবনধর্মে বিশ্বাসী নারী। জীবনের স্বভাব বিরুদ্ধ কোন আবেগ-উচ্ছ্বাস, বেদনা-আর্তিকে প্রশ্রয় দেয় নি সে।[৯]

কুর্শিকে ভালবাসে প্যাঁকালে। কিন্তু কুর্শির সাথে রোতোর মাখামাখিতে প্যাঁকালে রাগে অভিমানে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অথচ মেজ-বৌ মনে করে তার সাথে বিয়ের প্রস্তাবের ফলেই প্যাঁকালে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তার আত্ম-গৌরববোধ খুব তীব্র ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাই মিথ্যা অভিযোগে প্যাঁকালে বাড়ি ছাড়লে সে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পৌরুষত্ব বিবর্জিত এ পলায়ন মেজ-বৌ মানতে পারে না। তার সাথে বিয়ের মিথ্যে গুজবের বিরুদ্ধে কেন সে রুখে দাঁড়ালো না, সে নিজের হাত নিজেই কামড়ে ধরে বলে,

> এই আবার পুরুষ, বেটাছেলে! এত বড় মিথ্যার ভয়কে সে উপেক্ষা করে চলতে পারল না। যে মিথ্যা-কলঙ্কের ঢিল লোকে তাকে ছুঁড়ে মারলে, সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদের ছুঁড়ে মারতে পারলে না।...শেষে কি-না পালিয়ে গেল! হার মেনে ! কাপুরুষ![১০]

এরই মধ্যে অসুস্থ সেজ-বৌ ও তার শিশুসন্তানকে দেখবার জন্য পাদরি সাহেব ও মেম সাহেব গজালের মায়ের বাড়িতে আসে। সেজ-বৌ এর চিকিৎসার সুবাদে সাহেব ও মিস্ জোন্সের সাথে মেজবৌ-এর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু মৃত্যু ঘটে সেজ-বৌ আর তার শিশু সন্তানের। তার নিকট এ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে হয় না। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে, এবং স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—"অনেক ডেকেছি আল্লা আজ আর তোমায় ডাকব না।"অসহায় পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে আসে মিস্ জোন্স। মেজ-বৌ তার নিকট লেখাপড়া শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু সমাজের ভয়ে সে ভীত হয়। মিস্ জোন্স খুশি হয় এবং বাচ্চাদেরসহ তাকে মিশনারিতে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। মেজ-বৌ-এর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। তার পড়া-লেখা চলতে থাকে, সেই সাথে বৃদ্ধি পায় শাশুড়ির গঞ্জনা, সমাজের উৎপাত। হঠাৎ 'চাঁদ-সড়কে সেদিন ভীষণ একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল, মেজ-বৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।' প্যাঁকালের মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, পাড়ার মৌলবি-মোল্লাদের দৌড়-ঝাঁপ বেড়ে গেল। এ সড়কের অনেকেই খ্রিস্টান হয়েছে, কিন্তু মেজ-বৌর খ্রিস্টান হওয়াটা যেন এ পাড়ার অস্থিরতা ও উন্মাদনায় নতুন মাত্রা দিল। কারণ মেজ-বৌর খ্রিস্টান হওয়াতে নিঃস্ব প্যাঁকালের মা আরও নিঃস্ব হয়ে গেল। তাকে পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাহাসের খরচ বাবদ ১৫ টাকা—শেষ সম্বল পোষা ছাগল ক'টা বিক্রি করে জোগান দিতে হয়।

চাঁদ সড়কের নতুন আগন্তুক বিপ্লবী আনসারকেও তা আলোড়িত করল। যাকে নিয়ে এত হট্টগোল সেই মেজ-বৌর সাথে সাক্ষাৎ করে আনসার জানতে চায়—সে স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান হয়েছে কী-না। আনসার মেজ বৌকে না চিনলেও, সে আনসারকে ভাল করেই চিনত ও জানতো। বহুদিন বেড়ার ফাঁক দিয়ে মেজ-বৌ আনসারকে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছে। আনসার মেজ-বৌর নিকট প্রশ্ন করে জানতে পারল ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজই তাঁকে খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেছে। আত্ম-সচেতন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও অধিকার-সচেতনতার দিক থেকে মেজ-বৌ বাংলার মহীয়সী নারীর সমমর্যাদায় উত্তীর্ণ। কিন্তু আনসারের সাথে সাক্ষাৎ হবার পর তার মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনার যেন নবজন্ম ঘটে। তাই সে আনসারের সাথে পরবর্তীতে দেখা করবার অনুমতি মঞ্জুর করে নিল। কারণ 'হৃদয়ের পানে হৃদয় ছোটার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের মত সে আপনাতে আপনি বিকশিত।'[১১] যে গভীর বিপুল প্রেমাকাঙ্ক্ষা মেজ-বৌ-এর মনের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় ছিল, সর্মপণযোগ্য প্রেমাস্পদকে পেয়ে নিজেকে নিঃশেষে দান করতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে এবং বলে, 'আমি সব করতে পারি তোমার জন্য। সে মনে করে, আনসার তার চাইতেও বড় যাদুকর। তার এতদিনের অহংকার মিথ্যা হয়ে গেল। তাকে জয় করার মত পুরুষও আছে জগতে। সেই সাথে মেজ-বৌ জানালো তার যে কোন প্রয়োজনে তাকে যেন কাজে লাগানো হয়। মুগ্ধ-বিমুগ্ধ আনসারের নিকট বিশেষ স্মৃতিময় হয়ে উঠল- হেলেন অর্থাৎ মেজ-বৌ।

অন্যদিকে মেজ-বৌর নিকটও যেন আনসার প্রবাদ-পুরুষ। তাকে বরিশাল পাঠানো হবে-এ সংবাদ জেনে আনসার তাকে আশ্রয় দিতে চাইলে, তা গ্রহণ করতে যেমন মেজ-বৌ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি আনসার এখানে থাকবে না, তা জেনেও এক ধরনের কষ্ট ও ক্ষোভ তার মনে দানা বেঁধেছে। ফলে সে কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, "যাবেই যদি তবে এ ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেয়ো না। আমিও কাল চলে যাই, তুমিও চলে যাও।"[১২]

পুলিশ নাটকীয়ভাবে আনসারকে গ্রেপ্তার করে। রানাঘাট স্টেশনে গাড়ি বদলের সময় আনসারের সাক্ষাৎ হয় মিস্ জোন্স, মেজ-বৌ, প্যাঁকালে ও কুর্শির সাথে। মিস্ জোন্স আনসারকে জানায়, মেজ-বৌ নাকি কাল খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে স্বেচ্ছায় বরিশালে যেতে

চেয়েছে। আরও জানাল, প্যাঁকালে খ্রিস্টান হয়ে কুর্শিকে বিয়ে করেছে। তারপর আনসার দূর থেকে দেখল, মিস্ জোন্সসহ কয়েক জন ধরাধরি করে কাকে যেন ট্রেনে তুলছে। এ আর কেউ নয়—মেজ-বৌ।

মেজ-বৌ অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তার চার পাশে ক্ষুধা আর যন্ত্রণার করাল মৃত্যু জাল। তবু আজন্ম লালিত বিশ্বাস নিয়ে সম্মানের সাথে বৈধব্যবরণ করতে চেয়েছে সে। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ তা হতে দেয় নি। মেজ-বৌ খ্রিস্টান হয়েছে আদর্শের মোহে নয়, শুধু খাদ্য ও অর্থের অভাবেও নয়। তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কারণ আরও গভীরে নিহিত। বরিশালে অবস্থানকালে মিনতির সাথে মেজ-বৌ-এর কথোপকথন প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> আমি ত মেম-সায়েব হতে আসি নি ভাই, মানুষ হতে এসেছিলুম। আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মত শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কিছু যে ভালো হয় নি আমার, তা বলব না। এখন যা শিখেছি, তাতে করে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত যোগাড় করবার অসুবিধা হবে না।[১৩]

মেজ-বৌ বরিশালে প্যাঁকালের ঠিকানায় চিঠি পায়। জানতে পারে তার ছেলের ভয়ানক অসুখ, টাইফয়েড। চিঠি পড়ে মেজ-বৌ মূর্চ্ছা যায়। সেদিন রাতেই মেজ-বৌ প্যাঁকালে ও কুর্শিকে নিয়ে কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে। মেজ-বৌ-এর খোকা আর নেই কাল সকালেই মারা গেছে। তার সে-কি আর্তনাদ। পাড়ার লোকের নিকট মেজ-বৌ রাক্ষুসী। তার খোকার স্মৃতি-চিহ্ন পুড়িয়ে ফেলে মেজ-বৌ আগের মতই গান গায়, চুড়ি পরে, বাঁকা সিঁথি কাটে, চওড়া কালো পেড়ে শাড়ি পরে পাড়া বেড়ায়। এ যেন তার আর এক জন্ম। কেউ বলে মেজ-বৌ শোকে পাগল, কেউ বলে রসের পাগল। খোকার মৃত্যুর চল্লিশ দিন হলে মেজ বৌ পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে চাইল। কিন্তু তার হাতের রান্না কে খাবে? সে যে খ্রিস্টান, খোকার মৃত্যুর সময় মা খ্রিস্টান জন্য তার হাতের পানিও খেতে চায় নি, তাই মোড়ল সাহেবের পরামর্শে মেজ-বৌ পুনরায় মুসলমান হয়। তারপর সব শিশুদের সে রান্না করে খাওয়ায়। মেজ-বৌর চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে! না না, আর কাঁদবে না সে। তার উপলব্ধি খোকা আছে ঐ তারায়, ঐ চাঁদে, ঐ আকাশের কোথাও না কোথাও। এ যেন এক শাশ্বত মায়ের আর্তক্রন্দন। মেজ-বৌ পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়া লেখা করানোর জন্য রুবির সাহায্য চায়। রুবি ঘর নির্মাণ ও নিজে এসে পড়ালেখায় সাহায্য করবে বলে অঙ্গীকার করে।

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল থেকে লতিফার নিকট চিঠি দিয়েছে আনসার। সে টিউবার-কিউলসিসে আক্রান্ত হয়েছে। হয়তো কয়েক দিন মাত্র তার আয়ু। তাই ইংরেজ বাহাদুর সদয় হয়ে তাকে মুক্তি দিচ্ছে। মুক্তি পেয়ে আনসার ওয়ালটেয়ারে যাবে। সেখানকার সমুদ্র সৈকতে সে জীবনের শেষ সময় কাটাতে চায়। "চিঠি পড়ে মেজ-বৌ যে মুখ উর্ধ্বে তুলে ধরলে, তা মানুষের মুখ নয়। ও যেন ঝরার একটু আগের শিশির সিক্ত রক্ত কমল।"[১৪] মেজ-বৌর মুখের অবস্থা দেখে রুবির চোখ পুড়ে গেল। নিজে ওয়ালটেয়ারে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে তাকে সেখানে যেতে কটাক্ষে আমন্ত্রণ জানালো। রুবির আমন্ত্রণে মেজ-বৌ জানায়, দু'মাস আগে হলে সে কি করতো জানে না, কিন্তু এখন সে খোকাকে হারিয়ে খোকাদের পেয়েছে। তা নাহলে সেখানে গিয়ে তার সেবা করে সে ধন্য হত। এভাবে সে রুবিকে পথ দেখায়। সেবা-পরায়ণ মায়াময় মেজ-বৌ খোকাদের সেবার মাধ্যমে তার নিজের খোকাকে হারানোর শোক ভুলতে চায়।

মেজ-বৌ চরিত্রটি শুধু নজরুল সাহিত্যেরই নয়, বাংলা সাহিত্যেরও এক অনন্য সৃষ্টি। সাধারণ গণ-শ্রেণির একজন সার্থক প্রতিনিধি হিসেবে তার দৃষ্টান্ত সমকালের সাহিত্যে প্রায় বিরল। চাঁদ-সড়কের কলতলার গজালের মায়ের সংসারের মেজ-বৌ চরিত্র প্রসঙ্গে ড. সুশীল কুমার গুপ্ত চরিত্রটি সম্পর্কে যে বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই স্বীকার্য:

> প্যাঁকালের মেজ-বৌদি ও বাড়ির মেজ-বৌয়ের দুঃখের ইতিবৃত্ত-সমাজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে খ্রীস্টান মিশনারি মিস্ জোন্সের সস্নেহ প্রভাবে তার ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ, আনসারের সংস্পর্শে মুক্ত জীবনের আস্বাদন, তার খোকাকে হারিয়ে মুসলমান জীবনে প্রত্যাবর্তন, দেশের ক্ষুধাতুর শিশুদের মধ্যে নিজের ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার অনুভূতি এবং পরিশেষে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে-দের জন্য তার পাঠশালা খোলবার সংকল্প পাঠককে একটি জীবন্ত ও দীপ্ত চরিত্রের সঙ্গে মুখো-মুখি করিয়ে দেয়। সমাজে ঘটনাস্রোতের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে মেজ-বৌ চরিত্রের ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। বস্তুতঃ এই চরিত্রই নজরুলের অন্যতম সার্থক চরিত্র।[১৫]

নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের মেজ-বৌ তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সে গরীব, কিন্তু ব্যক্তিত্বে অটল। সত্যানুসন্ধানী, প্রগতিশীল মেজ-বৌ একজন জীবন সংগ্রামী নারী। সেই সাথে সেবা-পরায়ণ ও প্রেমময়ী রমণী; কিন্তু সবার উপরে বড় হয়ে উঠেছে স্নেহময়ী মাতার শাশ্বত স্বরূপ। আর এখানেই মেজ-বৌ সবার নিকট পরম শ্রদ্ধার্হ।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের বিপ্লববাদী নায়ক চরিত্র আনসার। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে অনেকটা নাটকীয় ভাবে অনুপ্রবেশ করে সে। সদ্য বদলি হয়ে আসা সরকারি চাকুরে নাজির সাহেবের বাসায় ওঠে আনসার। লেখকের বর্ণনায়–

> যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামা-কাপড়-কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের ফেটিগ ক্যাপের মত টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস। তরবারি ক্রসের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরণের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফরমের মত কোর্ট-প্যান্ট। পায়ে নৌকার মত এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা তেমনি নাক চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে করে তৈরী-গ্রীক-ভাস্করের এ্যাপালো মূর্তির মত- নিখুঁত সুন্দর।[১৬]

বিশ্বমানবতা ও শাশ্বত সত্য পথের এই সৈনিক শাসন-শোষণ ও নিপীড়নহীন, মানবকল্যাণধর্মী সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। বলা যায়, নজরুলের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার ধারক আনসার। সে সমাজের নিম্নশ্রেণি তথা-মেথর-মুচি, ঝাড়ুদার, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণি পেশার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের অতন্দ্র কর্মী। কৃষ্ণনগরে সে একটি শ্রমসংঘ গঠন করতে চায়। ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসের নায়ক পাভেলের মতই আনসার বিশ্বাস করে যে, 'সব মানুষের মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা আছে। এ সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলেই দেশের সাধারণ শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব।' প্রসঙ্গত বলা যায়, নজরুল তার রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের জন্যই কৃষ্ণনগরে সপরিবারের বসবাস করতে এসেছিলেন। আনসারের পোশাক ও শরীরের উল্লিখিত বর্ণনাও কৃষ্ণনগরবাসী বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী নজরুলের মতই।

আনসার নাজির সাহেবের স্ত্রী লতিফা ওরফে বুঁচির প্রিয় খুল্লতাত ভাই। অনেক শ্রদ্ধা ও ভক্তি লতিফার মনে বাউণ্ডেলে এই ভাইটির প্রতি। কারণ আনসারের বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, ভাই-বোন নিয়ে একটি সুখের সংসার ছিল। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান সে। ইচ্ছে করলেই সে বিলাসী জীবন-যাপন করতে পারতো। কিন্তু আনসার তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এক অনিশ্চিত সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছে। তার এমন অনিশ্চিত জীবনের জন্য লতিফার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে, "তোমায় ছেলেবেলা থেকেই ত জানি দাদু, তুমি চিরটা দিন এমনি পরের দুঃখে পাগল।"- এই পরের দুঃখে দুঃখী মানুষটি লতিফার কথার জবাবে বলে–

> দুনিয়ার সব মানুষ এক ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমি আত্মীয়-পরিজনের কেউ নই! আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথি আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।[১৭]

আনসার তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথমে ছিল কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু মহাত্মা-গান্ধীর চরকা আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসবে না এ প্রতীতি আনসারের জন্মেছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে এ রাজনৈতিক দলটির কোন সুনির্দিষ্ট ইস্তেহার ছিল না। ফলে রুশ-বিপ্লব তথা সাম্যবাদী দর্শন আনসারকে আকর্ষণ করে। যা ব্যক্তিগত জীবনে নজরুলকেও প্রভাবিত করেছিল, তারই বাস্তবরূপ আনসার চরিত্রে প্রতিফলিত। এ সম্পর্কে আনসারের স্পষ্ট উচ্চারণ- 'আমি আজ মনে করি যে, আর সব দেশ মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এদেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে?' সে আরও বলে, 'সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।'

তাই আনসার হাতে নিয়েছে চির-বঞ্চিত, চির-লাঞ্ছিত, অবহেলিত, দুঃখ জর্জরিত মানুষের মুক্তির মশাল। এ মশালের প্রজ্বলিত আলোয় উদ্ভাসিত হবে– তাদের চিরকালীন মুক্তির পথ। কৃষ্ণনগর আগমনের তিন দিনের মধ্যেই আনসার-গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রি, কুলি-মজুর-মেথর প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণির মানুষের অন্তরে এ মশালের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে–

> শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক ক্ষেপাতে। সরকারি কর্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমনকি কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেদিকে আনসারের ভ্রুক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।[১৮]

লতিফার এই 'ছন্নছাড়া ভাইটি সর্বহারা ভিখারিদের জন্যই আজ পথের ভিখারি। তাকে কাঙ্গাল করেছে এই কাঙ্গালদের বেদনা।' আর আনসার এই বেদনার দ্বারা লীন হয়ে বেছে নিয়েছে দুর্ভর জীবন, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

কৃষ্ণনগরের জীবনে আনসার খুব বেশি দিন তার মিশন চালাতে পারলো না। তবুও এরই মধ্যে সে কৃষ্ণনগরের প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক, মেথর-কোচোয়ান, গাড়োয়ান সব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রবল প্রাণপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছে আনসার। এমনকি চাঁদ-সড়কের মেজ-বৌ যাকে কি-না কেউ হৃদয়ের দিক থেকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাকেও আনসার মন্ত্র মুগ্ধের মত করেছে আবিষ্ট। তাই বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না মেজ-বৌ।

আনসার বিপ্লবী নেতা, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তাই সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মীরা সব সময় তার পিছু পিছু থাকে। ফলে সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আনসার কৃষ্ণনগরে এসে সরকার বিরোধী কার্যক্রমে জড়িত। তাই কৃষ্ণনগরে তার অনুসারীদের প্রথমে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর সারারাত নাজির সাহেবের বাড়ি ঘিরে রেখে ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে আনসারকেও গ্রেফতার করা হয়। উদীয়মান বলশেভিক আন্দোলনে ভীত হয়ে ইংরেজ সরকার বরাবরই কম্যুনিস্টদের উপর চণ্ডনীতি তথা দমননীতি অনুসরণ করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে আনসারকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কৃষ্ণনগর উত্তাল হয়ে ওঠে। "দলে দলে মেথর-কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার-গুতো-চাবুক লাথিতে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা নাজির সাহেবের বাড়ি ঘিরে ফেললে পুলিশ উপায়ন্তর না দেখে দু-একটা ফাঁকা গুলি করলে বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। ওরি মধ্যে একটা বৃদ্ধ মেথর চিৎকার করে বলে উঠল, হুজুর, আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।"[১৯]

মানবতাবাদী সংগ্রামের মহানায়ক আনসার। মানুষকে ভালবাসা, তাদের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সংকটে পাশে দাঁড়ানোয় তার ধর্ম। তাই সাধারণ মানুষ তার মনোমন্দিরের পূজ্য। এ কারণেই সমস্ত জনতার ভালবাসা, আবেগ আর উৎকণ্ঠা তার জন্য। তাদের প্রিয় নেতা, প্রিয় সন্তান, প্রিয় বাবাকে কিছুতেই তারা গ্রেফতার করতে দেবে না। তাই "বাইরে জন-সঙ্ঘ ক্রন্দন কাতর কণ্ঠে আকাশ ফাটা জয়ধ্বনি করে উঠল। ও যেন বিক্ষুব্ধ গণদেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুঙ্কার।"[২০]

পুলিশ ভয় পেয়ে গেল। আনসারকেই অনুরোধ করল এই গণরোষের আগুন নেভাতে। আনসারের বিপ্লবী জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। এ সব গণদেবতারা যদি স্বেচ্ছায় পথ না ছাড়ে, তবে পুলিশ গুলি চালাবে। মারা যাবে বিপ্লবী আন্দোলনের অগণিত সম্মুখ সৈনিক। তাই আনসার জনতার উদ্দেশ্যে বলে,

> বন্ধুগণ! তোমাদেরও হয়ত আমার মত করেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না।[২১]

পুলিশ উস্কানিমূলক বক্তব্য পরিহার করে আসল কথা বলতে বলে। এবার আনসার জনতার উদ্দেশ্যে পুলিশের দিকে তাকিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে,

> এইবেচারারা তোমাদের মতই হতভাগ্য, দুঃখী। পেটের দায়ে পাপ করে, দেশদ্রোহী হয়। ওদের ক্ষমা কর, দু'দিন পরে ওরাও আসবে তোমাদের কমরেড হয়ে। যে মৃত্যু ক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই।[২২]

এ যেন বিশ্বখ্যাত ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসের নায়ক পাভেল সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দিয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি:

> কমরেড সব! সৈন্যরাও আমাদের মত মানুষ। ওরা আমাদের গুলি করবে না। কেন করবে? যে সত্যের ঝাণ্ডা আমরা হাতে নিয়েছি সে সত্য যে সবার জন্য। আমাদের মতো ওদেরও তা একান্ত দরকার। ওরা এখনও বুঝতে পারে নি। কিন্তু বোঝবার দিন আসছে। সেদিন ওরা খুনে আর ডাকাতদের ঝাণ্ডা নেবে না, হাত ধরে পাশে এসে দাঁড়াবে ওই মুক্তি পতাকার তলায়।[২৩]

রুশবিপ্লবের (১৯১৭) ফলে এই শ্রমিক নেতা পাভেলের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছিল। নজরুলও স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম আর গণমানুষের মুক্তির। বাংলার যে অক্ষয় যৌবন সে সময়ে মুক্তিকামী ভারতবাসীর নেতৃত্ব করেছে, দেশের আজাদীকে তরান্বিত করার জন্য যে তরুণ-তরুণীরা ফাঁসিমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, দেশ প্রেমিক সেই সর্বহারার দলের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন নজরুল তাঁর *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে।[২৪]

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের নায়ক আনসার চরিত্রের মধ্যে দ্বৈতসত্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান-বিপ্লবী ও প্রেমিকসত্তা। ব্যক্তি নজরুল ও তাঁর সাহিত্য কর্মেও এই দ্বৈতসত্তার ঘটেছে সার্থক যোজন। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ-তূর্য।' এই সুর ধ্বনিই যেন তাঁর সাহিত্য জীবনে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে বার বার। আনসার চরিত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। বিপ্লবী আনসারের জীবনেও এসেছে গভীর প্রেম। কিন্তু বিপ্লবের গভীর মন্ত্রে দীক্ষিত আনসার তার প্রেমাস্পদ, হৃদয়ের রাণি ম্যাজিস্ট্রেট কন্যা রুবির প্রেমকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে ঠেলে দেয়। তারপরও তাকে দেখলে তার হৃদস্পন্দন বাড়ে। লতিফার নিকট গল্পের ছলে এ রকম ঘটনারই বর্ণনা করে আনসার। হঠাৎ ময়মনসিংহের কোন এক সভামঞ্চ থেকে রুবিকে দেখে চিনতে যেমন অসুবিধা হয় নি, তেমনি বক্তৃতা করতে গিয়ে আনসারের কথা বার বার জড়িয়ে যায়। এর কারণ রুবির প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা। তাছাড়া লতিফার সাথে বিধবা রুবির কথোপকথনের মধ্যেও আনসারের প্রতি তার সুগভীর ভালবাসার পরিচয় ফুটে ওঠে। আবার মেজ-বৌ আনসারের মনোরাজ্যে এক বিশেষ মহীয়সী ও প্রেমিকাসত্তারূপে ধরা দেয়। তার জন্য সব করবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। আনসারও তাকে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তার এ প্রস্তাব মেজ-বৌ গভীর অভিমানে প্রত্যাখান করে। কারণ সে জানতে পারে, আনসার আর বেশি দিন চাঁদসড়কে থাকবে না।

নিখিল মানুষের বেদনা আনসারকে পীড়িত করে, বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু তার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে লুকানো থাকে সুগভীর প্রেম। যৌবনের সুখ-বাসনা বিসর্জন দিয়ে এ মানব পূজারি ছুটেছে মানুষের মুক্তির জন্য।[২৫] অথচ তারই জীবনে নেমে এলো এক করুণ ট্র্যাজেডি। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মত যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় সে। কারাগারে মৃত্যু হলে সরকারের উপর দায় বর্তাবে। তাই তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার সংবাদ ও তার বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লেখে লতিফার নিকট।

তার দুই প্রেমিকা মেজ-বৌ ও রুবি চিঠি পড়ে জানতে পারে তার অসুস্থতা ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে। মেজ-বৌ কষ্ট পায়, কিন্তু তার সন্তানের মৃত্যু তাকে দিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। তবে মেজ-বৌ রুবিকে দেয় নতুন পথের ঠিকানা। রুবি ছুটে যায় ওয়ালটেয়ারে। যেখানে একটি কক্ষে মৃত্যুর প্রহর গুনছে আনসার। কিন্তু আজীবন সর্বত্যাগী, সুখ-ঐশ্বর্য আর রিপু দমনে যার কঠিন ব্রত সেই আনসারের আজ এ কি ক্ষুধা? মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও সে রুবিকে বলে, "রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।"[২৬] রুবি তার উপবাসী ভিখারি বন্ধুকে ফেরাতে পারে নি। রুবির বর্ণনায় জানা যায়, বিরাট বিপুল জীবন নিয়ে যে ধরায় এসেছিল, তাকে ভীষণ দুঃখ আর কষ্টে চলে যেতে হয়েছে। সাগরের মত প্রাণ যার, তাকে তার ইচ্ছেতেই মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে রুবিও তার সাথের সাথী হবার জন্য অপেক্ষা করে। নিষ্ঠুর নিয়তির এ এক অমোঘ রহস্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে আনসার চরিত্রটি এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। ট্র্যাজেডির নায়কের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই তার চরিত্রে বিদ্যমান। বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে যে চরিত্রটি *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছিল, মরণব্যাধি যক্ষ্মা তাকে করে দেয় অকালেই নিঃশেষ। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে বিপ্লবী চরিত্রের আদর্শ আনসার। তবে নজরুল মানসের দ্বৈতসত্তার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে সে। ফলে তৃণমূল, ছন্নছাড়া শ্রমজীবী মানুষদের মহানায়ক, গণদেবতা আনসার চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের নায়ক আনসার চরিত্র সৃষ্টি নজরুলের এক দুঃসাহসী কর্ম-প্রেরণা।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের অপর নায়িকা চরিত্র রুবি। রুবি চরিত্রটি প্রথমে সরাসরি উপন্যাসের মধ্যে আবির্ভূত হয় নি। বরং লতিফা ও আনসারের কথোপকথনের মধ্যে রুবি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। রুবি ম্যাজিস্ট্রেট ম. হামিদ সাহেবের মেয়ে। তাকে বিয়ে দেয়া হয়– মোয়াজ্জেম হোসেন নামক এজন আই.সি.এস পরীক্ষার্থীর সাথে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বিধবা হয়। বিয়ের আগেই রুবি প্রবলভাবে ভালবেসে ছিল আনসারকে। কিন্তু বাবা-মায়ের পীড়াপীড়ি ও মান রক্ষার্থে সে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। তাই তার স্বামীকে সে কোনদিনই ভালবাসতে পারে নি। এমন কি বাসরসজ্জার রাতে তার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে যে মালা গাঁথে রুবি। ঐ মালা শুকিয়ে গেলেও আনসারকেই উপহার দেয় সে।

তার এ প্রেম দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য। পারিবারিক শাসন-ত্রাসন তাকে পরাস্ত করতে পারে না। কিংবা মৃত স্বামীও তাকে স্মৃতি কাতর করে না। এমন কি এজন্য নেই কোন তার অনুশোচনা। বরং তার নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি, "আমার স্বামী মহৎ ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে সারাজীবন দুঃখ পাওয়ার দায় থেকে বেচে গেলেন।"[২৭] তার ধ্যান জ্ঞানের আরাধ্য সজন আনসার। তাই বিধবা হবার পর শত চেষ্টা করেও বিয়ে দিতে পারে না, তার বাবা-মা। কারণ শত চেষ্টা করেও সে আনসারকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তাই যেদিন আনসারকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার খবর রুবি কাগজে পড়ে সেদিন এই সুন্দর পৃথিবী তার কাছে মনে হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু বাউণ্ডেলে, বিপ্লবী আনসার তাকে ভালবাসে কি-না তা সে

জানে না। যখন সে লতিফার নিকট জানে যে, আনসারও তাকে ভালবাসে। তখন তার হৃদয়ের সেলুলয়েডে গভীরভাবে অনুভূত হয়, "সেও ভালবাসে, শুধু এইটুকু সান্ত্বনাতেই যেন রুবির বুক ভরে উঠল। শুধু এই একবিন্দু শিশিরের প্রতীক্ষাতেই যেন সে তার তৃষ্ণার্ত মুখ তুলে অনির্দেশ শূন্যের পানে তাকিয়ে ছিল।"[২৮]

রুবি বড়লোক উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যা। তার অহংবোধ আছে। সেই সাথে আছে ভালবাসা সম্পর্কে আদর্শজাত পক্ষপাতিত্ব। তাই তার প্রেমাস্পদকে অন্য কেউ ভালবাসুক, সেটা চায় না রুবি। ফলে সে যখন বুঝতে পারে, মেজ-বৌ ভিতরে ভিতরে আনসারের প্রতি দুর্বল, তখন এই উচ্চশিক্ষিত প্রেমিক রমণী হয়ে ওঠে ঈর্ষাতুরা। তার হিংসা ও মানবীয় সুলভ আচরণও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় না। লতিফার নিকট আনসারের চিঠি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল 'রুবির চোখ নিমিষের তরে যেন জ্বলে উঠল।' আবার মেজ-বৌ যখন আনসারের চিঠি পড়ে মুখ উর্ধ্বে তুলে বিমর্ষ হয়ে যায়, তখনও মনে হয়, 'রুবির চোখ যেন পুড়ে গেল।' এ সব প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও মেজ-বৌর প্রতিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রুবির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই মেজ-বৌর স্কুল খোলার উদ্যোগে রুবি সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

বুঁচিকে লেখা আনসারের চিঠির মাধ্যমে রুবি শুনতে পায় আনসারের আবাহন। তার মৃত্যুর আগে 'অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখতে চায় সে। এই 'জন' যে কে– রুবি তা ভাল করেই উপলব্ধি করে। ফলে তার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় না। রুবি তার প্রেমিকের অন্তিম ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখতে চায় না। রাতের আঁধারে আত্মীয়-পরিজনের বন্ধন ছিঁড়ে ছুটে যায় ওয়ালটেয়ার সমুদ্রসৈকতে। এখানেই সে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। রুবিও তার বেলা শেষের প্রেমিকের সাথে শুভদৃষ্টি বিনিময় করে। নদী যেমন সমুদ্রের মাঝে বিলীন হয়ে পূর্ণতা পায়, তেমনি রুবি তার প্রেমিকের নিকট নিঃশেষে আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে জীবনকে করে তোলে সার্থক ও পরিপূর্ণ। স্বার্থতাড়িত বাস্তব সংসারে দু'জনের মিলন ঘটে নি।[২৯] ওয়ালটেয়ারে দু'জনের মিলনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু পরিণাম হল ভয়াবহ। উপন্যাসের শেষে বুঁচিকে লেখা পত্রে রুবি বলেছে–

> আমি পরিপূর্ণ রূপে তার ক্ষুধার্ত মুখে আত্মসমর্পণ করলাম। যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দিব না, দু'দিন আগে মরবে এইত! তাছাড়া এ মৃত্যু তো ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু জীবাণু আমাকেও তো আক্রমণ করবে।[৩০]

রুবি এখানে নীতির খাতিরে প্রেমকে অবমাননা করে নি। মৃত্যুপথযাত্রী প্রেমিকের অন্তিম সাধ সে পূরণ করেছে। রুবি চরিত্রের প্রতি লেখকের বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত। তাকে এখানে ত্যাগী ও মহৎভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। আনসারের সাথে রুবির মিলন, তার মৃত্যু এবং রুবির যক্ষ্মা আক্রান্ত হওয়া এ যেন অতি নাটকীয়তারই বহিঃপ্রকাশ। এবং নজরুল মানসের সাথে তা সামঞ্জস্যহীন। চরিত্রটি প্রসঙ্গে বলা যায়, 'প্রেমের জন্য রুবি ঘর ছেড়েছে, সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেছে, মৃত্যু পথযাত্রী যক্ষ্মারোগীর কাছে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছে।'[৩১]

ত্রিশের দশকে রচিত *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে নজরুল আনসার, মেজ বৌ আর রুবি এই তিনটি চরিত্র বা নায়ক-নায়িকার মধ্যদিয়ে দেশ-কাল-সমাজ-ধর্ম আর মানুষের যে ছবি এঁকেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় সমকালীন ধ্যান-ধারণা থেকে কত অগ্রসরমান ছিল নজরুলের চেতনা। এ উপন্যাসের নায়ক শ্রেণিসংগ্রামী, এ উপন্যাসের একজন নায়িকা নিম্নশ্রেণির দরিদ্র অশিক্ষিত কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, অপর নায়িকা উচ্চশ্রেণির শিক্ষিতা। কিন্তু তথাকথিত নৈতিকতার ঊর্ধ্বে ভালবাসার পাত্রকে যার অদেয় কিছুই নেই, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বিধবা যুবতী নারীদের মত সে নীতির জন্যে নিজেকে ফাঁকি দেয় নি বা ভালোবাসার পাত্রকে বঞ্চিত করে নি।[৩২] রুবি চরিত্রটি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বাধীনচেতা ও সাহসী নারীর এক সার্থক প্রতিমূর্তি।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের লতিফা ওরফে বুঁচি চরিত্রটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। আনসার ও রুবি চরিত্র বিকাশে লতিফা চরিত্রটি যেন অনেকটা অনুঘটক। খুল্লতাত আনসারের প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধা আর আশঙ্কা চরিত্রটিকে মানবীয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ করেছে। আনসারের অনিশ্চিত ও বিপ্লবী জীবন তার চোখে অনেক জলও ঝরিয়েছে। আবার বলা যায়, আনসার ও রুবির প্রেমের অনুঘটকও সে। মেজ-বৌও তাকে ভরসা করে, সুখ-দুঃখের সাথী মনে করে। তাই বার বার তার কাছে ছুটে আসে। নাজির সাহেবের স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসেবেও লতিফা চরিত্রটি আদর্শ স্থানীয়। উচ্চবিত্ত ঘরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও লতিফার চরিত্রে কোন অহংবোধের ভাব লক্ষ্য করা যায় না। এজন্য বলা যায়, আদর্শ নারী চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লতিফা চরিত্রটি।

নজরুল গণ-মানুষের কবি। তাঁর সাহিত্যিক জীবনে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ বিশেষ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের মেজ-বৌসহ তার চারপাশের মানুষগুলো নজরুলের দরদী মনে লাভ করেছে বিশেষ স্থান। এ কারণে গজালের মা, হিড়িম্বা, প্যাঁকালে, পাঁচি, বড় বৌ, সেজ-বৌ, কুর্শি প্রমুখ চরিত্রগুলোর প্রতি নজরুলের সহৃদয় ভালবাসা অকৃপণ। ফলে অপ্রধান চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও এসব চরিত্রগুলো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে।

গজালের মা চাঁদ-সড়কের নিম্নশ্রেণির দরিদ্র পরিবারের বিধবা কর্ত্রী। তিন ছেলের বিধবা স্ত্রী, ছোট ছেলে প্যাঁকালে ও বেশ কয়েকজন নাতি-নাতনি নিয়ে তার সংসার। সম্পদ বলতে কিছুই নেই। এমন কি মাথা গুজবার ঠাঁই-টুকুরও বড় অভাব। একটি মাত্র ঘরে সবাইকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। তার মধ্যেই থাকে হাঁস-মুরগি, ছাগল আর ছোট ছেলে প্যাঁকালে। তাও আবার রাজমিস্ত্রীর কাজে সামান্য উপার্জন। এই সামান্য উপার্জনে তার সংসার চলে না। তাই অন্যের বাড়িতে সেও মাঝেমাঝে কাজ-কর্ম করে সামান্য আয় করে। বাড়ির বড়-বৌ, মেজ-বৌ তারাও অন্যের ধান ভানে। সেজ-বৌ ও সদ্যপ্রসূত সন্তান চরম অসুস্থ। চিকিৎসা করবার সামর্থ্য নেই। এর মধ্যে মেয়ে পাঁচি স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছে। তারও সন্তান হবে। কিন্তু দায় ডাকবার মত টাকাও নেই। ফলে চিরশত্রু হিড়িম্বা যার সাথে তার তুমুল ঝগড়া হয় তাকে ডাকতে হয়। গজালের মা আর হিড়িম্বা-এরা চাঁদ সড়কের অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। অল্পতেই ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়। আবার বিপদে একের প্রয়োজনে অন্যে ছুটে আসে।

বিরাট বিশাল সংসারের দরিদ্রকর্ত্রী প্যাঁকালের মা তার পরিবারের বন্ধন রাখতে চায় অটুট। ফলে বিধবা পুত্রবধূদের সে সুখে-দুঃখের সাথী। আবার তারা নিকা করে অন্য ঘরে যাক তা চায় না সে। ফলে মেজ-বৌর ভগ্নিপতি ঘাসু মিঞার সাথে তার বিয়ের কথা ওঠাতে শাশুড়ি উদ্বিগ্ন হয়। ছেলে প্যাঁকালের সাথে বিয়ে দিয়ে মেজ-বৌকে নিজের কাছে রাখতে চায়। ছোট শিশুদের মুখে সে খাবার তুলে দিতে পারে না জন্য তার যন্ত্রণার শেষ নেই। প্যাঁকালের গৃহত্যাগে সে আরও বিধ্বস্ত হয়। সেই সাথে মেজ বৌর খ্রিস্টান হওয়াতে এই বিধবার স্বপ্ন-সাধ একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মেজ-বৌর সন্তানসহ বাড়ির অন্যদের নিয়ে কোন রকম বাঁচার সব অবলম্বন হয়ে যায় নিঃশেষিত। সবশেষে মেজ-বৌর সন্তান মারা যাবার পর ক্ষুধায়-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেও মারা যায়।

প্যাঁকালে তার মায়ের সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয় নি তার। সামান্য উপার্জনে সংসার চালাতে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খেতে হয় তাকে। রাজমিস্ত্রির কাজ করে, সামান্য উপার্জনে সংসারের এতগুলো মানুষের দুবেলা অন্ন জোটাতে পারে না সে। প্যাঁকালের শখ যাত্রাদলে গান করা, টেরিকেটে সিঁথি করা। অথচ চার আনা দিয়ে একটা আয়না কিনে সিঁথির ভাঁজটা ঠিক করারও সামর্থ্য নেই তার। এমনি অভাবের মধ্যেই ভালবাসে চাঁদ-সড়কের খ্রিস্টান মেয়ে কুর্শিকে। পুকুরঘাটে কুর্শিকে ভালবাসার কথা দেয় সে। অন্যদিকে মেজ-বৌ এর সাথে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু মাঝে মধ্যে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে সে দায়িত্ববান সন্তানের কর্তব্য পালন করে। মেজ-বৌ খ্রিস্টান হওয়ার পর প্যাঁকালে খ্রিস্টান হয়ে কুর্শিকে বিয়ে করে এবং বরিশালে পাড়ি জমায়। বরিশালে প্যাঁকালে কুর্শির খুনসুটিপূর্ণ সংসারে বেশ সুখের আমেজ দেখা যায়। কিন্তু বাড়ি থেকে মেজ-বৌর সন্তানের অসুস্থতার খবরে সবাই ছুটে যায় চাঁদ-সড়কে। প্যাঁকেলের মা ক্ষুধা-অনাহারে আর শোকে-দুঃখে মারা গেলে সে 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলে চিৎকার করতে থাকে। মায়ের অভাব তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং পুনরায় মুসলমান হয়। প্যাঁকালে তার পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে সে ছিল যথেষ্ট সচেষ্ট। যদিও কুর্শির প্রতি প্রেম তাকে খানিকটা স্বার্থপর করে তোলে। তারপরও তার চরিত্রের মধ্যে সামাজিক ও পারিরারিক দায়বদ্ধতা বহুলাংশে প্রস্ফূটিত।

দেশী কনভার্ট খ্রিস্টান মধু ঘরামির মেয়ে কুর্শি। প্যাঁকালের চোখে রাজকন্যা। এই রাজকন্যাকে ঘিরে পাড়ার জোয়ান ছেলেদের উৎসাহ ও আগ্রহ কম নয়। প্যাঁকালের মত রোতোরও আগ্রহ আছে কুর্শির প্রতি। কুর্শিও ভালবাসে প্যাঁকালকে। তাই হঠাৎ তার গৃহত্যাগে মেজ বৌর মত কুর্শিও অস্থির হয়ে ওঠে, 'ফিরে আয় তুই, ফিরে আয়! তোরি দিব্যি করে বলছি, ওর সঙ্গে দুটো ইয়ারকি ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নাই আমার।'

প্যাঁকালের গৃহত্যাগে কুর্শি যেমন আহত হয়। আবার অভিমানে প্রতিশোধ পর্যন্ত নিতে চায়। তবুও প্যাঁকালের বাড়ির খবর নেয় কুর্শি, সুখ-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়। ভালবাসার মানুষ নাই কিন্তু তার স্মৃতি তো আছে। তারপর মিস জোন্সের নিকট জানা যায়, প্যাঁকালে খ্রিস্টান হয়ে কুর্শিকে বিয়ে করেছে এবং তাদের সংসার জীবনের চিত্র পাওয়া যায় সুদূর বরিশালে। যেখানে কুর্শি প্যাঁকালের চেয়ে বেশি মাইনের চাকরি করার জন্য মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে খুনসুটি হয়। মেজ-বৌ এর ছেলের অসুস্থতার কারণে কুর্শি সবার সাথে চাঁদ সড়কে এসে জানতে পারে তার বাবা ও শাশুড়ি মারা গেছে।

বিপর্যস্ত প্যাঁকালে খ্রিস্টান থেকে আবার মুসলমান হলে কুর্শিও কয়েকদিন কান্নাকাটি করে এবং মুসলমান হয়ে প্যাঁকালের সংসার করে। কুর্শি চরিত্রটি উপন্যাসের একটি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল চরিত্র।

কাজী নজরুল ইসলাম কিছুদিনের জন্য চাঁদ-সড়কে বসবাস করেছিলেন। সেখানকার বাস্তব জীবনভাষ্য তাঁর *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে উদ্ভাসিত। সাধারণ খেটে খাওয়া নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণির জীবন সংগ্রাম তাঁর উপন্যাসে দেদীপ্য। তাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দারিদ্র্য, অভাব অনটন যেমন তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত, তেমনি প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনাও প্রকাশিত। মানুষের ক্ষুণ্নিবৃত্তির সাথে প্রেমের প্রতি দুর্বার আকর্ষণও জীবনের অপ্রতিরোধ্য অনুষঙ্গ। কুর্শি আর প্যাঁকালের প্রেমচিত্র এরকম জীবনভাবনারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের উচ্চবিত্ত চরিত্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণির চরিত্রগুলো আরও বাস্তব ও জীবনমুখী। জীবনের কঠিন করাল মূর্তির এক নির্মম প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। এজন্য মেজ-বৌ চরিত্রটি যেমন পাঠকের চেতনার গভীরে নাড়া দেয়, তেমনি অন্যান্য চরিত্রগুলোও পাঠক মনে গভীর ক্ষত চিহ্ন এঁকে দেয়।

তিন.

নজরুলের গদ্যের ভাষা জীবনমুখী। সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণিচরিত্রের মুখের ভাষা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। নজরুলের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে ঐ অঞ্চলের কথ্যভাষার সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসের কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কের কলকাতায় ক্রিশ্চান আর মুসলমান মেয়েদের ঝগড়ার অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য,

> ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, "হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার। হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মত চর্বি হয়েছে, না লা?... হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত করে হঙ্কার দিয়ে উঠল, "তা বলবি বৈ কিলা সুঁটকি। ছেলের তোর খেরাস্তানের বাড়ির হারাম রাধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!"[৩৩]

উপন্যাসের দুই সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের একটি খণ্ডচিত্র অংকনে নজরুল অসাধারণ দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। সেই সাথে আঞ্চলিক ভাষা ও এর বুলি ব্যবহারে নজরুলের মুন্সিয়ানাও প্রশংসাযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যরচনায় সাধুরীতি ছেড়ে চলিতরীতি গ্রহণ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর *সবুজপত্র* প্রকাশের পর। কিন্তু *সবুজপত্র* প্রকাশের অব্যবহিত পরেই নগরবাসী না হয়েও নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে গদ্যের চলতিরীতিকেই আশ্রয় করেন। কথাসাহিত্যে সাধুরীতির ব্যবহার নজরুলে দেখা যায় পরবর্তীকালে, কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবনের শুরুতে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং *কুহেলিকা* উপন্যাসে। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের গদ্যকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার জন্য চলিতরীতির প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু চলিত-রীতিও কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। এ রীতিও কথ্যরীতি নয়, নজরুলের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য তার কথ্যভঙ্গী, কৃত্রিম চলিতরীতি ব্যবহারের পাশাপাশি তিনি ভাষাকে যথাসম্ভব রাখতে চেয়েছেন কথ্যভঙ্গী সুলভ।[৩৪]

চার.

মহৎশিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তি ভাবনার অন্তরালেও সমাজকে সে অস্বীকার করতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে সমাজ নির্মিতির ক্ষেত্রে নজরুল নিঃসন্দেহে বরপুত্র। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমকালীন কোন সাহিত্যিকের রচনাতেই অখণ্ড সমাজ-সমগ্রতার প্রকাশ ঘটে নি। কিন্তু নজরুল সাহিত্যে সমাজ-সমগ্রতার বিচিত্র রূপ পরিদৃষ্ট। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নজরুল সাহিত্যে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত। সেই সাথে সমকালীন সমাজের জন-আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। অর্থনৈতিক—মন্দায় দরিদ্র জীবনের করাল রূপ, বিশ্বমন্দার কষাঘাতে বিপর্যস্ত জনজীবন, আর এই জীবনের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন তার থেকে মুক্তির শ্লোগান নিয়ে বাংলা সাহিত্য আসরে নজরুলের প্রবেশ। স্বদেশী আন্দোলন, চরকা আন্দোলন, খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের পরও ইংরেজ সদম্ভে তার অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত রাখে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ নাইট খেতাব বর্জন করলেন। রুশবিপ্লবের অভিঘাতের ছোঁয়া লাগে বাংলায়। আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক এই উন্মাতাল কালপর্বেই বাংলা সাহিত্যে নতুন সুরের যোজনা করলেন নজরুল। *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশি*, *সর্বহারা*,

সাম্যবাদী প্রভৃতি কাব্যে তাঁর সমাজ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ও সাহসী উচ্চারণ দেদীপ্য। তাঁর কথাসাহিত্যেও এ ধারা অব্যাহত। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নজরুল সমাজমনস্ক শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন।

কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কের মুসলমান ও দেশি কনভার্ট ক্রিশ্চানদের দৈনন্দিন জীবনচিত্র অঙ্কনে নজরুলের অসাধারণ দক্ষতা অবশ্যই স্বীকার্য। বিশেষ করে ঝগড়ার দৃশ্য এবং দরিদ্র-জীবনভাষ্য অঙ্কনে নজরুল তুলনা-রহিত। গজালের মায়ের সংসারের চালচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেন, 'কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশি টানাটানি ছিল জায়গার। যেটা উনুনশাল, সেইটেই-ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাতে জন-সাতেকের শোয়ার ঘর।'[৩৫]

শুধু স্থানের অভাবই নয়, গজালের মায়ের সংসারের সদস্যরা দুবেলা পেট পুরে খেতেও পায় না, এমনি কি অসুখে মিলে না চিকিৎসা ও পথ্য। মেয়ের সন্তান জন্মদানের জন্য একজন দাই ডাকবার মত সামর্থ্য নেই তার। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি প্যাঁকালেকেও না খেয়ে কাজে যেতে হয়। তারপর লেখকের বর্ণনায় আমরা যখন জানতে পারি, 'প্যাঁকালের চলে যাবার পরই তার দ্বাদশটি ক্ষুধার্ত ভাইপো-ভাইঝি মিলে যে বিচিত্র সুরে ফরিয়াদ করতে লাগল ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত বুঝি আর সবকিছুই বিচলিত হয়।'[৩৬] তখন আমাদের সামনে দারিদ্র্য পীড়িত শোষিত বাঙালি সমাজের রূপ অখণ্ড মূর্তিতে ধরা দেয়। এই উপন্যাসে মেজ-বৌ চরিত্রের মধ্যে সমাজ-সমগ্রতার প্রতিরূপের বাস্তব ভিত্তি পরিণতি লাভ করে। একদিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব-অনটন, রোগজর্জরতা অন্যদিকে অশিক্ষা, কুসংস্কার, শোষণ-শাসন এই যূপকাষ্ঠে মেজ-বৌ, প্যাঁকালে গজালের মায়ের জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত করে তার নিখুঁত বর্ণনা ফুটে উঠেছে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে।

তাছাড়া বিপ্লবী আনসার চরিত্র অবতারণার মাধ্যমে লেখক রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস চরকা আন্দোলন, অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না, তা নজরুল বিশ্বাস করতেন। এছাড়াও রুশবিপ্লবের প্রভাবে গণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও নজরুল মানসকে প্রভাবিত করে। ফলে তার সাহিত্যে সৃষ্টি হয় আনসার, জাহাঙ্গীর ওরফে উলঝুলুলের মত চরিত্র। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের আনসার চরিত্রে ভারতবর্ষের সমকালীন অস্থির রাজনৈতিক জীবন পরিদৃষ্ট। কংগ্রেস রাজনীতি ত্যাগ করে গণমানুষের মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আনসার বৃহত্তর সমাজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। কিন্তু এই প্রয়াস যথার্থরূপে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। প্রসঙ্গত ড. সুশীল কুমার গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে,

> এই গ্রন্থের পটভূমিকায় রয়েছে বাংলাদেশে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। হিন্দু বিপ্লবীদের সঙ্গে মুসলমান যুবকদের দেশপ্রেমের বর্ণনা করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু নায়কের ব্যক্তিগত প্রেম-সমস্যা ও নারীতত্ত্ব বড় হয়ে উঠায় এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সফল হতে পারে নি।[৩৭]

সমালোচকের মন্তব্যটি *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের ক্ষেত্রে আংশিক গ্রহণযোগ্য হলেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নজরুল সাহিত্যের মৌল বৈশিষ্ট্যই এ উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত। জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত বিপর্যস্ত লেখক নজরুল আনসার-এর পরিণতির মধ্যদিয়ে যেন নিজের পরিণতিরই ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত প্রদান করে। সর্বোপরি *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে সমাজের বাস্তব প্রতিরূপ অঙ্কন ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়াসে সংগঠিত কার্যক্রমের দ্বারা পক্ষান্তরে নজরুল সাহিত্য ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতায় একনিষ্ঠ শিল্পী রূপে নিজেকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

পাঁচ.

যেকোন শিল্পের প্রাসঙ্গিক নামকরণ-ঐ শিল্পের স্বরূপ বিকাশে সহায়ক হয়। তাই নামকরণ যেকোন সৃষ্টিকর্মের জন্য একান্ত অপরিহার্য। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য হলো, একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে ক্ষুধা। আমাদের নিত্যদিনের পরম শত্রু— মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই; তা আমাদের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত, এ সত্যটুকু আমাদের জীবনসত্যে অস্বীকৃত। কিন্তু তাকে তো এড়ানো যায় না। তেমনি বাঁচতে গেলে ক্ষুধা দানবের মতো প্রতিমুহূর্তে গ্রাস করতে চায়। তাই মৃত্যু ও ক্ষুধার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মানুষ সর্বকালে সর্ব অবস্থায় দিশেহারা ও অসহায়। নজরুল উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে একদিকে মৃত্যুকে দেখিয়েছেন তার শাশ্বত প্রবহমানতায়। আবার ক্ষুধাকে দেখিয়েছেন অনিবার্য চাহিদায়। তাই আমরা মেজ-বৌ ও তার সন্তানের মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারি নি, কারণ প্রতিরোধ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য ছিল না বলে। আনসার ও রুবির মৃত্যু ট্র্যাজেডির মতই আমাদেরকে অনাবিল তৃপ্তি দেয়। কারণ সেখানে দেহের ক্ষুধায় ও পরিতৃপ্তির স্বাদ তারা পেয়েছে বলে। কিন্তু মেজ-বৌ জীবনে কি পেল? সে

একদিকে মৃত্যুকে দেখেছে, অনুধাবন করেছে, মৃত্যুর সাথে বসবাস করেও মৃত্যু তাকে যেন পরাভূত করতে পারে নি। অন্যদিকে ক্ষুধার রাজ্যে বিচরণ করেও দেহের ক্ষুধাই চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তার রূপ-যৌবন-প্রেম সবই যেন ক্ষুধার করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। নজরুল একটি মাত্র চরিত্রের মধ্যেই মৃত্যু ও ক্ষুধাকে সীমায়িত করতে চেয়েছেন। তাই উপন্যাসের যেখানে শেষ মেজ-বৌ তখনও সেখানে আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থেকে যাচ্ছে। চিরকালীন মৃত্যু ও ক্ষুধার ভৌতিক আলো নিয়ে সে বসে আছে আমাদেরই নিত্যদিনের সংসার জীবনের দেউলে।[৩৮]

তাছাড়া গজালের মায়ের সংসারের মৃত্যু ও ক্ষুধার যে চিত্র উপন্যাসে দেখা যায় তাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপন্যাসের শুরুতে লেখক যখন বলেন, 'এ যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই! আমদানি হতে যতক্ষণ রফতানি হতেও ততক্ষণ।' অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের এই চাঁদসড়কে মৃত্যুর জন্য লেখক দায়ী করেছেন মূলত ক্ষুধাকে আবার রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল থেকে লতিফার নিকট লেখা পত্রে বিপ্লবী আনসার যখন বলে, 'এ কি ক্ষুধা আমার? এই কি মৃত্যু ক্ষুধা? তখনও মৃত্যু ও ক্ষুধাকে ঘিরে এক ধরনের রহস্য জাল সৃষ্টি হয়। বিপ্লবের স্বপ্ন সাধ উপেক্ষা করে আনসার প্রেমিকার সাথে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। যার পরিণতিতে তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ উপন্যাসটিতে একদিকে পেটের ক্ষুধা অন্যদিকে জৈবিক ক্ষুধার সম্মিলিত ধারা বহমান। যার পরিণতিতে ঘটেছে অনিবার্য মৃত্যু। এই মৃত্যুর বীভৎস বর্ণনা মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের মূল ঘটনা প্রবাহকে করেছে নিয়ন্ত্রণ। তাই উপন্যাসের নামকরণ *মৃত্যুক্ষুধা* যথার্থ ও সার্থকতার দাবি রাখে।

ছয়.

যেকোন শিল্প সৃষ্টির পেছনে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ প্রতিফলিত হয়। শিল্পী তাঁর জীবন সত্যে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে করেন অভিষিক্ত। নজরুল বিদ্রোহী কবি, সাম্যের কবি, মানবতাবাদের কবি। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর ভালবাসা ও দরদ। 'জীবনের একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে' জমাকৃত 'কোটি কোটি টাকা'- 'এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান' নজরুল কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি বিদ্রোহ করেছেন 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা পুরাতন পচা, সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নাম কুসংস্কার ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে।' অর্থাৎ মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও প্রেমের জন্যই তিনি হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী। আবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পরম অন্বিষ্ট। তাছাড়া পরাধীন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তিনিই প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। অথচ সমকালে কোন রাজনৈতিক নেতাও স্বাধীনতার ঘোষণার মত সাহসী উচ্চারণে এগিয়ে আসেন নি। অন্যদিকে রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে সাম্যবাদের দ্বারাও নজরুল প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত এক বীর সেনানী।

নজরুল সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিল লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অসহায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। তারা ছিল কুলি, মজুর, কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার-কুমোর প্রভৃতি শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষ। এ সব সাধারণ মানুষের জীবনভাষ্য এবং তাঁদের অধিকার আদায়ের মহানায়ক হিসেবে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে অবতারণা করা হয়েছে বিপ্লবী আনসারকে। আর এ চরিত্রের মাধ্যমেই লেখক তার ব্যক্তি মানসের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছেন।

অনেকে মনে করেন, নজরুলের গদ্য-সাহিত্য অনেকটাই শিথিল, কাব্যের সুকঠিন যুথবদ্ধতার তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে তা অপরিপক্ব। কিন্তু *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসটি নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় এবং জীবনজিজ্ঞাসার অভিনব ব্যঞ্জনায় নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা* অনেকটাই সফল। ড. সুশীল কুমারের মতে, *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের জন্য নজরুল সৎ ঔপন্যাসিকের গৌরব করতে পারেন। এটাই সত্যিকার লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস নজরুলের। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থক শিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছেন।'[৩৯] উপন্যাসটি প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, *মৃত্যুক্ষুধাই* নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পেটের ক্ষুধা মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার ধর্ম বিশ্বাস এবং জন্মার্জিত সংস্কার কিভাবে শিথিল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নজরুল তার ছবি এঁকেছেন এ উপন্যাসে।'[৪০]

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটি নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও *মৃত্যুক্ষুধাই* নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং শিল্প সফলতার দিক থেকে এক অনন্য স্মারক।

তথ্যসূচি:

---

১. নারায়ণ চৌধুরী, নজরুল চর্চা, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০, পৃ. ৯৪

২. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ: ১৯৯৩, পৃ. ৬০৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫

৯. চন্দন আনোয়ার, নজরুল সাহিত্য ঃ প্রসঙ্গ প্রেম, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২০০৯, পৃ. ১৩৫

১০. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৭

১১. মোঃ হারুন-অর-রশীদ, চিরঞ্জীব নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২০০০, পৃ. ৯৯

১২. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩২

১৫. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত মানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ: ১৯৯৭, পৃ. ২৭৩

১৬. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০

২৩. মাক্সিম গোর্কি, মা (অনুবাদ: পুষ্পময়ী বসু),' রাদুগা' প্রকাশন, মস্কো, সপ্তম সংস্করণ:১৯৭৯, পৃ. ১৭৬-১৭৭

২৪. মুহম্মদ আবদুল হাই, উপন্যাস রচনায় নজরুল, নজরুল স্মৃতি (বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত), সাহিত্যম্, কলকাতা, নতুন সংস্করণ: ১৯৮৭, পৃ. ১১৭-১১৮

২৫. চন্দন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২৬. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

২৯. চন্দন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৩০. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬

৩১. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৯৭, পৃ. ৫৬০

৩২. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৮৭, পৃ. ৮১

৩৩. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০

৩৪. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১

৩৫. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬

৩৬. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮

৩৭. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৩৮. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, নজরুল-সাহিত্যে সমাজচিন্তা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২০০০, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৯. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

৪০. মুহম্মদ আবদুল হাই, উপন্যাস রচনায় নজরুল, নজরুল স্মৃতি (বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত), সাহিত্যম্, কলকাতা, নতুন সংস্করণ: ১৯৮৭, পৃ. ১১৮

নজরুলের 'সাম্যবাদী': মানবতা-প্রবণতার চিত্রভাষ্য

ফজলুল হক সৈকত*

উনিশ শতকের রোম্যান্টিসিজমের রূপান্তরমূলক যে কাঠামো বিশ শতকের মডার্নিজমের শরীরে, তারই মেঘ-ছায়াতলে কাজী নজরুল ইসলামের [জন্ম: ২৫ মে ১৮৯৯; মৃত্যু: ২৯ আগস্ট ১৯৭৬] প্রতিভার প্রক্ষেপণ-ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল হর্ষঘেরা প্রবণতায়। একুশ শতকের প্রথম প্রহরে এখন যখন মডার্নিজমের আক্ষেপ শমিত ও দমিত, উত্তর আধুনিকতাবাদ যা-যা এড়িয়ে-মাড়িয়ে গেছে, ধুলো ঝেড়ে তুলে নিতে প্রস্তুত পুনর্বার, তখন নজরুলের চিন্তাজগতের দরোজায় কড়া নড়ে ওঠে যেন অনিবার্যভাবে। হয়তো নজরুলের শিরা-শোণিতের সংক্ষোভ, ইতিবাচকতা আজ বাংলা কবিতায় বড় বেশি প্রয়োজন। তাঁর সংশয়হীনতা, জাগ্রত মানুষের প্রতি প্রবল আস্থা আর অস্তিত্ব-ব্যক্তিত্বের মজবুত ভিত বাঙালি সমাজ ও সভ্যতায় সমূহ নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার উচ্চারণ। পরাধীন-পর্যুদস্ত একটি জাতির সামনে তাঁর আবির্ভাব ছিল আলোকবর্তিকার মতো। দিক-নির্দেশক বাতিঘরের মতো। জাতিকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য, সামগ্রিকভাবে সচেতন করার জন্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য যে সর্বপ্লাবী প্রতিভার তখন দরকার

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

হয়ে পড়েছিল– কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই প্রার্থিত, কাঙ্ক্ষিত প্রতিভা। আরেকভাবে বলা যায়, বাংলা কবিতা কেবল একবার সমুদ্রের ভয়াল গর্জন নিয়ে ফুঁসে উঠেছিল, মাত্র একবার উন্নত শির আর তেজতপ্তলাভা-শব্দপুঞ্জের সাথে প্রেম ও প্রকৃতির অনন্যসাধারণ মিশ্রণে ভেসে গিয়েছিল এবং তা অবশ্যই নজরুলের মধ্য দিয়ে। যাবতীয় অসুন্দরের বিরুদ্ধে নজরুলের প্রতিবাদ এবং তাঁর শুভবোধ আমাদের চিন্তা-ভুবনে তাই প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলে এক অনাবিল বিলোড়ন। আর আমরা যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো আশ্রয় খুঁজতে থাকি নজরুলের সাহিত্যদর্শনের, শিল্পদর্শনের ইতিবাচক প্রহরের বিস্তৃত পরিসরে।

বিশেষ এক কালপর্বে নজরুল বিস্ময়কর প্রতিভা। সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক ধারা, দার্শনিক চিন্তা এবং শিল্পের মননশীলতা ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে নজরুল এক গুরুত্বপূর্ণ অভিধা। ভারতীয় রাজনীতির উথাল-পাথাল তরঙ্গে এবং সমাজের ভয়াবহ সংকটের কালে 'ঔপনিবেশিক ক্ষমতা'র বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি। সংগ্রাম করেছেন সকল প্রকার শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং অহিংস নীতির অন্তর্নিহিত দেউলিয়াত্ব অনুধাবন করেছিলেন সাম্যবাদ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ নজরুল; তাই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত অর্জনের প্রশ্নে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নিয়ে ভাবতে চাননি। নজরুলের মনে নতুন ভারতবর্ষের প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ছাড়াও তাঁর শিক্ষক শ্রী নিবারণচন্দ্র ঘটক প্রভাব ফেলেছিলেন। নিবারণচন্দ্রের সংগ্রামী সান্নিধ্যে নজরুল এসেছিলেন ১৯১৭ সালে। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক এই নিবারণচন্দ্র ঘটক তখন পশ্চিমবঙ্গীয় বিপ্লববাদী সংগঠন 'যুগান্তর'-এর সক্রিয় সদস্য।[১] দেশ-কালের সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মার যে যোগাযোগ, সেই শক্তি নজরুলকে কালান্তরে মহানায়কের ভূমিকায় আসীন করেছে। ক্রান্তি-সঙ্কটের এই বর্তমানে নজরুল আমাদের আরো অধিকতর প্রাসঙ্গিক এবং নমস্য। সমূহ অন্যায়-অবিচার আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিপক্ষে তাঁর স্বভাবজ আবেগের স্পন্দন-বিলোড়নের অন্তরালে আন্তরসত্যে অঙ্গীকার ছিল সুদৃঢ়। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধ বাঙালিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে প্রহরে প্রহরে। 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।'[২] আজ যেন আমাদের প্রাত্যহিক উচ্চারণের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতি-ধর্মের পারস্পরিক সম্প্রীতি নজরুল-ভাবনার এক অনবদ্য আলোকশিখা। তাঁর আদর্শ ছিল এমন এক সমাজ, যেখানে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ থাকবে না। শ্রেণিবিভাজনের উর্ধ্বে সকলের পরিচয় হবে অভিন্ন। 'মানুষ' হিসেবে পরিচিত হবে সবাই। তিনি বাঙালিকে শুধু বাঙালি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ দেশের সম্প্রদায়িকতা বিষয়টি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মধ্যেবিত্তের বৈরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর তাই তিনি নিজের সম্প্রদায়ের ভিতরে খুব স্পষ্ট অবস্থানে থেকেই তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন ও প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন: 'ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের।'[৩] সাম্প্রদায়িকতা যে ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা তা নজরুল গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৯২২ সালের শেষদিকে নজরুল বামপন্থার সাথে পরিচিত হন। বামপন্থার রাজনৈতিক আদর্শ কবিকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের অভিঘাত নজরুলের ভাবনায় প্রতিফলিত হয়। ফলে 'রাজনৈতিক প্রপঞ্চ', 'সামাজিক বিন্যাস' এবং 'সংগ্রাম' সম্পর্কে তাঁর মধ্যে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে। এই প্রতিফলনের কারণেই নজরুল সামাজিক বিন্যাসকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হন। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অংশ হিসেবে শোষণ জিইয়ে রাখে এরকম কোনো আদর্শ বা তত্ত্বকে তাই নজরুল মেনে নেননি। যে সত্যটি নজরুলের উপলব্ধিকে শাণিত করতে সাহায্য করেছে তা হচ্ছে ভারতবর্ষের পরাধীনতা। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন 'চরকা' বা 'দেশজ খদ্দর কাপড়' একটা জাতির মুক্তির একমাত্র পথ হতে পারে না। দেশ যেখানে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া, ঔপনিবেশিক শক্তি যেখানে অদম্য শক্তিতে তৎপর, সেখানে চরকা কিংবা অসহযোগ আন্দোলন মুক্তির পথ নয়। এই সময় নজরুলের মনে 'স্বরাজ' নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। এই বোধই ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত 'শ্রমিক প্রজা কৃষক পার্টি' গড়ে তুলতে তাঁকে প্রেরণা যোগায়।[৪] পার্টির উদ্যোগে নজরুল সাপ্তাহিক 'লাঙল'[৫] পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মূল নির্যাসই হলো ঔপনিবেশিক শক্তির বহুমুখী তৎপরতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে শাণিত করা।

নজরুলের 'সাম্যবাদী' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'শ্রমিক প্রজা কৃষক পার্টি'র মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার বিশেষ [প্রথম] সংখ্যায় 'সর্বপ্রধান সম্পদ-রূপে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'সাম্যবাদী' গ্রন্থের কবিতাবলিতে ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়গত ভেদাভেদকে অতিক্রম করে মানবতাবাদী চেতনায় সাম্যবাদী-প্রবণতাকে জায়গা করে দিয়েছেন নজরুল। কবির মতে সকল ধর্মের মূল বাণী হলো– মানুষ ও মানবতা। তাঁর

ধারণা বিভেদ আর শ্রেণিবিভাজন করেছে মানুষ; নিজেদের লাভের জন্য। তাই সমাজের কোলাহল থেকে সরে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের আকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি দারুণ আগ্রহ ও সাহসের সাথে। মানুষের জয়গান গেয়েছেন কবি দেশ-কাল-পাত্রের ভেদাভেদকে ছাড়িয়ে। লিখছেন সে কথা:

গাহি সাম্যের গান–

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্ !/ নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।–.../ হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।/ মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি.../ – মূর্খরা সব শোন,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; – গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!/ [মানুষ: সাম্যবাদী]

সাম্যবাদী জীবনের চেতনায় উপনিবেশ বিরোধিতা এবং জাতীয়তাবাদ নজরুলের মধ্যে মহত্তর বোধে চালিত হতে পেরেছে। নজরুল তাঁর কাব্যজীবনের প্রারম্ভ থেকেই হিন্দু-মুসমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অভিন্ন বলয়ে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলন যখন কতকটা স্তিমিত, তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাতাস তীব্র হয়ে উঠল। নজরুল তখন বাঙালি জাতির সামনে নিয়ে এলেন মানবতাবাদের শাশ্বত বারতা। তিনি লিখলেন: "নদীর পাশ দিয়ে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ-প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু– তার জন্য ত তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি– আমারই মত একজন মানুষকে।'[৬] তার ভাবনায় সমুন্নত ছিল মানব জাতির ঐতিহ্য। সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। দাঙ্গায় যে উভয় সম্প্রদায়েরই দায় রয়েছে তা তিনি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে অবলোকন ও উপলব্ধি করেছেন। কুসংস্কার আর সঙ্কীর্ণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকরা তাঁকে তাঁর সৃষ্টির পথে বার বার বাধা দিয়েছে। দৃঢ়চেতা কবি নজরুল তখনও থেকেছেন আপোসহীন, প্রবল প্রতিবাদী। প্রসঙ্গত, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেয়া তাঁর ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল– "কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।"[৭] মানবিকতা আর সহমর্মিতায় তাঁর চিন্তা আচ্ছন্ন ছিল সর্বদা। সমূহ বাধা-বিপত্তি-ব্যবধানকে দূরে সরাতে চেয়েছেন নজরুল:

গাহি সাম্যের গান–/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম- ক্রীশ্চান।.../ মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই। [সাম্যবাদী: সাম্যবাদী]

দেশের ও জাতির শান্তি রক্ষায় কিংবা পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর যে অভিব্যক্তির প্রকাশ, তা জাতীয় চেতনার প্রতি তাঁর প্রবল বিশ্বস্ততাকেই ধারণ করে। হিংসামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। নজরুলের সৃষ্টিশীল কর্মজীবনের মূল সাধনা ছিল জাতি-ধর্মের-গোত্রের বিভেদমোচন। সকল দেশের মুক্তির পথের যাত্রী তিনি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের বিপক্ষে যে অভিযান, তার পন্থা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত. সাফল্যের মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না, কারণ মানুষ বাঁচে তার চেষ্টাতে, সাফল্যে নয়। মুক্তিলাভের আদর্শ মানব-সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কোথাও তা ধনাভিজাত্যের বিপক্ষে কোথাও বা প্রতিষ্ঠিত অত্যাচারমূলক রাজ ব্যক্তির বিপক্ষে, কোথাও বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে। এই যে সমাজের বা রাজশক্তির বা যে কোন প্রকার আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই বিদ্রোহের শক্তি নজরুল মনে-প্রাণে ধারণ করেছিলেন। নজরুল সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অন্যায়, অপশক্তির মূল উৎপাটনের দিকেও সচেতন মানুষের বিশেষ দৃষ্টি কামনা করেছেন এবং তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যে রাজশক্তি মানুষের প্রতি পাশবিক আচরণ করে, যে রাজশক্তি অগণন নারীকে বিধবা কিংবা সন্তানহারা করে, সেই রাজশক্তির ধ্বংস অনিবার্য। জাগ্রত জনতাই নজরুলের আরাধ্য ছিল। তাই জাগ্রত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো প্রকার ধর্মবিদ্বেষ দৃষ্টিগোচর হয়নি তাঁর। দেখাননি জাতিবিদ্বেষও। জাতি-গোত্র কেন্দ্রিক হানাহানি থেকে মুক্ত হয়ে ভালোবাসার সাগরে ভাসবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর সরল বিবরণ:

সাম্যবাদী-স্থান–

নাই কো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।/ নাই কো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গীর্জা-ঘর,
নাই কো পাইক-বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।/ এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্‌ত, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছে ভাই ভাই। [সাম্য: সাম্যবাদী]

নজরুল এ সরল সোজা-পথেই মুক্তি অন্বেষণ করেছেন। সম্মিলিত শক্তিই যে পরিত্রাণের মোক্ষম উপায়, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতীয় সমাজতন্ত্র কেবল ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বিশ্ববাসীকে পথ দেখাবে, ওরকমের জাতীয়তাবাদী স্বপ্ন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্রও দেখতে ভালোবাসতেন। তবে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মিলন ঘটানোর এই চিন্তাটিকে যে নতুন ও অভিনব বলা যাবে তা অবশ্য নয়। জাতীয়তাবাদী হিটলারও ওই চিন্তা পোষণ করতেন এবং তাঁর নাৎসী পার্টির নামই ছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রী পার্টি। সুভাষচন্দ্র যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতেন তার সাথে কেবল যে স্বামী বিবেকানন্দই যুক্ত ছিলেন তা নয়, চিত্তরঞ্জন দাসের কর্মসূচিতে তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে বলে তিনি ভাবতেন। কিন্তু এই যে জাতীয়তাবাদী কাঙ্ক্ষিত ঐক্য এর ভিত্তিটা কী হবে? গান্ধীর ক্ষেত্রে ঐক্যের ভিত্তি ছিল ধর্ম; যদিও তিনি ওইভাবে কথাটা বলেননি, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নাকচ করে দিয়েছেন। পরাধীন ভারতেবর্ষে জাতীয়তাবাদ, স্বভাবতই সামনে এসেছে, কিন্তু স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য যাঁরা অগ্রপথিক তাঁদের পক্ষে জাতীয়তাবাদকে ডিঙিয়ে যাওয়া দরকার ছিল সমাজতন্ত্রের দিকে; সুভাষচন্দ্র সেদিকে যাননি, যদিও যাবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত এককেন্দ্রিক শক্ত রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়নি, বরঞ্চ সমাজতন্ত্রের ধারণার বিপক্ষেই কাজ করেছে। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতার সামাজিকীকরণ চায়, তার শর্ত হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। বলশেভিজম সেটিই ঘটাতে চেয়েছিল। সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদকে যে বিদেশি মতবাদ বলেছেন এবং তার পরিবর্তে স্থানীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবন করবেন বলে জানিয়েছেন সেই বক্তব্যে জোরটা যতটা সমাজতন্ত্রের ওপর পড়েছে, তার চেয়ে বেশি পড়েছে স্থানীয়ত্বের ওপর। 'এদেশে বিদেশি কোনো মতবাদ চলবে না'– এমন ঘোষণা সেইসব শাসকদের কণ্ঠ থেকে আমাদেরকে কতবার শুনতে হয়েছে, যারা সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে প্রাণপণে সচেষ্ট ছিল।[৮] নজরুলের জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদী চেতনাকে বুঝতে হলে তৎকালীন ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক চরিত্রটিকে অনুধাবন করতে হবে। আর আমরা জানি, মহৎপ্রাণ মানুষ সত্য চিনতে ভুল করেন না। আর তাই তাঁদের ভাবনা নিবদ্ধ থাকে কল্যাণকামিতার দিকে। তাঁদের মতে ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম। নজরুলের কাছে মানুষের মূল্য এত বেশি যে ধর্মবেত্তাদের একই সারিতে সহজে সাজাতে পারার ঔদার্য ও সাহস দেখিয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন 'বুদ্ধ-কৃষ্ণ-মোহাম্মদ-রাম' ধর্মবিশেষের ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত হলেও বিস্তৃত অর্থে তাঁরা মানুষেরই বন্ধু।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-সাধনার পুরোসময় মানুষকে মানবতাবাদে উজ্জীবিত হবার পথে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আর সকলকে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ওঠার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। মূলত তাঁর সাহিত্য ভাবনার অন্যতম প্রধান সুর হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রয়াস। 'মন্দির ও মসজিদ' নামক প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন– 'মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে– যাহার হওয়া উচিৎ ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু– তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা-জ্বালা মহামন্দিরের আঙ্গিনাতলে!'[৯] নজরুল চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা। তাঁর সৃষ্টিকর্মে তাই স্থান পেয়েছে উদার মানবতাবাদ ও প্রাণময়তার মাহাত্ম্য। নজরুলের শিল্পদর্শন উগ্রসাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে স্থিত। তিনি মোল্লাতন্ত্র-পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তি অসাম্পদায়িকতার প্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নজরুল তাই তাঁর সমকালে এবং কালের প্রবহমানতায় কালোত্তরেও সাম্যবাদী সম্প্রীতি প্রত্যাশীদের শক্তি ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছেন। আজ সভ্যতার অগ্রগতির এ আলোয় এবং প্রযুক্তির প্রবল উৎকর্ষের দিনে আবারও যেন ধ্বনিত হতে শুনি নজরুলের সেই সাম্যের দিকে আর শান্তির পক্ষের আহ্বান: 'প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহা-ভারতের হিমালয়/(আজ) এই কথা যেন কয়–/মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে/ইহা কি সত্য নয়?/হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,/সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল!'[১০] নজরুলের এই আকুতি যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি– এই প্রত্যাশা, আজ এই ক্রান্তিকালে বড়ই প্রাসঙ্গিক। বড়ো-ছোটর পার্থক্যকে ঘোচাতে হলে অতি-অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বড়োকে। এবং মানবতার কবি নজরুল এ-বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। জানাচ্ছেন আমাদেরকে তাঁর সে আশার বাণী:

কালের চরকা ঘোর,/ দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে– চড়ে দেড়শত চোর।

এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়–/ সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়।

[রাজা-প্রজা: সাম্যবাদী]

কবিতায় ভাষার নবায়নের যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন টি.এস. এলিয়ট, সে অনুভবের ইতিবাচক ও বাস্তব অনুশীলন আমরা নজরুলে পাই। অনুকরণে কিংবা প্রভাবে অভ্যস্ত না-হয়ে তিনি স্বকীয় শব্দাবলি প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা নির্মাণ করতে পেরেছিলেন অনায়াসে। সমাজের, জীবনের আর মানুষের বিচিত্র প্রবণতার শাঁস-সত্যটি তিনি অকপটে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন কালের কাব্যরুচি আর হৃদয়গত কাব্যবাণীর প্রকাশধর্মিতার প্রবল চাপের কারণে। ব্যক্তি নজরুল যেমন ছিলেন আকর্ষণীয়, তেমনি তাঁর চিন্তালোক, সাহিত্যলোক পাঠককে আকর্ষণ করেছে উচ্চকণ্ঠে, ধ্বনিনির্ভর ঝড়-বর্ষণ-কান্নার আওয়াজে-মোড়া বহির্মুখি প্রবণতার কঠিন বাস্তবতায়। নিজের সম্পর্কে বড় সাবধান নজরুল ঘোষণা করেছেন: 'আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,– কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,– আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।'[১১] সত্য-সুন্দর আর অগ্রগমণের কবি নজরুল বলছেন সত্য-অন্বেষার কথামালা:

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল জুড়ে?

কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চুড়ে?...

ডুবে নাই তারা অতল গভীরে রত্ন-সিন্ধুতলে,

শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

[ঈশ্বর: সাম্যবাদী]

নতুন শিল্প নিয়ে কথা বলার পরিবর্তে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন দার্শনিক গ্রামসি। নজরুলের সাহিত্যকর্মে আমরা গ্রামসি'র এ কথার প্রাসঙ্গিক ও ইতিবাচক প্রয়োগ লক্ষ্য করি। তিনি শিল্পের চাতুর্যকে ধরতে চেষ্টা করেননি তেমনভাবে, বরং খুঁজেছেন নতুন সংস্কৃতির আলো। আর তা হলো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংস্কৃতি উদ্ভাসনের যে আহ্বান নজরুলের, তাতে গণমানুষের সমর্থনও যোগ ছিল। বলা চলে নজরুল ওই বিশেষ বোধকে সচেতন মানুষের চিন্তন সুতোয় প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন। সময় ও সমাজ পরিসরে তাঁর এ অভিযাত্রা বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালিকে অমিত আলোর এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়েছে। তাই সকল ইতিবাচক বিদ্রোহে-সংগ্রামে নজরুল আমাদের নমস্য। উত্তর-উপনিবেশবাদ সম্পর্কে নজরুলের ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট– প্রয়োজনে সশস্ত্র আন্দোলন এবং সর্বহারাদের সংগঠিত করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা– কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আপোসহীন, অতিসাধারণ জীবনযাপনে সংগ্রামী 'মহান দারিদ্র্যের' এক প্রতিবাদী প্রতিনিধি। আর সেই প্রতিবাদী চেতনা থেকে তিনি সমূহ শুভবোধ ও ইতিবাচক অনুভূতিকে লালন ও প্রকাশ করেছেন সাহিত্যচর্চার সময়-পরিসরে। শিল্প-প্রতিভা এবং নিবেদিত-প্রাণ কর্মী নজরুলের জীবনচেতনা বিরল কৃতিত্বে ভাস্বর। তাঁর ঘোষণা:

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে,/ ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।

দিব্যি পেতেছ খল কলও'লা মানুষ-পেষানো কল,/ আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল!

[চোর-ডাকাত: সাম্যবাদী]

তিনি জানতেন তাগিদই মানুষকে তার অধিকার আদায়ে প্রত্যয়ী হতে শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগায়। নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। পতিতা বলে গালি দিতে, অশ্রদ্ধা করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব-স্বাধীনতা-ভালোলাগা-মন্দলাগাকে বিবেচনায় রেখে নজরুল সাজিয়েছেন 'বারাঙ্গনা' কবিতার কথারাজি। নজরুল জানেন– বিশ্বাস করেন, কোনো মানুষ ধার্মিক বা ধর্মের অনুসারী হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় না; পারিপার্শ্বিকতা এবং সমাজগতির অভ্যাসবশত ধর্ম ও মত অবলম্বন করে মানুষ। আর পাপ-পুণ্যের হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এবং অভিমতও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের জন্মরহস্য, মানুষের মানসিক-শারীরিক সম্পর্কের বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে– সচেতন পাঠক সামান্য হলেও ভাবতে সহায়তা করে। সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিধান আর মানুষের মনের ইচ্ছা আর আকুলতার মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাকে তিনি মানবসৃষ্ট দুর্যোগই বোধ হয় বলতে চেয়েছেন; যে মহাদুর্যোগের অসহায় শিকার আমরা প্রায় সকলে– সভ্যতার প্রারম্ভকাল থেকে। সত্যভাষী-সাহসী– সমাজ-বিপ্লবী নজরুল জানাচ্ছেন:

শোনো মানুষের বাণী,/ জনমের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোনো গ্লানি!

পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?

শত পাপ ক'রি হয়নি ক্ষুণ্ন দেবত্ব দেবতার।...

শুন ধর্মের চাঁই–/ জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,/ অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!

[বারাঙ্গনা: সাম্যবাদী]

'যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন।'[১২] নজরুল তাঁর সমকালে এদেশের মানুষের অকল্যাণ-অবনতির আশঙ্কায় অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ী থেকে আমাদেরকে এক অনন্য কাব্যসুধা দান করেছিলেন। আর দিয়েছিলেন প্রতিবাদে প্রস্তুতি নেওয়ার শক্তি ও শক্তির মানসিক খোরাক। নজরুলের প্রয়োজন শেষ হবার নয়; যাবতীয় নেতিবাচকতা ও অশুভের বিপরীত বোধে তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। নারী-পুরুষের সহাবস্থান এবং পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে সভ্যতার সমূহ সৌন্দর্য। নারী পুরুষের কিংবা পুরুষ নারীর প্রতিযোগী নয়; শত্রুও নয়– তারা পরস্পরের সম্পূরক। এই সহজ সত্যটি আমরা বেমালুম ভুলে থাকি ব্যক্তিস্বার্থের মোহজালে আবদ্ধ থাকার কারণে। কবি নজরুল আমাদের ঘুমে-কাতর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন সে সত্যের রঙ ও বারতা:

সাম্যের গান গাই–

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।/ বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।.../ এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,

নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।.. ./ জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শস্য-লক্ষী নারী,

সুষমা-লক্ষী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।/ [নারী: সাম্যবাদী]

আমরা জানি পুঁজির যাত্রা শুরু হয় পণ্য সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে। উৎপাদনের পর যে সঞ্চালন, তার বিকশিত রূপই বাণিজ্য নামে পরিচিত। পুঁজির আধুনিক ইতিহাসের শুরুর কথা বলতে গিয়ে কার্ল মার্কস বলেছেন, ১৬ শতকে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য এবং বাজার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এর শুরু। ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে না হলেও পুঁজির যাত্রা অবশ্যই শুরু হয় মুদ্রা বা অর্থ দিয়ে; এটি আবির্ভূত হয় মুদ্রা-সম্পত্তি হিসেবে, বণিক এবং মহাজনের পুঁজি হিসেবে।[১৩] মার্কস বলেছেন, কোনো কোনো সামগ্রী আছে যেমন খাদ্য বা জ্বালানি– এগুলো প্রতিদিনই লাগে। আবার কোনো কোনোটির ব্যয় যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়– এগুলো মাসে, দুইমাসে বা বছরে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু সে যাই হোক আয়টা এমন হতে হবে যাতে এই সবগুলো ব্যয় নিশ্চিত করা যায়। শ্রমশক্তির মূল্যের ন্যূনতম সীমা হলো এই সবকিছুর ব্যয় নিশ্চিত করবার মতো প্রয়োজনীয় আয়। শ্রমশক্তির দাম যদি এই ন্যূনতম সীমার নিচে বা তার মূল্যের নিচে নেমে আসে, তাহলে শ্রমশক্তির রক্ষণ ও বিকাশ ঘটবে বিকলাঙ্গরূপে। পণ্য হিসেবে শ্রমশক্তি আলোচনায় যে এসব বিষয় অবধারিতভাবে আসে তা অনেক তাত্ত্বিকই স্বীকার করতে চান না বা সরাসরি উপেক্ষা করেন বলে মার্কস উল্লেখ করেছেন।[১৪] অন্যসব পণ্যের মতো শ্রমশক্তিরও একটি মূল্য নিশ্চয়ই থাকবে। প্রশ্ন হলো, এই বিশেষ ধরনের মূল্য নির্ধারিত হবে কীভাবে?[১৫] আমরা যে শ্রমিককে তার প্রাপ্য মূল্য দেই না, তা নজরুলের কবিতার ভাষ্যে পাওয়া যায়। এই অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদও জানিয়েছেন কবি। লোভ আর স্বার্থের চেতনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মনের পবিত্রতাকে আশ্রয় করে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের কথা বলেছেন নজরুল। প্রসঙ্গত কুলি-মজুরকে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে না দিয়ে তাদেরকে সম্মান জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদেরকে বঞ্চিত করার প্রতি প্রতিবাদের ইঙ্গিতও রয়েছে এখানে:

তোমার অট্টালিকা/ কার খুনে রাঙা?– ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।

তুমি জান না ক', কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে/ ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।

আসিতেছে শুভ দিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!

[কুলি-মজুর: সাম্যবাদী]

'নজরুল ইসলাম যখন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন, তখন সমগ্র বাংলায় তথা সমগ্র উপমহাদেশে [বর্তমান বাংলা-পাকভারত-শ্রীলংকা] সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীদের উপর সাম্রাজ্যবাদের ভ্রুকুটি,

জালিয়ান ওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে রঞ্জিত রাজপথ, বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের সাজানো বাগানে তীব্রতর ধ্বস, আর রুশ বিপ্লবের এবং ইউরোপের তৎকালীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী লেখক ন্যুট হামসুন, লরেন্স প্রমুখের প্রভাবে মান্ধাতা আমলের ধ্যানধারণার বুনিয়াদে তীব্র কষাঘাত এবং দুঃখ বেদনা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বৃহৎ সম্ভাবনাময় নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের প্রত্যাশা অদৃশ্য আন্দোলনের হাতছানি দিচ্ছে। সংকটাপন্ন বুদ্ধিবাদ তখন পথের সন্ধানে উচ্চকিত। নতুন বাস্তব অবস্থায় আস্থা স্থাপনের আগ্রহ আকুলি বিকুলি করছে। নজরুলের মাধ্যমে সেই মানসরূপটিই হুবহু প্রফিলিত হয়েছে।'[১৬] সারাদুনিয়ার সকল মানুষ এক জাতি; মানবসমাজ– এই পরিচয় যেন সত্য হয়; প্রতিষ্ঠা পায় মানবিক পরিচিতি– এই ছিল নজরুলের বাসনা। মহামিলনের আকুলতা তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন চিরন্তনতার সার্টিফিকেট। মিলনের সুরের আনন্দে নজরুল দুর করতে চেয়েছেন সকল ব্যথা-যন্ত্রণার অভিশাপ। তিনি জানাচ্ছেন:

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশি।/ এক জনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।/ একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা– সকলের অপমান।
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান।/ [কুলি-মজুর: সাম্যবাদী]

সঙ্গীতের জন্য নজরুল চিরকাল বেঁচে থাকবেন সেইটি প্রায় সকলেই মানবেন, কিন্তু বিদ্রোহ ও সাম্যবাদী চেতনার জন্যও যে তিনি সবসময় প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন, সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। উপনিবেশের কাল বিগত হয়েছে বটে। কিন্তু নব্য-উপনিবেশবাদ ও নব্য-সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করেছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে; যে-ভূমিতে নজরুলের জন্ম হয়েছে এবং যে-রাষ্ট্র তাঁকে জাতীয় কবি করেছে, সবখানেই। এমন নব নব রূপে আসে অত্যাচার. শোষণ পীড়ন, জাতিতে জাতিতে সংঘাত, দাঙ্গা, যুদ্ধ, পরসম্পদ ও রাজ্য লুট এবং থেকে যায় বিপুল বৈষম্য মানুষে মানুষে। এগুলোর কোনোটিরই অবসান হয় না, বিদ্যমান কাঠামোয় হবেও না কোনোদিন। তাই নজরুল একালেও জরুরি, আগামিকালেও। নজরুল সাহিত্যের মূল্যবিচারে নতুন নতুন আধুনিক সমালোচনাসূত্র একালের দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট আরও গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করবে। এখন প্রাচ্যবাদ, উত্তর আধুনিক, উত্তর-উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র, উন্নয়ন, নারীবাদ, বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার ইত্যাদি নতুন তত্ত্বালোকে নজরুল সাহিত্য অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[১৭]

সারাদুনিয়া জুড়ে উপনিবেশিক স্বার্থের টানাপোড়েন এবং শ্রেণিচেতনার চরিত্র থেকে অনুধাবন করা যায় যে, শোষণ আর শাসনের সূত্র ধরেই এই ধরনের ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক বসতি স্থাপনের চেষ্টা হয়ে থাকে। ভারতেও অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় শ্রেণিবিভাগের পেছনে উপনিবেশিক শাসনের চিন্তার সরাসরি প্রভাব রয়েছে। যেমন আফ্রিকায় জাতিবৈষম্য ও বর্ণ পৃথকীকরণের সবচেয়ে সংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বর্ণবাদ। এ ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শোষিত, শাসিত ও পদদলিত হয়েছিল; অথচ জগতের তাবৎ মানবাধিকারের ধ্বজাধারীদের চোখের সামনেই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী শাসকরা বর্ণবাদকে সাংবিধানিক অধিকাররূপে পালন করেছে।[১৮] মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন উদাহরণ বিরল। আবার ভারতবর্ষসহ অন্যত্র যে অসাম্যনীতি প্রবর্তিত হয়েছে, তারও ভিত্তি মানবাধিকার লঙ্ঘনের দুঃসাহসের সূত্র ধরেই। সংস্কৃতি যখন নতুন সমাজ গড়ার উপকরণ, তখন তার বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে দেয়াল টানা পরিণত হয় জটিল ও সূক্ষ্ম কর্মে। নজরুলের সাহিত্যকর্মে বিশেষ করে কবিতাও তার সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নজরুল জানতেন শুধু শোষণ এবং অত্যাচারের বিশ্বস্ত চিত্র আঁকাই কোনো প্রতিরোধের সংস্কৃতির জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা কেবল বঞ্চনার উপলব্ধিই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারে না। তাই প্রতিরোধের সংস্কৃতির মূল কথা বঞ্চনার অবসানের বাণীর প্রকাশক এক অপরিমেয় আশাবাদ। নজরুলের চেতনায় স্থির থাকা সংস্কৃতির প্রতিটি স্তর ও আঙ্গিক তাই একটি স্বাধীন ভূমির জন্য, একটি সাম্যবাদী সমাজের জন্য কথা বলেছে।

নজরুল বাঙালি জাতিসত্তার রূপকার। সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে ছিল তার অবস্থান। ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি আর আত্ম-উদ্বোধনকে বিবেচ্য রেখেছেন তিনি সবসময়। কেননা নজরুল মানতেন– ব্যক্তিকে নির্ভর করেই নির্মিত হয় সমষ্টির অস্তিত্ব ও অবস্থিতি। সকল ধর্মের মানুষের জীবনধারাকে অখণ্ড জীবনধারায় পরিণত করার প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে অস্তিত্ববাদী ও মানবতাবাদী চিন্তার নিঃশঙ্ক প্রকাশ; দরিদ্র-অশিক্ষিত-

ক্ষুধার্ত-অত্যাচারিত জনতার জন্য রুটি-কাজ আর সৌন্দর্য উপভোগের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় সাজিয়েছেন কবি তাঁর কথামালায়। নজরুল ছিলেন জনতার কাতারের দাঁড়ানো এক শক্ত মানুষ; ফাঁকবিহীন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ভূমিকায় তিনি ছিলেন অকুতোভয় সৈনিক।

তথ্যসূত্রঃ

---

১. এখানে উল্লেখ্য যে নিবারণচন্দ্র ঘটক ১৯১৭ সালে ৮ জানুয়ারি নিজ বাড়িতে অস্ত্র আইনে গ্রেফতার হন। পাঁচ বছর সশ্রম কারাভোগের পর ঝাউগ্রামে ১৯২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

২. 'মানুষ', "সাম্যবাদী", নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। বর্তমান প্রবন্ধে নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতিসমূহ উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, যৌবনের গান, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৩২ সালের নভেম্বরে সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ; কলকাতার দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৪. এই পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেছেন কুতুবউদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার এবং শামসুদ্দীন হুসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

৫. ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে।

৬. হিন্দু-মুসলমান, নজরুল রচনাবলী প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. প্রতিভাষণ, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ 'জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি', *নতুনদিগন্ত*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪, ঢাকা।

৯. মন্দির ও মসজিদ, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত।

১০. সাম্যের জয় হোকঃ অগ্রন্থিত, নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১. রাজবন্দীর জবানবন্দী, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২. নবযুগের সাধনা, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩. ভূমিদাস প্রথাকে কেন্দ্র করে ভূমি মালিকানার সাথে আধিপত্য ও নিপীড়নের সম্পর্ক এবং পাশাপাশি মুদ্রার ক্ষমতার নৈর্ব্যক্তিক রূপ বোঝাতে মার্কস এখানে দুটো ফরাসি প্রবাদ স্মরণ করেছেন যেগুলো হলোঃ 'মালিক ছাড়া কোনো জমি নাই', 'মুদ্রার কোনো মালিক নাই'।

১৪. এ বিষয়ক তথ্যের জন্য দেখুন, আনু মুহাম্মদ, মার্কসের পুঁজিঃ পুঁজির সূত্র, বিরোধ ও শ্রমশক্তি, *নতুনদিগন্ত*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এপ্রিল-জুন ২০০৯, ঢাকা।

১৫. এ প্রসঙ্গে হবসের মন্তব্য স্মরণ করেছেন মার্কস। হবস বলেছেন, 'মানুষের মূল্য হলো অন্য সবকিছুর মতোই তার দাম, অর্থাৎ তার ক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্য যত দাম তাকে দেওয়া হয় সেটা।'(Hobbes: Leviarhan, London, 1839-44, p.76)

১৬. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'নজরুল মানস প্রবন্ধের আলোকে', *প্রেক্ষণ*, খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, বর্ষঃ ১১ সংখ্যাঃ ৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, ঢাকা।

১৭. আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর উইনস্টন ই ল্যাংলি একুশ শতকে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য একটি কাজ করেছেন। (তাঁর গ্রন্থ Kazi Nazrul Islam, The Voice of Poetry and The Struggle for Human Wholeness) এ প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তাঁর বক্তব্যঃ This relevance is particularly evident in areas such as development, multiculturalism, nationalism, globalism, post-modernism, the environment, and human nature as well as human capabilities. One finds his works focusing on human identity and human rights, also, including those rights saaociated with our democratic entitlement.

১৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, 'আফ্রিকায় বর্ণবাদ ও প্রতিরোধের সংস্কৃতি', *উলুখাগড়া*, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৬, ঢাকা।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

কাজী নজরুলের মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

মো. আবদুল ওহাব*

আদিম মানব সমাজের কাঠামো থেকে মানবতাবোধ প্রবাহিত হয়ে আসছে। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ যখন অসহায় ছিল, তখন পাহাড়ে-বনে-জঙ্গলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তারা একত্রে বসবাস এবং আহরিত খাদ্যাদি ভাগ করে খেত। আদিম মানবতাবোধের এই রোদন সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় নানাভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে একটা পরিণত রূপ লাভ করেছে। মানুষের কল্যাণে নিবেদিত ধর্মের বাণীতেও মানবতাবোধের আদর্শ প্রচারিত। সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের শোষিত, বঞ্চিত ও মজলুম মানুষের স্বপক্ষে লেখনী সঞ্চালিত করেন। জাতিগোত্র-ভেদ যে বিভেদ-বুদ্ধি এনে দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দেয়, জাতির নামে ব্যবহৃত বর্ণবিদ্বেষই যে অপসংস্কৃতি, তা নজরুল কবিতায় স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধ কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াসমাত্র।

বাঙলায় মানবতাবাদী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অন্যতম প্রধান ছিলেন মুজফফর আহমদ। তারই সাহচর্যে মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি কবি হিসেবে আমরা দেখতে পাই কাজী নজরুল ইসলামকে।[১] তিনি ইংরেজের উপনিবেশ, তার পরাধীন দেশে জন্ম নিয়ে দেখেছেন শাসনের নামে শোষণের পায়তারা। কবি দেশের দুর্দশার কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন পুঁজিবাদী শোষণকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্র ছিল বিদেশী শোষক। এরা এদেশের স্বাধীনতা হনন করে রাজ্যপাটের অধীশ্বর সেজে দেশবাসীকে অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে। নজরুল তার কাব্য সাধনার শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের নাগপাশ থেকে এ দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন সত্তায় অধিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। প্রতিবাদ জানালেন সাম্রাজ্যবাদী সকল শোষণের বিরুদ্ধে। দাবি করলেন এ দেশের নিঃশর্ত স্বাধীনতার। ১৯২২ সালে তিনি 'ধূমকেতুতে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিলেন: এদেশের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। এ দেশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে এদেশের মানুষের হাতে, তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে।[২] ব্রিটিশরা এদেশে এসেছিল বণিকতন্ত্রের খড়্গ উঁচু করে। বণিকবেশে এসে রাজ্যপাটের অধীশ্বর সেজে এদেশের মানুষের উপর প্রয়োগ করে সকল রকমের অত্যাচারের কশাঘাত।

নজরুল মূলত মানুষের কবি, মানবতার কবি। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মানুষের প্রাধান্য। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব ও বিশ্বাসে তিনি কাব্য সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। মানুষ সমন্ধে নজরুলের ধারণা উঁচু, মানুষের আত্মিক শক্তির বিপুলতায় তিনি বিশ্বাসী। কোন মানুষই তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। প্রত্যেক মানুষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তার বিশ্বাস। এই মানুষ সবার উপরে। তাই কবি মানুষ কবিতায় বললেন:

গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,/ সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।[৩]

বাউল সাধকগণও মানুষকে সবার উপরে কল্পনা করে ভজনা করেছেন। এই মানুষকে ভজনা করলেই প্রকৃত মানুষ ও সোনার মানুষ হওয়া যাবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। বাউল সম্রাট লালন শাহ বললেন:

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি/ মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।
দ্বিদলের মৃণালে সোনার মানুষ উজ্জ্বলে/ মানুষগুরু কৃপা হলে জানতে পাবি
এই মানুষে মানুষ গাথা[৪]

আর বাউল কবি মহসিন আলী বললেন:

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা।

মানুষ ভজন করল যারা, খোদার দিদার পাইল তারা/ মানুষই হয় সৃষ্টির সেরা, সবার উপর হয় আসন॥
মানুষ কভু নয়রে খোদা, খোদা ছাড়া নয়রে জুদা/ মহসিন ভেবে বলে মানুষেতে খোদা মিলে
পড়ে থাকো চরণ তলে সিদ্ধি হবে সাধন ভজন॥[৫]

মানুষ সবার উপরে। এই মানুষকে কখনো ঘৃণা ও অপমান করা উচিত নয়। এই মানুষের কলবে আল্লাহর আরশ। মানুষের মাঝে তিনি অবস্থান করেন। তাই কবি নজরুল বলেছেন:

কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি,
হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি।[৬]

আর লালন শাহ বললেন:

লামে আলিফ লুকায় যেমন,/ মানুষে সাঁই আছেন তেমন,
তা নইলে কি সব নুরীতন,/ আদম তনে সিজদা জানায়॥[৭]

এ বিষয়ে বাউল কবি মকসেদ আলী বললেন:

কি আজব এই মানব জনম/ গড়েছেন ঐ মালেক সাঁই।
সৃষ্টির সেরা মানব গড়ে/ তার ভিতর নিজে লুকায়॥[৮]

কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতার মাহাত্ম্য এবং জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। পবিত্র কাবা শরীফ কাদা মাটি ইস্টক পাথরে হজরত ইব্রাহীমের তৈরি। আর এই মানব দেহ আল্লাহর নুরে আল্লাহর তৈরি। তাই কবি নজরুল এই মানব দেহকে, মানব হৃদয়কে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন:

এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি/ ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,/ এই খানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই,/ এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।[৯]

আর বাউল কবি আবদুল খালেক বললেন:

সহস্র 'কাবা' হতে একটি হৃদয় মূল্যবান।/ খোদ্ খোদা 'হৃৎকাবা'তে আছে বর্তমান॥
কাদা মাটি ইস্টক পাথর / ইব্রাহীমের বানানো ঘর
দেহ মক্কা আরব শহর/ খোদা বিরাজমান।[১০]

এ বিষয়ে লালন শাহ বললেন:

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে/ দেখনারে মন চেয়ে।
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার/ মরিস কেন হাঁপিয়ে॥[১১]

মানুষের কল্যাণের জন্যই জগতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আবির্ভাব হয়েছে। সেই মানুষকে ঘৃণা করে সেই মানুষকে মেরে যে ধার্মিক বেশধারী ভণ্ডের দল গ্রন্থের পূজা করে, কবি তাদের কাছ থেকে কেতাব গ্রন্থ কেড়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরিমরি,/ ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।/ পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! মুর্খরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।[১২]

এ বিষয়ে নেত্রকোণার খ্যাতিমান বাউল কবি জালাল খাঁ বলেন:

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে,
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।[১৩]

কবি লক্ষ্য করলেন: এই পূজনীয় মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-বঞ্চনার পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষেরা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে কীভাবে শোষিত হয়েছে, নজরুলের কবিতায় তার সঠিক চিত্র উদ্ভাসিত। সাম্রাজ্যবাদের দোসর ধনিক-বণিকশ্রেণি শ্রমজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবৃত্তে নানা বাধাবন্ধন আরোপ করে শোষণ করতে থাকে। চাষি ফসল উৎপাদন করেও খেতে পায় না। শ্রমিক কলের চাকা ঘুরিয়েও পায় না মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম অধিকার। মজুর-মুটে-জেলে-তাঁতির একই অবস্থা। নজরুল আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষের মৌলিক অভাবগুলোর কথা তুলে ধরেছেন। অন্নের অভাব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি:

অন্ন স্বাস্থ্যপ্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল কিছু,/ দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই,/ দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড় খাই।[১৪]

গ্রামের মাঠে যে ফসল ফলে তা দেখতে ছবির মত সুন্দর। অথচ এ দেশের মানুষ অভাবের তাড়নায় খাবারে তরকারি জুটে না, নুন আর কাঁচা মরিচ প্রার্থনা করে।

তোর গাঁয়ের মাঠে রবি ফসল ছবির মতন লাগে,/ তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নুনলঙ্কা মাগে?

তোর গাইগুলোকে নিঙড়ে কারা দুধ খেয়েছে ভাই?/ তোর দুধের ভাঁড়ে ভাতের মাড়ের ফেন হায় তাও নাই।[১৫]

অভাগীর ঘরে কতদিন আখা জ্বলে না। না খেয়ে মানুষ মারা যায়। আল্লাহর নেয়া'মত দিতে হিন্দু মুসলমান বাছাই করেন না। অথচ ধনিক শ্রেণি ব্যবধান সৃষ্টি করছে।

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,/ ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় মরে,
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলমান,/ আল্লা যাদের নিয়ামত দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ।[১৬]

অন্নের মত বস্ত্রসমস্যাও গণমানুষের মৌলিক সমস্যা। সন্তান মায়ের দুগ্ধ পাচ্ছে না। কাপড় কেনার পয়সা নাই। কবি নজরুল এই অভিশাপ থেকে মুক্তি কামনা করেছেন। নজরুল নানা কবিতায় বস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন:

মাতৃস্তন্য পায়নি সে তাই
কাফন কেনার পয়সা নাই।[১৭]

খেটে খুটে শুতে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা।[১৮]

এই মোর সাধ, সাধনা আমার, প্রার্থনা নিশিদিন,
মানুষ রবে না অন্নবস্ত্রহীন আর পরাধীন।[১৯]

সকল রকম দারিদ্র্যের মূল কারণ শোষণ। কাব্যজীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত নজরুলের এই উপলব্ধির ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত জুবিলী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণেও নজরুল বলেছিলেন: 'মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য ঋণ, অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মত জমা হয়ে আছে এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম'।[২০] কাব্যজীবনের প্রারম্ভ থেকে গণমানুষের অভাব-দারিদ্র্যের উৎসমুখ তিনি নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। শ্রমজীবী এবং অন্ত্যজ মানুষদের শোষণ করেই একশ্রেণির মানুষ ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। সে প্রসঙ্গেও কবির বক্তব্য:

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত ইটে,/ ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কলওলা মানুষ পেষানো কল,/ আখপেষা হয়ে বাহির হতেছে ভূখারী মানব দল।
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কলওয়ালা,/ ভরিছে তাহার মদিরা পাত্র, পুরিছে স্বর্ণজ্বালা।
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন ভুড়ি,/ নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি।
পেতেছে বিশ্বে বণিক বৈশ্য অর্থ বেশ্যালয়,/ নীচে সেথা পাপ-শয়তান সাকী গাহে যক্ষের জয়।[২১]

কৃষকের মাঠভরা ধান আর আকাশ ভরা খুশি মহাজনেরা রক্তের মত চুষে নিয়েছে। কৃষকের ফসলে হাট ভরে যায়-তাই ক্ষেতের পাটে মহাজনের নৌকা বোঝাই হয়। অথচ কৃষকের হাঁড়ির অবস্থা ভাল নয়:

কে খায় এই মাঠের ফসল কোন সে পঙ্গপাল,
আনন্দের এই হাটে কেন তাহার বাড়ির হাল?[২২]

হাতুড়ি আর শাবলই হচ্ছে শ্রমিকের জীবিকা অর্জনের প্রধান সহচর। শ্রমশক্তির সঙ্গে এই আনুষঙ্গিক সামগ্রী নিয়ে শ্রমিক কারখানায় কলুর বলদের মত পরিশ্রম করে এবং ধীরে ধীরে জরা ও ব্যাধির অপঘাতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এ জন্যই তারা ধ্বংস পথের যাত্রী। তাদের যা ছিল সবই মালিক-মহাজনদের দ্বারা লুণ্ঠিত। সুতরাং সামনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। নজরুল লিখেছেন:

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,/ এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকেরে!/ আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!/ ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।[২৩]

শ্রমজীবী মানুষের অভাব-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের নগ্নতায় ধনীর শোষণকে নজরুল চিহ্নিত করেছেন। ধনিকশ্রেণি ধীবরদের কিভাবে শোষণ করে 'সর্বহারা' কাব্যের "ধীবরদের গান" শীর্ষক কবিতায় সে সম্পর্কে নজরুলের বক্তব্য আছে। জেলেরা ঝড় বৃষ্টি-রৌদ্র উপেক্ষা করে গহীন জলে যে মৎস্য শিকার করে, সেখানেও অত্যাচারীর দৃষ্টি নিপতিত হয়:

ও ভাই নিত্য নতুন হুকুম জারি/ করছে তাই সব অত্যাচারীরে,
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়/ আমরা মৎস্য পেলে।[২৪]

নজরুলও মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার-মহাজনদের কৃষকের উটকো শোষক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ওরা জমির মালিক নয়, মাটির সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই–এটা বলদর্পীর ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়:

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,/ সন্তানসম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,/ মাটির মালিক তাঁহারাই হন!
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।/ নিতি নব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।
ভগবান! ভগবান![২৫]

এভাবে 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্য দুটোতে নজরুল মানুষের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণের নানাচিত্র তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নির্ধারিত গণমানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনেও নির্গলিত–শোষণ–বঞ্চনার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। কবির মতে– দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর মানুষেই মূলত দেবতা বিরাজিত। এদের সেবা করাই পরম ধর্ম। তাই সমাজে যারা অবহেলিত তাদেরকেই কবি ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। জগৎ জুড়ে দুর্বলেরা শুধু মার খাবে। কবি কুলি-মজুর কবিতায় বলেন:

দেখিনু সেদিন রেলে/ কুলি বলে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে,
চোখ ফেটে এল জল,/ এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?[২৬]

যে মজুর, মুটে ও কুলির পরিশ্রমে, সেবায়, মানুষের জীবন যাত্রা সুন্দর আরামদায়ক হয়েছে। তারাই প্রকৃত মানুষ, তারা সমাজ সেবক, তাদের মধ্যেই দেবতা আছে। কবি বলেন:

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,/ তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান,/ তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।[২৭]

কুলি-মজুররা বরাবর নিপীড়ন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের সম্মান দেখিয়ে আসছে তা আজকে শুধু অচল নয়, এই কুলি-মজুরদের ব্যথিত বক্ষেই পা ফেলে আসে নব উত্থান। এই উত্থানই নজরুলের ঈপ্সিত সমাজবিপ্লব। অনুরূপভাবে অত্যাচারী ধর্মব্যবসায়ী – যারা ধর্মাচরণে মানুষের অমর্যাদা ও ঘৃণা দিনের পর দিন বাড়িয়ে তোলে। ধর্ম সেখানে মানুষকে সম্মান করার কথা বলছে। রাখাল বলে, চাষা বলে, তোমরা আজ তাকে ঘৃণা করছ, তার প্রতিবাদে কবি বলেছেন:

রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে।
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সেজে।/ চাষা বলে কর ঘৃণা।[২৮]

জাতিভেদ, বর্ণ, কৌলীন্য, ছুঁৎমার্গ ও ধর্মীয় ভণ্ডামির দ্বারা শ্রমজীবী মানুষরা বরাবরই শোষিত হয়ে এসেছে। নজরুল অন্যায় ও অসত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল রকমের সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচার ও শোষণের কথাকে কবিতার উপাদান করেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন সমাজে সৃজন করেছে ধনী-নির্ধন, খাতক-মহাজন, রাজা-প্রজা, কুলি-সাহেব, শ্রমিক-মালিক প্রভৃতি, তেমনই এই বৈষম্য থেকেই সামাজিক জীবনে নিম্ন পেশাজীবী ও অস্পৃশ্য শ্রেণিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মুনষ্যত্বকে বড় করে না দেখে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ছোটবড় ভেদাভেদকে নজরুল সামাজিক শোষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চোর-ডাকাত, বীরাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, পাপী-তাপী, কুলি-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, ধীবর, মেথর, সর্বহারা প্রভৃতি বিত্তহীনদের সামাজিক অমর্যাদা ও অস্বীকৃতি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। নজরুলের বক্তব্য:

জাতের নাম বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।[২৯] [জাতের বজ্জাতি]

কবি অন্যত্র বললেন:

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,/ অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।[৩০] [সত্য-মন্ত্র]

আর লালন শাহ বললেন:

জাত বিজাতের মিথ্যা বড়াই/ মিছে ওই অভিনয়।
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই/ মানুষের পরিচয়।[৩১]
জাত বিচারী ব্যভিচারী/ জাতির গৌরব বাড়ি বাড়ি
দেখলাম 'চেয়ে'/ লালন বলে হাতে পেলে/ জাত পোড়াতাম আগুন দিয়ে।[৩২]

যে সত্যদ্রষ্টা কাণ্ডারী মুক্তির অন্বেষণে তিমির রাত্রি দুস্তর পারাবার অতিক্রম করে যাত্রীদের নিয়ে যেতে চান, তাঁকেও নজরুল হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডুকতা বর্জন করে কেবল মানবসত্যের আলোকে মাতৃমুক্তি পণে ব্রতী হতে বলেছেন:

"হিন্দু না ওরা মুসলিম"? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।[৩৩]

এ ছাড়াও কবির ধারণা হয়েছে দুর্বলচেতা-পরাধীন জাতি আত্মকলহের মধ্যদিয়েই জেগে উঠবে এবং একদিন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করে শত্রুদের করবে বিতাড়িত।

তাই কবি হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম, খ্রিস্টান সবারই সাম্য ও জয়ের গান গেয়েছেন। কবি সাম্যবাদী কবিতায় গাইলেন:

গাহি সাম্যের গান–/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।[৩৪]

আর লালন শাহ গাইলেন:

এমন সমাজ কবেগো সৃজন হবে,
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান জাতি গোত্র নাহি রবে॥[৩৫]

শোষণ-বঞ্চনার আরেকটি ক্ষেত্রে নজরুল তাঁর চিন্তা-চেতনাকে উদ্‌বেলিত করেছিলেন। সেটি হচ্ছে নারীর প্রতি অসম্মান। পুঁজিবাদ অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মত নারীকে পণ্যে পরিণত করে। সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে খর্ব করে পুঁজিতন্ত্র হীনতার পথ তৈরি করেছে।

উপবাসী মানুষ ক্ষুধায় কাতর হয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বহু আশা করে মন্দির ও মসজিদ অভিমুখে গেলেও তার ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা হয়নি। ভিখারী মন্দিরের পূজারিকে এবং মসজিদের মোল্লাকে ক্ষুধার কথা জানিয়েও কোন ফল পায়নি। মসজিদে অঢেল গোস্ত রুটি থাকলেও নামাজ না পড়ার দোহাই দিয়ে মোল্লা গোস্ত রুটি নিয়ে মসজিদের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। মোল্লা ও পুরুতের মানবতা ও মানবকল্যাণ ভুলে যাওয়ার কথাই কবি বললেন:

মসজিদে কাল শিরনী আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি/ বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন/ বলে, 'বাবা' আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন

তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা-"ভ্যালা হল দেখি লেঠা,/ ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে নামাজ পড়িস বেটা?

ভুখারী কহিল 'না বাবা!" মোল্লা হাঁকিল তা'হলে শালা/ সোজা পথ দেখ! গোস্ত রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা![৩৬]

মানুষের কল্যাণের জন্যই জগতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আবির্ভাব হয়েছে। ধর্মগ্রন্থের মূলকথা হচ্ছে, মানুষকে ভালবাসা। কোন মানুষকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। ধর্মের অপর নাম মানবতা। এই মানুষেই খোদা বিরাজমান।

পরিশেষে বলা যায় নজরুল মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করেছেন। মানুষের ব্যথা ও বেদনা তাকে গভীরভাবে অভিভূত করেছে। তাই মানুষকে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে দেখে তিনি শোষক ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন:

আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।/ অত্যাচারীর খরড় কৃপাণ ভীম/ রণ-ভূমে রণিবে না।[৩৭]

সমাজে যারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অবহেলিত তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কবি সংগ্রাম করেছেন আজীবন। সমাজে মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা করে একটি সুসংহত সুন্দর সমাজ উপহার দেওয়াই ছিল তার সাধনা।

তথ্য নির্দেশ

---

১ সুমিতা চক্রবর্তী, "মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা", ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, পৃ. ২৯৯।
২ কাজী নজরুল ইসলাম, "ধূমকেতুর পথ", ধূমকেতু (১৩শ সংখ্যা), ২৬ শে আশ্বিন, ১৩২৯, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০৩।
৩ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬৮।
৪ সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা দেহতত্ত্বের গান (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলনেন, ১৯৯০), পৃ. ৭৯-৮০।
৫ নিজস্ব সংগ্রহক: কথক, বাউল কবি মহসিন আলী আল চিশতি, গ্রাম: বলিহার, পোস্ট: মনিগ্রাম, থানা বাঘা, জেলা: রাজশাহী।
৬ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৭ মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ. ৯৬।
৮ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, শফিউল্লাহ সরকার, পিতা: ফসি উল্লাহ গ্রাম: ব্রহ্মণ পুস্করিনী (ইদলপুর), পোস্ট: প্রেমতলী, থানা: গোদাগাড়ী, বয়স: ৮৩, পেশা: কৃষি।
৯ কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।
১০ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, হামিদ আকবর হোসেন, পিতা: ময়েন মণ্ডল, গ্রাম ও পোস্ট: নন্দনপুর, থানা: পুঠিয়া, বয়স: ৬০, পেশা: চাকরী।
১১ মুহম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯০।
১২ কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯।
১৩ যতীন সরকার (সম্পাদিত), *জালাল গীতিকা সমগ্র* (ঢাকা: নন্দিত, ২০০৫), পৃ. ৭৭।
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম "চোর-ডাকাত", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২।
১৫ কাজী নজরুল ইসলাম, "উঠরে চাষী", 'নতুন চাঁদ', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪০।
১৬ কাজী নজরুল ইসলাম, "শোধ করো ঋণ", 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
১৭ কাজী নজরুল ইসলাম, "বড়দিন", 'শেষ সওগাত',, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩০।
১৮ কাজী নজরুল ইসলাম, "কেন আপনারে হানি হেলা", 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৫।
১৯ কাজী নজরুল ইসলাম, "দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়", নজরুল রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, প্রথমার্ধ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬।
২০ কাজী নজরুল ইসলাম, "নজরুল রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পৃ. ১৯৯।
২১ কাজী নজরুল ইসলাম, "চোর-ডাকাত", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২।
২২ কাজী নজরুল ইসলাম, "ওঠরে চাষী", 'নতুন চাঁদ', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০।
২৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২।
২৪ কাজী নজরুল ইসলাম, "ধীবরদের গান", 'সর্বাহারা', নজরুল রচনালী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।
২৫ কাজী নজরুল ইসলাম, "ফরিয়াদ", 'সর্বহারা', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।
২৬ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৭।
২৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮।
২৮ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।
২৯ কাজী নজরুল ইসলাম, জাতের বজ্জাতি।
৩০ কাজী নজরুল ইসলাম, সত্য-মন্ত্র।
৩১ সাবির আহমেদ চৌধুরী, লালন কাব্যে বিশ্বজনীয়নতা, লালন মৃত্যু-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, মীরপুর, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬২।
৩২ ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম, লালনের মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িতকার ভিত্তি, লালন-শত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪।
৩৩ কাজী নজরুল ইসলাম, "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" 'সর্বহারা' নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।
৩৪ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।
৩৫ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমি কবি লালন শাহ: জীবন ও সঙ্গীত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১৪৫।
৩৬ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮।
৩৭ কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বিষয়-বিন্যাস: প্রেম, নারী ও যুদ্ধ

চন্দন আনোয়ার*

কাজী নজরুল ইসলাম কবি, গীতিকার। প্রায় সমোচ্চারিত না হলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে, তাঁর প্রতিভার বিকাশের প্রথম পর্বের বিকাশ ঘটে ছোটগল্প চর্চার মধ্য দিয়ে। গাল্পিক হিসেবেই সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা গল্প, প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও গল্পগ্রন্থ। কৈশোরের প্রায় সবটুকু সময় নজরুল গল্পচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য পরে, প্রতিভা বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে কবিতা ও সঙ্গীতকে বেছে নিয়েছেন। মাত্র তিনটি গল্পগ্রন্থের অল্প কয়েকটি গল্পেই নজরুল তার প্রতিভার *স্বাতন্ত্র্যকে* চিনিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তির নায়ক কাজী নজরুল ইসলামের প্রকৃত সাহিত্য চর্চার সূচনা ঘটে যুদ্ধের ময়দানে, গোলা আর বারুদের মধ্যে বসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাত শংকিত কিশোর নজরুল তখন রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। দেশ সেবার ডাকে সাড়া দিয়ে স্কুল ছেড়ে পল্টনে যোগ দেন নজরুল। 'যে বয়সে মন শুধু গ্রহণ করতে থাকে এবং বিবেচনাহীন উচ্ছ্বাসে পরিচালিত হয় সেই কিশোর বয়সেই কবি লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে ছিলেন, দূর থেকে দেখেছিলেন বর্বতার নির্লজ্জ অভিনয়, নিষ্ঠুরতার তাণ্ডবলীলা, পাশব বৃত্তির নগ্ন আত্মপ্রকাশ, মানবতার অপমৃত্যু। জীবনের গ্লানি আর মৃত্যুর বীভৎস রূপ তাঁর নিকট প্রকট হয়ে উঠে একান্তভাবে। এতে কবির অনুভূতি প্রবণ স্পর্শ-চঞ্চল মন ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়।'[১] তবে যুদ্ধে গিয়ে নজরুল যেমন রণ-হুঙ্কার প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি আবার ফার্সি সাহিত্যের সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটেছে। মূলত, নজরুলকে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়নি। সৈনিকের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়েছে মাত্র। ফলে প্রচুর অবসর ছিল তাঁর। আর এ সুযোগেই বাঙালি পল্টনের এক পাঞ্জাবি মৌলবির কাছে ফার্সি শিখেছিলেন নজরুল। হাফিজসহ প্রধান কবিদের কবিতাও পড়ে ফেলেন গোলা-বারুদের স্তূপে বসেই। বিশেষত, হাফিজের প্রেমভাবনা দারুণভাবে আলোড়িত করে কিশোর সৈনিককে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, নজরুল করাচি সেনানিবাসে রসদ গোলাবারুদের তত্ত্বাবধয়াক ছিলেন ।

যুদ্ধক্ষেত্র হতে নজরুল কলকাতায় ফিরেছিলেন নতুন চোখ নিয়ে। সে চোখ একসাথে দ্রোহের ও প্রেমের। যে কিশোর অনেকটা আবেগের বশেই পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন, যুদ্ধ ফেরত সে কিশোর-ই জাতির মুক্তির প্রবল অন্তর তাগিদ অনুভব করলেন। নির্যাতনে, নিষ্পেষণে, দাসত্বে ও শৃঙ্খলে তাঁর দেশ ও জাতি তখন অতিক্রম করছে ভয়ানক এক দুঃসময়। নজরুল উপলব্ধি করেন, এবার একটি বড় যুদ্ধ দরকার জাতির মুক্তির জন্য। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছেন, দেশের নেতারা এ বিষয়ে চরম নীরব, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা নিজেদের স্বার্থে। সৈনিকের গন্ধ তখনও নজরুলের দেহে, নেশা চোখে। যে কিশোর প্রি-টেস্ট পরীক্ষার আগে কলম ফেলে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন, সেই কিশোর আবার হাতে নিলেন কলম। 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের 'দুরন্ত পথিক' গল্পের মুক্তিকামী জনতার জ্যোতি ভরা চোখ মূলত, গোলা-বারদ স্নাত সৈনিক নজরুলেরই চোখ। দুরন্ত পথিক আর কেউ নন, যুদ্ধফেরত নজরুল স্বয়ং।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ মাঠের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রথম সাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম। বিরাট সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবেই নজরুলের জন্ম। আর কিশোর বয়সে সৈনিকব্রত গ্রহণের ফলে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগে বাংলা সাহিত্য ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে। সৈনিক জীবনের মূলমন্ত্রই হল দুর্বার প্রাণশক্তি। অস্ত্র-গোলা-বারুদ যুদ্ধের উপকরণ মাত্র। এ কারণেই সৈনিকের পোশাক ছেড়েও সৈনিকই থেকে গেছেন নজরুল। তাঁর বিপ্লব-বিদ্রোহী সত্তার গভীরে ছিল সৈনিক জীবনের প্রেরণা। উত্তরকালে নজরুল সৈনিকের পোশাক পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এবং এ পোশাক পরে গর্ববোধও করতেন। সুভাষ বসু বলেছেন, 'কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব লেখেছেন। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা কম। অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।'[২]

বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রম ও বিস্ময়কর প্রাপ্তি নজরুল প্রতিভা। এই প্রতিভার ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গে। তবে সর্বত্র সমান ও সফল, এ কথা বলা যাবে না। বিশেষত, কবি ও গীতিকার হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের খ্যাতি ও স্বীকৃতি। বাংলা কবিতার বাঁক বদলের নায়ক নজরুল। রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-বিলাপের দেশে নজরুলই প্রথম প্রাণবন্ত শক্তিমান পুরুষ, যে কিনা বলতে পারলেন, 'আমি আপনারে ছাড়া করি

না কাহারে কুর্নিশ।' তবে এই বিদ্রোহী গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনিকেও অস্বীকার করতে পারেননি। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য'-এই হল নজরুলের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র। তবে তরুণ বয়সে লেখা নজরুলের গল্পগুলোতে এই বিদ্রোহী সত্তার আভাসমাত্র পাই। 'কাব্যের জগতে তিনি অর্ধেক বিদ্রোহী, অর্ধেক প্রেমী। উপন্যাসের জগতে বিদ্রোহের চাইতে প্রেমই বেশি। আর ছোটগল্পের বেলায় বলতে গেলে, তাঁর পরিমণ্ডল শুধুমাত্র প্রেমেরই।'[৩]

নজরুলের বিপুল গান-কবিতার তুলনায় ছোটগল্পের সংখ্যা অতি অল্প। মাত্র তিনটি গল্পগ্রন্থ-'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলিমালা'। এছাড়াও দু'একটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্প রয়েছে। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে নজরুল তাঁর 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো লেখেছিলেন। বয়স তখন মাত্র আঠার কিংবা উনিশ হবে। এতে কাঁচা বয়সের উচ্ছ্বাস-আবেগে ভরপুর। নজরুলের মতো বিরাট শিল্পী প্রতিভার ততটা সফল সৃষ্টি হয়ে উঠেনি গল্পগুলো। বলা হয়ে থাকে,'তার মহৎ প্রতিভার অসাফল্যের স্বীকৃতি।'[৪] এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, গভীর জীবনবোধ, অতৃপ্তিবোধ ও পরিমিতিবোধের সার্থক প্রতিফলন ঘটেনি নজরুলের গল্পে। বাংলা কবিতায় নজরুল ব্যতিক্রম প্রতিভা। একটা নতুন যুগের প্রবর্তক এই ক্ষণজন্মা শিল্পী। নজরুল প্রতিভার পরশপাথর বাংলা সাহিত্যের যেখানেই লেগেছে, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে বিপুল বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব। গল্পকার নজরুলও গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেননি। বাংলা সাহিত্যের শান্ত পরিবেশে যুদ্ধের পটভূমি ব্যবহার করে সমকালে নজরুল রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভাধর কবি-গীতিকার নজরুলের গল্পগুলো পৃথক বিচার ও বিশ্লে-ষণের দাবি রাখে। 'প্রায় একই সময়ে কাব্য চর্চায় হাত দিলেও কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশে বেশ কিছুদিন কুণ্ঠিত ছিলেন তিনি এবং পাঠকদের কাছেও গাল্পিক হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কবি নিজেও বলেছেন,– 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে।'[৫] কবি আবদুল কাদিরের মতে, 'নজরুলের প্রথম জীবনে 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোতে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থান বড় কথা নয়, আবেগের প্রগাঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্বর্যে এগুলো মনে আনে স্বপ্নাবেশ। তরুণ প্রেমের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এগুলোকে করেছে রস মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।'[৬]

১৩৪২ সালের 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় নজরুলের ছোটগল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যা বলা হয়, তা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এক্ষেত্রে স্মরণীয় :

> এই আধুনিকপন্থীদের মধ্যে নজরুল ইসলাম একটি জ্যেষ্ঠ আসন পাওয়ার অধিকারী। যদিও তিনি 'রিক্তের বেদন', 'ব্যথার দান' ও 'শিউলিমালা' মাত্র এই তিনখানা গল্পের পুস্তক রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় নব ধর্মী প্রতিভার বিদুৎ চমক রয়েছে। তাঁর গল্পাংশের পরিকল্পনায়, পশ্চাদভূমির নির্ধারণে, চরিত্র সৃষ্টি বা চিত্র-নৈপুণ্যে তিনি অন্যের অনুসারী হন নাই- তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক। শুধু তাই নয় বিচিত্র ঐশ্বর্যের মর্যাদায় তাঁর গল্পরচনা সার্থক হয়েছে। নজরুল ইসলাম বাংলা কথাসাহিত্যের বর্ণহীন একাকিত্বে নবীন রঙের পরশ লাগিয়েছেন। এটি আমরা তাঁর 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দানে'র মধ্যে বেশ লক্ষ্য করে থাকি।...বাংলার সাধারণ গল্পের বিরুদ্ধে যে বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ ওঠে, নজরুল ইসলামের গল্প সে অভিযোগ এড়িয়ে যায়।[৭]

নজরুলের গল্প ত্রুটিযুক্ত হলেও পাঠকের প্রবল আকর্ষণ অনস্বীকার্য। সীমাহীন আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছ্বাস, কাব্যময়তার জন্য গল্পের কাহিনী সহজেই পাঠকের মনোযোগ কাড়ে। আরও একটি কারণ, গল্পের ভবঘুরে, বাঁধন-হারা, কল্পনাবিলাসী, স্বপ্নাতুর যুদ্ধাংদেহী নায়কদের মধ্যে ব্যক্তি নজরুলের আত্মক্ষেপণ ঘটেছে।

এর মধ্যে তিনি নিজেকে বিকশিত ও প্রতিফলিত করেছেন। এই জন্যে তাঁর প্রায় গল্প আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত। তাঁর বাউণ্ডেলেপনা, প্রচলিত জীবনের প্রতি ঔদাসীনতা, বন্ধনভীরু মন, প্রকৃতি প্রীতি, রোমান্টিক আকুলতা, বিষাদ ব্যাকুলতা এ সমস্তই তাঁর গল্পে আছে। মোটকথা রোমান্টিক কবি নজরুলকে তাঁর গল্প থেকে বিশিষ্ট করে দেখা সম্ভব নয়। রোমান্টিক নজরুলের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে গল্পে-প্রচলিত জীবনের প্রতি অনীহা, সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রতি দারুণ উন্মাদনা, প্রেম ও সৌন্দর্যের সুগভীর আকুতি, বিরহ ও বিষাদের মধ্যে একরূপ আত্মতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায়।[৮]

১.

---

* বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্যথারদান' গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)। মাত্র এক'শ টাকার বিনিময়ে 'ব্যথার দান' গ্রন্থের কপিরাইট বিক্রি করেছিলেন নজরুল। ক্রেতা ছিলেন 'মোসলেম পাবলিসিং হাউসের' স্বত্বাধিকারী আফজালুল হক। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন:

এই 'ব্যথার দান'ই নজরুলের প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক। প্রকাশিত হওয়ার পরে সরকারী দপ্তরে প্রথম রেজিস্টারভুক্ত হয়েছিল ১৯২২ সালের ১লা মার্চ তারিখে। কাজেই পুস্তকখানা ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার মেট্ কাফ প্রেসে প্রথমবারে এই পুস্তকের ১১০০ কপি ছাপা হয়েছিল। দাম ধার্য করা হয়েছিল দেড় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৪৭। এটা মনে রাখার বিষয় যে তার জীবনের প্রথম গ্রন্থকার হয়েছিল এমন একখানা পুস্তকের যে-পুস্তকে তার কোন স্বত্ব ছিল না।[৯]

'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থটি ছয়টি গল্পের সংকলন। গল্পগুলো হল- 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল-বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি'। 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা'র মাঘ (১৩২৬), কার্তিক (১৩২৬) ও শ্রাবণ (১৩২৭) সংখ্যায় যথাক্রমে 'ব্যথার দান', 'হেনা' ও 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পত্রয় প্রকাশিত হয়। 'মোসলেম ভারতে'র শ্রাবণ (১৩২৭) সংখ্যায় 'বাদল-বরিষণে', এবং 'নূর' পত্রিকার ফাল্গুন-চৈত্র (১৩২৬) সংখ্যায় 'ঘুমের ঘোর' প্রকাশিত হয়। 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটি সংকলনের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে বলা হয়েছে : মানসী আমার/মাথার কাঁটা নিয়েছিলাম ব'লে/ক্ষমা কর নি/তাই বুকের কাঁটা দিয়ে/ প্রায়শ্চিত্ত ক'রলুম। স্পষ্টতই বোঝা যায়, নজরুলের হারিয়ে যাওয়া কোন এক মানসী প্রিয়ার স্মৃতিচিহ্ন গল্পগুলো। প্রশ্ন উঠতে পারে, কে এই মানসী প্রিয়া? নজরুল কখনই কিছু বলেননি এই কাঁটার মালিক সর্ম্পকে। এ প্রসঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠজন মুজফ্ফর আহমদের বক্তব্য :

> অনেক দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইসলামের এই গ্রন্থখানা (ইরানী কবি হাফিজের দিওয়ানা), আরও কিছু পুস্তক, কিছু চিঠি-পত্র, অনেক দিনের পুরনো কবিতার খাতা, বিছানা, কিট-ব্যাগ এবং 'ব্যথার দান' পুস্তকের উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা খোয়া যায়। মিউজিয়ামে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মতো নজরুল এই কাঁটাটিও রক্ষা করে আসছিল।...কে ছিল এই কাঁটার মালিক তার নাম সে আমায় কোনদিন বলে নি।[১০]

নজরুলের প্রেমের ইতিহাসে তিনজন নারী-নার্গিস, আশালতা সেন (প্রমীলা) ও ফজিলাতুন্নেসা- এঁদের কারো মাথার কাঁটা নয়, এটা প্রমাণিত সত্য। প্রাক সৈনিক জীবনে কিশোর নজরুল কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারেন। কিশোর বয়সের এ ভালবাসা হয় সম্পূর্ণ আবেগ নির্ভর। প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠিত হয় না। 'অনেকে মনে করেন নজরুলের যুদ্ধে যাওয়ার পিছনে-ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা ছিল। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্কুল জীবনে যে কিশোর সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন-দেখা যাচ্ছে তার প্রথম গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে প্রেমের অভিমান, বিচ্ছেদ ইত্যাদির আধিক্য।'[১১] অবশ্য শ্রী ভূদেব চৌধুরী মনে করেন অন্যটা :

> গল্প গ্রন্থটি মানসীকে উৎসর্গিত। এর সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কোন শরীরী প্রিয়ার যোগ আছে কি না, সে কৌতূহল অবান্তর। গল্পগুলো ব্যক্তি কবির অন্তরবাসিনী 'মানসী' তাঁর প্রিয়ার রূপকে বক্ষে ধরে এসেছে। একদিকে প্রেমের জন্য অমিত যৌবনের বিষদগ্ধ উৎকণ্ঠা, আর একদিকে যুদ্ধের মরণ-ভীষণ কর্মভূমির আকর্ষণ; এ দুয়ের মধ্যে হাবিলদার কবির কল্পনাও উন্মথিত হয়ে ফিরেছে।[১২]

'ব্যথারদান' গ্রন্থের গল্পগুলোর নতুনত্ব ও বিষয় বৈচিত্র্য বাংলা ছোটগল্পে স্বতন্ত্র স্বাদ এনেছে। প্লটের শৈথিল্য সত্ত্বেও গল্পগুলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। আর এ জন্যই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৩২) গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা উল্লেখ করে জনপ্রিয়তার সংবাদ ছেপেছিল।

'ব্যথার দানে'র প্রত্যেকটি গল্পেই কিশোর মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস, প্রেম-ভালবাসা, কামনা-বাসনার করুণ-মধুর ছবি দেখা যায়। প্রেমের বহুবিধরূপ রূপায়ণে ও মনোবেদনা বিশ্লেষণে নজরুল কৃতিত্বের দাবিদার। প্রত্যেক গল্পে ফুটে উঠেছে ব্যর্থ প্রেমের গভীরবেদনা। আর এ বেদনার সাথে গল্পকারের ব্যক্তিচৈতন্যের নিবিড় যোগ রয়েছে। একটা অখণ্ড বেদনার সূতোয় গাঁথা গল্পের কাহিনীগুলো। গল্প পড়ে পাঠকের মধ্যে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গল্পের পরিণতি করুণ হলেও পাঠকের প্রতিটি শিরায়-উপশিরায় সুখানন্দের অনুভূতি জাগায়। 'কল্লোল' (মাঘ, ১৩৩০) পত্রিকায় নজরুলের 'ব্যথার দান'কে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের শোকোচ্ছ্বাসমূলক নিবন্ধ 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক কাব্য 'বসন্তপ্রয়াণ' এর মতো 'গদ্যকাব্য' বলে অভিহিত করা হয়। বর্ণনার চাতুর্য, কল্পনার মাধুরী, আবেগের প্রাবল্যে ও ভাষার লালিত্যে নজরুলের গল্প কবিতার মতো ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। পত্রিকাটিতে নজরুলের গল্পের স্বরূপও বিশ্লেষিত হতে দেখি এভাবে :

সব গল্পেই প্রত্যাখ্যাত, নিপীড়িত ও প্রতিদানহীন প্রেমের দুঃখ বিবৃতি। প্রত্যেক গল্পের প্রথম কয়েক লাইন পড়িয়াই গল্পের আখ্যানভাগের সমস্ত বুঝিতে পারা যায়। সেইখানে আমাদের মন থামিয়া যাইত কিন্তু কবির ভাষায়-অপূর্বতা,গভীর আত্মবিশ্লেষণ শক্তি ও রচনার মাধুরী অবলীলাক্রমে আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

প্লটের মৌলিকতা না থাকিলেও গল্পের স্থান ও নায়কগণের জীবনের ঘটনা সমাবেশে কবি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। বাংলার শ্যামলতার মাঝে গোলেস্তাঁ, চমন, বেলুচিস্থানের ডালিমের লালিম-ছোঁয়া লাগাইয়াছেন। বাঙালির নিশ্চেষ্ট জীবনের মাঝে 'হিঞ্চেনবার্গ লাইনে'র মৃত্যুর মধ্যে মাদকতার স্বাদ দিয়াছেন।

এক কথায় বইখানি কাঁচা বয়সে লেখা বলে ইহাতে কাঁচা হাতের চিহ্ন আছে।[১৩]

'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের অনেক কয়টি গল্পের পটভূমি আন্তর্জাতিক। যুদ্ধের পটভূমিতে লিখিত গল্পগুলো ভিন্ন অনুভব জন্মায় পাঠকের মনে। নজরুলের গল্পেই সম্ভবত, প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র পাই। গোলা-বারুদের গন্ধ পাঠকের চিত্তে রণাঙ্গনের উন্মাদনা জাগায়। 'রুশ দেশে বলশেভিক বিপ্লবের পরপর নজরুল তাঁর গল্পের নায়কদের যে মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করে 'লালফৌজে' যোগদান করিয়েছেন এবং প্রতি বিপ্লবীদের সংগ্রামে তারা যোগ দিয়েছে। এইটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে নজরুলের পূর্বে কেউ করে ছিলেন কি না আমাদের জানা নেই।'[১৪]

১৩২৯ সালের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র মাঘ সংখ্যায় 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে যা বলা হয়, প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য :

... গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটি গল্পেই করুণ রস নিবিড়ভাবে জমে উঠিয়াছে। নিরাশ প্রেমের মর্মন্তুদ গভীর বেদনা এই পুস্তকের প্রত্যেক পাতায় ফুটিয়াছে। গল্পগুলিতে আখ্যানবস্তুর কারিগরী না থাকিলেও ভাব বৈচিত্র্য ও বাক্য সম্পদে উহা মনোরম হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্র ব্যাখ্যান ও মানব মনের সূক্ষ্মবিশেষণে লেখকের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পগুলিও পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও উহাদের অন্তরের যোগ আছে। একটি বিপুল ব্যথা নিবিড় ক্রন্দন মণিগণের মধ্যস্থিত সূত্রখণ্ডের ন্যায় সমস্ত গল্পকয়টিকে ধারণ করিয়া আছে। শব্দ নির্বাচনের অসামান্য কৃতিত্ব গল্পগুলিতে অক্ষণ্ন রহিয়াছে। তাঁর লিখনভঙ্গি লক্ষিত গতিতে পাঠকের অন্তরের অন্তস্থলে যাইয়া প্রবেশ করে এবং মদির মাদকতা আবেশে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই মাদকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে অবসাদ জন্মায় না-তীব্র তেজে দহন করে না। রুদ্র তালে শিরায় শিরায় রক্তকণা নাচাইয়া তোলে।... কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা গ্রন্থটির বহুস্থানে ছড়ানো রহিয়াছে। কোন কোন গল্পে যুদ্ধক্ষেত্রের যে রূপ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যে রূপ নূতন, সেইরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ।[১৫]

'ব্যথার দান' গল্পটিতে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী। খানিকটা আত্মজৈবনিক ঢঙে লেখা গল্পটি দারা-বেদৌরা-সয়ফুলমুলক্-এই তিনজন নর-নারীর প্রণয় সংকটের করুণ আলেখ্য । চরিত্ররা নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই উপস্থাপন করে। চমৎকার নাটকীয় আবহ তৈরি হয়েছে গল্পের কাহিনীতে। দেহের অতীত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে মূলত এক প্রকার বোহেমিয়ান জীবন দৃষ্টি তুলে ধরেছেন গল্পকার। নিপুণ গদ্যশৈলি যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি কবিতার আমেজও পাওয়া যায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে গল্পের নায়ক দারার নাম ছিল নূরন্নবী। নজরুল নিজেকে প্রায়শ নূরু নামে পরিচয় দিতেন। উত্তরকালে তাঁর 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের নায়কের নাম রাখেন নূরু। নূরু নামের প্রতি নজরুলের দুর্বলতা ছিল। তবে দারাও নজরুলের পছন্দের নাম। গল্পের কাহিনীতে কিশোর নজরুলের সেন্টিমেন্ট কাজ করবে অতিসঙ্গত কারণেই। মুজফ্ফর আহমদের ভাষায়-'শুধু প্রেম নয়, নজরুল ইসলামের এই গল্পের ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিকতাও ফুটে উঠেছে। আমাদের একটা নতুন জিনিষ বলতে হবে।'[১৬] গল্পের কাহিনী সংঘটনের স্থান বেলুচিস্থানের গুলিস্তান, বুস্তান ও চমন প্রভৃতি জায়গায়। করাচি সেনানিবাসে থাকাকালীন সময় নজরুল গল্পটি লেখেছিলেন। এতে প্রধানত, কল্পনার আশ্রয়ে পরিভ্রমণ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নগর। কেননা, আমরা জানি, নজরুল সৈন্যবিভাগে যোগ দিলেও কখনই উপমহাদেশের বাইরে যাননি।

গল্পের নায়ক দারার মা অন্তিম শয়ানের সময় বেদৌরাকে হাতে তুলে দিয়ে গেল। সেদিন হতেই দারা-বেদৌরার প্রেমও মধুর পরিণতির স্বপ্নজাল বুনতে শুরু করে। সেই সাথে 'তুমি যে আমার' এই রকম অধিকারের বাণীও উচ্চারিত হয়। কিন্তু বেশিদিন টিকে না এই তরুণ-তরুণীর মধুর মিলন প্রত্যাশা। বেদৌরার ঐতিহ্য প্রিয় মামা মূর্তিমান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাদের মিলনের পথে। নির্দয়ভাবে ভেঙে দেয় দুই কিশোর-কিশোরীর স্বপ্নঘর। কেড়ে নিয়ে যায় বেদৌরাকে দারার জীবন হতে। যুক্তি হিসেবে বলে, চাল চুলোহীন ভবঘুরে বাউণ্ডেলে দারার সামর্থ্য নেই বেদৌরার ভরণ-পোষণের। বেদৌরার স্বার্থান্ধ মামার যুক্তি বিশ শতকের বস্তুতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বাস্তবতা। এই শতকেই প্রথম মানুষের প্রেমও বাজারে ওঠে পণ্যের মতো। অর্থ-বিত্তের বিনিময়ে দর কষাকষি চলে প্রেমের। এই বাজারে দারার শূন্য হাত। ফলে বেদৌরাকে পাবার অধিকার তার নেই। বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেদৌরার আশা ত্যাগ করাই তার জন্য শ্রেয়। বেদৌরাকে নিয়ে ঘর করার আশা ত্যাগও করে দারা। কিন্তু বেদৌরাকে ত্যাগ করতে পারে না।

দারা বলেছে, 'যাকে অন্তরের অন্তরে পেয়েছি তাকে খামাখা বাইরে পেতে এত বাড়াবাড়ি কেন? তাই সেদিন আমার পোড়ো বাড়িতে শেষ কান্না কেঁদে বললুম, বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে আমার বুকের প্রতি রক্ত কণিকায়।'

অন্যদিকে বেদৌরাও অতিক্রম করে প্রতীক্ষার যন্ত্রণাদগ্ধ ব্যাকুল প্রহর। তার বিশ্বাস, দারা একদিন ফিরবেই। দারা ফিরেছেও সত্য, কিন্তু ততদিনে বেদৌরা জীবনের অনেকটা সময় চলে গেছে। মাঝখানে ঘটে গেছে অনেক কিছুই। এখন তার 'মালতীর লতা রিক্ত কুসুম।' যৌবনভারে বেদৌরার বিষাক্ত শরীর, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড শক্তির চাপে সয়ফুলমুলক্ নামক এক বেলুচ যুবকের কাছে আত্মদান করে ফেলেছে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে। বেদৌরা এখন রিক্তা ভিখারিণী। তার করুণ আর্তি-'সে যে ফিরে আসবেই সে তো জানা কথা। কিন্তু এতদিনে কেন? এ অসময়ে কেন? এখন যে আমার মালতী লতার রিক্ত কুসুম। ওগো এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব। যদি এলেই তবে কেন দু'দিন আগেই এলে না? তা হলে তো তোমায় এমন করে এড়িয়ে চলতে হতো না। (ব্যথারদান)

নারীত্বের ঐশ্বর্য হারিয়ে বেদৌরা এখন নিঃস্ব, অসহায়। দারার সাথে মিলনের নৈতিক অধিকার হারিয়েছে সে। বেদৌরার দাবি, তার দেহ নষ্ট কিন্তু অন্তরে দারার প্রেম আজও অবিকৃত এবং পবিত্র অবস্থাতেই বিদ্যমান। দারার পবিত্র প্রেমের পূঁজার ঢালি সাজানো আছে তার মন মন্দিরে। বেদৌরার ভাষায়, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর ; পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী। পাপের অনুশোচনায় জর্জরিত বেদৌরার দেহ-মন। কামনা-বাসনা প্রবৃত্তি সর্বস্ব বেদৌরা এখন মৃত। দারার প্রেম পবিত্র কিন্তু বেদৌরার দেহ অপবিত্র। তাই প্রাণের দহনে নীলকণ্ঠ বেদৌরার হাহাকার 'ওগো, তোমার সে বেদৌরা আর নেই, সে মরেছে, মরেছে। তবে প্রাণ তোমারিই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে। তুমি তাকে বৃথা এমন করে খোঁজে বেড়াচ্ছ। বেদৌরা নেই-নেই-নেই!' (ব্যথারদান)

সত্যিই, অত্যন্ত মর্মস্পশী বেদৌরার এই আর্তনাদ। এই তরুণীর গভীর অন্তর্দাহ গল্পের কাহিনীতে ট্রাজিক বলয় তৈরি করেছে। আমাদের স্বার্থতাড়িত সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থায় সম্ভ্রম হারানো নারীর প্রকৃত অবস্থা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। বেদৌরার আত্মবিশ্লেষণ বা আত্মসমালোচনা পাঠকের মনকে সহানুভূতিশীল করে। ড. জীবন কুমার মুখোপাধ্যায় বেদৌরার আত্মযন্ত্রণার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন চমৎকারভাবে :

> বেদৌরার এই আত্মযন্ত্রণা পাঁচজনের সহানুভূতিকে দাবি করে। সে তিন দিক থেকে আক্রান্ত। একদিকে তার যৌবন পিপাসা, আর একদিকে প্রকৃতির উন্মাদনা এবং তৃতীয় দিকে দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি। ত্রিমুখী আক্রমণে বা ষড়যন্ত্রে অসহায় নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারল না, বিভ্রম আচ্ছন্ন করল। মুহূর্তের বিভ্রমে সে চিরকালের জন্য পতিতা হয়ে গেল। এই বিভ্রান্তির হাত হতে রক্ষা করতে পারত তার বুদ্ধি। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসী বেদৌরার জীবনে বুদ্ধি যাঁর দান প্রবৃত্তি তাঁরই দান। এখন একটি দান যদি আর একটি দানকে পরাভূত করে বিপদ ডেকে আনে, তবে দুর্বল মানব কন্যা বেদৌরার আর করণীয় কি থাকে ? অভিমানে তখন সংশয় জাগে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায়।[১৭]

অন্যদিকে, গল্পের নায়ক দারার বেদনাও কম নয়। প্রেম মানব আত্মার এক গভীরতম ক্ষুধা, যে ক্ষুধা নিবৃতি ঘটে একমাত্র প্রেমাস্পদের সাথে মিলনে। সেই মিলনের প্রধান অন্তরায় তার প্রেমিকা বেদৌরা নিজেই। প্রেমের এই নির্মম অবমাননা দারাকে অশান্ত করে। ক্ষুব্ধ দারা যোগ দেয় 'মুক্তির সেবক'[১৮] দলে। উদ্দেশ্য যুদ্ধ মাঠে রক্ত ঝরিয়ে প্রেমিকার প্রতারণার প্রতিশোধ নেওয়া। এ দলে যোগ দিয়েছে কাহিনীর ভিলেন সয়ফুলমুলক্ও। এ যুবক বেদৌরার দুর্বল মুহূর্তে দেহ পেয়েছে কিন্তু মন পায়নি। ব্যর্থ প্রেমের চরম অসন্তোষ, অতৃপ্তি নিয়ে দারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হয়। দারার বাইরের যুদ্ধের চেয়ে ভিতরের যুদ্ধ আরো ভয়ানক বলেই যুদ্ধের মাঠে এমন ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে। যে কারণে, শত্রুপক্ষের বোমার আঘাতে দারা অন্ধ ও বধির হলে সফল হয় তার যুদ্ধযাত্রার। স্বদেশের জয় হয় যুদ্ধে, সেই জাতীয় বিজয় অর্জন হয় দারার-ই মহৎ মূল্যে এবং অন্ধ-বধির জীবনের শূন্যতা দিয়ে। অন্ধ ও বধির দারার প্রেম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যের 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার অন্ধ কবি সুরদাসের প্রেমের ন্যায় রক্ত মাংসের কামনা বাসনার উর্ধ্বে ওঠে গেল। বেদৌরার দেহ আর দারার প্রয়োজন নেই। দেহের প্রবৃত্তি এক পসলা বৃষ্টির মতো সাময়িক। কিন্তু প্রেমের দ্বীপশিখা সূর্যের মতো বিস্তৃত ও স্থায়ী। কামনা বেদৌরার বাহিরটা নষ্ট করেছে, ভেতরটা নষ্ট করতে পারেনি। তেমনি চর্ম চক্ষুহীন দারার প্রেম আরো গভীর ও মহৎ। দারার এই নির্মম প্রায়শ্চিত্ত বা অনুশোচনা বেদৌরার দেহের পবিত্রতা নষ্টের জন্য নয়, বেদৌরাকে প্রসন্ন চিত্তে ক্ষমা করতে না পারা অক্ষমতাজনিত কারণে। নিজের বিচারে সে নিজেই অপরাধী। দারার আত্মবিশ্লেষণ-

> আমি দেখছি সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি একরত্তিও বড় নই ! আমারও মন তাদের মত অম্নি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা। নইলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা কর'তে পারলুম না কেন ? হোক না কেন যতই বড় সে দোষ! বাহিরটা তার নষ্ট হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভেতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ্র র'য়েছে ! অনেকে যে

ভিতরটা অপবিত্র ক'রে বাহিরটা পবিত্র রাখার চেষ্টা করে, সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দোষ। কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র র'য়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা করতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই ; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট । (ব্যথারদান)

দারার এই আত্মবিশ্লেষণ পাঠকের মনে গভীর প্রীতি জন্মায় তার প্রতি। অপরাধকে ক্ষমা করতে না পারার অপরাধী দারা। তাই আমরা দেখতে পাই, বেদৌরার শাস্তির চাইতে দারার শাস্তির মাত্রা আরও অধিক। গ্রিক ট্র্যাজেডির আত্মাপরাধ জনিত জীবনদর্শনের ছায়া দেখতে পাই দারা ও বেদৌরার মধ্যে। শরৎচন্দ্রের দেবদাসের অনুরূপ বেদনা নায়ক দারার। পার্থক্য হল, শরৎচন্দ্রের নায়ক দেবদাস যে পরিস্থিতিতে বেশ্যাসক্ত ও মদ্যপ হয়েছিল, নজরুলের নায়ক দারা সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধে গিয়ে আত্মহননের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

প্রেম ও যুদ্ধ একই তালে এসেছে রোমান্টিক প্রেমের গল্প 'হেনা'তে। গল্পের নায়ক প্রেমবঞ্চিত এক আফগান যুবক। আর পটভূমি ইউরোপের ফ্রান্স, উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোয়েটা, পেশোয়ার ও কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত। হেনার প্রেম প্রত্যাখ্যানের জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে নায়ক সোহরাবের অগ্নিমূর্তি। একদিকে যুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা, 'লালে লাল ! শুধু লাল আর লাল। এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল হয়ে শুয়ে আছে।' অন্যদিকে হেনার প্রেম প্রত্যাখ্যান 'আমি আজও তোমায় ভালবাসতে পারিনি।' নায়ক সোহরাবকে অস্থির করে।

পেশোয়ারে এসে সোহরাব জানতে পারে, হেনার মুখ আর বুকের ভাষা ভিন্ন। হেনার চোখে অশ্রু আর মুখে দাম্ভিক অস্বীকার, সোহরাবকে দ্বিধার সংকটে ফেলে। সে বুঝতে পারে, দুনিয়ার সব চেয়ে মস্ত হেঁয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন। হেনার উপর গভীর অভিমানবশত সোহরাব আত্মধ্বংসের পথ বেছে নিল। আবারও সে যাবে যুদ্ধে। স্বদেশি আমিরের পক্ষে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিল। এবার যাবে চিরদিনের জন্যে। মজার বিষয়, এই জন্য হেনার কাছেই প্রেম ও প্রেরণা প্রার্থনা করে যুবক। বিদায় নিতে গিয়ে অভিমানী সোহরাব যখন বলে, 'হেনা, আমীরের হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আর ফিরে আসব না। বাঁচলেও আসব না।' তখন বীরাঙ্গনা আফগান মেয়ের পাহাড় ফাঁটা উদ্দাম জলস্রোতের মতো প্রেমের প্রকাশ ঘটে, 'সোহরাব, প্রিয়তম! তাই যাও! আজ যে আমার বলবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালবাসি। আর আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে 'আশেক'কে কষ্ট দেব না।' (হেনা)

হেনার বাইরে কঠিন মূর্তি, ভেতরে কিন্তু কোমল প্রাণ। তার প্রেম আর দেশ প্রেম একই সূত্রে গাঁথা। তাই বিদেশে যুদ্ধরত স্বদেশি যুবকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেও পরে ঠিকই ভালবাসে, যখন যুবক স্বদেশের জন্য যুদ্ধে যেতে চাইল। নব জাগ্রত হেনা এবার সোহরাবের সহগামীও। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতও হয়। সেই সাথে হেনা একনিষ্ঠ প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়।

'কালো মানুষের বড্ড বেশি চাপা অভিমান তাদের কালো রূপের জন্যে, তারা মনে করে তাদের কেউ ভালবাসতে পারে না। কেউ ভালবাসছে দেখলেও তাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। বেচারাদের জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী।' (বাদল-বরিষণে) কালো মেয়ের এই ট্রাজিক বেদনাই নজরুলের 'বাদল বরিষণে' গল্পের মূল বক্তব্য। বিশুদ্ধ রোমান্টিক চেতনার গল্প। গল্পের নায়িকা কাজরিয়া কৃষ্ণবর্ণ। কালিগঞ্জের উপকণ্ঠের বাঁকে শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে বিদেশি এক যুবক কাজরিয়াকে প্রেম প্রস্তাব করে অকস্মাৎ। এই প্রেমের প্রস্তাব কাজরিয়াকে স্বাভাবিক বিশ্বাসের সংকটে ফেলে। সে জানত, কালো মেয়েদের ভালবাসা পাওয়ার অধিকার নেই। যুবকের প্রেম প্রস্তাব অর্থ এক ধরনের অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান। অস্বাভাবিক হীনমন্যতায় ভারাক্রান্ত কালো মেয়ে কাজরিয়া উপলব্ধি করতে পারেনি, সত্যিকারের সৌন্দর্য দেহের ব্যাপার নয়, অন্তরের। ভেতরে ফেনায়িত অভিমানবশত কাজরিয়া বিদেশি যুবকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, 'নাহিরে সুন্দর পরদেশী, ম্যয় কারী কাজরিয় হুঁ।' কাজরিয়ার এই অভিমান অতি স্বাভাবিক, যৌক্তিক। সৃষ্টিকর্তার বিরাট সুন্দরের আধার এই বিশ্ব অথচ কাজরিয়ার বেলাতে এত কৃপণতা কেন ? কাজরিয়ার অচরিতার্থ প্রেমের হৃদয় বেদনা অত্যন্ত সহানুভূতির মন দিয়ে দেখেছেন গল্পকার।

কাজরিয়ার কালোরূপ যুবকের চিরআকাঙ্ক্ষার। অন্ধকারের মধ্যে আলোর মানিকের মতো কালো মেয়ের ভেতরে তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার দ্বীপশিখা জ্বলে। বাইরের কালো রূপ দেখে সবাই, তাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের সুপ্ত প্রেমের খবর কেউ নেয় না। কাজরিয়ার সেই সুপ্ত প্রেম বিদেশি যুবকের পরশে জেগে উঠতেই ভীত বিহবল হয়ে পড়ে। প্রচলিত সমাজ ধারায় এই প্রেমের পরশ ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হয়। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে কাজরিয়ার মিনতি :

দেখ, বিদেশী পথিক! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজরিয়া বলে উপহাস করে। তাদের সে আঘাত আমি সইতে-উপেক্ষা করতে পারি ! তুমিই কেন আমায় ভালবাসি বলে উপহাস করছ? ওগো সুন্দর শ্যামল ! তুমি কেন হতভাগিনীকে আঘাত করছ ? এ অপমানের দুর্বার লজ্জা রাখি কোথায় ? জানি,

> আমি কালো কুৎসিত, তাই বলে ওগো পরদেশী তোমার কি অধিকার আছে আমাকে অমন করে মিথ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ করার ? ছিঃ ছিঃ আমায় ভালবাসতে নেই, ভালবাসা যায় না, ভালবাসতে পারবে না। এমন করে আর আমার দুর্বলতায় বেদনা-ঘা দিও না। (বাদল-বলিষণে)

প্রকৃতপ্রস্তাবে, এই বিদেশি যুবকের প্রেম কাজরিয়ার তৃষিত হৃদয়েরও চাওয়া। যুবক তার আরাধ্য পুরুষ। এড়িয়ে যাবার যত ছলই করুক না কেন, সমাজের চোখে যতই বেমানান হোক না কেন, কাজরিয়ার তীব্র প্রেম আকাঙ্ক্ষা স্থির থাকতে দেয়নি। ফলে বাঁধভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের মতো আবেগ-আর্তি নিয়ে লুটিয়ে পড়ে বিদেশি যুবকের বুকে। একনিষ্ঠ প্রেমিক যুবকও তার চিরজনমের কামনার ধনকে বুকে টানে চিরক্ষুধিতের মতো। যেই মুহূর্ত হতে কাজরিয়া আত্মসমর্পণ করেছে, সেই মুহূর্ত হতেই জীবনের নব দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। অন্তরের গভীর প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করলে কাজরিয়া কাঙালিনীর মতো ছুটে আসে যুবকের কাছে। আবার ভেতরে দীর্ঘ দিনের জমাট বাঁধা হীনতাভাব ফিরে যেতে বাধ্য করে তাকে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক এই কারণে, কাজরিয়ার মন কিন্তু এই পরাজয় মানতে অস্বীকৃতি জানায়। পরিহাসের বিষয় হল, কাজরিয়ার কালো রূপ যার দান, অন্তরের প্রেমও তারই দান। কাজরিয়া কেন হার মানবে ? আপন আত্মশক্তির প্রতি প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী কাজরিয়া মির্জাপুরের পাহাড়ের বুকে বিরহী নামক উপত্যকায় ভাদ্রের কৃষ্ণা-তৃতীয়ায় চিরদিনের জন্য ঠাঁই করে নিল বিদেশি যুবকের সবুজ বুকে। কিন্তু কাজরিয়ার এই মিলন সুখ বেশিদিন সইল না। প্রত্যাশার চাইতে এত অধিক সুখ কাজরিয়া পেল যে, সে সুখ বুকে ধারণ করে সে পাড়ি জমাল কালরূপ স্রষ্টার কাছে। তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার দুর্বার অমোঘ টান কাজরিয়াকে বাঁচতে দেয়নি। কাজরিয়ার মৃত্যুতে প্রেম ছড়িয়ে গেল প্রকৃতিতে। পথিক প্রেমিকও প্রেম পেল আপন করে। এই বিয়োগ বেদনা তার মনে নব চেতনার জন্ম দিল। কালো মেয়ে কাজরিয়ার এই মিলন সুখ, সাদা-কালো বিভেদের কলুষে আক্রান্ত বাস্তব সমাজ মেনে নিত না। তাই মিলনের অমৃত সুখ বুকে নিয়ে কাজরিয়া চলে গেল নীরবেই। কালো মেয়ের প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ে নজরুল চমৎকার মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Lucy Gray' কবিতার উপসংহারের সাথে গল্পটির বেশ সাদৃশ্য দেখতে পাই।

সৈনিক জীবনে কঠোর বিধি-নিষেধ ও আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতে হয়। যুদ্ধের সেনানীকে 'দুর্বিনীত দুর্বার নর-রক্ত পিপাসু দুর্বৃত্ত দানবের মতই' ভয়ংকর হতে হয়। কিন্তু সৈনিকের অন্তরের নীরব প্রদেশে বসবাস করে বিজয়া লক্ষ্মী নারী। নারীর প্রেম ও প্রেরণাই যুদ্ধরত সৈনিকের শক্তির উৎস। 'ঘুমের ঘোরে' গল্পের মূল বক্তব্য তাই। নায়ক আজহারের বাহিরে সৈনিকের রুদ্র মূর্তি, ভেতরে কান্নার স্রোত বইছে। তার প্রেয়সী তারই বন্ধু পত্নী এখন। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে আজহার তার পরিত্যক্ত প্রেমিকা পরীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। পরীও সুযোগ বুঝে মধুর প্রতিশোধ নিতে ভুল করে না। সে কঠিন ভাষায় বলে 'আপনি এখানে কেন আর?'

জীবনকে মহৎ কর্মে উৎসর্গ করার কর্তব্যবোধের তাগিদেই পরীকে ত্যাগ করেছিল আজহার। এ কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল পরীর গভীর প্রেম। বড় প্রাণ নিয়ে আজহার ভালবেসেছিল পরীকে। আরও বড় কর্মে পরীর প্রেমের মহৎ প্রেরণাকে কাজে লাগাতে গিয়ে সে আজ করুণ ট্রাজিক পরিণতির শিকার। বড় প্রেমের প্রাপ্তি মিলনে নয়, বিরহে। এ চিরন্তন সত্য আজহারের প্রেমিকা বুঝতে পারল না। যে প্রেমিক আঘাত করে তার বুকের প্রিয়ারে, তার বুকেও বাজে শতগুণ ব্যথা। আজহারের আক্ষেপ :

> হায় ! প্রাণ প্রিয়তমের পাওয়াকে এড়িয়ে চলবার ধৈর্য্য আর শক্তি পেতে যে আমি কত বেশী বেদনা আর কষ্ট পেয়েছি, তা তুমি বুঝবে না পরী-বুঝবে না ! তবু কিন্তু বড় দুঃখ র'য়ে গেল যে, হয়তো তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা বুঝতে পারলে না। তোমায় অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে যত বেদনা দিয়েছি, তার কত বেশি ব্যথা যে আমাকে চাপতে হয়েছে, কত বড় কষ্ট যে নীরবে সইতে হয়েছে, তা যদি তুমি জানতে পারতে পরী, তাহলে সে দিন এই কথা মনে করে আমায় এত বড় আঘাত করতে পারতে না। (ঘুমের ঘোর)

আজহার সৈনিক। প্রেমিকার আঘাতের ঘা তার ভেতরে। ফলে যুদ্ধে সে অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে পরীর দাবি, তার দেওয়া আঘাতই এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, 'আমার ভালবাসা হয়তো তার কর্তব্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' পরীর এ আত্মত্যাগ আরও গভীর, বৃহত্তর। আর এজন্য তাকে জীবন ধর্মের সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। একদিকে মন্ত্রপড়া স্বামী অন্যদিকে প্রেমিক। আজহারকে চিন্তা করাও তার জন্য ভয়ানক ও অমার্জনীয় পাপ। ফুল শয্যার রাতে পরী অন্তরের ব্যথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। পরীর জন্য স্বস্তির বিষয় হচ্ছে, তার বেদনা তার স্বামীও জানে। কেননা তার স্বামী আজহারের বাল্যবন্ধু। আজহার তাকে সব বলে গেছে। পরীকে সুখী করার জন্য অনুরোধও করেছে।

প্রেমের আকর্ষণ দুর্নিবার। বড় প্রেমের বড় টান। প্রেমাস্পদকে রেখে দূরে যেতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত পারে না প্রেমিক। আজহার যে মনোবলে বলিয়ান হয়ে পরীকে ছেড়েছিল, তা ছিল মূলত বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি। বাস্তবে প্রেমের ধর্ম এটা নয়। বুদ্ধি দিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই মানতে চায় না হৃদয়। ফলে শুরু হয় ভেতর-বাইরের অন্তর্বিরোধ। আজহার-পরীর প্রেমে এই দ্বন্দ্বই দেখতে পাই।

কিশোর প্রেমের সার্থক চিত্রায়ণ হয়েছে 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক যেমন সুরবালার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে, আলোচ্য গল্পের কিশোর নায়কও তার কিশোরী প্রেমিকা মোতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে কারণে-অকারণে পিটিয়ে, নানা উপদ্রব চালায়। নায়কের নিষ্ঠুর আঘাত নায়িকার কাঙ্ক্ষিতও বটে, 'কই ভাই এ দু'দিন আমায় মার নি।' নায়ক শুধু আঘাতই করে নি, উপহারও দিয়েছে প্রাণভরে। 'আমার হাতের সামনে যা কিছু ভাল জিনিস থাকত ; তাই তাকে দিয়ে যেন আমার প্রাণে গভীর তৃপ্তি আসত।... বই থেকে ছবি ছিঁড়ে তাকে দেওয়াই ছিল আমার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। এর জন্য প্রায়ই পাঠশালায় সারাদিন কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

কিশোরের নানারঙের দিনগুলো বিষাদে ভরে উঠে তখনই, যখন মোতির বিয়ের আলাপ চলে জমিদারের বি এ পাশ শিক্ষিত ছেলের সাথে। মহৎ প্রেমিকের মতো কিশোর তার প্রেমিকার সুখের জন্য প্রতিষ্ঠিত অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তুতি নিল। তার প্রেমিকার নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্বামী-সংসার হবে, এ প্রত্যাশায় অপ্রাপ্তির ব্যথা বুকে পাথর চাপা দিয়ে, নির্মম অভিনয়ে-আঘাতে মন ফেরাতে চাইল, 'তোমায় এতদিন শুধু মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত করে এসেছি মোতি, কোনদিন সত্যিকারের ভালবাসি নি।' নায়কের এই নিষ্ঠুর কথাতে যতটুকু আঘাত পেল তার প্রেমিকা, তারও অধিক ব্যথা পেল সে নিজেই। 'তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, বে-দিল'- প্রেমিকার এই প্রতি উত্তরে আর্তগভীর আর্তনাদের ঝড় উঠে কিশোরের অন্তরে। তার অভিমানী প্রেমিকাও বসে বিয়ের পিঁড়িতে।

কিশোর প্রেমিক এখন চির-নিঃস্ব, চির-উপবাসী। অতৃপ্ত কামনার দুঃসহ যন্ত্রণায় দেহ-মন বিষাক্ত তার। 'হঠাৎ ঐশ্বর্যের লেখনীর আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয় চির দারিদ্রের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড় দীন, হৃদয় বড় দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।'[১৯] মোতিকে ফিরিয়ে দিয়ে কিশোর প্রেমিক এখন পলে পলে বেদনার দহনে পুড়ছে। অতি সহজেই যাকে বলতে পারল 'আমাকে ছাড়তেই হবে', তত সহজে ভুলতে পারল না। ক্লান্তিতে ভরে গেল একাকী চলার পথ। তার ঘর এখন অন্ধকার কুটির। চিরব্যথার দাবানলে জ্বলছে তার দেহ-মন। প্রতীক্ষার ব্যাকুল প্রহর কাটাবে না তার জন্য কেউ আর। কিশোরের রিক্ত মনের হাহাকারের খবর কোনদিনই হয়ত পাবে না তার বিমুখ প্রেমিকা। তার আক্ষেপ, একে একে সব ঘরেই প্রদীপ জ্বলবে, শুধু তার একা ঘরেই আর কোন দিন সন্ধ্যা-দ্বীপ জ্বলবে না। সেই ম্লান দ্বীপ শিখাটির পাশে তার আসার আশায় কোন কালো চোখের করুণ কামনা ব্যাকুল হয়ে জাগবে না। অন্তরের বাসনা-কামনা, আক্রোশ-অশান্তিকে অবহেলা করে যে কিশোর প্রেমের দাবি ছেড়ে দিল, সেই-ই অনুভব করে তার জীবনে নারীর অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। এই নায়ক আর 'ঘুমের ঘোর' গল্পের নায়ক আজহারের বেদনার ধরন একই। উভয়েই নায়িকাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে জীবন ধর্মের অবমাননা করেছে। ফলে নির্মম আত্মপীড়নে ভুগতে হয়েছে তাদেরকে।

প্রত্যাশিত প্রেম বঞ্চিত এক যুবকের সকরুণ মর্মবেদনার লিখিত দলিল 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটি। যুবক এখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দি। একদিন পরেই বিচার হবে। ন্যূনতম দু'বছরের জেল নিশ্চিত। জীবনের দুর্দিনের এই দুঃসময়ে যুবক চিঠি লিখছে তার মানসী প্রিয়াকে। যে মানসী প্রিয়া কখনই তাকে ভালবাসেনি। অবহেলা, অনাদর, উপেক্ষাতে ভরে দিয়েছে যুবকের চাওয়া-পাওয়াকে।

যুবকের 'অন্ধ বধির ভিখারী মন' কাঙালের মতো প্রেম চেয়েছিল। মানসী প্রিয়ার সামান্য স্পর্শেই যুবকের বেদনার্ত দেহে-মনে সুখের ঝড় বয়ে গেল। পরিতাপের বিষয়, যুবকের বুকের ব্যথার কারণ তার মানসী জানতেও চায় না। এ উদাসীনতা যুবকের বুকের ব্যথা আরও বাড়িয়ে দিল। যুবক তার প্রিয়ার রহস্যের পাষাণ প্রাচীর ভাঙতে পারে না। এই না জানার ব্যথা তার বুক জুড়ে প্রধান ব্যথা।

গল্পটিতে নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চমৎকার। যুবকের প্রেম একনিষ্ঠ প্রেম। হিংসাকাতর এই যুবক তার মানসীকে আর কেউ ভালবাসতে পারে, এ ভয়ে ত্রস্ত ছিল। লোকালয় ছেড়ে বিজন বনে দিন কাটাবার কথাও ভাবে এক সময়। যুবক জীবনে আর কাউকে ভালবাসতে পারেনি কিংবা ভালবাসার অভিনয় করে আবার পথে ফেলে দিয়ে কারো প্রেমের অপমানও করেনি। সৎ ও গভীর প্রত্যয় তার মনে। সুতরাং তার মানসী প্রিয়ার কাছে সৎ ও একনিষ্ঠ প্রেম প্রত্যাশা সে করতেই পারে। তার সরল স্বীকারোক্তি :

আমি বড্ড হিংসুটে। তোমায় অন্যে ভালবাসবে, এই চিন্তাটাও সইতে পারিনে, দেখতে পারা তো দূরের কথা।...আমি চাই, তুমি একা আমার–শুধু আমার ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে আমার হও, আর আমিও পূর্ণরূপে তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুখী হই। আমি ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না- কখনই না, কিছুতেই না। তাই যখনই আমি দেখেছি যে, অন্যে তোমার দিকে একটু চেয়ে দেখেছে আর তুমিও তার পানে হেসে চেয়েছ, অমনি মনে হয়েছে এক্ষুণি গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিই। (রাজবন্দীর চিঠি)

সমাজ-সংসারের প্রেমের সবটাই ফাঁকি, অল্পতেই তুষ্ট। যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চির অতৃপ্ত। তাই ঘর বাঁধা হয়নি। তার মানসী প্রিয়াও আর সকলের কাছে সহজ-সরল, কেবল তার কাছেই দুর্বোধ্যের চাদরে ঢাকা এক রহস্যময়ী নারী। অশান্ত যুবক দিকশূন্য হয়ে ক্ষ্যাপা বাউলের মতো ঘুরেছে। নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যানে এ যুবকের মনে বাসা বাঁধে গভীর অভিমানের। তার চোখে নারীর সেবিকারূপ, ভালবাসারূপ তার পুরোটাই নারীর করুণা, প্রেম নয়। ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ যুবকের দৃষ্টিতে নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১.এমনি করে পুরুষ নারীর কছে চিরদিন প্রতারিত হয়ে আসছে।

২.তোমাদের কাছে থেকেও তোমাদের মন বুঝতে স্বয়ং ভগবান পারবে না, এ আমি আজ জোর গলায় বলছি।

৩. তারা পুরুষের ভালবাসার বড় অনাদর করে; বড় অবহেলা অপমান করে। তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী করতে পারে না। আমাদের বেদনার সৃষ্টি এইখানেই। (রাজবন্দীর চিঠি)

নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের বিপ্লবী নায়ক যক্ষ্মা আক্রান্ত আনসারের মতো 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পের নায়কের বুকও খেয়ে ফেলেছে পোকায়। যক্ষ্মা আক্রান্ত রাজবন্দি যুবকও মৃত্যুর প্রহর গুণছে জেলে। দু'বছর কেন, ছয় মাসের জেল হলেও যুবকের ফেরার পথ নেই। তাই শেষ সত্য জানিয়ে গেল তার মানসী প্রিয়াকে। আবারও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে বলেছে- 'যদি কোন অপরাধ করে থাকি তোমার কাছে কোনদিন, তবে তা ভুলে যেও না, ক্ষমা করো এই ভেবে যে তুমি যাকে কিছুতেই ভালবাসতে পার নি- সেই তোমার সকল কথা তার শেষ দিন পর্যন্ত খোদার পবিত্র বাণীর চেয়েও পবিত্রতর মনে করে মেনে চলেছে। এইটুকু ভেবে পার তো একটু আনন্দ অনুভব করো। আমার মতন দুর্জয় বাঁধনহারাকে তুমি জয় করেছিলে এই ভেবে একটু গৌরব করো।' (রাজবন্দীর চিঠি)

নজরুলের প্রেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রেয়সীর প্রেম প্রত্যাখ্যান, অবজ্ঞা, অবহেলা এমন কি নিষ্ঠুর আচরণও প্রেমের প্রাণ প্রাচুর্য এবং মাধুর্য ম্লান করতে পারে না। রাজবন্দি যুবক, যে নিজেকে শ্রী ধূমকেতু নামে চিঠির শেষে পরিচয় দিয়েছে, সে ই মহৎ প্রেমের ধারক। তার মানসী প্রিয়ার কাছে আশীর্বাদ চাইল পুনর্জন্মে যেন সেই ভাগ্যবান হয়ে জন্মাতে পারে, যাকে সে ভালবাসতে পারে। কাকতালীয়ভাবে পরবর্তীতে নজরুলের জীবনেও রাজবন্দি যুবকের মতো এক তরফা প্রেমের ঘটনা ঘটেছিল। ফজিলাতুন্নেসা নামে এক উচ্চশিক্ষিতা যুবতীর প্রেমপ্রার্থী ছিলেন। যুবতী নজরুলের প্রেম প্রস্তাবে সাড়া দেননি। রাজবন্দি যুবকের অনুরূপ নজরুলের মধ্যেও প্রত্যাশিত প্রেম না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশের অন্ত ছিল না।

২.

কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'রিক্তের বেদন'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। গ্রন্থটি আটটি গল্পের সংকলন। 'রিক্তের বেদন' গল্পটি ১৩২৭ বৈশাখের 'নূর'-এ, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'১৩২৬ জ্যৈষ্ঠের 'সওগাত'-এ, 'মেহের- নেগার' ১৩২৬ মাঘের 'নূর'-এ, 'সাঁঝের তারা' ১৩২৭ মাঘের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়, 'রাক্ষুসী' ১৩২৭ মাঘের 'সওগাত'-এ, 'সালেক '১৩২৭ আষাঢ়ের 'বকুল'-এ 'স্বামী হারা' ১৩২৬ ভাদ্রের 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়েছে। 'দুরন্ত পথিক' গল্পটি 'দৈনিক নবযুগ' হতে ১৩২৭ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারতে' সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো বেশ আগেই লেখা অথচ প্রকাশ করা হয়েছে অনেক পরে। বিলম্বে প্রকাশের জন্য প্রকাশকের পক্ষ হতে কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক কৈফিয়তে বলেন- 'রণকোলাহলের মত্ততার মাঝে জন্মেছিল তরুণ কবির ভাবরাজ্যের দ্যোতনা-ভরা এই উচ্ছ্বাস। মেসোপটেমিয়ার ধুলি ঝেড়ে আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকেই একে কোল দিতে হয়েছিল। আমার অযোগ্যতাই এতদিন কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত তার পরিচয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এতে কবির এবং তাঁর পাঠকবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের জন্য আমি দায়ী। অদ্য প্রায়শ্চিত্ত করলাম।'[২০]

নজরুলের কিশোর বয়সের আবেগ, উচ্ছ্বাস ও বেদনার্ত হৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তি ডাইরি স্টাইলে লেখা গ্রন্থের প্রথম গল্প 'রিক্তের বেদন'। হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু হয় কিশোর নজরুল সৈনিক জীবনের যাত্রা। তারপর লাহোর হয়ে গিয়েছিলেন নৌশেরা। এখানেই তিনমাস ট্রেনিং করেন। ট্রেনিং শেষে চলে যান করাচি। অনেকটা আবেগের বশে সৈন্যদলে যোগ দিলেও নানা দোলাচালের ঢেউ খেলে গিয়েছিল কিশোর নজরুলের মনে। অনেক

বন্ধন ছিঁড়ে যেতে হয়েছিল। ফলে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় নজরুলের মন দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছিল। আত্মীয়, বন্ধু-স্বজনদের স্নেহ-ভালবাসার শেকল তখনও এই কিশোরের পায়ে বাঁধা। তাছাড়াও কিশোর বয়সেই নজরুল কোন কিশোরীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে গভীর অভিমান বুকে নিয়েও এমন দুঃসাহসিক অভিযানে নামতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। 'শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল জীবনে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হওয়ার যত সংকল্পই নিয়ে থাকুন না কেন তাঁর সেনাবাহিনীতে যাওয়ার অন্যতম এবং আশু উদ্দেশ্য ছিল মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গণে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যন্ত্রণা ভোলার তাগিদ।' [২১] অন্তত, 'ব্যথার দান' গল্পের উৎসর্গ পত্রটি পড়ে তাই মনে হয়। আমরা 'রিক্তের বেদন' গল্পের তরুণ নায়কের মধ্যে হুবহু কিশোর নজরুলের প্রতিকৃতি দেখতে পাই। লাহোর, নৌশেরায় নায়কের মনে যে হতভাগিনী কিশোরী শাহিদার কথা মনে পড়ে, এমন এক হতভাগিনীর[২২]কথা লাহোর রেলস্টেশনে কিংবা নৌশেরা ট্রেনিং এর ফাঁকে নজরুলের মনেও ছিল বলে জানা যায়।

গল্পের কাহিনীর কিশোর নায়কের আছে প্রগাঢ় দেশপ্রেম। মা ও মাতৃভূমি এই কিশোরের কাছে একই গুরুত্বের ও সম্মানের। দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মদানকারী জাতির বীর সন্তানেরা তার অনুপ্রেরণা। নজরুলের আজন্ম বিশ্বাস ছিল, সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে তরুণরাই দেশ ও জাতির মুক্তি তথা সৃষ্টির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। 'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়কেরও এই বিশ্বাস। তার আবেদন:

> তোমরাই ত আমাদের দেশের ভবিষৎ আশা, ভরসা সব। বৃদ্ধদের মানা শুনো না। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, আবার কোন মুগ্ধ যুবক নিজেকে ঐ রকম বলিদান দিতে আসলে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাৎ করেন। মনে করেন এই মাথা-গরম ছোকরাগুলো কি নির্বোধ ! ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল ভাই, এদের এ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বন্ধন। (রিক্তের বেদন)

গল্পের বি এ পড়ুয়া নায়ক মায়ের একমাত্র জীবিত সন্তান। দেশ সেবার অন্তর ডাক পেয়েছে কিন্তু মা এ পথের প্রধান বাধা। মায়ের অন্ধ স্নেহের বাঁধন এবং পল্লবিত আশাকে অনেকটা নিষ্ঠুরভাবে দমন করে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে তরুণ। সে বলেছে, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও–তোমার এ জনম পাগল ছেলেকে ছেড়ে দাও।' মায়ের আঁচল কেন, কোন বাঁধাই আর আটকে রাখতে পারবে না তরুণকে। তরুণের এই যে দেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস, আত্মনিবেদনের একনিষ্ঠ প্রত্যয়, তার পিছনে রয়েছে ভিন্ন কারণ। আর তা হল, তরুণের অন্তরে অব্যক্ত প্রেমের চরম অস্থিরতা। 'বন্দে মাতরম–বন্দে মাতরম' আর্ত বন্দনার প্রতিধ্বনিতে যে তরুণের বুক কাঁপে, তারই বুক কাঁপে কাজল আঁখির চকিত চাহনিতে। যাত্রাপথে মধুপুর স্টেশনে গ্যাসের আলোয় তরুণের সামনে ঝাপসা হয়ে আসে সজল আঁখির তরুণী শাহিদার মুখ। শাহিদার আলু থালু আকুল কেশ, ধুলি-লুণ্ঠিত শিথিল বসন, চাপা কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের প্রতিমূর্তি তরুণকে আহত করে। লাহোরে অবস্থানরত নায়কের চোখে ঝলমলে সোনালি সকাল পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। তার দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসও ফিকে হয়ে আসে। এই তরুণ-তরুণীর প্রেম লজ্জা মিশ্রিত এবং পুরোটাই অব্যক্ত। প্রথম প্রেমের লজ্জা, ভয়, শংকা বাসা বাঁধে দুই জনের অন্তরেই। গভীর প্রেমে ভাষা নীরব। তাই বিদায়ের মাহেন্দ্রক্ষণেও হাজার চেষ্টাতেও তরুণ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। এমন কি শাহিদাও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি কিংবা হাত বাড়িয়ে বাধার প্রাচীর দাঁড় করতে পারেনি। অব্যক্ত যন্ত্রণায় শাহিদা মাটি খামচে ধরেছে আর তীরবিদ্ধ পাখির মতো ছট্‌ফটিয়েছে কেবল। নায়কের আত্মবিশ্লেষণ :

> ওঃ, প্রথম যৌবনের এই গোপন ভালবাসাবাসির মাধুর্য কত গাঢ় ! আমার বিদায়ের দিনে একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে পারি নি তা'কে। শুধু একটা জমাট অশ্রুখণ্ড এসে আমার বাক রোধ করে দিয়েছিল ! সেও কিছু বলেনি, যতদিন বাড়ীতে ছিলুম, ততদিন শুধু লুকিয়ে কেঁদেছে আর কেঁদেছে। তারপর বিদায়ের ক্ষণে তাদের ভাঙ্গা দেয়ালটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়ে ছিল। আর তার তরুণ সুন্দর মুখটি এই ভোরের গ্যাসের আলোর মতোই করুণ ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছিল!–মা যেন আমার গোপন ব্যথার রক্ত-ক্ষরা দেখেই সেদিন বলেছিল, যা বাপ, একবার শাহিদাকে দেখা দিয়ে আয় ! সে মেয়ে ত কেঁদে কেঁদে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে !"– আমি তখন জোর ক'রে বলেছিলুম, " না মা, মরুক্‌গে সে, আমি কিছুতেই দেখা করতে পারব না।' হায় রে, খামখেয়ালীর অহতুক অভিমান ! (রিক্তের বেদন)

পাড়াগাঁয়ের এই প্রকৃতির প্রেমের অনিবার্য পরিণতিই হল বিচ্ছেদ। প্রথম প্রেমের এই দীর্ঘশ্বাস প্রতিটি মানুষের জীবনেই সত্য। বিরহ কাতর তরুণের যে গানটি মনে পড়ে, তা মূলত পাড়াগাঁয়ের কিশোর প্রেমের চিরকালের বেদনা মাখানো। সৈনিক জীবনের কঠোর শ্রম ও অনুশাসনের মধ্যেও অন্ধস্মৃতির ব্যথার চাপ থাকে তরুণের বুকে। আরবের মরুপ্রান্তরে সৈনিকের পোশাক পরিহিত তরুণের যুদ্ধ মূলত নিজেরই সঙ্গে। আত্মজয়ের কঠিন ব্রত নিয়ে যুদ্ধে এসেছে সে। পূর্ণ রিক্ত হওয়ার সাধনা তার। শাহিদার স্মৃতিকে ধুয়ে মুছে ফেলতে চায় সে। সে বলেছে,'আজ তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। হৃদয়, শক্ত হও-বাঁধন ছিড়তে হবে।' প্রেম পাওয়ার প্রবল তৃষ্ণা কিন্তু প্রেম চাইতে ভয়। আবার পেতেও যেন ভয়। আর পেলেও হারানোর ভয়। নজরুলের 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদার মতো 'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়কও বন্ধন ভীরু, সংসার উদাস। যুদ্ধ জয়ে চেয়ে

আত্মজয় আরও কঠিন। সর্বস্ব বর্জিত তরুণ এখন চরম রিক্ত। কিন্তু এই রিক্ততাও জীবনের জন্য কাম্য নয়। এর যন্ত্রণা আরও ভয়াবহ। প্রেম-ভালবাসা, মিলন-বিরহ, ভোগ-বাসনা, তৃপ্তি-অতৃপ্তির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানব জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দুর্নিবার আকর্ষণ মানুষের জীবনে অমোঘ সত্য। যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়ে বা বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করতে চায় জীবন বিমুখ মানুষেরা। এই পলায়নপর মনোভাব তাদের জীবনে ডেকে আনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। ভীরু-কাপুরষকে জীবন কখনও ক্ষমা করে না। জীবনের ধর্মই বুক উঁচিয়ে সংকটের সামনে দাঁড়ানো। দীর্ঘ এক বছর মনের সাথে ভয়ানক যুদ্ধ করে এই সত্য উপলব্ধি ঘটে কুর্দিস্থানে অবস্থানরত তরুণের মনে। তরুণ এখন পূর্ণ রিক্ত। তার ভাষায়, সে আত্মজয় করতে পেরেছে কিন্তু এই রিক্ততাই তার অন্তরে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টির কারণ। কারবালায় অবস্থানকালে তরুণ বলেছে, ইতিহাসের বিয়োগান্তক করুণ ঘটনার সাক্ষী অর্থাৎ বহু বীরের আত্মত্যাগের বেদনার ভারাক্রান্ত কারবালার আকাশ, বাতাস ও বক্ষের মতো তার জীবনও এক বিপুল রিক্ততায়পূর্ণ। ভোগ-তৃষ্ণার তীব্র আকুতি জেগে উঠে তার মনে। তরুণ আবার নতুন করে জীবনের প্রতি দরদী হয়ে ওঠে। তার আত্মোপলব্ধি :

> বাইরের যুদ্ধের চেয়ে ভিতরের যুদ্ধ কত দুরন্ত দুর্বার। রণজিৎ অনেকেই হ'তে পারে, কিন্তু মনজিৎ ক'জন হয় ? সে কেমন একটা প্রদীপকাঠিন্য আমাকে ক্রমেই ছেয়ে ফেলেছে । সে কি সীমাহীন বিরাট শূন্য হয়ে গেছে হৃদয়টা আমার। এই কি রিক্ততা ? ভোগও নেই –ত্যাগও নেই; তৃষ্ণাও নেই, তৃপ্তিও নেই ; প্রেমও নেই–বিচ্ছেদও নেই ;–এ যেন কেমন এক নির্বিকার ভাবা! না, এমন রিক্ততা-ভরা তিক্ততা দিয়ে জীবন শুধু দুর্বিষহ হয়ে পড়ে ! এমন কঠিন অরুণ মুক্তি ত আমি চাই নি ! এ যেন প্রাণহীন মর্মর-মন্দির। (রিক্তের বেদন)

নায়ক রিক্ততার অহংকার করে বলেছে, সে এখন রিক্ত ও মুক্ত। তার হৃদয় সাহারা মরুভূমির মতো প্রাণহীন। হাজার বছর বৃষ্টিপাতেও তার হৃদয়ে ঘাস জন্মাবে না এবং ফুল ফুটবে না। নায়কের আত্মজয় ও রিক্ততার এই দর্প ঘোষণা কেবলই মৌখিক। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই ভিন্ন সত্য। আরবের মরুমায়াবিনী বেদুঈন যুবতী গুল্ তার অহংকারের বেড়া ভেঙে দিয়েছে। গুলের প্রেমের আহবান সে বাহ্যিকভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও অন্তর হতে পারেনি। যেখানে বাধা প্রেম সেখানে আরও দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য। তরুণের অন্তরের প্রকৃত সত্য বেদুঈন যুবতী ঠিকই ধরতে পারে। তাই সে বুঝতে পারে বিদেশি তরুণ আত্মপ্রবঞ্চনা করছে। অন্তরে সত্যকে আড়াল করছে মিথ্যার আশ্রয়ে। এ কারণেই নায়ক কারবালা ছেড়ে আজিজিয়া এলেও তার পিছু ছাড়েনি। নায়ক নিজেই বলেছে 'শুনেছি এদেশের সুন্দরীরা এম্‌নি মুক্ত স্বাধীন আবার একগুঁয়ে। একবার যাকে ভালবাসে, তাকে আর চিরজীবনেও ভোলে না। এ উদ্দাম ভালোবাসায় মিথ্যা নেই, প্রতারণা নেই।' গুলের একনিষ্ঠ প্রেম নায়কের প্রাণে নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে। ফলে ভেঙে যায় তার আত্মজয়ের পাষাণব্রত।

গল্পের নায়ক নিজেকে খাঁটি দেশ প্রেমিক ও প্রবল দায়িত্ব সচেতন ভাবে। আর এই দায়িত্ববোধের বাহানাতেই শাহিদাকে ছেড়ে এত দূরের মরুভূমিতে। শাহিদার বিয়ের সংবাদ তার জন্য সুসংবাদ। কেননা এতে নায়কের রিক্ত হওয়ার সাধনার পূর্ণতা আসে, পরিপূর্ণ মুক্তিও ঘটে। নায়ক বলেছে, 'ভুলে যাও শাহিদা, ভুলে যাও, নতুন আনন্দে; পুরাতন সব ভুলে যাও।' কিন্তু এ সবই নায়কের বন্ধনহীন মনের কথা। তার রক্ত-মাংসের দেহ এতটা মহৎ নয়, এতটা অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। জীবনের বিশেষ আবেগের বশে যা ছাড়তে পারা যায় সহজেই, জীবনের চরম দুর্দিনে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ভীষণ যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে। নায়ক যতটা সহজে শাহিদাকে ছাড়তে পারে, তত সহজে ভুলতে পারে না। বরং দূরপ্রাচ্যের প্রাণহীন মরুর মাঝে প্রাণের অবিরাম ঝর্ণা বয়ে দেয়। শাহিদার বিয়ের সংবাদে হিংসাতুর প্রেমিক উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়েছে। অপ্রাপ্তির অশান্তি আর অস্থিরতায় ছট্‌ফটিয়েছে। নায়কের আত্ম-অহংকার পরাস্ত হয় নির্মমভাবেই। আত্মদ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত নায়কের সত্য উপলব্ধি ঘটে, বন্ধনেই প্রকৃত মুক্তি। ভেতর-বাইরের সক্রিয় সংঘাত-সংঘর্ষ নায়কের আত্মজয়ের পথে প্রধান বাধা। নায়কের আত্মোপলব্ধি নিম্নরূপ :

> এই আমাদের রক্তমাংসময় শরীর আর তারই ভিতরকার মনটা নিয়ে যতটা অহঙ্কার করি, বাইরে তার কতটুকু টিকে?–যেমনি মনটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে এক নিমেষের জন্য দুরস্ত ক'রে রাখি, অমনি মনে হয়, 'এই ত এক মস্ত দরবেশ হয়ে পড়েছি।' তারপরেই আবার কখন কোন্ ক্ষণে যে মনের মাঝে ক্ষুধিত বাসনা হাহাকার ক্রন্দন জুড়ে দেয়, তা আর ভেবে পাই না! আবার পেলেও সেটাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চাই! হায় রে মানুষ! বুঝি বা এই বন্ধনেই সত্যিকারের মুক্তি রয়েছে? (রিক্তের বেদন)

এই তো গেল শাহিদার কথা। নায়কের জীবনে অযাচিতভাবে আগত বেদুঈন যুবতী গুল এর অযৌক্তিক প্রেম প্রত্যাশাকে কতটুকু অগ্রাহ্য করতে পারে? গল্পের শেষে নায়কই কর্তব্যবোধে তাড়িত হয়ে গুলকে হত্যা করে। এখানে গুলের হঠাৎ মৃত্যু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিনীর অপমৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়, একই

অভিযোগ তোলা যায় নজরুলের বিরুদ্ধেও। অবশ্য নায়কের আত্ম-অনুশোচনাও লক্ষ্য করি। গুল বেঁচে থাকতে যে প্রেম পায়নি মরণের পরে সে প্রেম পেয়েছে। গুলের নিস্প্রাণ দেহ বুকে নিয়ে নায়কের যে আর্ত-হাহাকার লক্ষ্য করি, তাতে নায়কের অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার দাবিদার। 'প্রেমের চরণে কর্তব্যের বলিদান দেব না' বললেও বাস্তবে নায়কের জীবনে প্রেমই নিয়ন্ত্রক শক্তি। আত্মক্ষয়ী প্রেমের স্থায়ী ঠিকানা নায়কের অন্তর। এতে প্রেমের অনির্বাণ শিখা জ্বলে অনুক্ষণ। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় নায়ক যেন সে প্রেম পেতে গিয়েও পেল না। শাহিদাকে ছেড়ে ক্ষ্যাপার মতো মধ্যপ্রাচ্যের মরুচারী হয়েছে, আর এক নায়িকা বেদুঈন গুলকে তো হত্যাই করেছে কসাইয়ের মতো। তারপরেও কি নায়কের মুক্তি ঘটেছে ? বরং সংকট ঘনায়মান হয়েছে। গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতো আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত নায়কও নিয়তির বিরুদ্ধে চিৎকার দিয়ে উঠতে দেখি, - 'এ কি পরীক্ষায় ফেললে খোদা?'

আত্মত্যাগের মাধ্যমে জীবনের মুক্তির সন্ধান করতে নায়ক বীরভূম হতে যাত্রা করে সালার, মধুপুর, লাহোর, নৌশেরা, কুর্দিস্তান, কারবালা, আজিজিয়া, কুতল্-আমরা এবং শেষে করাচি দীর্ঘ সফর করেছে। কিন্তু মুক্তি তো পেলই না বরং পথভ্রষ্ট হয়েছে। শেষে নায়কের মনে এই সত্যোপলব্ধি ঘটে, প্রথাগত স্বাভাবিক জীবনই মানুষের মুক্তির সোপান। এই জীবনবাদী চেতনায় উত্তরণের ফলে গল্পের নায়ক চরিত্রটির মহিমা বৃদ্ধি পেল।

বাউণ্ডেলে এক কিশোরের হাস্য-করুণ জীবনের কাহিনী 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পের পটভূমি। গল্পের কাহিনী অত্যন্ত করুণ, মর্মস্পর্শী। অনেকের মতে, গল্পটিতে কিশোর নজরুলের নিজের জীবনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। গল্পের পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের 'দপ্তর'-এর ধারণা নজরুলের মাথায় ছিল। গল্পের এক স্থানে 'মুচিরাম গুড়ে'র আদলে ছেলেদের মজলিস জমানোর কথাও আছে। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য। বাঙালি পল্টনের এক যুবক নেশার ঝোঁকে আত্মস্মৃতি রোমন্থনের বৃত্তান্ত গল্পটি। নায়ক নব বিবাহিত। তার স্ত্রী রাবেয়া লজ্জাবতী, বিনয়ী। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে যুবক তার স্ত্রী রাবেয়ার উপর একপ্রকার বর্গীয় উপদ্রপ চালায়। পাশাপাশি দরজার ফাঁক দিয়ে লাজুক বউয়ের পটল চেরা চোখ দু'টির ভাসা ভাসা করুণ দৃষ্টিও ব্যাকুল করে তাকে। ক্রমশ বাড়ে নায়কের ছেলেমি। সে সাথে লাজুক বউয়ের প্রেমেও পড়ে গেল। লেখাপড়া চুলায় উঠবে, এই ভয়ে বাবা তড়িঘড়ি করে ছেলেকে পাঠিয়ে দিল শহরে। বিদায়কালে ছেলেমি আর জ্যাঠামি দিয়ে নায়ক তার অন্তরের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখতে পারে না। অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে, 'আমার দুষ্টোমি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখ।' এই প্রথম এবং শেষকথা নায়কের তার নব বিবাহিত স্ত্রীর সাথে। কারণ তার অনুপস্থিতে রাবেয়া মারা যায়। স্ত্রীর মৃত্যু নায়কের জন্য অপ্রত্যাশিত চরম আঘাত। বুক ভাঙা আর্তনাদ করে সে বলেছে, 'হায় সে ত চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণের স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে ত আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমার বুক যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।' আর এ কারণেই দ্বিতীয় স্ত্রী সখিনা নায়কের চরম অবহেলা, অনাদরের স্বীকার। অসীম দীর্ঘশ্বাস নিয়েই রাবেয়ার মতো সখিনাও একদিন চিরবিদায় নেয় সংসার হতে। মৃত্যুর সময়েও স্বামীর স্মৃতিকে বুকে ধারণ করেছিল সকিনা। 'মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মতো পাপিষ্ঠের চরণ-ধুলোর জন্য কেঁদেছে। আমার ছেঁড়া পুরনো একটা ফটোবুকে ধরে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল।'

গল্পটিতে নজরুলের প্রাক্-সৈনিক জীবনের দুরন্ত কৈশোরের বাউণ্ডেলেপনা দিনগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে। এজন্যেই গল্পটির স্বতন্ত্র বিচারের দাবিদার। যুবকের দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাবার কিছুদিন পরে তার মাও মারা গেল। সর্বহারা, বন্ধনহারা নায়ক পল্টনে যোগ দিতে গেল করাচিতে। তবে পরপর দু'জন স্ত্রীর মৃত্যু কাহিনী বাস্তবতার মূল্যকে ক্ষুণ্ন করেছে। মূলত, করাচি সেনানিবাসে বসে কিশোর নজরুলই আত্মকথা বললেন এক যুবকের বরাত দিয়ে। প্রফেসর রফিকুল ইসলামও মনে করেন, গল্পটি নজরুলের ছেলেবেলার স্মৃতি নির্ভর। জগৎ-জীবন সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল নজরুলের ছেলেবেলাতেই। আর এ জন্যই গল্পটি পাঠক মনোযোগ পেয়েছিল ঈর্ষনীয় পর্যায়ের।

প্রেম ধর্মে সবাই সমান। ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, কালো-ফর্সা তথা দেশ কালের উর্ধ্বে প্রেমের বসবাস। প্রেম মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য। 'মেহের-নেগার' গল্পের নায়িকা মেহের-নেগার আর শহরের খুরশেদজান বাঈজীর কন্যার রূপ ও অন্তরের প্রেম অভিন্ন। ওয়াজিরস্থান পাহাড়ের পাদদেশে স্বপ্নাতুর যুবক য়ূসোফ তার মানসী প্রিয়া মেহের-নেগারের সাথে মিলনের আশায় ব্যাকুল প্রহর কাটায়। মেহের-নেগার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে মিলনের। কিন্তু বাস্তবে মেহের-নেগারের রহস্য ভেদ করে মিলন অসম্ভব। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো মেহের-নেগার যুবকের সাথে মিলন-বিরহের খেলা খেলে। শহরের খুরশেদজান বাঈজীর কন্যা গুলশানের মধ্যে মেহের-নেগারের প্রতিরূপ দেখতে পেয়ে বিস্মিত যুবক,'অমন হুবহু মুখ, চোখ-

অমনি ভুরু,অমনি চাহনি, অমনি কথা।' অবশেষে যুবক প্রেমের প্রস্তাব দিল বাস্তবের বাঈজী কন্যা গুলশানকেই। এ প্রস্তাবে গুলশানের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে। যুবকের পবিত্র প্রেমের ভার বইবার বা অপমান করবার একবিন্দু সামর্থ নেই রূপ বাঈজীর কন্যার। প্রেম পবিত্র। পূজারীকেও পবিত্র হতে হয়। কঠিন হলেও সত্যটিই বলল গুলশান, 'রূপজীবনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য অপবিত্র। ওগো আমার শিরায় শিরায় যে অপবিত্র পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।'

প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও, পরে গুলশান জানতে পারে, তার দেহের রক্ত-মাংস অপবিত্র কিন্তু যেখানে প্রেমের আশ্রয় সেই হৃদয় তার পবিত্র। যুবকের শুভ্র ভালবাসার সোনার কাঠির ছোঁয়াতে রূপজীবনীর কন্যা গুলশানের মধ্যেও প্রেমের অনুভূতি জেগে উঠে। তাই য়ূসোফের প্রেম প্রস্তাব সে গ্রহণ না করে পারে না। এই গ্রহণের বিনিময়ে প্রেমিককে রক্ত-মাংসের দেহের সীমানায় পাবার প্রত্যাশা ছাড়তে হয় তাকে। সমাজ-সংসারের রীতি-নীতিতে দেহগত মিলন সম্ভব নয়। য়ূসোফ, গুলশানের অন্তর দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা পেল। যাকে কেবল পূজা দেওয়া যায়, ছোঁয়া যায় না।

> তোমাকে পেয়েও যে এই আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, এ তোমাকে ভালবাসতে-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পেরেছি বলে। আমার-আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ূসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালবাসি তারই অপমান ত করতে পারি নে আমি। (মেহের-নেগার)

কাবুলের আমীর ও ইংরেজের লোলুপ নজর পড়ে য়ূসোফের জন্মভূমি ওয়াজিরস্থানে উপর। ফলে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক য়ূসোফ যুদ্ধে যাবার জন্য শপথ নিল। বিদায় নিতে গিয়ে জানতে পারে, গুলশান চিরদিনের জন্য চলে গেছে। মর্মফলকে রক্ত দিয়ে লেখে গেছে তার চলে যাবার কারণ। গুলশানের প্রেমের প্রতি গল্পকারের গভীর সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। সমাজ অস্বীকৃত অপবিত্র জঠরে জন্ম এই চরিত্রের মুখ দিয়েই প্রেমের পবিত্রতা ঘোষণা করলেন নজরুল।

> অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক আমায় ঘৃণা করো না। একবিন্দু অশ্রু ফেল, আমার কল্যাণ কামনা করে-আমি অপবিত্র কি না আমি জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল। আর ওগো স্বামিন্, তুমি যদি কখনও এখানে আস-আর তা আসবেই-তবে আমায় মনে করে কেঁদো না। যেখানেই থাকি প্রিয়তম আমাদের মিলন হবেই। এই আকুল প্রতীক্ষার অবসান এই দুনিয়াতেই হতে পারে না। খোদা নিজে প্রেমময়। অভাগিনী-গুলশান। (মেহের-নেগার)

শাশ্বত প্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে এ গল্পে। নায়ক-নায়িকার স্বপ্নালোকে মিলন দৃশ্যে ফার্সি কবি হাফিজের কাব্যলক্ষ্মীর সাথে মিলনের চিত্রকল্প কাজে লাগিয়েছেন নজরুল। যেখানে প্রেমের বসবাস, সে অন্তর ধর্মে সবাই সমান। প্রচলিত সমাজ-ধর্মের রীত-নীতি সত্য প্রেমের অন্তরায়। আমরা 'বাদল-বরিষণে' গল্পের কালো মেয়ে কাজরিয়ার মতো গুলশানকে দেখতে পেলাম, প্রেমের পবিত্রতা রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করতে। গুলশানের জন্মের জন্য যে সমাজ দায়ী, সেই সমাজের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সে প্রাণ দিল। গুলশান তার জীবন দিয়ে প্রেম ও প্রেমিকের মর্যাদা রক্ষা করে মূলত আমাদের প্রেমহীন নিষ্ঠুর সমাজকে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়ে গেল। ইতিঃপূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রূপ বাঈজীদের নিয়ে গল্প লেখতে দেখেছি কিন্তু তার নায়িকারা প্রেমের ধর্ম রক্ষার চাইতে সমাজ-সংস্কারের নীতি রক্ষাতেই অধিক সোচ্চার। রূপ বাইজীর কন্যাকে গল্পের নায়িকা করে এবং তার মধ্যদিয়ে শাশ্বত প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়ে নজরুল এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

রহস্যের চাদরে মোড়া এক নারী সদৃশ সন্ধ্যাতারার সাথে আরব সাগরের বেলার উপরে একটি ছোট্ট পাহাড়ে বসা এক যুবকের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কের কাব্যময় প্রকাশ 'সাঁঝের তারা' গল্পটি। ড. সুশীলকুমার গুপ্তের মতে,'সাঁঝের তারার মধ্যে কথিকার ঢঙটি প্রবল এবং এর উপর রবীন্দ্রনাথের লিপিকার রচনাশৈলির প্রভাব একান্তভাবে অনুগম্য।'[২৩] 'পাওয়াটাই বড়, পাওয়াতেই সার্থকতা' নাকি 'না পাওয়াটাই পাওয়া, ওই না পাওয়াতেই সকল পাওয়া সুপ্ত রয়েছে।' এমন এক দ্বান্দ্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি একাকী পথিক যুবক। সে একবার ভাবে, বন্ধনেই মুক্তি। কামনার-বাসনার প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনই তার কাম্য। তারও প্রতি অঙ্গ কাঁদে মিলনের প্রত্যাশায়। তার এ চাওয়া যেমন মানুষের অনিবার্য সত্য, তেমনি আবার মানুষের এই মোহ ক্ষণস্থায়ী। নির্দিষ্ট সময়ের পরে এ মিলনও হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক। এ সত্যও যুবক অস্বীকার করতে পারে না। এ সমস্যার সমাধান পায়নি বলেই যুবকের কাউকে আপন করে পাওয়া হয় নি। সে নিজেই বলেছে, 'আমার মনের ভোগ আর বৈরাগ্যের একটা নিষ্পত্তিও হল না। আর তাই কাউকে জীবন ভরে পাওয়া হল না।'

যুবকের মানসী প্রিয়া অস্তপারের সন্ধ্যালক্ষ্মী। তার কিছুটা চেনা, কিছুটা অচেনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো কখনও কাছের স্বজন, আবার কখনও দূরের অচেনা জন। দু'জনের এ রকম মিলন-বিরহের খেলা চলে নিয়ত। যুবকের মানসী প্রভাত বেলার উদয়ের পথের যাত্রী। তারপরও যুবকের পথ চাওয়া ফুরায় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস 'দেখা হবেই, তাকে পাবই।' গল্পটিতে প্রেমের চিরকালীন বিতর্ক ভোগে সুখ না ত্যাগে সুখ, পেয়ে সুখ

না হারিয়ে সুখ অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। যুবকের মানসী প্রিয়া অন্তঃপুরবাসিনী, বিচিত্ররূপিণী। মিলন-বিরহের, বাস্তব-অবাস্তবের সন্ধিক্ষণে অবস্থান দু'জনের।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধনের প্রধান শর্ত, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস একখণ্ড বরফের মতো, সামান্য পরিমাণের অবিশ্বাসের তাপ লাগলেই তা গলতে শুরু করে। তখন জীবন হয়ে উঠে নরক যন্ত্রণাসম। 'রাক্ষসী' গল্পের বিন্দি চরম দারিদ্র্যপীড়িত জীবনকেও স্বর্গীয় সুখ ভাবত। সে নিজেই বলেছে 'স্বামী আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত' আর নিজে খেতুম মাড়-শুদ্ধ ভাতের ফেন। মেয়ে মানুষের আবার সুখ কি, ছেলে মেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান ঠাণ্ডা, নাইবা হলুম জমিদার।' (রাক্ষসী) অন্যদিকে তার স্বামী মদখোর। তাতেও তার আপত্তি নেই। পুরুষ মানুষের এ রকম দু'একটি বদভ্যাস থাকেই। সে শুধু বলেছে, 'মদ খাও ক্ষতি নেই, দেখ তোমায় মদ যেন না খায়।' জীবনের কষ্টের অধ্যায় শেষে সুখের মুখ দেখার সময় এগিয়ে আসছিল বিন্দির, ঠিক তখনি স্বামী পরনারী আসক্ত হয়। কপাল ভাঙে হতভাগিনী বিন্দির। সর্বংসহা এই নারী স্বামীর সকল অবিচার ও নিপীড়ন মেনে নিলেও স্বামীর প্রতারণা মেনে নিতে চায় না। বাগ্‌দী কন্যার সাথে অবৈধ সম্পর্ক, অতঃপর বিয়ের সিদ্ধান্ত, রাতে ঘরে না ফেরা, তার বহু কষ্টার্জিত সঞ্চিত অর্থ বাক্স ভেঙে ছিনিয়ে নিয়ে হবু শ্বশুরকে দেওয়া, চেলা কাঠ দিয়ে তাকে নির্মমভাবে পিঠানো-স্বামীর এ সব নোংরামি বিন্দিকে সংক্ষুব্ধ করে। ক্রমশ তার স্বামী নরকের পথে হাঁটছে। কোনমতেই ফেরাতে পারছে না সে। স্বামীকে রক্ষার্থে বিন্দি কঠিন সিদ্ধান্ত নিল শেষে। 'যত পাপ হবে আমার'- এই দায়ভার নিয়েই বিন্দি তার স্বামীকে হত্যা করে নির্দয়ভাবে। এতে তার কোন অনুশোচনা নেই। বরং তার সোচ্চার ঘোষণা, 'ভগবান আছেন। তিনি তো জানেন আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামীকে, দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি।' স্বামীকে নরকের পথ হতে রক্ষা করতে পেরে বিন্দি আত্মসুখ পেলেও তার ভিতরের আত্মদহনও কম ছিল না। তার নিজের স্বীকারোক্তি, 'আমি দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে...। নিজে হাতে কাটলেও সে ত ছিল আমার নিজেরই সোয়ামী।' স্বামী হত্যার অপরাধে বিন্দিকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। সেখানে সে ভালই ছিল। মুক্তি পেয়ে বরং সে অমীমাংসিত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে যে ভুল করেনি স্বামীকে হত্যা করে, তার প্রমাণ বিদেশি শাসক তাকে মেয়াদ শেষের আগেই মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু সমাজ তা মানেনি। ছেলের সমাজচ্যুতি, মেয়ের অনূঢ়া অবস্থা, নিজে রাক্ষসী নামে পরিচিত এ সবই যেমন বিন্দির কপালে জুটে। বিন্দি তার ভালবাসার ভাগ দিতে চায়নি। তার অন্তরের দেবতা অন্য নারীর হবে, নারীত্বের ও প্রেমের এ অবমাননা সে হতে দেয়নি। স্বামী বাঁচল, বিন্দি নিজেও বাঁচল। তার স্বামীকে আরও গভীরভাবে পাওয়ার প্রত্যাশাও জেগে রইল। ঈর্ষাকাতর বিন্দি প্রেমের স্বধর্মই পালন করেছে। 'প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। নজরুলের কবিতা ও গল্পে ঈর্ষার জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে নগ্নভাবে। ঈর্ষা কত সাংঘাতিক হতে পারে তা দেখতে পাই 'রিক্তের বেদন' এর 'রাক্ষুসী' গল্পে। এই রাক্ষসী বিন্দি স্বামীকে গভীরভাবে ভালবেসে ঈর্ষাকাতর অবস্থায় হত্যা করেছে।'[২৪]

স্বামী-স্বজনহারা, সমাজচ্যুত, আশ্রয়হীন এক বিধবা যুবতীর যন্ত্রণাকাতর আত্মকাহিনী 'স্বামীহারা' গল্পটি। জসীম উদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর সমগোত্রীয় বেদনা এই যুবতীর। মা,বাবা, ভাই, বোন, মায়ের মতো শাশুড়ি, স্বামী দেবতা সবই চিরনিদ্রায় শায়িত আছে গোরস্থানে। এ যুবতীর ঠিকানাও এখন গোরস্থান। দিন কাটে মৃত্যুর অপেক্ষায়।

এ যুবতীরও সুখের সংসার ছিল। স্বামী আজিজ ছিল দেবতার মতো মহৎ। সামাজিক অবস্থানের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও তার স্বামী তাকে প্রত্যাশার অধিক ভালবাসত। তার এ সুখ ছিল প্রতিবেশীদের ঈর্ষার কারণ। 'এত বাড়াবাড়ি সইবে না' এ অভিশাপ জর্জরিত ও দগ্ধ করে তাকে। যুবতীর ভাষায়, সমাজ শুধু চোখ রাঙাতেই জানে। যে যত দুর্বল তার তত জোরে টুটি চেপে ধরতেই সমাজ ওস্তাদ। তার স্বামী এসব পাত্তা দেয়নি। বরং এত বেশি ভালবাসা দিয়েছে তাকে সে ভালবাসার ভার গ্রহণের শক্তি ছিল না তার। সে বলেছে, 'ওগো দেবতা এত আনন্দ দিয়ো না এই ক্ষুধিতাকে, প্রেমের এত আকাশ ভাঙা ঘনবৃষ্টি ঢেলে দিও না এ চিরমরুময় হৃদয়ে-সকল দেহমন প্রাণ ছেয়ে ফেলো না তোমার ও ব্যাকুল ভালবাসার ব্যগ্র নিবিড় আলিঙ্গনে। আমার ছোট্ট বুকে এত অনন্দ, এত ভালবাসা সইতে পারবে না।'

যুবতীর আশঙ্কাই সত্যি হল। হঠাৎ পাওয়া সুখ তার বেশি দিন সইল না। গ্রামে কলেরা-বসন্ত রোগ মহামারি আকারে দেখা দিলে তার স্বামী আজিজ ঝাপিয়ে পড়ে আর্তের সেবায়। শঙ্কিত যুবতী হাতে-পায়ে ধরেও এ পথ হতে ফেরাতে পারে না। দিন-রাত আর্তের চেয়ে অধীর হয়ে সেবা করতে করতে এক সময় তার স্বামীও কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। লাশ বাড়ি হতে বের করতেই স্বামীর এক আত্মীয় তাকে বাড়ি হতে বের করে দিল। এ অপমান মেনে নিয়েছে সে কিন্তু আত্মীয়টি যখন বলল 'তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি।' এ অপমান সে সইতে পারে না। আত্মীয়-

পরিজনহীন যুবতী এখন অপেক্ষায় আছে কখন জীবন প্রদীপ নিভবে। পরপারে তার স্বামী অনন্ত প্রেমের সুধা নিয়ে প্রতীক্ষারত। প্রথাগত সমাজে বিয়ের মন্ত্র দিয়ে যে দাম্পত্য বন্ধন গড়ে উঠে, সেখানে ভালবাসার চাইতে পরস্পরের স্বার্থবোধই বেশি সক্রিয়। যুবতী তার স্বামীর বিপুল বিত্ত-বৈভবে লোভ নেই। তার একমাত্র চাওয়া স্বামীর প্রেম। সমাজের শত চাপ ও লাঞ্ছনার পরও মৃত স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম প্রকাশ করায় স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার চরিত্রটি।

৩.

কাজী নজরুল ইসলামের তৃতীয় এবং সর্বাধিক সফল গল্পগ্রন্থ 'শিউলিমালা'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল কার্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। মাত্র চারটি গল্পের সংকলন এতে। 'জিনের বাদশা', 'অগ্নি-গিরি' এবং 'শিউলিমালা' গল্প তিনটি ১৩৩৭ সালের 'সওগাত' পত্রিকায় যথাক্রমে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকশিত হয়। আর 'পদ্ম-গোখরা' গল্পটি মেটকাফ প্রেস-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাপ্তাহিক 'দুন্দুভি'তে প্রকাশিত হয়। একমাত্র 'পদ্ম-গোখরা' গল্পটি ব্যতীত তিনটি গল্পেই রসঘন প্রেমের কাহিনী। এক জোড়া পদ্ম-গোখরার প্রতি গ্রাম্য বধূর অকৃত্রিম স্নেহ-ই 'পদ্ম-গোখরা' গল্পের মূল বিষয়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র মৃতবৎসা জোহরার যমজ দুই সন্তান মৃত্যুর পরে সাপ হয়ে ফিরে আসার অবিশ্বাস্য ও ভৌতিক কাহিনী পাঠকের মনে নাড়া দিয়ে যায়। নজরুলের পরিণত বয়সে লেখা 'শিউলিমালা'। এখানে নজরুল অনেকাংশেই একজন সফল গল্পকার। চরিত্র চিত্রণ, ঘটনার বিন্যাস ও নাটকীয়তা আনয়নে চমৎকার মুন্সিয়ানা প্রদর্শন করেছেন। 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদনে'র মতো অযৌক্তিক আবেগ-উচ্ছ্বাস নেই 'শিউলিমালা'তে। গ্রন্থভুক্ত চারটি গল্পই মোটামুটি খাঁটি গল্প হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক কল্লোলগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ রচনার কৌশল নজরুল প্রয়োগ করেছেন তাঁর শেষ গল্পগুলোতে। পুর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে প্রকারান্তরে 'কল্লোলে'র লেখকদের স্বীকৃতি দিলেন নজরুল।

অনেক আলোচকের মতেই নজরুলের শ্রেষ্ঠগল্প 'জ্বিনের বাদশা'। চমৎকার উপভোগ্য নাটকীয় আবহ তৈরি হয়েছে গল্পের কাহিনীতে। আমাদের গ্রাম বাংলার দুরন্ত কিশোর প্রেমের চমৎকার রোমান্টিক গল্প 'জ্বিনের বাদ্‌শা'। হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূচনা হলেও শেষ পরিণতি ট্রাজিক। ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরবর্তী মোহনপুর গ্রামের চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় পক্ষের বখাটে ছেলে আল্লা-রাখা কাহিনীর নায়ক। ছেলের অকাল মৃত্যু ঠেকাতে মা তার সন্তানের নাম রাখল 'আল্লা-রাখা'। অর্থাৎ আল্লাহ এ ছেলের বিশেষ যত্ন নিবেন। আল্লাহ মায়ের আশা পূরণ করেন, বিশেষ যত্নেই ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যার প্রমাণ গ্রামবাসীদের অভিব্যক্তি হতেই জানা যায়, 'ও গুয়োটা আল্লা-রাখা না হয়ে যদি মামদো ভূত হত, তাহলেও বরং ছিল ভাল। ভূতে বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না।' গ্রামের সকল কুকীর্তির নায়ক আল্লা-রাখা মুসলমানদের নিকট 'ইবলিসের পোলা', কায়েতের নিকট 'অমাবস্যার জন্মিৎ' এবং স্বয়ং পিতার নিকট 'হালার পো' খেতাবে ভূষিত।

আল্লা-রাখা জেদী, একগুয়ে, সাহসী কিশোর। যা তার ইচ্ছা কিংবা যা তার মনে ধরে তা বাস্তবায়নের জন্য রীতিমত যুদ্ধে নামে। গ্রামেরই নারদ আলীর কন্যা সুন্দরী চান্ ভানুর রূপে মুগ্ধ আল্লা-রাখার হঠাৎ মনে হল চান্ ভানুকে তার চাই-ই। সুতরাং চান্ ভানুর মন জয়ের নানা নাটকীয় ও কৌতুকপূর্ণ কৌশল আঁটে। আল্লা-রাখা দক্ষ তীরন্দাজ। বীর প্রেমিকের মতো তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চান্ ভানুর বাড়িতেই গেল। 'যা থাকে কপালে ! আল্লা-রাখা তার বাবরী চুলের মাঝে একটা এবং দু'দিকে দুটো এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে যায়, গালে বেশ করে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চান্ ভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।' আল্লা-রাখার প্রথম পদক্ষেপ সফল হয় না। চান্ ভানুর ব্যঙ্গ-রসিকতার কাছে সে পরাস্ত হয়। ফিরে আসে চ্যালা কাঠের অভ্যর্থনা নিয়ে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসেবে জলদানো সেজে বলে, 'তুই যদি আল্লা-রাখারে ছাইড়া আর কারেও সাদি করিস, হেই রাত্রেই তোদের ঘাড় মটকাইয়া আমি রক্ত খাইয়া আসুম।' তারপর নিজেই মূর্ছিতা চান্ ভানুকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দিল। এই বীরত্ব প্রদর্শনেও কোন ফল হয় না। আল্লা-রাখার তৃতীয় প্রচেষ্টা ছিল নকল জ্বিনের বাদশার ভূমিকায় অভিনয়। কলকাতা হতে চিঠি ছাপিয়ে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে চান্ ভানুর পরিবারে মধ্যে। চিঠির ভাষাও চমৎকার এবং উদ্দেশ্যমুখী। চিঠিতে লেখেছে :

> হে নারদ আলি শেখ / তোরে ও তোর বিবিরে বলিতেছি।/তোর ম্যায়্যা চান্ ভানুরে, / চুন্নু ব্যাপারীর পোলা আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দে। তারপর তোরা যদি না দেছ তবে বহুৎ ফেরেবে পরিবি।...তোরা একদিন আল্লা-রাখারে ডাকিয়া আনিয়া আর একজন মুন্সী আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।...খবরদার-হুশিয়ার-সাবধান আমার এই পত্রের উপর ইমান না আনিলে কাফের হইয়া যাইবি। (জ্বীনের বাদশাহ)

একনিষ্ঠ প্রেমিকের মতো আল্লা-রাখার প্রেম লাভের করুণ-মধুর সংগ্রাম আমাদের রোমাঞ্চিত করে। প্রেমাস্পদের সামান্য স্পর্শের জন্য যে প্রেমিক স্বেচ্ছায় বুকের রক্ত ঝরাতে পারে, যতই তা বালখিল্য হোক, সে একজন সৎ প্রেমিক। আর তাই চান্ ভানুর অন্যত্র বিয়ে হলে রাতারাতি ডানপিটে প্রেমিক নিজেকে বদলে নেয়। মাথার সেই বাবরি চুল নেই, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পরনে একখানা গামছা, হাতে পাঁচালী, কাঁধে লাঙল সব মিলিয়ে আল্লা-রাখার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রেম মানুষকে কী পরিমাণ মহৎ করে তুলতে পারে, এই কিশোরই তার প্রমাণ। প্রেমের জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় প্রেমার্তের মনের শুদ্ধতা আসে। আল্লা-রাখার জীবনের ম্যাজিক পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে প্রেমের সুমহান আদর্শের সক্রিয় ভূমিকা। বাবরি চুলের ডানপিটে কিশোর আল্লা-রাখার মধ্যে কিশোর নজরুলের ছায়া দেখতে পাই আমরা।

'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প 'অগ্নি-গিরি'। কিশোর নজরুল তাঁর বিচিত্র কর্মযজ্ঞের এক পর্যায়ে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আসানসোলের আবদুল ওয়াহেদের রুটির দোকানে মাসিক ১ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। ঘটনাক্রমে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিকুলাহর সুনজরে পড়েন কিশোর নজরুল। তাঁর এবং তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ ধন্য নজরুল তাদের সাথেই চলে আসেন ময়মনসিংহের ত্রিশালে। কাজী রফিকুলাহ সাহেব নজরুলকে ত্রিশালের নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। 'নজরুল কিশোর মৈমনসিংহের দরিরামপুর গ্রামে কিছুদিন পড়াশোনার সময়কালীন জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে 'অগ্নি-গিরি' গল্পটিতে। গল্পের কাহিনীতে দেখতে পাই, গ্রাম বাংলার দুরন্ত ডানপিটে একদল কিশোর নিজেদের খামখেয়ালীপনা আর খেলার ছলে এক ভয়ানক পরিণাম ডেকে এনেছে। নায়ক কিশোর সবুর বীরভূম গ্রামের আলি নসিব মিঞার বাড়ির লজিং মাস্টার। শান্ত-সুবোধ এ ছেলেটি গরিব কিন্তু বনেদি ঘরের। পাড়ার বখাটেদের দল রুস্তমি দলের হাস্য-রসিকতার পাত্র এই কিশোর নির্জীব পুতুলের মতো প্রতিক্রিয়াহীন। রাস্তায় বেরুলেই বখাটের দল পিছু ধরে আর শ্লোগান ধরে 'প্যাঁচারে তুমি ডাহ ! হুই প্যাঁচা মিয়া গো, একডিবার খ্যাচখ্যাচাও গোও।' সবুরের নির্লিপ্ততা ও পলায়নপর মনোভাবের কারণে উৎসাহী বখাটেরা জ্বালাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে থাকে উত্তরোত্তর। অন্যদিকে অন্দরমহলে তারই ছাত্রী গল্পের নায়িকা নূরজাহানও এ নির্লিপ্ততাকে তার রূপের অবমাননা বলে মনে করতে থাকে। আত্মসচেতন নূরজাহানের প্রচণ্ড আক্রোশ সবুরের উপর। 'আগে হত না-এখন কিন্তু নূরজাহানের সে অহংকারে আঘাত লাগে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার রূপের কি তাহলে কোনো আকর্ষণ নেই। আজ তিন বছর সে সবুরের কাছে পড়ছে-এত কাছে তবু সে একদিন মুখ তুলে তাকে দেখল না ?'

ভেতরে-বাইরে সবুরের দিন কাটে কড়া নজরদারিতে। একদিকে বখাটেদের উৎপাত, অন্যদিকে নারী কাজল আঁখির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, শান্ত-গোবেচারা তরুণ সবুরের জীবন অনাকাঙ্ক্ষিত সংকটে জড়িয়ে পড়ে। নূরজাহানের বিচারে সবুর সুপুরুষ নয়। তারপরেও ক্রমাগত হৃদয়ের দুর্নিবার টান অনুভব করে সে। সবুরের চোখ দু'টিই নূরজাহানের নিকট লোভনীয়, আকর্ষণেরও কারণ। 'রূপের মধ্যে তার চোখ দুটি। যেন দুটি ভীরু পাখি একবার চেয়ে অম্‌নি নত হয়ে পড়ে! সে চোখ তার চাহনি-যেমন ভীরু, তেমনি করুণ, তেমনি অপূর্ব সুন্দর ! পুরুষের এত বড় সুন্দর চোখ সহজে চোখে পড়ে না।'

এরপরই আমরা দেখতে পাই, বখাটেদের অপমানে সবুর নীরব থাকলেও নূরজাহান নীরব থাকতে পারে না। নির্জীব পূজারীর বুকে দেবতা যেমন আঘাত করে ঘুম ভাঙায়, তেমনি নূরজাহানও তার প্রেমিক পুরুষের মনের সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটায় কৃত্রিম তিরস্কারের মাধ্যমে-'আপনি বেডা না ? আপনারে ইবলিশ পোলাপাইন যা তা কইব, আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন ? আলায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না ?' নূরজাহানের এ শেষোক্তিতে সবুরের পৌরুষত্বের অগ্নিরূপ জেগে ওঠে। নূরজাহানের প্রচেষ্টা সফল হয়। সবুর চাপা কণ্ঠে 'নূরজাহান' উচ্চারণ করতেই রক্তিম হয়ে ওঠে নূরজাহানের মুখমণ্ডল। বিস্ময়ে-বিমূঢ়রে মতো তাকায় সবুরের দিকে 'এ কোন বনের ভীরু হরিণ'। প্রেমের শক্তি সুপ্ত অগ্নি গিরির মতো জ্বলে উঠতে পারে প্রয়োজনে। আর তা কখন যে জ্বলে উঠবে তাও বলা যায় না। সবুরের ভেতরের সুপ্ত পৌরুষ এতটাই অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে জেগে উঠে যে, পাড়ার রুস্তমির দলকে একাই পরাস্ত করে সে। রুস্তমি দলের আমিরের ছুরির প্রত্যাঘাতে আমির মারা গেলে খুনের দায় বর্তায় হতভাগা সবুরের উপরেই। খুনের অপরাধে সাত বছরের জেল হয়। মূর্ছিতা নূরজাহান আর্তনাদ করে যখন বলে, 'কে তোমারে এমনডা করবার কইছিল ? কেন এমনডা করলে।' প্রতি উত্তরে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে সবুর বলেছে, 'এ যদি না দেহাইতাম তুমি আমায় ঘৃণা করতা। খোদা তোমায় সুখে রাখুন।'

প্রেমের একটি নিজস্ব গতি ও শক্তি আছে। সীতাকে নিয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ হতে পারে, এক হেলেনের জন্য ট্রয় নগরী ধ্বংস হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধটি চলেছে ব্যক্তির পৌরুষত্ববোধ, আত্মসম্মানবোধ ও অহংবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য। সবুরও নূরজাহানের প্রেরণায় পাড়ার বখাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সত্য কিন্তু সবুরের অপরাজেয় পৌরুষ ও আত্মসম্মানবোধ এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। নজরুল বিশ্বাস করতেন, নারীর

ভালবাসা আর পুরুষের ভালবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশি। পুরুষের ভালবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান। আমরা নব জাগ্রত সবুরের মধ্যেও এ বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। সুপ্ত অগ্নিগিরির আকস্মিক অগ্নুৎপাতের মতো প্রণয়িনীর তিরস্কারে জেগে উঠা সবুরই পরিপূর্ণ পুরুষ। সেই সাথে অতিসাধু অনেকাংশে নিষ্প্রাণ পুতুল চরিত্রটি মোটামুটি সার্থক চরিত্র হয়ে উঠতে দেখি। গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ড. সুশীলকুমার গুপ্ত-'অভিপ্রায় ও কার্যকরতার অনন্যতা আছে বলে গল্পটি যে একটি শিল্পসম্মতরূপ লাভ করেছে, এ অনস্বীকার্য।'[২৫]

'শিউলিমালা' রোমান্টিক প্রেমের গল্প। '১৯২৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নজরুল ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন;...সে-সময়ে অধ্যক্ষ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটে; সেই সোহার্দ্যের স্মৃতি তাঁর সুবিখ্যাত 'শিউলিমালা' গল্পে কিছু ছায়া ফেলেছে।'[২৬] কলকাতার নামকরা তরুণ ব্যারিস্টার আজাহার গল্পের নায়ক। দাবা খেলায় তার যশ খ্যাতি প্রচুর। শিলং বেড়াতে গিয়ে দাবা খেলার সূত্রে পরিচয় ঘটে শিউলির সাথে। শিউলির সতেজ রূপ আজাহারকে মুগ্ধ করেছিল। প্রথম পলকেই তার অনুভূতি, 'এ যেন সত্যিই শরতের শিউলি, গায়ে গোধূলি রং এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্রমুখখানি-হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলি ফুলের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়ত একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙল।' শিউলি ও দাবা-এ দুই নেশায় মেতে আজাহার নিজেকে এ পরিবারে সাথে জড়িয়ে ফেলেছিল। আজাহার কেবল দক্ষ দাবারু নয়, একজন দক্ষ প্রেমিকও বটে। শিউলির অন্তরের দুর্বল ঘরে আসল চালটা দিতে সে ভুল করেনি। গান শিখানোর ছলে শিউলির সাথে অবাধ মেশার নিবিড় সুযোগ ঘটে তার। সম্পর্ক যত গভীর হতে থাকে, বেদনার বোঝা ততই বাড়তে থাকে। 'যত ভালবাসা, তত ভয়!' কারণ এ প্রেমের অনিবার্য পরিণতি বিচ্ছেদ-বিরহ। এ সত্য তারা দু'জনেই জানত। তারপরও দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেছে পরস্পরের প্রতি। হৃদয়ের এই অজানা দুর্নিবার আকর্ষণ চির-রহস্যময়, পৃথিবীকেও করেছে বিচিত্র-সুন্দর। যথারীতি আসে বিদায়ের মুহূর্ত। শিউলির করুণ কণ্ঠের বিদায়ের গান এবং অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে আর্তনাদ করে উঠেছিল আজাহারের অন্তরাত্মা, 'আমার সমস্ত মন যে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল- ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্তের জন্যেই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি, জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না।'

স্মৃতিকাতর প্রেমিক আজাহারের এখন চলার পাথেয় স্বেচ্ছায় গৃহীত বিচ্ছেদ বেদনা। মানুষের জীবনে এ এক বড় হেঁয়ালি, সহজে পাওয়াটাকে মূল্য দিতে চায় না। একদিন সেই সহজিয়ার জন্য কাঁদতে হয় কঠিন কাঁদন। আজহার চাইলেই এবং সামান্য হাত বাড়ালেই একদিন শিউলি তার কী না হতে পারত। আজ অকৃতদার আজহারের জীবনে শিউলি কেবলি স্মৃতি। প্রতি আশ্বিনে শিউলি ফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা পালনই এখন তার প্রেমের নিয়তি। আজহার চরিত্রে নজরুলের বাস্তব জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। নজরুলের প্রেমিক হৃদয়ের পূর্ব স্মৃতি জড়িয়ে আছে চরিত্রটির সাথে। তাই গল্পের মধ্যে একটা বেদনার সুর পাঠকের মনকে আলোড়িত করে। আজন্ম অপ্রাপ্তি-অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছিল প্রেমিক নজরুলের।

নজরুলের অগ্রন্থিত দুটি গল্প- 'বনের পাপিয়া' ও 'হারা ছেলের চিঠি'। 'হারা ছেলের চিঠি' গল্পটি প্রকাশ হয় 'অলকা'র প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যায় (পৌষ ১৩২৯)। লাইব্রেরির পুরাতন পত্রিকা ঘাটতে গিয়ে কলকাতার গবেষক বসুমতি মজুমদারের নজরে পড়েছিল। কোন গ্রন্থে গল্পটি সংকলিত না হওয়ায় এই গবেষক কলকাতার ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুষ্কোণ'-এর কার্তিক-পৌষ ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই গল্পটি সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের গবেষক আসাদুল হক। রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, নজরুল-রচনাবলি (৫ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭-এ গল্পটি সংযোজন (পৃ.৩৭৭-৩৮৩) করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'এ গল্পটিতে নজরুলের প্রথম কুমিল্লা ও দৌলতপুর যাওয়া এবং দৌলতপুরের বেদনা বিধুর অধ্যায়ের পর কুমিল্লা ফিরে আসার স্মৃতি ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রমীলা নজরুলের আদি নিবাস মানিকগঞ্জের উল্লেখ লক্ষণীয়।'[২৭]

'হারা ছেলের চিঠি' গল্পটি আদি-অন্ত ডায়রি স্টাইলে লেখা। বন্ধন ভীরু এক কিশোর অজনা ঠিকানায় যাত্রার আবেগঘন কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা অত্যন্ত মোহনীয় হয়েছে। আত্মীয়-পরিজন কেউ-ই এই কিশোরকে ঘরে রাখতে পারে না। অচেনা বীণ-বাদিনীর কাজল-সজল চোখের মিনতি তাকে পথহীন পথের পথিক করে দিশেহারা বাউল বানিয়েছে। 'ঝড়ের রাতে বিহগ শাবকের' মতো আশ্রয় প্রার্থী কিশোর। কিন্তু কেউ আদর করে কাছে ডাকলে অভিমান-ক্রন্দন বাসা বাঁধে অন্তরে এবং পালিয়ে বেড়ায়। ১৩২৭ সালের ২১শে চৈত্র এই কিশোর বন্ধু-স্বজনদের অজ্ঞাতে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। এ প্রসঙ্গে তরুণ নজরুলের কুমিল্লা গমনের স্মৃতি আমাদের স্মরণে আসে। সমগ্র যাত্রাপথ কিশোরের ভেতরের প্রচণ্ড রকমের তোলপাড় ঘটে

যায়। গভীর হৃদয় আর্তি নিয়ে নিবিড় বন্ধনে জড়ায় কিশোর কিন্তু নিমেষের ভুলে কিংবা খামখেয়ালির কারণে সেই বন্ধন ছিঁড়ে আবারও পা বাড়াতে হয় অনিশ্চিতের পথে। বন্ধন ভাঙা-গড়ার খেলা খেলে কিশোরের জীবনে অস্থিরতার পাহাড় জমেছে, 'এ কি অশোয়াস্তির অভিশপ্ত অশান্ত জীবন আমার ! কে আমায় নির্দয় ভুল করায় ? কে এমন করে আমার পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়িয়ে দেয় ? কে সে ? কেন তার অহেতুক দুশমনি আমার ওপর ?' যাত্রা পথে কিশোর বাংলাদেশের চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে দিতে এগিয়েছে। কাঁখের কলসি জলে ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতাররত কিশোরী পল্লীবধূ, পথের দু'ধারের বিচিত্র ঘাস, সুপারি গাছের সারি, কাশের সারি, কঁচি ধানের চারা, কলার ভেলা, সবুজ ঘন বন ছায়া মুগ্ধ করে কিশোরকে। পাশাপাশি বাংলার কিশোরী পল্লীবধূর বাপের বাড়ির খবর জানার ব্যাকুল আবেদন এবং উপবাসক্লান্ত বিধবার কষ্ট দেখে কিশোরের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। 'গোয়ালন্দের ঘাটে পদ্মার বুকে স্টিমারে রেলিং ধরে ঐ ওপরে মানিকগঞ্জের সবুজ সীমারেখা দেখে' স্মৃতিকাতর কিশোরের বুক চোখের জলে ভাসে । মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর হয়ে কিশোর কুমিল্লায় পৌছায় গভীর রাতে। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ক্লান্ত ও দ্বিধা-সংকোচে বিধ্বস্ত এই পথিক কিশোরকে আশ্রয় দেয় বিশ্বমাতার অন্নপূর্ণা রূপের এক নারী।

> তুমি এসে দাঁড়াতে আমি কেমন অভিভূতের মতো তোমার পানে চেয়ে রইলাম। আমার এমন মুখর মুখও মূকের মতো কথা হারিয়ে ফেলল। আমি তোমায় চিনলাম। কত দেশ-বিদেশেই তো ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু এমন ভরাট শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃরূপ তো আর আমার চোখে পড়েনি। সে রাজরাশ্বেরী বিশ্বমাতার অন্নপূর্ণা–রূপে দু-চোখ আমার ডুবে গেল! তোমার বিহবল চোখের চাওয়াতেও জন্ম-জন্মান্তরের মাতৃত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধিত চেনা চাওয়া দেখেই আমি চিনলাম, এ যে আমারি হারা মায়ের দৃষ্টি। তুমি বলেছিলে নাকি, তোমার কোন-সে অতীত জন্মের হারা-মানিককে খুঁজে পেতেই এমন করে বারে বারে শত শত মা-হারা ছেলের মা হচ্ছো। এমন করে বিশ্ব মায়ের ফাঁদ পেতেছ, সে পলাতকা শিশুকে ধরবার জন্য। তাই তুমি ধর্ম-সমাজ কিছু মানো নি, সকল পথে পাওয়া ছেলেকেই সমানভাবে কোল দিয়েছ। (হারা ছেলের চিঠি)

নিঃসন্দেহে, এই নারী নজরুলের ধর্মমাতা শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবী। 'হারা ছেলের চিঠি' গল্পটিতে নজরুলের কুমিল্লা সফরের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে। কলকাতায় নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পরিষদে'র অফিসে থাকালীন সময়ে আলী আকবর খান নামে এক পুস্তক ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় ঘটেছিল। আলী আকবর খান ছিলেন স্বভাবে চতুর এবং ধূর্ত প্রকৃতির। নজরুলকে দিয়ে কবিতা-ছড়া লিখিয়ে ব্যবসা করার মানসে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার দৌলতপুরে নিয়ে আসেন। পথে কান্দিরপাড়ে আলী আকবর খানের বাল্য সহপাঠী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ি উঠেন। ইন্দ্রকুমারের মাতা শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবীকে আলী আকবর খান মা বলে ডাকতেন। নজরুলও বিরজাসুন্দরী দেবীকে মা বলে ডাকতে শুরু করেন। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বিরজাসুন্দরী নজরুলকে মাতৃত্বের আঁচলে বেঁধে ফেলেন। আলী আকবর খানের বাড়িতে থাকার সময়ে তারই বোনকন্যা সৈয়দা খাতুনের (পরে নার্গিস আসার খানম রাখা হয়) সাথে গভীর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। অবশ্য নজরুলকে আটকানোর জন্য আলী আকবর খানের পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে সবই। ৩রা আষাঢ় ১৩২৮ সালের শুক্রবার নিশীথ রাতে নজরুল-নার্গিসের বিয়ের দিন নির্ধারণ করা হয়। আলী আকবর খানের অপমানজনক শর্ত, বিয়ের পর নার্গিসকে নিয়ে অন্যত্র যেতে পারবেন না এবং নার্গিসের কিছু আচরণে ক্ষুব্ধ নজরুল বিয়ের আসর হতে উঠে পায়ে হেঁটে কুমিল্লায় চলে এসেছিলেন। আলী আকবর খান এবং তাঁর বোনকন্যার প্রতারণার শিকার হয়ে নজরুল মানসিক ও দৈহিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এই সময়ে বিরজাসুন্দরী তাঁর আশ্রয়ে রেখে এবং মাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে নজরুল স্বাভাবিক করে তুলেন। পরবর্তীতে এই পরিবারের মেয়ে আশালতা সেনগুপ্তার (প্রমীলা) সাথে নজরুলের প্রণয় ও বিয়ে হয়েছিল। 'হারা ছেলের চিঠি' গল্পের কিশোর নায়কের মধ্যে আমরা নজরুলের জীবনপর্বের কুমিল্লা অধ্যায়ের স্পষ্ট প্রতিকৃতি দেখতে পাই। জীবনের চরম দুঃসময়ে বুকে টেনে নিয়ে যে নারী নব জীবন দিল, সেই মহীয়সী নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যেই কিশোরের এই চিঠি লেখা।

'তারপর, বুকে তীর বিঁধে আবার যখন আহত পাখিটির মতন রক্তবমন করতে করতে তোমার দ্বারে এসে লুটিয়ে পড়লাম, তখন তুমি আর মাসি-মা আমায় কি যত্নেই না বুকে করে এসে তুলে নিলে। তোমার আর আমার ঐ শিশু-বোন কটি আবার যমের দ্বার হতে আমায় ফিরিয়ে আনলে। আজ ভাবছি কী ঘরের মায়ায় বনের হরিণকে মুগ্ধ করলে ? আশীর্বাদ করো মা, তোমাদের এই দেওয়া প্রাণ যেন তোমাদেরই কাজে লাগিয়ে যেতে পারি।' (হারা ছেলের চিঠি)

নজরুলের দু'টি গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' তরুণ বয়সে লেখা। তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'শিউলিমালা' মোটামুটি পরিণত বয়সের লেখাই বলা চলে। আতাউর রহমান বলেছেন, 'তাঁর প্রথম জীবনে গদ্য রচনাগুলির শুধু এক কিশোর চিত্তের দুঃখানুভূতি পরিচয় হয়ে আছে। 'ব্যথার দান'-এর এক স্থানে লিখেছেন, প্রিয়তমার কাছ থেকে আঘাত পাওয়াতে যে কত বড় মাধুরী, তা বেদনাতুর ছাড়া কে বুঝবে? 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ও

'বাঁধনহারা' এই তিনটি রচনাতে নজরুল অত্যন্ত দুঃখবিলাসী, অভিমানী। একটি সংবেদনশীল চিত্তের ব্যথাকাতর চীৎকার বেদনা বিহ্বল একটি যুবকের অশ্রু সজল দৃষ্টি, একটি সবুজ-অবুজ মনের অসংযত প্রেমাবেগের প্রকাশকেই 'রিক্তের বেদন' বা 'ব্যথার দান' বলে অভিহিত করতে পারি।'[২৮] নজরুলের সব গল্পের নায়ক-নায়িকারাই বয়সে কিশোর কিংবা তরুণ। তরুণ বয়সে সুনামির মতো ফেনায়িত আবেগের জোয়ার বয়ে যায় মানুষের জীবনে। এই অপ্রতিরোধ্য আবেগ-উচ্ছ্বাস যেমন বাস্তব, তেমনি অনিবার্য। তাই দেখতে পাই, কিশোর প্রেমের আবেগ, বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, আশা-হতাশা, ভয়-শংকা প্রতিটি গল্পেরই উপজীব্য বিষয়। কোন প্রেমই পরিণতির মুখ দেখেনি। মিলন তো অনেক দূরের প্রশ্ন, তারা কেউ-ই মিলনের প্রত্যাশাও করতে পারে না। প্রেমের সুখময় মিলন আছে, প্রেমের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি আছে, এ কথা যেন এ সব কিশোর-কিশোরীরা জানেই না। কখনও কখনও মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় বটে, আর তখনই তাদের মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে ওঠে কিংবা পাগলের মত পথে বেরিয়ে পড়েছে সমাজ-সংসার ছেড়ে। অথবা যুদ্ধের খাতায় নাম লেখিয়েছে আর যুদ্ধের মাঠে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। আসলে তারা কি চায়, তারা নিজেরাও জানে না। 'ব্যথারদান' গল্পের দারা-বেদৌরা-সয়ফুলমুলক্, 'হেনা' গল্পের সোহরাব-হেনা, 'বাদল বরিষণে' গল্পের কাজরিয়া-বিদেশি যুবক, 'ঘুমের ঘোর' গল্পের পরী-আজহার, 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পের কিশোর প্রেমিক ও তার প্রেমিকা জ্যোতি, 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পের রাজবন্দি যুবক ও তার পাষাণ মানসী প্রিয়া, 'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়ক ও তার প্রেমিকা শাহিদা, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পের কিশোর ও তার স্ত্রী রাবেয়া ও সখিনা, 'জ্বিনের বাদ্‌শা' গল্পের ডানপিটে কিশোর আল্লা-রাখা ও চান্ ভানু, 'অগ্নি-গিরি' গল্পের শান্ত কিশোর সবুর ও নূরজাহান প্রত্যেকেই আমাদের পাড়াগাঁয়ের কিশোর-কিশোরীর সংস্করণ। কিশোর নজরুলের স্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে চরিত্রগুলোতে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, নজরুল তার গল্পের কাহিনীতে দুর্বার আবেগ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে বেদনার গাঢ় প্রলেপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নামকরণ 'ব্যথার দান' 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলিমালা' করার মধ্যেই মূল উদ্দেশ্য নিহিত। মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় নিরবচ্ছিন্ন বিরহ-বেদনার মধ্য দিয়ে। আর এই বেদনার সূত্রপাত ঘটে থাকে মূলত বয়ঃসন্ধিক্ষণেই। তবে এই বেদনা শুধু যে কষ্টের এমনটা নয়। এর একটা পর্যায়ে পাওয়া যায় আনন্দ ও সুন্দর। 'নজরুল যেন বলতে চাইছেন, দুঃখের পর্যায় পেরিয়েই আনন্দ তথা সুন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিরন্তর দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা মানুষকে সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে রাখে, তাকে স্বার্থ চিন্তায় দেয় শুকিয়ে। সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তি নয়, দুঃখ বরণই সমস্ত মনুষ্যত্বের নিদান। দুখ-বেদনায় মানুষ কষ্ট পায় কিন্তু তার মনুষ্যত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, বরং দুখের আগুনে পুড়ে তা আরও পরিশুদ্ধ হয়।'[২৯]

নজরুলের গল্পের কিশোর প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিরহ-বেদনার জোয়ারে ভাসার পেছনে রয়েছে দু'টি কারণ। প্রথমত, অযাচিত, স্বঘোষিত ও স্বগৃহীত বিরহ বিলাপ তরুণ কবির ধর্ম। দ্বিতীয়ত, পাড়াগাঁয়ের কিশোর কিংবা তরুণ বয়সের প্রেম গড়ে উঠে অনেকটা খেলার ছলে। সমাজ কিংবা অভিভাবক কেউ-ই এই প্রেমের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত থাকে না। বরং কাঁচা বয়সে ঘুণে ধরেছে, এই ভেবে কঠোর ও নির্মমভাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে মন ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে কিশোর বয়সে জীবন ও জগতের পরিধি থাকে সীমায়িত। সাধারণত, নিজ পরিবারের গণ্ডি বা সমাজ কিংবা গ্রামের বাইরের বৃহত্তর পরিসরে তাদের পদচারণা ঘটে না তখনও। ফলে তাদের প্রেমের পথে বাধা এলে বুকফাঁটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ব্যাতিত কিছুই করার থাকে না। তরুণ বয়সে মনে লজ্জা-ভয়-সংকোচ-দ্বিধা-মোহ খুব জোরালোভাবে বাসা বাঁধে। মুখ ফুটে প্রেমের স্বীকৃতি চাইবার মত শক্তি বা সামর্থও তাদের থাকে না। এই দিক হতে বিচার করলে তরুণ নজরুলের লেখা গল্পগুলো বাস্তবতা বর্জিত নয়। বরং অপরিণত বয়স হলেও মোটামুটি একটা নব জীবন জিজ্ঞাসাও আছে কয়েকটি গল্পে। আমরা গ্রাম বাংলার সর্বত্রই এই ধরনের কিশোর প্রেম দেখতে পাই। কমবেশি সকল প্রাণবন্ত মানুষই নজরুলের গল্পের নায়ক-নায়িকাদের মতো অব্যক্ত কিশোর প্রেমের স্মৃতি অন্তরে লালন করে থাকেন অনেকটা 'টিনএজ লাভ' বলতে এ সময়ে যে ধারণা প্রচলিত আছে, নজরুলের গল্পের প্রেমও তাই।

নজরুলের নায়কদের উপর শরৎচন্দ্রের নায়কদের মত নির্লিপ্ততার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। নায়িকাদের ভালবাসে গভীরভাবেই অথচ গ্রহণ করতে তাদের যেন কী এক অদৃশ্য বাধা। কর্তব্যের অজুহাতে কিংবা অন্য কোন বাহানা ধরে নায়করা বন্ধন মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের বিচিত্র নগর-মরুভূমি পরিভ্রমণেও তাদের ক্লান্তি নেই। আত্মধ্বংসের পথ বেছে নিতেও ভয় নেই। যুদ্ধের মাঠ তাদের অতি প্রিয় জায়গা। তবে শরৎচন্দ্রের নায়কদের মতো নজরুলের নায়করা একবারে প্রতিক্রিয়াহীন থাকেনি। শরৎচন্দ্রের নায়করা নায়িকাদের সব দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু মুক্তি দেবার সাহস ছিল না। নজরুলের নায়করা কিন্তু এতটা নয়। বরং প্রেমিকাকে অবহেলা করে কিংবা এড়িয়ে গিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে জীবনকে। অশান্ত মনকে শান্ত করতে হয়েছে যুদ্ধের মাঠে রক্ত ঝরিয়ে। আমরা 'ব্যথার দান' গল্পের নায়ক দারাকে দেখতে পাই, একের পর এক শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করে ভেতরের আঘাতের প্রতিশোধ নিতে। 'ঘুমের ঘোর' গল্পের নায়ক আজহারও দারার মতো যুদ্ধের মাঠে অপ্রতিরোধ্য

শক্তি। দু'জনের পার্থক্য হল, দারার প্রেমিকা বেদৌরা রিপু তাড়িত হয়ে দেহ বিলিয়ে প্রতারণা করেছে আর আজহারের প্রেমিকা পরী কৃত্রিম আঘাতের মাধ্যমে প্রেমিকের মন অশান্ত করে তুলেছে। নায়কদের এভাবে আত্মধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে দুই নায়িকাকেই জীবনে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। 'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়ক রিক্ত হওয়ার সাধনা করতে এজিদের কারবালা পর্যন্ত গেল। সেখানে অযাচিত ভাবে প্রেমপ্রার্থী এক আরব বেদুঈন যুবতীকে হত্যা পর্যন্তও করেছে। তারপরেও রিক্ত হতে পারেনি। বরং এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বন্ধনেই মুক্তি। একই ভয়ে 'হেনা' গল্পের আফগান যুবক সোহরাব ও 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী ' গল্পের নায়কও যুদ্ধে গেল।

অন্যদিকে যারা যুদ্ধে গেল না তারাও কম প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না। এক্ষেত্রে 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পের নায়ক সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। প্রেমিকার প্রতারণা ও অবহেলা মানতে না পেরে সে ফুঁসে উঠে। নায়কের মতে, চিরদিনই পুরুষরা প্রতারিত হয়ে আসছে নারীর দ্বারা। আর সামাজিক জীবনের অস্থিরতার মূল কারণও তাই। নায়ক জোর গলায় বলেছে, নারীর মন দেবতাও বুঝতে পারে না। আমরা নজরুলের 'পূজারিণী' কবিতায় নারীকে এই ধরনের দেবী, লোভী, বহুগামী, ছলনাময়ী, মিথ্যাময়ী, আলেয়া প্রভৃতি বলতে দেখেছি। হিংসাকাতরতা প্রেমেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে প্রত্যেক নায়কের অন্তরে রয়েছে নবাগত ক্ষুধিত যৌবনের তীব্র হাহাকার। প্রাপ্তিতে তাদের ভয়, অপ্রাপ্তিতেও তাদের বিরহ জ্বালার অন্ত নেই। প্রত্যেক নায়কই এক গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে পতিত। কিসে সুখ ? পাওয়াতেই সুখ নাকি না পাওয়াতেই সুখ। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের মূলভাবের প্রতিফলন দেখতে পাই। কোন গল্পেই প্রেমের সুখময় মিলন সমাপ্তি নেই। বাসনার বহ্নি নিভিয়ে, দেহকে পূত পবিত্র ভেবে ক্ষণিকের বাস্তব মিলন প্রত্যাশার পরিবর্তে অনন্ত প্রেমের তপস্যা করেছে নজরুলের গল্পের অনেক নায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হল তার কি তা পারল? তারা কি পারল জীবনধর্মকে অস্বীকার করতে ? আমাদের গ্রামের কিশোর বয়সের ছেলেরা যেমন রেগে-ফুঁসে-অভিমানে বাড়ি ছাড়ে কিংবা গ্রাম ছাড়ে, আবার পেটে টান ধরলে, বেলা গড়ালে কিংবা একদিন-দু'দিন আত্মীয়ের বাড়ি পালিয়ে থেকে আবার মাথা নিচু করে পিছন দরজা দিয়ে ঘরে ফিরে। তেমনি নজরুলের কিশোর নায়কেরা রাগে-অভিমানে গুলিস্তান, আফগানিস্তান, করাচি, কারাবালা, উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিচিত্র জায়গা ঘুরে, যুদ্ধের মাঠ কাঁপিয়ে জীবন ক্ষুধা নিয়ে শেষে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরেছে। তবে নজরুলের পরিণত বয়সে লেখা 'শিউলিমালা' গল্প গ্রন্থের নায়ক আল্লা-রাখা, সবুর, আজহাররা বয়সে কিশোর বা তরুণ হলেও তাদের বেদনা কিছু পরিমাণে আবেগ-উচ্ছ্বাস পরিশীলিত।

অন্যদিকে নজরুলের গল্পের নায়িকারা আমাদের পাড়াগাঁয়ের কিশোরীদেরই প্রতিবিম্ব। বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই সময়টা মেয়েদের চোখে-মুখে বাসা বাঁধে লজ্জা-ভয়-সংকোচ। সামান্য কিছুতেই হরিণ শাবকের মতো শিউরে ওঠে। ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে বেড়ায়। অন্যদিকে নজরুলের নায়করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়িকাদের মন ও ভাষা বুঝতে পারেনি। যারা বুঝেছে তারা আবার না বুঝার ভান করেছে। অনেকটা অসহায়ের মতো নায়কদের স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নিতে হয়েছে নায়িকাদের। 'ব্যথার দান' গল্পের নায়ক দারা তার প্রেমিকা বেদৌরাকে পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টাই করে না। 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'ঘুমের ঘোর' গল্পের নায়কেরা অতি সাধু সেজে প্রেমিকাদের তুলে দিল পর পুরুষের হাতে। 'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়ক তো এতটাই পাষাণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যে, বিদায়কালে মায়ের হুকুম পর্যন্ত মানে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা অভাগিনী শাহিদাকে এক নজর দেখতেও চায় না। আর 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পের অভাগিনী পল্লী বধূরা আরও করুণ পরিণতির শিকার। 'শিউলিমালা' গল্পের উচ্চ শিক্ষিত নায়ক আজহার তার প্রেমিকাকে গ্রহণের ব্যাপারে চরম নির্লিপ্ত থেকেছে। আর 'অগ্নি-গিরি' গল্পের কিশোর নায়ক সবুর তো নিজের পক্ষে কোন উকিলই নিয়োগ করে না। ফলে নূরজাহানের কপালে লেখা হয়ে গেল চিরকালের বিরহ-বিচ্ছেদের নিয়তি। তবে 'রাক্ষুসী' গল্পে বিন্দি বাংলা ছোটগল্পের বিরল চরিত্র। এমনভাবে কোন চরিত্র প্রেমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই। 'হেনা' গল্পের হেনা ও 'রিক্তের বেদন' গল্পের বেদুঈন যুবতী গুলের প্রেম আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের নারীদের প্রেমের স্বরূপ চিনতে সাহায্য করে। 'বাদল-বরিষণে'র গল্পের কালো মেয়ে কাজরিয়া এবং 'মেহের-নেগার' গল্পের খুরশেদ বাইজীর কন্যা গুলশানের প্রেম প্রতিষ্ঠা করে নজরুল প্রেমের নবতর মূল্যায়ন ঘটালেন। নজরুলের প্রায় সব নায়িকাই একনিষ্ঠ প্রেমের পূজারি। যাকে ভালবাসে, অন্ধের মতো কামনা করে তাকে। এজন্য বুকফাঁটা আর্তনাদ ও অসীম দীর্ঘশ্বাসের অন্ত নেই তাদের জীবনে। প্রেম হল ধারালো চাকুর মতো। আসতেও কাটে, যেতেও কাটে। শেষ পর্যন্ত প্রেমের একটা প্রাপ্তি আছেই। সমাজ-সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে ভালবাসতে গিয়ে অনেক সময় জীবন ধর্মের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রেমের সেই অমৃত আলয়ে চলে যেতে হয়েছে নজরুলের বেশ কয়েকজন নায়িকাকে। তারপরেও তিল পরিমাণ আপমান হতে দেয়নি প্রেমের। কিশোর প্রেমের এই আবেগ-উচ্ছ্বাস নজরুলের প্রথম জীবনের প্রেম চেতনার প্রধানতম বিষয় ছিল। প্রেম-চেতনায় কৈশোরিক পরিণতি শেষ পর্যন্ত বড় বেশি উত্তরণ ঘটেনি কোন গল্পেই।

তথ্যসূচি:

[১] আহমদ শরীফ, "নজরুল কাব্য প্রেরণার উৎস", *নজরুল কবি ও কাব্য*, প্রণব চৌধুরী সম্পা. (ঢাকা : বাংলাদেশ বইঘর, ২০০০), পৃ.৪৩
[২] সুভাষচন্দ্র বসু, "কবি নজরুল", *নজরুল স্মৃতি* , বিশ্বনাথ দে সম্পা. (কলকাতা : সাহিত্যম্, শতবর্ষ সংস্করণ : মে ১৯৯৮) পৃ. ১৯
[৩] আতোয়ার রহমান, "কথাশিল্পী নজরুল", *নজরুল সাহিত্য*, মীর আবুল হোসেন সম্পা, (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২য় সংস্করণ ১৩৭২) পৃ.১৬৭
[৪] আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, ডি, এম লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ: ১৩৬৩, কলকাতা, পৃ.১২০
[৫] মিহির সেন, "ছোটগল্পে নজরুল", *নজরুল স্মৃতি*, পৃ.১৩৬
[৬] আবদুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (সম্পাদনায় শাহাবুদ্দীন আহমদ) (ঢাকা : নজরুল ইসটিটিউট, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ.২০৪
[৭] মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সমকালে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩) পৃ.১৬৮
[৮] মোবাশ্বের আলী, *নজরুল প্রতিভা* (ঢাকা : মুক্তধারা, ৩য় সং ১৯৮৯) পৃ. ১৯৭
[৯] মুজফ্ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম:স্মৃতিকথা (ঢাকা :* মুক্তধারা, ৫ম প্রকাশ ১৯৯৭) পৃ. ২৬৬
[১০] মুজফর আহমদ, পৃ.৪৪
[১১] আতাউর রহমান, *নজরুলের জীবনে প্রেম ও বিবাহ*, (ঢাকা : শুভ্রা প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃ. অনুল্লেখ্য
[১২] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার* (কলকতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৯) পৃ. ৩৮২
[১৩] মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, পৃ.৪৫-৪৬
[১৪] রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি* (কলকাতা : কেপি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২য় সংস্করণ:১৯৯৭) পৃ.৫৫৫
[১৫] মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, পৃ. ২৪
[১৬] মুজফ্ফর আহমদ, পৃ.১৬২
[১৭] ড. জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়, "ব্যথার দান ঃ ব্যথার পূজা", *নজরুল গদ্য সমীক্ষা* (সম্পাদনায় ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন) (ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স, ১৯৭৮) পৃ. ৯৪
[১৮] মূল গল্পে দারার 'লালফৌজে' যোগদানের কথা ছিল। মুজফ্ফর আহমদ 'লালফৌজ' কেঁটে 'মুক্তির সেবকদল' বসিয়ে দিয়েছিলেন। এর একটা বাস্তব কারণও ছিল। ব্রিটিশ ভারতে তখন 'লালফৌজ' উচ্চারণ করাও ছিল নিষিদ্ধ। গল্পটি প্রকাশ হলে পুলিশি হয়রানীর শিকার হতে পারেন নজরুল। রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং মজুর শ্রেণীর পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত সৈন্যদল 'লালফৌজ' ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারে, এ ভয়ে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। তাই সরকারের কড়া নজরদারি ছিল সারাদেশে। মুজফ্ফর আহমদ বলেন "আমিই তা থেকে (গল্প থেকে) লালফৌজ কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল' বসিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে 'লালফৌজ' কথা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল। সে লালফৌজে ব্রিটিশ ভারতের লোকেরা যে যোগ দিবে, তা যদি গল্পেও হয়, তা পুলিশের কাছে হজম করা মোটেই সহজ হতো না।" মুজফ্ফর আহমদ, পৃ. ১৬৩
[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধ্যবর্তিনী, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (৯ম খণ্ড) (ঢাকা : জয় বুক্স ইন্টারন্যাশনাল, বিশেষ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১০) পৃ. ৩৩৮
[২০] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী (১ম খণ্ড)*, পৃ. ৭৬৩ (গ্রন্থ-পরিচয়)
[২১] শেখ দরবার আলম, *নজরুলের নানান দিক* (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪) পৃ.৬৫
[২২] 'ব্যথার দান' গল্পের নায়িকা শাহিদার সূত্র ধরে 'কবি নজরুল' গ্রন্থের লেখক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিলেন চুরুলিয়া গ্রামে। সেখানে তিনি এক ধনী পরিবারের গৃহবধূ শাহিদার সন্ধান পান। তিনি জোর দিয়েই বলেন, এই শাহিদাই নজরুলের 'মানসী' প্রিয়া ছিলেন। যার মাথার খোঁপার কাঁটা সম্বল করে কিশোর নজরুল সৈনিকব্রত গ্রহণ করে চিরকালের মতো সব ছেড়ে চলে যান। তার এই বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন 'নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্যে'র লেখক শেখ আজিবুল হক। ব্যাপক অনুধাবন ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তিনি নিশ্চিত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন, নজরুল ও তাঁর 'মানসী'র লীলাভূমি ছিল রাণীগঞ্জের জগন্নাথ গার্ডেনে। দুই কিশোর কুমার নজরুল ও তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ নিয়মিত যেতেন গার্ডেনে এবং দেখতেন 'আয়তলোচনা সুশ্রী বরণা এক কিশোরী'কে। কিশোরীর নাম ছিল স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়। চ্যালেঞ্জ করেই একদিন কিশোর নজরুল কিশোরীর সামনে দাঁড়ান এবং মাথার একটা কাঁটা চান এই বলে যে, কলম করে কবিতা লিখবে। এই ঘটনা তিনি জেনেছেন এডভোকেট ভোলানাথ দত্তের নিকট হতে। ভোলানাথ দত্ত শুনেছিলেন শৈলজানন্দের নিকট হতে। তিনি ছিলেন নজরুল ও শৈলজানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কবি আতাউর রহমান মনে করেন, 'বিষয়টি মীমাংসা করা সহজ নয়। নজরুলের কৈশোর জীবনের অবস্থাগতদিক থেকে বিচার করলে শাহিদাই তার 'মানসী' হওয়ার কথা। পক্ষান্তরে আজিবুল হক স্বাক্ষী সাবুদ দাঁড় করিয়ে স্বর্ণলতাকে কবির 'মানসী' প্রমাণ করেছেন।' তিনি বরং ভিন্ন একটি সূত্র অর্থাৎ 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা তার প্রেমিকা মাহবুবা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে সৈনিকে যোগ দেবার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এতে বুঝা যাচ্ছে মাহবুবা যে-কোন কারণেই হোক, নূরুল হুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই নূরুল হুদা যদি নজরুলের প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে নজরুল কি এই রকম প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণায় আত্মীয়-স্বজন বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে মরণযজ্ঞে-অর্থাৎ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ? নিশ্চিত করে এটা বলা যাবে না। তবে নজরুলের জীবন ইতিহাস ও সাহিত্যকর্ম পরিক্রমণ শেষে বুঝা যায়, তাঁর প্রাক-সৈনিক জীবনের কোন নায়িকাই ছিল 'মাথার কাঁটার' মালিক।' (আতাউর রহমান, পৃ. অনুল্লেখ)
[২৩] ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ. ২৭
[২৪] আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য সমীক্ষা* (ঢাকা: মুক্তধারা, চতুর্থ সং ১৯৮৭) পৃ.৭১
[২৫] ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ.২৭৯
[২৬] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী* (২য় খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়) পৃ. ৯০৮
[২৭] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী (৫ম খণ্ড)*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭), পৃ. ৩৯৭
[২৮] আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা, পৃ. ৬৭
[২৯] ড. জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ.১০০

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

ঊনবিংশ শতকে রাজশাহী জেলার বাংলা সাহিত্য

ড. ইয়াসমীন আকতার সারমিন*

ঊনবিংশ শতকের রাজশাহী জেলা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধশালী ও প্রভাবশালী জনপদ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশ সম্ভবত: খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দি হতে খৃস্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দির মধ্যে গড়ে উঠেছিল। পুণ্ড্র জনপদটি মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং পাল ও সেন বংশের শাসনাধীন ছিল। প্রাচীন এ জনপদটি বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল তা ইতিহাসস্বীকৃত। সেন বংশের অবসানের দ্বারা বাংলার মুসলমান শাসন শুরু হলে পুণ্ড্র জনপদ এ শাসনের অধীনে চলে আসে। বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বহু জনপদকে একত্রিত করে 'মূঘলে বাঙ্গালা' গঠন করলে এতদঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সুলতানী শাসন অবসানে ভারত উপমহাদেশে মোঘল শাসনের সুত্রপাত হয় এবং মোঘল সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলাকে মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করে স্বাধীন বাংলাকে একটি প্রদেশে পরিণত করেন যার নাম রাখা হয় সুবে বাংলা। আর এভাবেই প্রাচীনকালের সমৃদ্ধশালী পুণ্ড্র জনপদ তার স্বতন্ত্রতা হারালেও সময়ের বিবর্তনে জনপদের একটি অংশ ক্রমে রাজশাহী নামে পরিচিতি লাভ করে বৃটিশ শাসনামলে জেলায় পরিণত হয়। নাটোর, নওগাঁ ও সদর মহকুমা নিয়ে এ জেলা গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতকে রাজশাহী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্ঠায় এতদঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে শিক্ষিত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। এ শ্রেণি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে এর প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। হিন্দু ও মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন।

মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী[১] রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'দুগ্ধ সরোবর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। সমাজের নানা অসংগতি নির্ধারণ ও সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'খোশ খবর' ও 'অন্তিম কালের কর্তব্য' উল্লেখযোগ্য ছিল।[২] তিনি বিশিষ্ট দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিমিয়া-ই-সা'আদত' অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে এ গ্রন্থ বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ এবং কালের কষ্টি পাথরে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে।[৩]

রাজশাহী জেলার বিশিষ্ট উকিল অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়[৪] ঐতিহাসিক, সংগঠক, সমাজসেবক এবং নাট্য আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচেছ, 'সমর সিংহ', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীর কাশিম', 'গৌড় লেখমালা', 'সীতারাম রায়', 'ফিরিঙ্গী বণিক', 'অজেয়বাদ'।[৫] তৎকালীন গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ভারতী, উৎসাহ, প্রবাসী, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভারতবর্ষ, হিন্দু রঞ্জিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়।[৬] বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার পথিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র সাড়া জাগানো গবেষণামুলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'সিরাজউদ্দৌলা' নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন এবং অন্ধকুপ-হত্যা সম্পর্কে অলীক এবং অন্ধকুপ হত্যা আদৌ সংঘটিত হয়নি বলে প্রমাণ করেছেন। 'কৈসর-ই-হিন্দ' ও সি.আই.ই. উপাধিতে ভূষিত-এ ব্যক্তি ১৯৩০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৭]

পাবনা জেলার কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)[৮] স্বরচিত গান গাইতেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে তাঁর রচিত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই' গানটি তৎকালীন সময়ে রাজশাহী ছাড়াও সমগ্র বাংলায় আন্দোলনের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।[৯] শুধু গীতিকার নয়, তিনি একজন সু-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত 'বাণী', 'অমৃত', 'কল্যাণী', 'অভয়া', 'আনন্দময়ী', 'শেষদান', 'বিশ্রাম' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত 'উৎসাহ' নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যত স্বদেশ প্রীতি ও ভক্তি।[১০]

রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার তাহেরপুর গ্রামের অধিবাসী হাজী কেয়ামতুল্লাহ (১৮৭০-১৯৬০) গজল, পুঁথি ও ধর্মসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন।[১১] তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাটটির মত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি ছিল 'ভাবসংগীত', 'আখলাকোননেছা', 'নারীর প্রতি উপদেশ', 'কেয়ামতের পদাবলী', 'বঙ্গীয় সুসংবাদ', 'পরশমণি', 'ইমাম হোসেনের জঙ্গী খতনামা' ইত্যাদি।[১২] এছাড়াও 'কেয়ামতী দোয়ায়ে জমিয়া'

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

(দোয়া সংগ্রহ), 'সোনারখনি' (খোদা ও রাসুলের প্রশংসা), 'তায়লিমে ছালাৎ' (ধর্ম উপদেশ) প্রভৃতি গ্রন্থ তাহেরপুর (রাজশাহী) থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩] তিনি সত্য নাটক নামে একটি নাটক লিখেছিলেন।[১৪]

এ জেলার পোরশা নিবাসী দোস্ত মোহাম্মদ মিঞাজী উনিশ শতকের শেষদিকে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'সিরাতুল ইসলাম', 'খয়বতের জঙ্গনামা', 'তুহফাতুন্নেসা', 'খায়রু বাশার', 'সিরাতুল আখবার' প্রভৃতি তাঁর রচিত ধর্মীয় গ্রন্থ।[১৫] আরেক খ্যাতিমান লেখক করিম বক্স সরদার[১৬] সোহরাব বধ, গাজী কালু প্রভৃতি নাটক রচনা করেন,[১৭] তিনি যৌবনে সংগীত ও নাট্য প্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

মহসেন উল্লা সরকার (১৮৬৯-১৯২৩)[১৯] খুব বেশি লেখাপড়া না করলেও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত তাঁর রচিত 'বুড়ির সুতা' একটি গণসচেতনামূলক গ্রন্থ ছিল। তিনি 'মর্সিয়া' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন[২০] এবং তৎকালে কলিকাতা থেকে প্রচারিত 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। তদানিন্তন নাটোরে রাজা-জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত গুনু প্রামাণিকের পক্ষে এবং নিরীহ কৃষক ও প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মহামান্য গভর্নর (ছোটলাট) বাহাদুরের নিকট ওজস্বিনী ভাষায় 'আবেদন' আকারে পেশ করেন। এ 'আবেদন' ও 'ফসকাগেরো' (অশ্রুবিন্দু উপহার) নামক নিবন্ধ এবং 'গুদাম' ও 'ছিন্নখেই' শিরোনামে দুটি কবিতা বহুল প্রচারিত ছিল। 'বুড়ির সুতা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ তার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।[২১]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)[২২] এর 'বর্তমান বঙ্গ সমাজ' ও 'চারিজন সংস্কারক' প্রথম রচনা। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে বৈষ্ণব পদের সংকলন 'পদ রত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'ফুলজানি', 'শক্তি গমন', 'কৃতজ্ঞতা', 'বিশ্বনাথ', 'রাজ-তপস্বিনী' প্রভৃতি।[২৩]

রাজশাহীর প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীশশধর রায় ঊনিশ শতকে কলিকাতার কোন কোন বাংলা মাসিক পত্রিকায় সামাজিক প্রবন্ধ লিখতেন।[২৪] তিনি 'উপনিষদ', 'রাঘব বিজয় কাব্য', 'ত্রিদিব বিজয় প্রশ্ন', 'বঙ্গ দর্পণ', 'শান্তি শতক', 'মানব সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[২৫] তাঁর রচিত 'আদিম বৈদিক সময়ের আর্য সভ্যতা' গ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষা পরিচয় (বৈশাখ ১২৯৮) সংখ্যায় (১৮৯১) প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, গ্রন্থকার ইংরেজিতে পারদর্শী হয়েও বাংলায় এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। হিন্দুদের বেদ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত এ পুস্তকটিতে লেখক স্থানে স্থানে স্বাধীন ভাব ব্যক্ত করেছেন। পুস্তকটি বলিহারের জমিদার বিদ্যোৎসাহী শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা কৃষেন্দ্র রায় বাহাদুরের বদান্যতায় তদীয় মুন্দ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।[২৬] তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রাজশাহী শাখার সদস্য পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২৭]

রাজশাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ সুন্দর রায় বালকদের জন্য 'কবিতা কুসুম মালা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটি প্রকৃত কাব্যের মর্যাদা না পেলেও শিশু কিশোরদের উপযোগী করে লেখা হয় এবং লেখক এতে যথেষ্ঠ কৃতকার্য হয়েছেন। গ্রন্থটি বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।[২৮] ব্রজসুন্দর স্যান্যাল 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক চার খণ্ডের জীবনী রচনা করেন।[২৯]

বিনোদ বিহারী রায় শুধু একজন ডাক্তার ছিলেন না, লেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থটি তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।[৩০] তাঁর রচিত 'আয়ুর্ব্বেদ্দ মতে শিশু পালন' গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "গ্রন্থখানির ভাষা সরল ও শুদ্ধ। ডাক্তার গ্রন্থকারের আয়ুর্ব্বেদ্দ শাস্ত্রের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হইতেছে। ..... যদিও গ্রন্থখানির সর্ব্বত্র প্রবীণতার পরিচয় পাওয়া যায় না তথাপি ইহাতে সারকথা অনেক আছে। গ্রন্থটি তালন্দ (রাজশাহী) প্রেসে মুদ্রিত"।[৩১]

রাজশাহী জেলার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রী রামজয় বাগচী[৩২] শুধু সাহিত্য রচনায় দক্ষ ছিলেন তা নয়, সংগীত রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে 'শিক্ষাপরিচর' পৌষ, ১৩০১ (১৮৯৫) এর সংখ্যায় লেখা হয়, "এ মহাপুরুষ বৃদ্ধ বয়সে আজিও রাজসাহীর সাহিত্য মণ্ডলে শিক্ষক স্থানীয়। আজিও যৌবনোচিত উৎসাহের সহিত সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সংগীত কুসুম গ্রন্থখানি সংগীতবিদ্যা বিশারদ কিন্নর কণ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু রোহিনী নন্দন সেন মহাশয়ের নামে উৎসর্গিকৃত এবং তিনি এ গ্রন্থটির যথেষ্ঠ প্রশংসা করেছেন"।[৩৩] তাঁর 'কবিতা ও কুসুম' এবং 'সংগীত কুসুম' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), নামক গ্রন্থদ্বয়ে ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস ও স্রষ্টার প্রতি ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের বিচিত্রতা অঙ্কনে তিনি একজন প্রকৃত চিত্রকর ছিলেন।[৩৪]

কালিকুমার সেন নৈতিক দর্শন বিষয়ে 'মনের প্রতি উপদেশ' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বইটিতে তিনি মানসিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ গ্রন্থটি রামপুর বোয়ালিয়া থেকে মুরারী মোহন বিশ্বাস কর্তৃক ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৫] রাজশাহী কলেজের শিক্ষক লোকনাথ চক্রবর্তী বঙ্কিম যুগের খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তিনি বঙ্কিম চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' এর যে সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন তা সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।[৩৬]

শ্রী কালিনাথ চৌধুরী[৩৭] 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামে একটি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৮] গ্রন্থটিকে ঊনিশ শতকের রাজশাহী জেলার ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল বলা যায়। জোবেদ আলী সরকার নামে রাজশাহী জেলার লেখক 'নারী পুরুষের রঙ্গ-রসের ঝগড়া' নামক একটি গ্রন্থ ১৮৭৫ সালে প্রকাশ করেন।[৩৯]

ঊনিশ শতকের সমাজ সচেতন পুঁথিকার এনায়েত কাজী 'কলিকাতার বয়ান' ও 'সকের মেলা' রচনা করেন।[৪০]এছাড়াও তিনি কিছু পুঁথি পয়ার ছন্দে রচনা করেছিলেন।[৪১] তাঁর পুঁথির বিষয়বস্তু নতুন হলেও নির্মাণ কলা গতানুগতিক ছিল। তবে তিনি সমাজ সচেতন ছিলেন।[৪২]

নাটোর নিবাসী শেখ জুমন উদ্দীন (১৮৮৭-১৯৪৭) নামের কবির মধ্যে একটি শিল্পী সত্তা সক্রিয় ছিল। তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধগুলোর মধ্যে সমাজ ও মানুষের কল্যাণ চিন্তা বিদ্যমান ছিল।[৪৩] সু-কবি ও সাহিত্যিক জুমন উদ্দীন 'মহামানব', 'মুক্তি পথ', 'কর্মবীর', 'জহরা', 'ইশকে মাওলা', 'গৃহ দর্পণ', 'অপূর্ব তাজমহল' ও 'স্বপ্ন ভ্রমর' গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।[৪৪] তাঁর 'মহা মানব' গ্রন্থটি হযরত মোহাম্মদের (সঃ) এর জীবনের কাব্যরূপ।[৪৫]

কবি খয়ের আলী সরদার (১৮৮১-১৯৫৫) নাটোর মহকুমার সিংড়া থানার পাঁচ পাকিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 'বন্যা কাহিনী', 'পতিত মোপেম, সমাজ চিত্র', 'শেষের বিপদ' নামে তিনটি কবিতার বই এবং 'কৃষক প্রজার মন কথা' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন।[৪৬]

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রঘুনাথ সুকুল (১৮৬৪-১৯৪৫) 'কেয়া' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন এবং 'মেঘদুত', 'রঘু বংশ', প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি 'নিহার ও নির্ঝর' এবং 'নিটাত শেষ' (৩য় খন্ড) কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৭]

নওগাঁ কে.ডি. হাই স্কুলের শিক্ষক কুমুদনাথ দাস ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'কাব্যগুচছ' 'জ্যোতির সন্ধানে', 'সাহিত্য জিজ্ঞাসান', *A History of Bengali Literature, 'Rabindranath, His mind Art and other Essays'* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[৪৮]

রাজশাহী জেলার আরেক জন কবি কাদের আলি রচিত 'মোহিনী প্রেম ফাঁস' নামক গ্রন্থটি ১৮৮১ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৯] রাজেন্দ্রলাল আচার্য[৫০] শিশুদের জন্য '৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ', 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ', 'রাণী ভবানী', 'বাঙ্গালার প্রতাপ' এবং বড়দের জন্য 'ফিরিঙ্গির বাণিজ্য', ও 'বাঙ্গালীর বল' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করে লেখক হিসেবে যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৫১]

রাজশাহী জেলার বৈদ্য বেলঘরিয়া নিবাসী রাম কিশোর তর্কালঙ্কারের পুত্র শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত (১৭৯৭-১৮৭১) রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে ১৭টি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য এবং ১৭টি দর্শনাদি বিষয়ক ছিল।[৫২]

ঊনিশ শতকের আরো একজন কবি ছিলেন গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী। পুঠিয়া নিবাসী এ কবি পুঠিয়ার রাণী 'মহারাণী শরৎ কুমারী' এর জীবনী রচনা করেন।[৫৩] দুর্গাদাস লাহিড়ী, 'রাণী ভবানী' এর জীবনী রচনা করেন।[৫৪] এ জীবনী গ্রন্থগুলোতে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় আছে।[৫৫]

উনিশ শতকে রাজশাহী জেলায় বাংলা সাহিত্য রচনায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। তৎকালীন সময়ে এ জেলার সাহিত্য রচনায় অগ্রগতি সাধনে লেখক সমাজ এগিয়ে এসেছিল বলেই নানাবিধ কুসংস্কার, নৈতিক অবক্ষয় থেকে রাজশাহী জেলার অধিবাসীরা রক্ষা পেয়েছিল। বাংলা সাহিত্যকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে জমিদাররা আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং এ জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও উৎসাহ লেখক সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সকল কবি সাহিত্যিক, লেখকদের রচনাবলী বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন সেটা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সমাজে যে বিশেষ প্রভাব রেখেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর লেখনিতে একদিকে সমাজের সংগতি উঠে আছে তেমনি অন্য দিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সচেতনা সৃষ্ঠিতে ভূমিকা রেখেছিল।

তথ্যসূচি:

---

[১] জন্ম হয় রাজশাহী জেলার অন্তর্গত দূর্গাপুর থানার আলিয়াবাদ গ্রামে। তিনি বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী, উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সাইফুদ্দীন চৌধুরী, তসিকুল ইসলাম (সম্পাঃ), রাজশাহী প্রতিভা, ১ম খণ্ড, (রাজশাহী ঃ রাজশাহী এসোসিয়েশন, ২০০০), পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

[২] ফজলুল হক, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০), জীবনী গ্রন্থমালা (২২), (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৯), পৃঃ ১২-১৭।

[৩] সেলিনা হোসেন, নুরুল ইসলাম (সম্পাদক) চরিতাভিধান, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী দ্বিতীয় সংস্করন, ১৯৯৭), পৃঃ ২৮৩।

[৪] তিনি কুষ্টিয়া জেলার শিমুলাই গ্রামে ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারখালি, রাজশাহী ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করে এখানেই ওকালতি আরম্ভ করেন এবং বিশেষ সুনাম ও প্রতিপত্তিসহ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

[৫] সেলিনা হোসেন, নুরুল ইসলাম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

[৬] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, তসিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

[৭] সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), সংসদ বাঙ্গালী চারতাভিধান, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা.লি. সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃঃ ২।
[৮] পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও রাজশাহীতে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ১৮৮৩ সালে কুচবিহার জেনকিংস স্কুল থেকে এন্ট্রাস, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ.এ. কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৯৯ সালে বি.এল.পাশ করে রাজশাহী কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। নাটোর ও নওগাঁ মহকুমায় কিছুদিন মুন্সেফের চাকুরী করেন। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫১।
[৯] সেলিনা হোসেন, নুরুল ইসলাম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯।
[১০] সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫০-৪৫১।
[১১] ফজলুল হক, "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" রাজশাহী পরিচিতি (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী ১৩৮৬ বাং) পৃঃ ১৩৮-১৩৯।
[১২] মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি (১৪০০-১৯৮৫), ২য় খণ্ড (রাজশাহী ঃ মিসেস রোকেয়া খাতুন, ১৯৮৮) পৃঃ ৩৩-৩৪।
[১৩] আলী আহমদ (সংকলিত), বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী), ১৯৮৫,পৃঃ ৩৬৭।
[১৪] মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্যঃ আধুনিক যুগ", বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১২-৯১৩।
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১২।
[১৬] তিনি নাটোর মহকুমার বড়াই গ্রাম থানার কাটালকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
খান মোহাম্মদ আফজাল, নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস (নওগাঁ ঃ মতি মঞ্জিল, ১৯৭০), পৃঃ ৯৩-৯৬।
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।
[১৮] মুহাম্মদ মজির উদ্দিন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১২।
[১৯] মুহঃ হাসারউদ- দীন- কবিরত্ন " বুড়ীর সুতা" প্রণেতা শ্রী মহসেন উল্লা সরকার, মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত) নাটোরের গৌরব, (নাটোর জেলা প্রশাসন, ১৯৮৯), পৃঃ ২০।
[২০] এস ওয়াজেদ আলী নাটোরে সংস্কৃতি চর্চা, মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।
[২১] মুহঃ হাসার উদ- দীন-কবিরত্ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
[২২] পিতা প্রসন্ন কুমার পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পুঠিয়ার রাণী শরৎ কুমারীর উৎসাহে সাহিত্য সেবায় মনোযোগী হন। সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪১।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪১।
[২৪] দীনেন্দ্র কুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, (কলিকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫বাং), পৃঃ ১১২।
[২৫] অধ্যাপক ফজলুল হক, "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য", প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
[২৬] শিক্ষা পরিচর, ৩য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ১২৯৮, পৃঃ ৯৫-৯৬।
[২৭] 'সাহিত্য, পরিষৎ পত্রিকার' সদস্য বৃন্দের তালিকা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২, ১৩০৩।
[২৮] জ্ঞানাঙ্কুর, মাসিকপত্র, ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১২৮০, পৃঃ ২১২।
[২৯] আলী আহমদ (সংকলিত), পৃঃ ২১২।
[৩০] Siddique, Ashraf (ed.) *Bangladesh District Gazetters, Rajshahi,* (Dacca : Bagngladesh Government Press ১৯৭৬). ., ঢ়ঢ়. ২৪০-২৪৪. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্যঃ আধুনিক যুগ", প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১৭।
[৩১] শিক্ষা পরিচর, ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১২৯৭, পৃঃ ১৪৪।
[৩২] তিনি ১২৪৯বাং (১৮৪২) সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেশী বিদ্বান না হলেও গ্রন্থকার ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কালিনাথ চৌধুরী, রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (কলিকাতা ঃ স্কুল বুক প্রেস, ১৯০১), পৃঃ ৩২৬।
[৩৩] শিক্ষা পরিচর, ৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩০১, পৃঃ ৩৫২।
[৩৪] শ্রী কালীনাথ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬।
[৩৫] *The Calcutta Gazettee*, ১৮৭২, ঢ়ঢ়. ৮-৯.
[৩৬] দীনেন্দ্র নাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
[৩৭] তিনি নওগাঁ মহকুমার আত্রাই থানার অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামে আঠারো শতকের শেষার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী জেলার ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন। (খান মোহাম্মদ আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৬।
[৩৮] অধ্যাপক ফজলুল হক, "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য", প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।
[৩৯] Siddiqui, Ashraf (ed.) *Op., Cit,* p. ২৪০.
[৪০] মুহাম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১২।
[৪১] Siddiqui, Ashraf (ed.) *Op., Cit,* p. ২৪০.
[৪২] মুহাম্মদ মজির উদ্দীন, "রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক", রাজশাহী পরিচিতি, পৃঃ ১৫৪।
[৪৩] মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, শেখ জুমন উদ্দীন (১৮৮৭-১৯৭৪), মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।
[৪৪] Siddiqui, Ashraf (ed.) *Op., Cit,* p. ২৪১.
[৪৫] মুহাম্মদ মজির উদ্দীন, "রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক", রাজশাহী পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩।
[৪৬] তিনি নাটোর মহকুমার সিংড়া থানার পাঁচ পাকিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এস, ওয়াজেদ আলী, নাটোরে সংস্কৃতি চর্চা, মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪-২৩৫।
[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪।
[৪৮] মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, :"বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্যঃ আধুনিক যুগ", প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১৩।
[৪৯] আব্দুর রাজ্জাক, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
[৫০] তিনি ১৮৮০ সালে রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কলিকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। তিনি রাজশাহী জেলার সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত ও অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪৭-৬৪৮।
[৫১] অধ্যাপক ফজলুল হক, "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য", প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।
[৫২] সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২১-৫২২।
[৫৩] Siddiqui, Ashraf (ed.) *Op., Cit,* p. ২৪১.
[৫৪] *Op., Cit.* p. ২৪২.
[৫৫] মুহম্মদ মজির উদ্দীন, "রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক", প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

প্রাচীন বাংলার সীমানা: উদ্ভব ও বিকাশ

ড. মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন*

সার সংক্ষেপ : ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে হলে প্রাচীন বাংলার সীমানা সম্বন্ধে জানা একান্ত প্রয়োজন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার সীমানা সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে বাংলার সীমানা কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল, বাংলার জনপদগুলোর সীমানা কীভাবে বিভক্ত ছিল, কীভাবে প্রত্যেকটি অঞ্চল জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং বাংলা নামকরণ কীভাবে করা হয় তা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার সীমানার উদ্ভব: প্রাচীন বাংলার সীমানা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বাংলাদেশ বলতে কোন ভূ-খণ্ডকে বুঝায় তা স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োাজন। ১৯৭১ সালের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, সেই ভূ-খণ্ডকে এখানে বাংলাদেশ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় সৃষ্ট পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে এই ভূ-খণ্ডের নাম হয়েছিল পূর্ববাংলা। ১৯৫৫ সালে এর নাম হয় পূর্ব- পাকিস্তান।[১] ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এটি ব্রিটিশ বাংলা নামক প্রদেশের অংশ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে মোঘল আমলে এই ভূ-খণ্ড ছিল সুবে বাংলা নামক প্রদেশের অংশ। এভাবে আমরা যদি পিছন ফিরে তাকাই তাহলে দেখব বাংলাদেশ সুদূর অতীতকাল থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রাষ্টের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এভাবে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন যে সকল জনপদসমূহ ছিল তা এসে যায়। তাই প্রাচীন জনপদসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাচীন জনপদসমূহের মধ্যে বঙ্গ এবং বাঙ্গাল অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাংলাকে একীভূত করে যে বাংলা প্রতিষ্ঠা করা হয় তার সম্পর্কে আলোচনা না করলে বর্তমানের বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের সীমানা সম্পর্কে অস্পষ্টতা থেকে যাবে। তাই প্রাচীন যুগের জনপদসমূহ থেকে শুরু করে পাল ও সেন আমলে বাংলা এবং ইলিয়াস শাহের শাসনামলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা অঞ্চল বলতে আজ যে ভূ-খণ্ডকে বোঝায় তার সবটুকু জুড়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র আজ পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। এর সীমার মধ্যে নানা সময় বহু রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, যেমন গোষ্ঠী যুগে জনপদ রাষ্ট্র–বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, রাঢ় কিংবা সামন্তযুগে গৌড়, হরিকেল, ময়নামতি, এমন কি বিহার, উড়িষ্যাসহ গৌড় কেন্দ্রিক সাম্রাজ্য এবং বুর্জোয়ান ধনবাদী যুগে আধুনিক বাংলাদেশ। বাস্তবে বাংলা নামে এর পুরো সীমা নিয়ে একটি মাত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা আজও কল্পনার জগতেই রয়ে গেছে।[২]

প্রাথমিক অবস্থায় জন অথবা গোত্র কোন নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করেনি। যখন একটি এলাকায় জনসাধারণ একত্রিত হয়ে বসবাস করে তখন তা জনপদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[৩] জনপদ এর মূল অর্থ 'গোষ্টীর পদচারণভূমী' অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বা এর পরিধির মধ্যে কোন গোষ্ঠী বা কয়েকটি গোষ্ঠী বসবাস করে তাই জনপদ।[৪] একটি জনপদ নদী অথবা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা সাধারণত চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশের অভাবে একটি জনপদের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে।[৫]

ভারতবর্ষের জনপদ রাষ্ট্রের সাথে প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের তুলনা করা যেতে পারে। গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহ বেশীর ভাগই পাহাড় অথবা উপত্যকায় বিভিন্ন সীমায় অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষের জনপদ রাষ্ট্রের মত গ্রীক নগর রাষ্ট্রেরও প্রত্যেক রাজনৈতিক স্বাধীন একক সত্ত্বা ছিল। প্রাচীন ভারতের জনপদ সংখ্যা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। পৌরাণিক হিসাব মতে এর সংখ্যা ৭৫ হতে ২৪০ এর মত।[৬] অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষত প্রাচীনতর সাক্ষ্যে, জনপদগুলোর নাম যে ভাবে আমরা পাই তা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয়।[৭] বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় এইসব কোম যে সব অঞ্চলে বসবাস করত, পরে তাদের অর্থাৎ সেই সব অঞ্চলের নাম হল বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি।[৮] এসব জনপদের সীমানাও কোন স্থায়ী ব্যাপার ছিল না। কখনো তা বেড়েছে, আবার কখনো কমেছে।[৯]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

জন হতে বা জনকে কেন্দ্র করে গঠিত এক একটি জনপদে এক-এক সময়ে এক একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে এবং অনেক সময় তাদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের সংকোচন বা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য (৭ম শতকে) এবং পৌণ্ড্রভুক্তি।[১০] আধুনিক বগুড়া শহরের সাত মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থান এর বর্তমান নাম।[১১]

প্রাচীনতম ঐতিহাসিককাল হতে আরম্ভ করে আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র/বহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলো প্রত্যেকেই স্ব-স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ মিলনে একের সংগে অন্যের যোগাযোগের সম্বন্ধও দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র পরায়ণ।[১২] ৭ম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে যখন হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছিলেন এবং পরবর্তীকালে পাল আমলে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। তখন বিভিন্ন জনপদ পরস্পরের ভিতর যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিল তিনটি জনপদ পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ।[১৩]

বাংলাদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গদেশ। প্রাচীন বাংলাদেশ যেসব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তার দু'টি বিভাগ মাত্র। এই দু'টি বিভাগের নাম হতেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি।[১৪] আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরী গ্রন্থে মোঘল আমলের সুবা বাংলার সীমানা প্রসঙ্গে বলেন যে, সুবা বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম হতে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বত মালা হতে দক্ষিণে হুগলী জিলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, সুবা বাঙ্গালা পূর্বে ও উত্তরে পর্বত বেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্র বেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার অবস্থিত ছিল। কামরূপ এবং আসামও সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল।[১৫] রাষ্ট্র পরিধির বিস্তারেও সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে এক এক সময় এক এক জনপদের সীমানাও বিস্তৃত ও সংকুচিত হয়েছে, সব জনপদের সীমা সকল সময় এক থাকে না। আসল কথা প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্রীয় সীমা সর্বত্র সকল সময় এক হয় না। প্রাচীন বাংলায়ও তা হয়নি ।[১৬]

যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ জনপদগুলোর সীমা ও অবস্থিতি নির্ণয়ের সহায়ক শুধু তাদের উল্লেখ ও আলোচনাই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।[১৭] নিম্নে প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ণয়ে বিভিন্ন জনপদগুলোর প্রাসঙ্গিক বিবরণ তুলে ধরে প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ণয়ের একটি প্রচেষ্টা করা হল।

বঙ্গ : বঙ্গ পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ।[১৮] বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সর্বপ্রথম এই দেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[১৯] বোধায়নের 'ধর্মসূত্রে' বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এমন অনুমান করলে ভুল হয় না। আরঙ্গ, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ ও কলিঙ্গজনেরা একবারে বৈদিক সংস্কৃতি বর্হিভূত এবং তাদের দেশে যাতায়াত করলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, বোধায়ন এইরূপ নির্দেশ দিয়েছেন।[২০] আরট্র পাঞ্জাবে, পুণ্ড্র উত্তর বাংলায়, সৌবীর দক্ষিণ পাঞ্জাবে, বঙ্গ ছিল মধ্য ও পূর্ব বাংলায়, কলিঙ্গ উড়িষ্যার পাহাড় সংলগ্ন ছিল। তারা পাল এবং বৈদিক সংস্কৃতি বর্হিভূত ছিল।[২১] রামায়ণে ও অন্যান্য জনপদের সঙ্গে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[২২] অযোধ্যায় উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিদের সাথে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল।[২৩] মহাভারতের উল্লেখ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপি ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ এবং প্রত্যেকটি দেশই স্ব-স্বতন্ত্র; কিন্তু জৈন উপাঙ্গটির ইঙ্গিত হতে মনে হয়, কোন এক সময়ে তাম্রলিপ্তি বোধ হয় বঙ্গের অধিকারভুক্ত হয়ে থাকবে। বঙ্গের উল্লেখ গুন্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড (খ্রীষ্টিয় ৩য় শতকে) শিলালিপিতে, রাজা চন্দ্রের (চতুর্থ শতকে) মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি এবং বাতাপীর (বাদামী) চালুক্যরাজ পুলকেশীর মহাকুট স্তম্ভলিপিতেও (৭ম শতক) দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এদের একটিতেও বঙ্গের অবস্থিতি নির্দেশ পাওয়া যায় না।[২৪] মহাকাব্য এবং সাহিত্যে ৫ম খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২শ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গ নামে একটি জনপদ ছিল তা মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি হতে প্রমাণ করা যায়। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্র কোলার তিরুমালি রক লিপি হতে জানা যায় বাংলাদেশ নামে বঙ্গ ছিল। এর প্রকৃত সীমানা কোথায় ছিল তা প্রকৃত পক্ষেই নিরূপণ করা কঠিন। বঙ্গ সাধারণত বাংলার পূর্ব এবং দক্ষিণ অংশকে বুঝাত।[২৫] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "বঙ্গক", "পৌণ্ড্রক" ইত্যাদি নামের অত্যন্ত মিহি রেশমি কাপড়ের কথা রয়েছে। নাম দু'টি বঙ্গ এবং পুণ্ড্র থেকে এসেছে বলে বোঝা যায়।[২৬] বঙ্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের টীকাকার বলেছেন এ বঙ্গ লৌহিত্যের পূর্বদিকে। সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা এবং ফরিদপুর ও বাখেরগঞ্জ এর কিয়দংশ বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং এই সমস্ত ভূখণ্ডই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে।[২৭] উনিশ শতকে করোতোয়া থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী স্থানকে (যার ভিতর উল্লিখিত রঙ্গপুর সুনির্দিষ্ট ভাবেই পড়ে) বঙ্গ বলা হচ্ছে।[২৮] পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন ভূমির অন্তর্ভূক্ত বলে বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু গুপ্ত আমলে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রবর্ধন দুই পৃথক রাষ্ট্র বিভাগে ছিল।[২৯] জৈন এবং বৈদিক গ্রন্থমতে, বঙ্গ বলতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পূর্ব অংশকে বোঝানো হয়েছে।[৩০] পাল ও সেন আমলের তাম্রলিপি বঙ্গের সীমানা নির্ধারণের সহায়ক উপাদান। কমৌল তাম্রলিপিতে দক্ষিণবঙ্গ অনুত্তর বঙ্গ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।[৩১] সেন শাসনের শেষের দিকে লিপিমালায় বঙ্গের দু'টি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বরূপ সেনের মদপাড়া ও কেশব সেনের ইদিলপুর

তাম্রলিপিতে বিক্রমপুর ভাগকে বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৩২] প্রতিহার রাজ ভোজদেবের গওআলিয়র প্রশস্তিতে দ্বিতীয় নাগভট্ট কর্তৃক বঙ্গপতিকে (ধর্মপাল) পরাভূত করার কথা উল্লিখিত আছে (নবম শতকে)। মনে হয়, একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দু'টি বিভাগ কল্পিত হয়েছিল। একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল, আর একটি বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। অনুমান হয়, বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রশায়ী খাল নালা সমাকীর্ণ ও দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ। অথবা এমনও হতে পারে, অনুত্তর বঙ্গ কোন বিশিষ্ট স্থানের নাম নয়। দক্ষিণ ও পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণনাত্মক নাম মাত্র। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন রাজের আমলে বঙ্গের অন্তত দু'টি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর ভাগ, অপরটি নাব্যভাগ বা নাব্য মণ্ডল।[৩৩]

শামস্-ই-সিরাজ অফিফ এর তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর বর্ণনা মতে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন লিপিতে বঙ্গ এবং বাঙ্গালাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একাদশ শতকে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে বাঙালা সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল।[৩৪] একাদশ শতক হতে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নতুন একটি নাম পাওয়া যায় বঙ্গাল। অবলুর লিপি এবং আরও অন্তত দু'টি দক্ষিণী লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দু'টি জনপদই একই সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এ অনুমান স্বাভাবিক যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে দুই পৃথক জনপদ ছিল। পরেও এদের পৃথকভাবেই গণ্য করা হত।[৩৫] পাল যুগে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা একটি দেশ ছিল। পরবর্তী সময়ে তা বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়। হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এর সময়ে এটা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। বাংলায় সকল জনপদগুলোকে একত্রিত করে মুসলিম আমলে এর নামকরণ করা হয় বাংলা এবং তা বহুল প্রচার করা হয়।[৩৬] ১৩৩৮ সালের পরবর্তী ১৪ বৎসরের মধ্যে হাজী ইলিয়াস সমগ্র দেশটিকে তার শাসনাধীন আনয়ন করেন এবং লখনৌতি থেকে বিশ মাইল উত্তর পূর্ব দিকস্থ প্রাচীন হিন্দুনগর পাণ্ডুয়াকে মুসলিম বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেন।[৩৭] ৭৪৪ হিজরী থেকে ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশালে তৈরি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া গেছে। কারও কারও মতে তাঁর কতকগুলো পাণ্ডুয়ায় তৈরি, মুদ্রার তারিখ ৭৪৩ হিজরী, কিন্তু এ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। যা হোক ৭৪৩ হিজরী যে ইলিয়াস পাণ্ডুয়া তথা উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৩৮] সুলতান ফিরোজ শাহ ৭৫৪ হিজরীতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে লখনৌতি অভিযান পরিচালনা করেন। দ্রুত অগ্রসর হয়ে তিনি পাণ্ডুয়া শহরের নিকটবর্তী হন। সেই সময় পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী ছিল।[৩৯] ইলিয়াস শাহ সর্বদা ফিরোজ শাহের ভয়ে ভীত থাকতেন এবং সেইজন্য ৭৫৭ হিজরীতে (১৩৫৬ খ্রিঃ) সন্ধির প্রস্তাব করে পুনরায় দূত প্রেরণ করেছিলেন। এই সময়ে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল এবং দিল্লী সাম্রাজ্য ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল।[৪০] মুদ্রার সাক্ষ্য প্রমাণে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইলিয়াস শাহ্ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময়ে সোনারগাঁও দখল করেন। ইলিয়াস শাহ ইতোপূর্বে লখনৌতি ও সাতগাঁও দখল করেছিলেন, সোনারগাঁও দখল করার ফলে তিনি সারা বাংলাদেশের অধিশ্বর হলেন।[৪১] ইলিয়াস শাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং চিল্কাহ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। পাণ্ডুয়ায় প্রাপ্ত ফার্সি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বুকানন বলেন যে, ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহের বিহারস্থ গভর্নর মালিক ইব্রাহীম বায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ইলিয়াস শাহের রাজ্য বিভাগের নীতি তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। ইলিয়াস শাহ বিহার থেকে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চম্পারণ, গোরখপুর ও কালী জয় করে বিরাট এলাকা তার রাজ্যভূক্ত করেন।[৪২] শুধুমাত্র বঙ্গের বিবরণ দিলে বাংলা অঞ্চলের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই প্রাচীন বঙ্গ অঞ্চলের যে সকল জনপদসমূহ ছিল সেগুলো সম্পর্কে অন্তত সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। নিম্নে বঙ্গ ব্যতীত প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

সমতট: দক্ষিণপূর্ব বাংলার আর একটি জনপদ হ'ল সমতট।[৪৩] হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুসারে সমতট অঞ্চল ছিল সমুদ্রতীরে এবং তা কামরূপ (আসাম) থেকে দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কুমিল্লা থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে ত্রিপুরা জেলার বাধকামতা অঞ্চল রূপে নির্দেশ করা হয়েছে।[৪৪] সমতট (দক্ষিণ অথবা পূর্ববঙ্গ), ডবাক (সম্ভবত : ঢাকা) কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর (বর্তমান কুমায়ূন ও গঢ়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যের নরপতিগণ এবং মালব, আর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনকানীক, ঢাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতিসমূহ সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করত। সমতট যদি বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয় তা হলে পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৪৫] সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ শতক) ডবাক, নেপাল, কর্তৃপুর কামরূপের সঙ্গে এবং বরাহমিহির (৬ষ্ঠ শতক) বৃহৎ সংহিতায় পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্ত-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে, সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।[৪৬] যদি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের নায়ক সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বলে মনে করা হয় তাহলে সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গ এলাকা জয় করেছিলেন বলে ধরতে হবে। এবং পূর্ব সীমান্তবর্তী সমতট বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত বলেই নির্দেশ করতে হয়। সপ্তম শতাব্দীতে 'সমতটে' এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চুয়াং; তাঁর মতে কামরূপ থেকে দক্ষিণ দিকে ১২০০/১৩০০ লি দূরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত নীচু ও আদ্র অঞ্চলে সমতটের কেন্দ্র, শহরের পরিধি ছিল ২০ লি। তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি

কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেই এসেছিলেন। এই অঞ্চলে ইদানিং প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও আবিষ্কার এই বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বিস্তারিত চিত্র আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছে।[৪৭]

পুণ্ড্র অথবা পুণ্ড্রবর্ধন অথবা বরেন্দ্রী: পুণ্ড্রজনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, এবং তারপরে বোধায়ণ – ধর্মসূত্রে। দ্বিতীয় গ্রন্থমতে এটা বঙ্গ এবং কলিঙ্গজনদের প্রতিবেশী।[৪৮] সেকালে ঐ অঞ্চলে প্রচুর পুণ্ড্র বা আখ জন্মাত বলে রাজ্যটির নাম হয়ে যায় পুণ্ড্রবর্ধন। মহাভারত ও রামায়ণের মত প্রাচীন মহাকাব্যেও পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৪০০ অব্দ অথবা মতান্তরে খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দে সংঘটিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পুণ্ড্ররাজ্যের অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯] গুপ্তযুগের লিপি এবং চীনা পরিব্রাজকরা একমত পোষণ করেন যে, পুণ্ড্র অঞ্চলের সীমানায় পুণ্ড্রবর্ধন এবং যা উত্তর বাংলায় অবস্থিত।[৫০] ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে। য়ুয়ান-চোঙের বিবরণে এই পুণ্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যায়।[৫১] বর্তমানে পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার কিছু অংশ ও বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনার কিছু অঞ্চল বরেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৫২] বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী মণ্ডল ছিল পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের একটি মেট্রোপলিটন জেলা।[৫৩] কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীকে পালরাজাদের জনকভু অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে ইঙ্গিত করেছেন এবং গঙ্গা করতোয়ার মধ্যে এর অবস্থিতি নির্দেশ করেছেন।[৫৪]

সুহ্ম ও রাঢ়: বঙ্গ অঞ্চলের মত রাঢ় অঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়।[৫৫] রাঢ় জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গা সূত্রে। জৈন প্রজ্ঞাপনন গ্রন্থে রাঢ় ও বঙ্গজনদের একত্র গ্রন্থিত করে উভয়কেই আর্য বলা হয়েছে। কোড়ীবর্ষ (বা পরবর্তীকালে কোটিবর্ষ) ছিল তাদের রাজধানী। কোটিবর্ষ দিনাজপুর জেলায় এবং দামোদর পট্রোলীর (৫ম–৬ষ্ঠ শতক) মতে, কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির অন্তর্গত ছিল।[৫৬] ৬ষ্ঠ শতকের সিকি শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ় উপমহাদেশে একটি পৃথক দেশ ছিল এবং তাম্রলিপি অনুসারে তা রাজা সিংহা কর্তৃক শাসিত হত। রাঢ় অঞ্চলকে অঙ্গ, কলিঙ্গ এবং বিহারের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক হাজার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষা এদের সাথে মিল ছিল।[৫৭] খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে বঙ্গ ও পুণ্ড্রের সাথে 'সুহ্ম' এর উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্যে ও পুরাণসমূহে প্রাচ্যদেশে সুহ্ম এর নাম পাওয়া যায়। সুহ্মের অবস্থিতি সম্পর্কে এই ধারণা করা সম্ভব যে, সুহ্ম সমুদ্রোপকূল ও তাম্রলিপ্তির নিকটবর্তী ছিল। দন্তীর 'দশকুমার চরিতে' দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মের সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকেন্দ্র বলে উল্লিখিত হয়েছে। বৃহৎ সংহিতায় সুহ্মদেশের অবস্থিতি বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৮]

গৌড়: পাণিনির সূত্রে গৌড়পুর নামক একটি স্থানের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৯] গৌড় নামটি সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত হলেও এর অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কষ্টসাধ্য। বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের যুগে যুগে পরিমণ্ডল সম্প্রসারণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গৌড়।[৬০] মালদহ জেলাস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলার সুপ্রাচীন রাজধানী গৌড় গঙ্গার একটি পরিত্যক্ত খাতের উপর অবস্থিত (২৪°৫৩′ উত্তর অক্ষাংশ, ৮৮°১৪′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)। গৌড়ের অবস্থান হচ্ছে পুরনো গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর সাবেক সংগমস্থলের নিকটে একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডের উপর।[৬১] কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপে উৎপন্ন অনেক শিল্প ও কৃষি দ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায়। পুরাণে গৌড় দেশের উল্লেখ রয়েছে।[৬২] গৌড় জনপদ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে এর অবস্থিতি ছিল পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে। মালদা–মুর্শিদাবাদ, বীরভূম–বর্ধমান অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই এর আদি পরিচিতি। কোন সময় হয়তো দক্ষিণ দিকে সমুদ্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটেছিল।[৬৩] ১৮০৮ সালে ড. বুকানন হ্যামিলটন শহরটির আয়তন ২০ বর্গমাইল ছিল বলে বর্ণনা করেছেন।[৬৪] কিন্তু এই সব উল্লেখ ও বিবরণের মধ্যে গৌড় জনপদের সঠিক অবস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলে শুধু এটুকু অনুমান করা যায়, মুর্শিদাবাদ–বীরভূমই এই জনপদের আদি কেন্দ্র; পরে মালদহ এবং সম্ভবত বর্ধমানও এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৬৫] উপরিউক্ত আলোচনায় প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর সীমানা নির্ণয়ের একটা চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। প্রামাণ্য দলিলের অভাবে উক্ত জনপদসমুহের সঠিক অবস্থিতি নির্ণয় করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার সীমানা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বাংলার নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা না করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই বাংলার নামকরণ সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। যা থেকে বুঝা যাবে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো কীভাবে আস্তে আস্তে জনপদ থেকে বাংলা এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ নামক একটি ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে।

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হতে আরম্ভ করে আনুমানিক খ্রিষ্টিয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলাদেশ, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। এই জনপদগুলো প্রত্যেকেই স্ব-স্বতন্ত্র এবং পৃথক।[৬৬] বাংলার প্রাচীনতম নাম বঙ্গ অথবা বঙ্গালা। বঙ্গ বা বঙ্গাল বলতে কেবল পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলাকেই বোঝাত। বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অন্য নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গকে বলা হত

পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, লক্ষণাবতী এবং গৌড়। আর পশ্চিম বাংলার নাম ছিল রাঢ়।[৬৭] বরেন্দ্রে অবস্থিত গৌড় শহরের মর্যাদা অত্যন্ত বেশি ছিল। হিন্দু আমলে যেমন কনৌজ এবং মুসলমান আমলে যেমন দিল্লী সাম্রাজ্যিক রাজধানী (Imperial Capital) রূপে পরিগণিত ছিল, গৌড়ও তেমনি বাংলাদেশের সাম্রাজ্যিক রাজধানী রূপে গণ্য হতো। হিন্দু আমলে বাংলা অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ সব স্বাধীন রাজ্যের রাজারা সুযোগ পেলেই গৌড় অধিকার করার চেষ্টা করত এবং গৌড় অধিকার করে গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করত। অথচ মুসলমান সুলতানেরা তাদের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে গৌড়ের নাম উৎকীর্ণ করেননি। তাঁরা লখনৌতি নামকেই সব সময় প্রাধান্য দিতেন।[৬৮] সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়ুজ গৌড়দেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সময়ে গৌড়ীয় মুসলমান অধিকারের দু'টি অংশ ছিল। গঙ্গার পশ্চিম দিকের অংশ রাঢ় ও পূর্ব দিকের অংশ বরিন্দ্র বা বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।[৬৯] সুবে বাংলা দ্বিতীয় ইকলিমে অবস্থিত।[৭০] ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস লেখার সময় বাঙ্গালা নামের উল্লেখ করেননি। তিনি বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গ নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। মিনহাজের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব ছিল বলা যায় না। বরং বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গের উল্লেখ করায় তার ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মিনহাজের বিবরণীতে অনেক স্থানে লখনৌতি এবং বঙ্গকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি প্রত্যেক বারেই বঙ্গ দ্বারা পূর্ব বাংলাকে নির্দেশ করেছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিনহাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়া উদ-দীন বরণী সর্বপ্রথম বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি বাংলাকে ইকলিম রূপে উল্লেখ করেছেন।[৭১] ইংরেজ শাসনামলে 'বেঙ্গল'(Bengal) যা ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রযুক্ত ছিল। ইংরেজদের 'বেঙ্গল' অন্যান্য ইউরোপীয়-দের 'বেঙ্গালা' থেকে নেওয়া হয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ইউরোপীয়দের লেখনীতে 'বেঙ্গালা' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১) 'বেঙ্গালা' রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত চাটিগানের ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত 'সোন্দিব' দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। দুজারিক (১৫৯৯) প্রায় ২০০ লী উপকূল বিশিষ্ট 'বেঙ্গালা' দেশের উল্লেখ করেছেন। স্যামুয়েল পর্চাস (১৬২৬) এর বর্ণনায়ও 'বেঙ্গালা' রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। "র‍্যালফ ফিচ (১৫৮৫-৮৬) 'বেঙ্গালা' দেশে 'চাটিগান' সাতগাম (সপ্তগ্রাম), হুগোলী (হুগলী) এবং তাণ্ডা (রাজমহলের নিকটবর্তী) শহরের উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাঙ্গালা শহরের উল্লেখ করেননি। রেনেলে এই শহরের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর অবস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। গ্যাস্টালদির মানচিত্রে (১৫৬১) চাটিগামের পশ্চিমে 'বেঙ্গালার' অবস্থিতি দেখানো হয়েছে। পর্তুগীজ-ভার্থেমা, বার্বোসা (১৫১৪) বা জাও দ্য ব্যারোসের (১৫৫০) বর্ণনায় 'বেঙ্গালা' রাজ্য ও 'বেঙ্গালা' শহরের কথা উল্লেখ রয়েছে। 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও 'বেঙ্গালা' রাজ্য যে 'বাংলা'দেশ অঞ্চলকে বোঝাত সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই।[৭২] ভারথেমা ও বারবোসা ও পিরেসের পর আর কেহ 'বাঙ্গালা' শহরের উল্লেখ না করায় মনে করা হয় যে, 'বাঙ্গালা' নামে কোন শহর ছিল না, বরং তারা (ভারথেমা ও বারবোসা) বাংলাদেশের কোন একটি শহরকে "সিটি অব বাঙ্গালা" বা বাংলাদেশের শহর নামে উল্লেখ করেছেন। বারবোসার উক্তিতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 'বাঙ্গালা' শহর সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। সমসাময়িক মানচিত্র আলোচনা করলে ভারথেমা ও বারবোসা বর্ণিত বাংলাকে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়। কিন্তু চট্টগ্রামকে বাঙ্গালা বলার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই নির্ভরযোগ্য উপকরণের অভাবে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ভারথেমা ও বারবোসা বর্ণিত 'বাঙ্গালা' সমুদ্র বা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[৭৩] মধ্যযুগের বাংলা-বাঙ্গালা-Bengala একই নাম। Marco polo এই দেশের নাম বলেছেন Bengala, যদিও তার অবস্থিতি নির্দেশ স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। যাহাই হউক, বাঙ্গালা-Bengala-Bangala-বাঙালা নাম বর্তমান বঙ্গদেশের মোটামুটি প্রায় সমস্তটারই, কোনও কোনও দিকে বর্তমান সীমা অতিক্রমও করেছে। মধ্যযুগীয় সাক্ষ্যে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় বঙ্গ বা বাঙ্গাল বলতে যে ভূ-খণ্ড বোঝাতো বর্তমান বঙ্গ বা বাংলাদেশের সমার্থক নয়, তার একটি অংশমাত্র। বঙ্গ ও বঙ্গাল এই দু'টি বিভাগের নাম হতেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙলাদেশ নামটির উৎপত্তি।[৭৪] বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে আবুল ফজলের ব্যাখ্যায়। আল শুধু শস্য ক্ষেত্রের আল-ই নয়, আল ছোট বড় বাঁধও বটে।[৭৫] আবুল ফজল 'বাঙ্গালাহ' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন; 'বাঙ্গালাহ'র আদিনাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড আল নির্মাণ করতেন, এই থেকেই 'বাঙ্গাল' এবং বাঙ্গালাহ নামের উৎপত্তি।[৭৬] 'তবকত-ই-নাসিরীতে' সর্বদা 'বঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে 'বাঙ্গালা' অথবা 'বেঙ্গল' নাম ব্যবহৃত হয়েছে।[৭৭] গোলাম হোসায়ন সলীম, তাঁর 'রিয়াজ-উল-সালাতিন' গ্রন্থে বঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থমতে, হযরত নূহ পয়গম্বরের আমলে এক অভাবনীয় বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হওয়ায় হজরত নূহ ও তাঁর যে কয়জন সঙ্গী ও পশুপক্ষী তাঁর বৃহৎ নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না। হযরত নূহ পয়গম্বরের পুত্র হাম; হামের পুত্র হিন্দ; হিন্দের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'বঙ্গ'। 'বঙ্গ' এর সন্তানেরা এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করায় এই দেশের নাম হয়েছে 'বঙ্গ'।[৭৮]

'বাঙ্গালা'হ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আবুল ফজলের এই ব্যাখ্যা ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করে নেন নি। তিনি মনে করেন এই অনুমান সত্য নহে। খ্রিষ্টিয় ৮ম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরও প্রাচীন কাল হতেই 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' দু'টি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এই দু'টি দেশের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশের নামের সাথে 'আল' যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হয়েছে, এটি স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা এই নামকরণ হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন বঙ্গালদেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন, তবে এক কালে দক্ষিণ ও পুর্ববঙ্গের তটভূমি যে এর অন্তর্ভূক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান কালে বাংলাদেশের অধিবাসীগণকে যে বাঙ্গাল নামে অভিহিত করা হয় তা সেই প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করে আসছে।[৭৯]

তবে কি করে এবং কখন থেকে 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন হয়েছে এবং এই নামেই সারা দেশকে বোঝানো হত তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আকবরের রাজত্বকালে এই অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়েছে এবং তার প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। আকবর পরবর্তী যুগে তাই বিদেশীরা এই নামই ব্যবহার করবে, এটাই স্বাভাবিক। 'বাঙ্গালাহ'ই তাদের ভাষায় হয়েছে 'বেঙ্গলা বা বেঙ্গল'। আকবর পূর্ব যুগেও বেঙ্গালার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কোপোলোর লেখনীতে। সুতরাং 'বেঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' নাম মুঘল যুগ থেকেই এর বহুল প্রচার এবং ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই এই নাম রূপ নিয়েছে 'বেঙ্গালা'; 'বেঙ্গলা' বা 'বেঙ্গল' এ।[৮০] ড. আব্দুল করিমের মতে ইলিয়াস শাহের পূর্বে বাংলায় কোন মুসলমান সুলতান সারা বাংলাদেশের অধীশ্বর ছিলেন না, তারা হয় লখনৌতি বা সাতগাঁও বা সোনারগাঁও এর সুলতান ছিলেন। ইতোপূর্বে বাংলার মুসলমান সুলতানেরা কোন এক অংশের সুলতান ছিলেন। কিন্তু ইলিয়াস শাহই সর্বপ্রথম বাংলার সুলতানে পরিণত হলো। এই জন্যই ঐতিহাসিক আফীফ ইলিয়াস শাহ কে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুতরাং ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সোনারগাও অধিকার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[৮১] ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসন কেন্দ্রেই (লখনৌতি, সাতগাও এবং সোনারগাঁও) নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানীর প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এই স্বাধীনতা প্রায় দুশো বছর ধরে অক্ষুণ্ন ছিল। তাই ইলিয়াস শাহ মুসলমান সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা'।[৮২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলার সীমানার বিভিন্ন অংশে ভিন ভিন্ন কোম বা গোষ্ঠীর উদ্ভব ও জনপদ গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন কোম বা গোষ্ঠীর দ্বারাই জনপদ বা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। কালক্রমে প্রাচীন বাংলার সীমানা বিবর্তিত হয়ে তা বর্তমান বাংলার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তথ্যসূচি:

---

১ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ*, (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ১৯৮৬), পৃ. ০৯; মো.মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১।

২ সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, নতুন দৃষ্টিকোণে একটি সমীক্ষা, হলমার্ক প্রিন্টার্স, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ১৮৪

৩ A.K.M. Yaqub Ali, æVang: from Janapada to Country", *Journal of the Varedra Research Muesum,* Vol. 05, Rajshahi, ১৯৭৬, চ. ১০১.

৪ সৈয়দ আমিরুল ইসলাম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৫ অ.ক.গ. ণধয়ঁন অষর, *ড়ঢ়. পরঃ.*, চ. ১০১.

৬ *ওনরফ.*

৭ Abdul Momin Chowdhury, æGeogrpahy of Ancient Bangal: An Aproach to its Study", *Bangladesh Historical Studies,* Vol. II, ১৯৭৭, চ. ৩৯.

৮ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০৮।

৯ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি*, (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৬১।

১০ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

১১ এম. আবিদ আলী খান, *গৌড় পাণ্ডুয়ার স্মৃতি কথা* (অনুবাদক: অধ্যাপক কাজী মোঃ শহীদুল হক এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূইয়া), (ঢাকা : ইসলামী ফাউণ্ডেশন; ১৯৮৭), পৃ. ৬, ফুটনোট –০১।

১২ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

১৩ অজয় রায়, *বাঙালা ও বাঙালী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৫৭–৫৮।

১৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৫ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ০১; উদ্বৃত; আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ভল্যুম,২, জেরেট কর্তৃক অনুদিত, পৃ. ১১৬; ড. আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড)*, (ফজলে বাকী অনুদিত), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১; গোলাম হোসাইন সেলিম, *বাংলার ইতিহাস*, (আকবর উদ্দিন অনুদিত), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৮।

১৬ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

১৭ *Ibid.*

১৮ A.K.M. Yakub Ali, *op. cit.*, P. ১০২.

[১৯] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।
[২০] *ওনরফ.*
[২১] R.C.Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol. 1, (Dacca: University of Dacca, 1963), P. ৮.
[২২] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১১০।
[২৩] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ০৪.
[২৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।
[২৫] A.K.M. Yakub Ali, *op. cit.*, P. ১০৩.
[২৬] *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, ঠড়ষ. ১, (কলিকাতা: ১৯৬৪), পৃ. ১১৭–১১৮।
[২৭] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১–১১২।
[২৮] সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।
[২৯] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।
[৩০] Kamruddin Ahmed, *A Social political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, (Dacca: Inside Library, 1975), P. VI.
[৩১] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *গৌড় লেখমালা,প্রথম স্তবক*, (কলিকাতা: শ্রী মুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, ১৩১৯ বাংলা), পৃ. ১৪০;
[৩২] N. G. Majumdar, *Inscription of Bengal, Vol. III*, (Rajshahi :Varendra Research Society, 1929), P. ১৩২.
[৩৩] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।
[৩৪] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ১৯.
[৩৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।
[৩৬] A.K.M. Yakub Ali, *op. cit.*, P. ১০৯.
[৩৭] এম.আবিদ আলী খান মালদহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৪।
[৩৮] সুখোময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানী আমল ১৩৩৮-১৫৩৮* (কলিকাতা: ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৮৮), পৃ. ২১।
[৩৯] গোলাম হোসাইন সেলিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।
[৪০] রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৪), পৃ. ৯৫, পরবর্তীতে এই গ্রন্থের নাম বাঙালার ইতিহাস ২য় খণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
[৪১] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।
[৪২] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।
[৪৩] ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: হেরা প্রিন্টার্স, ২০০২), পৃ. ৩০; পরবর্তীতে এই উৎস প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
[৪৪] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ১৭.
[৪৫] রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙালার ইতিহাস, (১ম খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৪), পৃ. ৪৬–৪৭, ফুটনোট–৭।
[৪৬] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ১৭.
[৪৭] ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*, (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২২; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।
[৪৮] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।
[৪৯] খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।
[৫০] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ২০.
[৫১] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫–১১৬।
[৫২] L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Rajshahi*, (Calcutta: Bengal Sectretariat Book Depot, ১৯১৬), P. ২ঃঃ.
[৫৩] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ২০.
[৫৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।
[৫৫] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ২০.
[৫৬] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬–১১৭।
[৫৭] Kamruddin Ahmed, *op. cit.*, P. x.
[৫৮] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।
[৫৯] R.C.Majumdar, *op. cit.*, P. ২৭.
[৬০] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।
[৬১] এম আবিদ আলী খান মালদহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।
[৬২] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।
[৬৩] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।
[৬৪] এম আবিদ আলী খান মালদহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।
[৬৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।
[৬৬] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।
[৬৭] ড. আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭)* ১ম খণ্ড, (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী অনুদিত) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ৯।
[৬৮] ড. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০২।
[৬৯] রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।
[৭০] গোলাম হোসাইন সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৮।
[৭১] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০১।
[৭২] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৩; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।
[৭৩] ড.আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।
[৭৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।
[৭৫] *ঐ*।
[৭৬] ড.আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৪; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।
[৭৭] গোলাম হোসায়ন সলীম, *প্রাগুক্ত*, ফুটনোট ৪৩, পৃ. ৩৩৫।
[৭৮] গোলাম হোসায়ন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬–১৭, অনুবাদকের ভূমিকায় পৃ. ৬।

[৭৯] ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, (কলিকাতা: জেনারেল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ০২; পরবর্তীতে গ্রন্থটির নাম সংক্ষেপে বাংলাদেশের ইতিহাস বলা হবে।

[৮০] ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৫; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

[৮১] ড. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫–১৫৬।

[৮২] ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৬; ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ও তাঁর ট্র্যাজেডি

আব্দুস সামাদ আজাদ*

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (ব্যাপ্টিজম ২৬ এপ্রিল, ১৫৬৪; মৃত্যু ২৩ এপ্রিল, ১৬১৬) ছিলেন একজন ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। তাঁকে ইংরেজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিশ্বের একজন অগ্রণী নাট্যকার মনে করা হয়। তাঁকে ইংল্যান্ডের "জাতীয় কবি" এবং "অ্যাভনের চারণ কবি" (Bird of Avon) নামেও অভিহিত করা হয়। তাঁর যে রচনাগুলি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ৩৮টি নাটক, ১৫৪টি সনেট, দুটি দীর্ঘ আখ্যান কবিতা এবং কয়েকটি কবিতা। তাঁর নাটক প্রায় প্রতিটি প্রধান জীবিত ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং অন্য যে কোন নাট্যকারের তুলনায় অধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে।

তাঁর সমকালে শেক্সপিয়ার ছিলেন একজন সম্মানিত কবি ও নাট্যকার। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর খ্যাতি হ্রাস পেয়েছিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে তিনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। রোমান্টিক (Romantic)[১] যুগের সাহিত্যিকরা তাঁর রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন। ভিকটোরিয়ান (Victorian)[২] যুগে তিনি রীতিমত পূজনীয় হয়ে ওঠেন, জর্জ বার্নার্ড শ'[৩]র ভাষায় তা ছিল চারণ পূজা (bardolatry)। বিংশ শতাব্দিতেও গবেষণা ও নাট্য উপস্থাপনার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রচনাকে পুনরাবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। আজও তাঁর নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুচর্চিত। সারা বিশ্বের নানা স্থানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নানা আঙ্গিকে এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ ও ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পিতা জন শেক্সপিয়ার ছিলেন একজন সফল গ্লোভার[৪] ও অল্ড্যারম্যান[৫]। শেক্সপিয়ারের মা মেরি ছিলেন একজন ভূমি সম্পদের অধিকারী ধনী কৃষক পরিবারের সন্তান। শেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে। ১৫৬৪ সালের ২৬ এপ্রিল তাঁর ব্যাপ্টিজম সম্পন্ন হয়। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে ২৩ এপ্রিল, অর্থাৎ সেন্ট জর্জেস ডে-এর দিন তাঁর জন্মদিন পালন করার প্রথা রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক গবেষক ভুল করে এই তারিখটিকে শেক্সপিয়ারের জন্মদিন বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরে জীবনীকারদের কাছে তারিখটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। কারণ, তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল। তিনি তাঁর পিতামাতার আট সন্তানের মধ্যে তৃতীয় এবং জীবিত সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ।

সে যুগের কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অধিকাংশ জীবনীকার মোটামুটি একমত যে শেক্সপিয়ার স্ট্র্যাটফোর্ডের কিংস নিউ স্কুল নামক গ্রামার স্কুলে[৬] পড়াশোনা করেন। ১৫৫৩ সালে সনদ প্রাপ্ত এই স্কুলটি শেক্সপিয়ারের বাড়ি থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়ে গ্রামার স্কুলগুলির মান সর্বত্র সমান ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। তবে স্কুলগুলির পাঠ্যক্রম সারা ইংল্যান্ডেই আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা ছিল। এই কারণে মনে করা হয়, শেক্সপিয়ার স্কুলে ল্যাটিন ব্যাকরণ এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের বিস্তারিত পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮ বছর বয়সে শেক্সপিয়ার ২৬ বছর বয়সী অ্যানি হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন। ১৫৮২ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে তাঁর বিয়ের লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল। শেক্সপিয়ার দম্পতির প্রথম সন্তান সুজানার ব্যাপ্টিজম হয় ১৫৮৩ সালের ২৬ মে। এর প্রায় দুই বছর পর হ্যামনেট নামে এক পুত্র ও জুডিথ নামে এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরা ছিল যমজ। ১৫৮৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ছিল তাদের ব্যাপ্টিজমের তারিখ। হ্যামনেটের মৃত্যু হয়েছিল মাত্র এগারো বছর বয়সে।

যমজ সন্তানের জন্মের পর শেক্সপিয়ারের জীবনের পরবর্তী ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫৯২ সালে লন্ডনের একটি মঞ্চদৃশ্যের বর্ণনায়। ১৫৮২ থেকে ১৫৯২ সাল পর্যন্ত বছরগুলোকে বিশেষজ্ঞগণ তাই শেক্সপিয়ারের জীবনের "হারানো বছর" বলে উল্লেখ করেন। জীবনীকারগণ নানা অপ্রামাণিক গল্পের ভিত্তিতে এই পর্বের এক একটি বিবরণ প্রস্তুত করেছেন। শেক্সপিয়ারের প্রথম জীবনীকার তথা নাট্যকার নিকোলাস রো স্ট্র্যাটফোর্ডের একটি কিংবদন্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, হরিণ রান্না করার অপরাধে বিচারের হাত থেকে বাঁচতে লন্ডনে গা ঢাকা দিয়েছিলেন শেক্সপিয়ার। আষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত আর একটি গল্প হলো, শেক্সপিয়ার লন্ডনের থিয়েটার পৃষ্ঠপোষকদের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নাট্যশালায় কাজ করতে শুরু করেন। জন অরে লিখেছেন শেক্সপিয়ার গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করতেন। বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন গবেষকের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

মতে ল্যাঙ্কাশায়ারের আলেকজান্ডার হঘটন নামে এক ক্যাথলিক ভূস্বামী তাঁকে স্কুল শিক্ষক রূপে নিয়োগ করেছিলেন। এই ব্যক্তি তাঁর উইলে "উইলিয়াম শেকশ্যাফট" নামে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছিলেন। তবে এইসব গল্পের সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসব গল্পই তাঁর মৃত্যুর পর প্রচলিত হয়েছিল। অন্যদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে শেকশ্যাফট একটি সাধারণ নাম।

শেক্সপিয়ারের পরিচিত নাটকগুলোর অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয় ১৫৮৯ থেকে ১৬১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলো ছিল মূলত মিলনাত্মক ও ঐতিহাসিক নাটক। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর দক্ষতায় এই দুটি ধারা শিল্পসৌকর্য ও আভিজাত্যের মধ্য গগনে উঠেছিল। এরপর ১৬০৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানত কয়েকটি ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটক রচনা করেন। এই ধারায় রচিত তাঁর *হ্যামলেট*, *কিং লিয়ার*, *ম্যাকবেথ* ও *ওথেলো* ইংরেজি ভাষায় রচিত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি ট্র্যাজিকমেডি[৭] রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ট্র্যাজেডি এমন একটি ধারণা যা সহজে সংজ্ঞায়িত করা দুষ্কর। আধুনিক সমালোচকগণ এ বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করেছেন। তবে এরিস্টটল *Poetics*[৮]-এ ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তাঁর মতে-

Tragedy is a representation of an action which is serious, complete in itself, and of a certain magnitude; it is expressed in speech made beautiful in different ways in different parts of the play; it is acted, not narrated and by exciting pity and fear gives a healthy relief to such emotions.

এ সি ব্র্যাডলি[৯] শেকসপিয়ারের ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে অন্যতম প্রধান প্রতিনিধিত্বশীল সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, শেকসপিয়ারের ট্র্যাজেডি হলোঃ æA tale of suffering and calamity conducing to death". অর্থাৎ, যন্ত্রণা ও দুর্দশার কাহিনী যার পরিণতি মৃত্যু। এটি লক্ষণীয় যে, শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। কোন একটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য অন্যটির সাথে সম্পূর্ণ মেলেনা।

শেক্সপিয়ার বেশ কয়েকটি ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে *ম্যাকবেথ*, *ওথেলো*, *কিং লিয়ার* এবং *হ্যামলেট* প্রসিদ্ধ। তাঁর ট্র্যাজেডিকে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। প্রখ্যাত শেক্সপিয়ার সমালোচক এ সি ব্র্যাডলি লক্ষ করেছেন শেক্সপিয়ারের "ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ধারনা" ("a sense for tragedy") দিয়ে লিখেছেন, ট্র্যাজেডির দর্শন ("philosophy") দিয়ে লিখেননি। ড. স্যামুয়েল জনসনের[১০] মতে শেক্সপিয়ার ছিলেন "মানব প্রকৃতির কবি"। তাঁর প্রায় সবগুলো ট্র্যাজেডিতে কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা সনাক্ত করা সম্ভব।

শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির কাহিনী একটি অনন্য চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এই চরিত্রের বিশালতার কাছে অন্যান্য চরিত্র ম্রিয়মান। এটি স্মর্তব্য যে, শেক্সপিয়ারের নাটক আমাদের সামনে বহু সংখ্যক চরিত্র উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রগুলির সংখ্যা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির চরিত্রের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি। কিন্তু মঞ্চে প্রধানত আলোক সম্পাত ঘটে নায়কের উপরেই। অন্যান্য চরিত্রের জীবনের উত্থান পতন থাকলেও তাদের জীবন থেকে যায় পটভূমিতেই। শেক্সপিয়ারের কোন ট্র্যাজেডিতেই দুটির বেশি চরিত্র অধিক গুরুত্ব পায়নি। নিয়তি, দেব-দেবী, অতিস্বাভাবিক শক্তি কোন কিছুই মানুষের চেয়ে বড় হয়ে ওঠেনি। তাঁর চরিত্রগুলো অনেক বেশি মানবীয়।

শেক্সপিয়ার এরিস্টোটলের *Poetics* সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন কিনা তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু *Poetics*-এ উল্লিখিত ট্র্যাজিক হিরোর মত শেক্সপিয়ারের নায়ক ভালো চরিত্র, কিন্তু সে নির্দোষ নয়। অথবা সে শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক মারলোর[১১] নায়কের মত অতিমানব নয়। আবার সে খল চরিত্রও নয়। তাঁর নায়ক মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তবে নায়ক চরিত্রে মন্দ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ভালো বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে বেশি। নায়ক এমন একটি ভুল করে, এরিস্টোটল যেটিকে বলেছেন *hamartia*[১২], যা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং যা তার করুণ পরিণতির ভিত্তি রচনা করে। তার চরিত্রের ভালো বৈশিষ্ট্য তার কোন কাজে আসে না বরং সামান্য ভুলের পরিণতিতে তার চরম ভোগান্তি এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। ব্র্যাডলির মতে লিয়ারের করুণ পরিণতির কারণ তার বার্ধক্য এবং দূরদৃষ্টিহীনতা, ওথেলোর ঈর্ষাপরায়ণতা, হ্যামলেটের সিদ্ধান্তহীনতা এবং ম্যাকবেথের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। যদি হ্যামলেটের যায়গায় ম্যাকবেথ অথবা ম্যাকবেথের জায়গায় হ্যামলেট থাকতো, তাহলে হয়তো তাদের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হতো। সংক্ষেপে, "চরিত্রই ভাগ্য বিধাতা" অর্থাৎ "character is destiny" প্রবচনটি শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে সত্য।

কিন্তু সেই ভুল ছাড়াও নায়কের জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কিছু উপাদান আছে যা তার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানত এরকম দুটি কারণ রয়েছে:

ক. অতিস্বাভাবিক (supernatural) এবং

খ. অপ্রত্যাশিত ঘটনা (chance and coincidence)।

এই দুটি উপাদান যদিও নায়কের উপরে প্রভাব ফেলে, তার নিজের চরিত্রই তার পরিণতির জন্য মুখ্যত দায়ী। *হ্যামলেট* নাটকে হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা এবং *ম্যাকবেথ* নাটকে তিন ডাইনি উভয় ক্ষেত্রেই নায়কের জন্য ক্ষতিকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যদিও অতিস্বাভাবিক চরিত্র নাটকে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে না, তথাপি নায়কের ভাবনা এবং আবেগে একটি সুগভীর রেখাপাত করে। যা কিছু ইতোমধ্যে বিরাজমান তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া অতিস্বাভাবিক চরিত্রের কোন ক্ষমতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ডাইনিরা ম্যাকবেথকে সিংহাসন লাভের জন্য ডানকানকে হত্যা করতে বাধ্য করে না। তারা শুধু ম্যাকবেথের অন্তর্নিহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই উস্কে দেয় এবং এর মাধ্যমে নায়কের পতনের বীজ বপন করে দেয়। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আমরা দেব-দেবীদের উপস্থিতি দেখতে পাই যারা ঘটনা প্রবাহ কারো অনুকূলে বা কারো প্রতিকূলে প্রবাহিত করে। অন্য কথায় গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নায়কের করুণ পরিণতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রধানত অতিস্বাভাবিক শক্তির উপর। কিন্তু শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিতে অতিস্বাভাবিক শক্তি মানব কর্মকাণ্ডের বাইরে অবস্থান করে।

একই কথা প্রযোজ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা কাকতালীয় ঘটনার ক্ষেত্রেও। *কিং লিয়ার* নাটকে অপ্রত্যাশিতভাবে এডগার কারাগারে করডেলিয়ার ফাঁসির আগে পৌঁছাতে পারে না। *ওথেলো* নাটকে দৈবক্রমে ডেসডিমনা একটি চরম মুহূর্তে রুমাল ফেলে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, শেক্সপিয়ারের নাটকে অপ্রত্যাশিত বা দৈত ঘটনা বিদ্যমান কিন্তু সেগুলো সব কিছুকে ছাপিয়ে নায়কের বিপর্যয়ের জন্য মূখ্য ভূমিকা পালন করে না। শেক্সপিয়ার এগুলো ব্যবহার করেছেন সুবিবেচনা প্রসূত উপায়ে। ব্র্যাডলির ভাষায়-"Neither does he employ it too frequently to be credible, not too rarely to be altogether unnatural." অর্থাৎ এত বেশী পরিমাণে ব্যবহার করেননি যেন অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে অথবা এত কম ব্যবহার করেননি যেন অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে শেক্সপিয়ার এরিস্টটলের *Poetics*-এ বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিনা তা পরিষ্কার নয়। তবে তিনি তাঁর নাটকের পাঠক বা দর্শকের মনে সফলভাবে অনুকম্পা ও ভীতি (pity and fear) সঞ্চার করতে সক্ষম। এছাড়াও শেক্সপিয়ার তাঁর নাটকে মানুষের যোগ্যতা ও মর্যাদার গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। সুযোগ নষ্ট হওয়া অথবা ভুল সিদ্ধান্তের ফলে নায়কের জীবনে করুণ পরিণতি এসেছে, তবে তার মর্যাদার হানি ঘটেনি। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিতে গভীর বেদনা ও মর্মন্তুদ কষ্টভোগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোন কোনটিতে ঘটেছে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় *হ্যামলেট* ও *কিং লিয়ার* নাটকের শেষে এত মৃত্যু সংঘটিত হয় যে মৃতদেহ দিয়ে মঞ্চ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এসবের মাধ্যমে শেক্সপিয়ার সফলভাবে করুণ রসের উদ্রেক করেছেন।

শেক্সপিয়ারের নায়কদের মনে দ্বন্দ্ব সংঘাতের যে দাবানল জ্বলে তা প্রধানত দুই ধরনের- একটি বহির্জগতের, আর অন্যটি মনোজগতের। বাহ্যিক দ্বন্দ্বে নায়ক লিপ্ত হয় খল চরিত্রের সাথে আর মনোজগতে থাকে আবেগ ও যুক্তির দ্বন্দ্ব। আবেগ ও যুক্তির এই দ্বন্দ্ব কখনও ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ আবার কখনও ব্যক্তি পর্যায় ছাড়িয়ে সার্বজনীন হয়ে গিয়েছে। ওথেলো এবং ইয়াগোর মধ্যে আবেগ ও যুক্তির দ্বন্দ্ব ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকেছে। হ্যামলেটের দ্বন্দ্ব আশেপাশের চরিত্রকেও প্রভাবিত করেছে। ম্যাকবেথ ও লিয়ারের দ্বন্দ্ব নায়কের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে সারা দেশে বিস্তৃত হয়ে পরিশেষে সার্বজনীন মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে।

শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির নায়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেও অন্তত একটি চরিত্রের উপর আলোকপাত করা হয়েছে-যে নায়কের খুব ঘনিষ্ঠ। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিতে পুরুষ চরিত্রগুলো প্রভাব বিস্তার করে। যদিও নারী চরিত্রগুলো তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি, তথাপি তাদের ভূমিকা খানিকটা হলেও কম। শেক্সপিয়ার তার নাটকে দ্বৈত কাহিনী এবং মূল কাহিনীর সাথে কখনও কখনও হাস্যরসাত্মক ঘটনা (comic relief) অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ড. স্যামুয়েল জনসন ট্র্যাজেডিতে হাস্যরসাত্মক ঘটনার অন্তর্ভূক্তিকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, মানব জীবনে অবিমিশ্র সুখ অথবা অবিমিশ্র দুঃখ কোনটিই স্বাভাবিক নয়।

শেক্সপিয়ারের ধর্ম নিয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্তু তার নাটক থেকে আমরা তার ধর্মীয় সংকীর্ণতার পরিচয় পাই না। তিনি গভীরভাবে ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন একথা সত্য কিন্তু খ্রীস্ট ধর্মের কোন নির্দিষ্ট মোড়কে তাঁকে আবদ্ধ করা যায় না। সামগ্রীক ভাবে দেখলে বোঝ যায় যে, তিনে ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক লেখক। সম্ভবত এটিই তাঁকে বিশ্বজনীন মহান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

i) Adams, Joseph Quincy (1923), *A Life of William Shakespeare*, প্রকাশক: Houghton Mifflin, (Boston).

ii) Bertolini, John Anthony (1993), *Shaw and Other Playwrights*, প্রকাশক: Pennsylvania State University Press, (Pennsylvania).

iii) Bloom, Harold (1999), *Shakespeare: The Invention of the Human*, প্রকাশক: Riverhead Books, (New York).

iv) Bradley, A. C. (1991), *Shakespearean Tragedy: Lectures on Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth*, প্রকাশক: Penguin, (London).

v) Bryant, John (1998), *Moby Dick* as Revolution, in Levine, Robert Steven, *The Cambridge Companion to Herman Melville*, প্রকাশক: Cambridge University Press, (Cambridge).

vi) Johnson, Samuel (2002), Lynch, Jack, ed., *Samuel Johnson's Dictionary: Selections from the 1755 Work that Defined the English Language*, প্রকাশক: Levenger Press, (Delray Beach, FL).

vii) Schoenbaum, Samuel (1991), *Shakespeare's Lives*, প্রকাশক: Oxford University Press, (Oxford).

viii) Taylor, Gary (1990), *Reinventing Shakespeare: A Cultural History from the Restoration to the Present*, প্রকাশক: Hogarth Press, (London).

টীকা:

[1] **Romantic Period** 1798Í1832.

[2] **Victorian Period** 1832Í1901.

[3] **George Barnard Shaw**(26 July 1856 – 2 November 1950), a famous English dramatist.

[4] A **glove**r is a person who produces and deals in gloves.

[5] An **alderman** is a member of a municipal assembly.

[6] A **grammar school** is one of several different types of schools in England.

[7] **Tragicomedy** is a literary genre that blends aspects of both tragic and comic forms.

[8] Aristotle's ***Poetics*** (335 BC) is the earliest-surviving work of dramatic theory and the first extant philosophical treatise to focus on literary theory.

[9] **Andrew Cecil Bradley** (March 26, 1851 – September 2, 1935) was an English literary scholar, best remembered for his work on Shakespeare.

[10] **Dr. Samuel Johnson** (18 September 1709 – 13 December 1784) was an English author who made lasting contributions to English literature as a poet, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor and lexicographer.

[11] **Christopher Marlowe**(baptised 26 February 1564; died 30 May 1593) was an English dramatist, poet and translator of the Elizabethan era.

[12] ***Hamartia*** is a term developed by Aristotle in his work Poetics. The term refers to a character's flaw or error.

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

খাসিয়া লোকসংস্কৃতি: শিশুতোষছড়া

মুহম্মদ আলমগীর*

[**Abstract :** A small part of the people of the Khasi tribe live in the Sylhet region of Bangladesh. Although we do have some sketchy ideas about their social customs, language, religions beliefs, their legends and different areas of their life from books and journals published from time to time, we know almost nothing about their folk-rhymes. The present treatise *Khasia Loksongskriti : Shishutoschara* will, we believe help a lot future researches on the sociological and cultural elements in the lives of the Khasis along with people of other small tribes and ethnic groups of the region.]

১. ভূমিকা

যে সকল নৃ-গোষ্ঠীর উপস্থিতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে — খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠী তাদের অন্যতম। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খাসিয়াদের বাস। মূলত মেঘালয় রাজ্যে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়কে কেন্দ্র করে তাদের বসতি গড়ে উঠেছে।[১] বাংলাদেশে তারা 'খাসিয়া' নামে পরিচিত হলেও অন্যত্র তারা 'খাসি' নামেই পরিচিত।[২] খাসিয়ারা মন-খ্মের (Mon-Khmer) ভাষা পরিবারের অস্ট্রো-এসিয়াটিক নামে পরিচিত একটি শাখা ভাষায় কথা বলে — যা সাধারণত খাসি ভাষা নামে অভিহিত।[৩] খাসি ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই — তারা তাদের ভাষা লেখার জন্য রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে। মন-খ্মের ভাষা পরিবারের ব্যাপ্তি মধ্য ভারত থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত।[৪] ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী খাসি ভাষীর সংখ্যা ১৭৬৬১৪ জন।[৫] এবং এর মধ্যে সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত খাসিয়াদের সংখ্যা ছিল ৩০৮৩ জন।[৬] গ্রিয়ারসন-এর ভারতের বিভিন্ন ভাষা জরিপকালে খাসিয়া ভাষী লোক সংখ্যা ছিল ১৭৭২৯৩ জন এবং সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত লোকসংখ্যা ছিল ৩২০০ জন।[৭] ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে খাসি ভাষী লোকসংখ্যা ছিল ১২,২৮০ জন।[৮] বর্তমানে (২০০৫) খাসি ভাষী লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষাধিক[৯] এবং বাংলাদেশে এদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ জন।[১০] ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তারা ছিল সর্বপ্রাণবাদী[১১] (Animist) এবং বর্তমানে বাংলাদেশের খাসিয়াদের ৭০% লোক খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী।[১২] খাসিয়াদের দাবি অনুযায়ী তাদের সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) নয় — মাতৃরৈখিক বা মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal)।[১৩]

ভারতের মেঘালয় রাজ্য এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত খাসিয়াদের লোকসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ অথচ তা খুব বেশি সংগৃহীত ও আলোচিত হয় নি। Major P. R.T. Gurdon-Gi *The Khasis*, আব্দুস সাত্তার-এর *আরণ্য সংস্কৃতি*[১৪], *আরণ্য জনপদে*[১৫], *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য*[১৬] বা খাসিয়া লেখক রুশ পতাম-এর *খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* ইত্যাদি গ্রন্থে কিছু কিছু লোককথা বা লোককাহিনি উপস্থাপিত হলেও লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি খাসিয়া লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ দিক প্রেম ও প্রার্থনা সঙ্গীত বিষয়ক একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[১৭]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ খাসিয়া লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান লোকছড়ার অন্তর্গত শিশুতোষছড়া উপস্থাপন ও বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ। এ প্রবন্ধে মোট ১০ (দশ) টি শিশুতোষ ছড়া উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। উপস্থাপিত ১০ (দশ) টি ছড়ার ৯ (নয়) টি বাংলাদেশের খাসিয়াদের মধ্য থেকে সংগৃহীত এবং ৪ সংখ্যক ছড়াটি খাসিয়া ভাষায় প্রকাশিত একটি শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। [দ্রষ্টব্য তথ্যসূত্র ১৪] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের গবেষণা খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ক জটিলতার সঙ্গে রয়েছে নৃ-গোষ্ঠীর টোটেম ট্যাবু, দুর্গম পথযাত্রা— সর্বোপরি গবেষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠীর বিশ্বাস অর্জনের বাধ্য-বাধকতা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-এর বাংলা ভাষা বিভাগে কর্মরত অবস্থায় ১৯৯৯ সালে জানুয়ারি মাসে জৈন্তাপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক জনাব বিজন রায়ের মাধ্যমে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার জৈন্তাপুর পুঞ্জির খাসিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়। দুই মাস ক্রমাগত যোগাযোগের ফলে জৈন্তাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সহকারী জনাব আনারুল ইসলাম (কুবল ভাই)-এর সহযোগিতায় তাদের সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং খাসিয়াদের অন্যতম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লামনিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব প্রদীপ লানডং খাসিয়া লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে আমার আন্তরিকতা উপলব্ধি করতে পেরে তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। উপলব্ধ আন্তরিকতার ধারাবাহিকতায় মার্চ মাসে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার জৈন্তাপুরপুঞ্জি, মোকামপুঞ্জি; গোয়াইন ঘাট উপজেলার লামাপুঞ্জি, নকশিয়ারপুঞ্জি, সংগামপুঞ্জি, জাফলংপুঞ্জি এবং মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুণ্ড পুঞ্জিতে ক্ষেত্র সমীক্ষণের মাধ্যমে শিশুতোষ ছড়াগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত ছড়াগুলো বাংলা অনুবাদসহ আমার খাতায় লিখে দিয়েছেন জনাব প্রদীপ লানডং।

সংগৃহীত ছড়াগুলো প্রথমে বাংলা অনুবাদসহ উপস্থাপিত হলো। পরবর্তী পর্যায়ে ছড়াগুলো নানাভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাসিয়া সমাজের সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যময় জীবন ও সংস্কৃতি অন্বেষণ করা হয়েছে। স্বীকার্য যে শিশুতোষছড়া লোকছড়ার একটি শাখা এবং লোকছড়া বিশাল লোকসাহিত্যের একটি উপাদান মাত্র। সঙ্গতকারণে শিশুতোষছড়ায় সমাজজীবন-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র আশা করা যায় না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সংগৃহীত ও উপস্থাপিত ছড়ার সংখ্যা কম বলেই — ছড়ায় প্রতিফলিত খাসিয়া সমাজ-জীবন-সংস্কৃতির অতি সামান্য অংশই প্রত্যাশিত।

২. সংগৃহীত শিশুতোষছড়া

এক. ঘুমপাড়ানি ছড়া

(১) থিয়ে থিয়ে হোন্/ মাঃ উসন্ উ হাতি
ইয়ো ডিও হাতি ইয়াহ্ হা । [সূত্র: প্রদীপ লানডং। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট]

বাংলা : (মা বলেন) ঘুমাও ঘুমাও সোনা/ ঐ দ্যাখো একটা হাতি,
(ঘুমাও) না হলে হাতি তোমাকে ধরবে।

(২) থিয়ে থিয়ে হোন্/ ইমেই জংফি ইলেই ইয়ো
ইয়া অয়ান কেট্ তেপেও কে হেইয়া হে। [সূত্র: ঐ]

বাংলা : (বাবা বলেন)–ঘুমাও ঘুমাও সোনামণি/তোমার মা বাজারে যাচ্ছে
মা বাজার থেকে/ তোমার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবে।

(৩) থিয়ে থিয়ে/ পেক্চাং পেক্চাং
এন্তি দার্তি চু হেওহি/ চু পুড়ে কট্হি
আয়্তে চু লিয়াস্কুর্ হি। [সূত্র: সোহানা কবির মিতা। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট]

বাংলা : ঘুমাও ঘুমাও/ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি (ঘুমাও)
কাল সকালে উঠবে/ তারপর বই পড়বে / তারপর স্কুলে যাবে।

(৪) থিয়ে খপ্ খপ্/ কো হে বা থিয়াং/ থিয়ে খপ্ খপ্
উটাই ও ম্যারসিয়াং।/ থিয়ে খপ্ খপ্/ ইয়া ফি না বাহ্
থিয়ে খপ্ খপ্/ সা লুম সা ওয়া ।
থিয়ে খপ্ খপ্/ উ লা ফেট্ সা থালাও

থিয়ে খপ্ খপ্/ বা না ডুং খাও।১৮

বাংলা : চুপি চুপি ঘুমাও/ মিষ্টি ভাই/ চুপি চুপি ঘুমাও
ঐ দ্যাখো একটা শেয়াল।/ চুপি চুপি ঘুমাও/ তোমাকে পিঠে নিচ্ছি -
চুপি চুপি ঘুমাও/ তোমাকে নিয়ে উঠা নামা করছি।
চুপি চুপি ঘুমাও/ শেয়াল জঙ্গলে চলে গেছে/ চুপি চুপি ঘুমাও
(তোমাকে পিঠে নিয়ে) আমি ধান ভানছি।

(৫) পুট্ চা ইউং উ খন খ্যেন/ হা গিন্ডিট্ লাডাউ
ডিনু লাম্ ফন্ লাম্ পাহ্/ খন্ খাদু পিতর
নিয়ং খন্ নিয়ং খন্ গিতায়/ খন উ সাপেড ডালই –
নিয়ং খন নিয়ং খন গিতায়/ খন গি রাহ্ সিলই। [সূত্র: কুণ্ডুলিনী খৈরম। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট]

বাংলা : কলা গাছের মাথায় (আগায়)/ ইদুঁরে বাচ্চা বাঁশি বাজায়।
কী দিয়ে কী ভাবে তাকে লোভ দেখায়/ পিতলের চুড়ি দিয়া।
কার ছেলে কার ছেলে এটা/ দলই এর ছেলে এটা।
(জমিদারের প্রিয় ছেলে এটা)/ কার ছেলে কার ছেলে এটা
বন্দুক বহনকারীর ছেলে এটা।

(৬) থিয়ে থিয়ে দিয়া/ ডেইট্ উমিঞাও ফা
উপাফো সদাগর/ থেত্ উ ইয়াফা হাতি উয়ি (Wea)। [সূত্র: ঐ]

বাংলা : ঘুমাও ঘুমাও লক্ষ্মী মেয়ে/ বিড়াল কামড়াবে তোমাকে
তোমার বাবা সওদাগর/ তোমার জন্য একটা হাতি কিনবে।

(৭) থিয়ে থিয়ে দিয়া/ ইলে ইয়াম্ ফ
পু অ উতে ডাবছিররাং/ উ রা উ ফা নিনি। [সূত্র: ঐ]

বাংলা : ঘুমাও ঘুমাও সোনা মেয়ে/ কেন তুমি কাঁদ?
কার এমন বুকের পাটা/ এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাবে?

দুই. অন্যান্য ছড়া

(৮) ও পিয়ু উনে ও পারা উনে/ লে খেচ্ সুন্ত সুবন ই
ছে বে ডোউ উনে ছে বেডাং উনে/ ছে পালাট্ খিয়েন লুম
ছাং উঃ স্কাউ লোহং লোহং/ মিঃ উঃ সেত্রম্ বমন
মন্ টেরি মন্খে/ ছাট্ ডেথেলি হা খ্যেল। [সূত্র: ডলি নাইয়াং। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট]

বাংলা : আয় বোনেরা আয় ভায়েরা/ চল ফুল তুলিতে যায়।

ছোট পাহাড়ের সেই পারে/ কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে

বামনের রাজা বাহির হন।/ রাজা বের হয়ে মনের আনন্দে

ডেখেলি মাছ মাথায় নিয়ে নাচতে থাকে।

(৯) দের দের নে থাট্ ব্লে/ দের দের নে থাট্ বসো

ছিয়ান লাইফো নে বি/ ছিয়ান লাইফো নে বি

ছি সন্ডক্ ডাখা/ নু এ গো ফা/ নু এ গো ফা

খ ব্লে খ বসো/ ই বাম্ ঙরে বি ই বাম্ ঙরে বি

লেঃ লিমিন্ ইয়ং ফা। [সূত্র: নমিতা নাইয়াং ও নীলিমা নাইয়াং। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট]

বাংলা : সাদা কাপড় লাল কাপড় উড়িয়ে/ তুমি ভাই কোথায় যাও — কোথায় যাও?

আমি যাচ্ছি সন্ডক্ ডাখা।/ কি দিয়েছে তোমায়! কি দিয়েছে!

সাদা চাল, লাল চাল?/ সাদা চাল তুমি খেও না/ লাল চাল তুমি খেও না

(খেলে) তোমার দাঁত সাদা হয়ে যাবে।

(১০) অংগেনি এজা গে বেই/ অংগেনি নিয়ান ইয়

অংগেনি পান্রাম্ পান্ছা/ অংগেনি ডুং কোবা ডুং খ

অংগেনি ডেংবাম্ ইয়োট্ ছিখ্লো।১৯ [সূত্র: ঐ]

বাংলা : কনিষ্ঠা — মা ভাত দাও।

অনামিকা— কোথায় পাব?

মধ্যমা — কর্জ করে আনো।

তর্জনী — ধান চাল ভান।

বৃদ্ধা —খাওয়ার পর পালিয়ে যাও।

(অর্থাৎ কর্জ শোধ করতে হবে না)

৩. পর্যালোচনা

গভীর মনোযোগসহ ছড়াগুলো পঠন-পাঠনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— ১, ২ ও ৩ সংখ্যক ছড়া উভয় লিঙ্গের শিশু, ৪ ও ৫ সংখ্যক ছড়া পুরুষ শিশু এবং ৬ ও ৭ সংখ্যক ছড়া নারী শিশুকে ঘুম পাড়াতে ব্যবহৃত হয়। উপস্থাপিত ছড়াগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়— খাসিয়া সমাজে প্রচলিত ছড়ায় উভয় লিঙ্গ ও মেয়ে শিশুর উপস্থিতি বেশি— যেখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শিশুতোষ ছড়ায় পুরুষ শিশু তথা ছেলে/ খোকার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে।[২০] এর কারণ হয়তো এই যে মাতৃরৈখিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অধিকার পুরুষের তুলনায় অনেকটাই বেশি[২১] এবং মেয়েদের অধিকার বেশি বলেই ব্যবসায়সহ অন্যান্য আর্থিক কর্মকাণ্ডে মা তথা মেয়েদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ২ (দুই) সংখ্যক ছড়ায় দেখা যায় বাবা শিশুকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছে যে তার মা বাজারে যাচ্ছে এবং তার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবে— সে যেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। খাসিয়াদের মাতৃরৈখিক সমাজের চিত্র ৭ (সাত) সংখ্যক ছড়ায় অত্যন্ত স্পষ্ট। মাতৃরৈখিক সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ের পর ছেলেরা শাশুড়ির বাড়িতে অবস্থান করে অর্থাৎ ছেলেকে মায়ের বাড়ি ছেড়ে শাশুড়ির বাড়ি যেতে হয়। এবং অনেক সময় দু/একটি সন্তান জন্মলাভের পর দম্পতি অন্যত্র নিজেদের বাড়ি তৈরি করে।[২২] দেখা যাচ্ছে বিয়ের পর পরই মেয়েকে মাতৃগৃহ ত্যাগ করতে হয় না। তাই সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে মেয়েকে বলা হচ্ছে— কেউ তাকে এখান (মাতৃগৃহ) থেকে

নিয়ে যেতে পারবে না। আট সংখ্যক ছড়ায়— যেখানে ছেলে-মেয়েকে এক সঙ্গে আহ্বান করা হয়েছে— সেখানে প্রথমেই মেয়েকে আহ্বান করা হয়— যাতে খাসিয়াদের মাতৃরৈখিক সমাজব্যবস্থার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

উপস্থাপিত ছড়ায় বিড়াল (ছড়া সংখ্যা ৭), হাতি (ছড়া সংখ্যা ১ ও ৬), কুকুর (ছড়া সংখ্যা ৮), শেয়াল (ছড়া সংখ্যা ৪), ইঁদুর (ছড়া সংখ্যা ৫) ইত্যাদি প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। দুটি ছড়ায় হাতির উপস্থিতিতে প্রমাণিত হয় যে খাসিয়া বসতির আশে পাশে হাতির উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। ১ সংখ্যক ছড়ায় শিশুকে হাতির ভয় দেখানোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের বসতির আশে পাশে বন্য হাতির উপদ্রব ছিল। ৬ সংখ্যক ছড়ায় সওদাগরের হাতি কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে এও স্পষ্ট যে ধনাঢ্য ব্যক্তি হাতি পালন করত। যোগাযোগের বাহন হিসেবে এবং জঙ্গল থেকে কাঠ ও অনুরূপ তৈজসপত্র আহরণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে আরণ্যক সমাজে হাতির উপযোগিতা সর্বাধিক। ক্ষমতাধর বা জমিদার/ সওদাগর কেবল হাতিই কেনে না তার সঙ্গে বন্দুকও থাকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ঘরে রাখার ও বহনের অধিকারও তারা লাভ করে (ছড়া সংখ্যা ৫)। ৮ সংখ্যক ছড়া থেকে জানা যায় ঘর-বাড়ি পাহারা দেবার কাজে কুকুর ব্যবহৃত হতো।

খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ধান (ছড়া সংখ্যা– ৪, ৯ ও ১০), মিষ্টি (ছড়া সংখ্যা– ২) এবং ফলের মধ্যে কলার উল্লেখ (ছড়া সংখ্যা– ৫) লক্ষ করা যায়। তিনটি ছড়ায় ধান চালের উল্লেখে অনুমতি হয় যে ভাত তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। তারা ধান ভেনে চাল তৈরি করে সেই চাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। ৯ সংখ্যক ছড়া থেকে বোঝা যায় যে লালচে ও সাদাটে রঙয়ের চাল পাওয়া যেত। চালের অতিরিক্ত ব্যবহার দাঁতের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিলো না। মাছও তাদের প্রিয় খাদ্য ছিলো এবং মনের মতো মাছ সংগ্রহ করতে পারলে তারা মাথায় মাছ নিয়ে নাচতো (ছড়া– ৮)।

খাসিয়ারা রঙ-বেরঙের কাপড় পরতে ভালোবাসে। আত্মীয়-স্বজন বা অন্যত্র ভ্রমণকালে তারা বাহারি কাপড় পরিধান করে এবং তা প্রদর্শনের বাতিকও তাদের মধ্যে লক্ষণীয় (ছড়া– ৯)।

১০ সংখ্যক ছড়ায় খাসিয়াদের অভাব-অনটন, অসাধুতা ও অসহায়তা এবং ক্ষণস্থায়ী আবাসনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অভাবে স্বভাব নষ্ট— এই চিরন্তন বিষয়টি থেকে খাসিয়া সমাজও মুক্ত নয়।

খাসিয়াদের ধাতু ও অলংকার ব্যবহারের বিষয়টি ৫ (পাঁচ) সংখ্যক ছড়া হতে জানা যায়। দেখা যাচ্ছে পিতলের ব্যবহার তারা জানতো এবং পিতলের অলংকার তাদের প্রিয় ছিল।

ছড়া সংখ্যা– ৪ এ ছোট ভাইকে পিঠে নিয়ে সহোদর/সহোদরার টিলায় ওঠা-নামা অথবা ঘরের উঁচু পাটাতন থেকে মাটিতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার[২৩] দৃশ্যটি অতীব মনোরম। শেয়ালের আগমনের ভয়— প্রস্থানের আশ্বাস, ভাইকে পিঠে নিয়ে তালে তালে ওঠানামাতেও যখন ভাই ঘুমায় না তখন বাধ্য হয়েই সহোদর/ সহোদরাকে এক সঙ্গে দুটি কাজ করতে হয়। ধান ভানার তালে তালে ভাইকে ঘুম পাড়াতে হয়। ফলে কিছুক্ষণ আগের মনোরম দৃশ্যটি কঠিন বাস্তবতায় বিদীর্ণ হয়। ভাইকে কাঁধে নিয়ে ধান ভানারত খাসিয়া শিশুটির মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং শহরতলীর ছিন্নমূল ও কর্মজীবী মহিলাদের অধিকাংশ বালিকা/ কিশোরীকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৯ সংখ্যক ছড়াটি লোককাহিনি আশ্রয়ী। সৃষ্টি সম্পর্কিত ও ধর্মীয় লোককাহিনি ছাড়াও খাসিয়া সমাজে যে নানান রূপকথা উপকথার প্রচলন ছিলো— ছড়াটিতে তা স্পষ্ট হয়। বস্তুকে ছাড়িয়ে কল্পনার যে বিস্তার মানবসমাজের মানসিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে তা উক্ত ছড়াটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে বেশ কয়েকটি উপবিভাগ লক্ষ্য করেছেন। যেমন— দোলনার ছড়া, ঘুমের আবাহন সম্বলিত 'আয় ঘুম' জাতীয় ছড়া, ঘুমের অনুরোধ 'ঘুম যারে' জাতীয় ছড়া, ঘুমন্ত শিশুর রূপ 'ঘুম যায়' বা 'ঘুমায়' জাতীয় ছড়া ইত্যাদি।[২৪] দোলনায় শিশুকে রেখে দোল দেওয়ার তালে তালে যে ছড়া উচ্চারিত হয় তাই দোলনার ছড়া।[২৫] আলোচ্য প্রবন্ধের ৪ সংখ্যক ছড়াটিকে দোলনার ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঘুমের আবাহন সম্বলিত 'আয় ঘুম' জাতীয় ছড়ায় ঘুমকে পার্থিব ভোগ্যবস্তু বা দুর্লভবস্তু প্রদানের প্রলোভন দেখানো হয়। এক্ষেত্রে ছড়াটিকে ঐন্দ্রজালিক শক্তি বা ঘুমের আবাহন মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়।[২৬] আলোচিত ৫ সংখ্যক ছড়াটি অনেকটা 'আয় ঘুম' জাতীয় ছড়া। ঘুমের অনুরোধ জানিয়ে 'ঘুম যারে'

জাতীয় ছড়ায় শিশুকে নানা দ্রব্যসামগ্রী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[২৭] এ ক্ষেত্রে কেবল দান নয়— শিশুকে ভয় দেখানোর পাশাপাশি অভয়ও দেওয়া হয়ে থাকে। আলোচ্য– ১, ২, ৩, ৬ ও ৭ সংখ্যক ছড়া উক্ত পর্যায়ভুক্ত।

৫ সংখ্যক ছড়াটিতে বন্দুকের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় যে ছড়াটি আধুনিক এবং ৩ সংখ্যক ছড়ায় সকালে নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার প্রসঙ্গ থাকায় এটা প্রমাণিত হয় ৩ সংখ্যক ছড়াটি অধিকতর আধুনিক। ঘুমপাড়ানি ছড়ার নবসৃষ্টি প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন— ছড়ার সুর বা ছন্দকে অক্ষুণ্ন রেখে সমসাময়িক জীবনের আধুনিক চিত্র 'ছেলেখেলার ছড়ায়' দেখা যেতে পারে কিন্তু ঘুমপাড়ানি ছড়ায় তেমন হতে দেখা যায় না।[২৮] অথচ আলোচ্য ৩ সংখ্যক ছড়ায় দেখা যায় ছড়ার সুর বা ছন্দকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে একেবারে আধুনিক জীবনের চিত্র সংবলিত ঘুমপাড়ানি ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে আদিম মানুষের প্রথম ছন্দ-বদ্ধ গীত ছড়া।[২৯] ছড়া শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত বলেই তা শিশুর মতো চির পুরাতন অথচ চির নবীন এবং তার আবেদনও সর্বজনীন।[৩০] ছড়াতে তথ্য ও তত্ত্ব নেই[৩১] বলা হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু পূর্বেই 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ' অর্থাৎ তথ্যের উপস্থিতি ছড়াতে লক্ষ করেছেন।[৩২] কিন্তু কোন তথ্য বা তত্ত্ব নয়— শিশুদের ছড়া ভাল লাগার কারণ এই যে— ছড়ার অসম্ভব জগতকে শিশুরা সত্য বলে গ্রহণ করে।[৩৩] এবং ছড়ার সঙ্গে '...যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে' বড়দের মনে তা 'মোহমন্ত্রের' কাজ করে।[৩৪] সঙ্গত কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন— 'ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।'[৩৫] বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপস্থাপিত, আলোচিত ও খাসিয়া সমাজে প্রচলিত শিশুতোষছড়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত ছড়ার 'চিরত্ব' যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. উপসংহার

বিশেষ সমাজে প্রচলিত শিশুতোষছড়ায় সেই সমাজের প্রতিবেশ ও পরিবেশের ছাপ রয়ে যায়। ফলে দুই অঞ্চলের শিশুতোষছড়ায় বিষয়গত দিক থেকে অনেকটা পার্থক্য খুব স্বাভাবিক। আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত শিশুতোষ লোকছড়াগুলোতে প্রতিফলিত খাসিয়া সমাজের ছাপ লক্ষণীয়— যা বাঙালি সমাজে প্রচলিত শিশুতোষছড়ার বিষয়ের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত করে। বাঙালি সমাজে প্রচলিত শিশুতোষছড়ার সঙ্গে খাসিয়া সমাজে প্রচলিত ছড়ার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়— বাংলা ছড়ায় যেখানে মামা তথা নানাবাড়ির প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে খাসিয়া ছড়ায় সেখানে মামা তথা নানা অনুপস্থিত। উক্ত পার্থক্যের মূলে রয়েছে দুই জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা। বাঙালি সমাজ যেখানে পিতৃতান্ত্রিক (অর্থাৎ পুরুষ বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে নিজ পিত্রালয়ে বাস করে) সেখানে খাসিয়া সমাজ মাতৃরৈখিক (অর্থাৎ নারী বিয়ে করে স্বামীকে নিয়ে নিজ মাতালয়ে বাস করে) এবং সঙ্গতকারণেই খাসিয়া শিশুকে মাতা তথা নানি বাড়িতেই অবস্থান করতে হয়। বাংলা ছড়ায় যেখানে শিশুকে ফুল তুলে ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়[৩৬] সেখানে খাসিয়া ছড়ায় শিশুকে ফুল তুলতে বামন রাজার নির্জন প্রাসাদে যেতে হয় এবং ফুলসহ ফুলের মতো শিশুদের পেয়ে অসুখী বামন রাজা শিশুদের সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠে (ছড়া– ৮)।

আলোচ্য প্রবন্ধে বাঙালি ও খাসিয়া সমাজে প্রচলিত শিশুতোষছড়ার একটি মাত্র বিষয়গত দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো। খাসিয়া সমাজের অধিক সংখ্যক শিশুতোষ ও অন্যান্য লোকছড়া সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হলে নানা কৌণিকে বাংলা লোকছড়ার সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে এবং সেই সঙ্গে বাঙালি ও খাসিয়া সমাজমানসের একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

খাসিয়াদের বৃহত্তম অংশ মেঘালয়ের খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বসবাস করে এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত খাসিয়াদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ব্যাপক ক্ষেত্র সমীক্ষণের মাধ্যমে আরো অধিক সংখ্যক লোকছড়াসহ লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদান খাসিয়া সমাজ থেকে সংগৃহীত হতে পারে। সংগৃহীত লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বৃহত্তর খাসিয়া সমাজের জীবন দর্শন ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। সন্দেহ নেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে খাসিয়া সমাজের লোকছড়া তথা লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে সামান্য হলেও দিক নির্দেশনার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

তথ্য সূত্র

১. Major P.R.T Gurdon, *The Khasis* (Delhi: Low Price Publications, 1996), p. 1.

২. রুশ পতাম, *খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: গ্রন্থকার, ২০০৫), পৃ. ১৬।

৩. (ক) G.A Grierson (ed.), *Linguistic Survey of India*, Vol. 2 (Reprint; New Delhi: Motilal Banarsidass, 1966), p. 1.

(খ) *খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২২।

৪. *Linguistic Survey of India*, Vol. 2, p. 1.

৫. *The Khasis*, p. 1.

৬. (ক) Ibid, p. 6-7.

(খ) রুশ পতাম তাঁর *খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সিলেট অঞ্চলে খাসিয়াদের সংখ্যা ৩০৮৬ জন এবং ১৮৬ পৃষ্ঠায় ৩০৮৩ জন উল্লেখ করেছেন।

(গ) Abdus Sattar তাঁর *In The Sylvan Shadows* (Dhaka: Bangla Academy, 1983) গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশে ৪৯০১ জন খাসিয়া আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৭. *Linguistic Survey of India*, Vol. 2, p. 4.

৮. *খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৮৬।

৯. তদেব, "মুখবন্ধ", পৃ. ১১।

১০. তদেব, পৃ. ১৭৭। লেখক এখানে গ্রামের সংখ্যা ১০৮টি বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু খাসিয়া গ্রামসমূহের নাম ও তালিকায় (পৃ. ১৮৮-১৮৯) মোট ৯৪টি গ্রামের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।

১১. *The Khasis*, p. 105.

১২. *খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৭২।

১৩. তদেব, পৃ. ৯৪।

১৪. আবদুস সাত্তার, *আরণ্য সংস্কৃতি* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭)।

১৫. আবদুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে* (তৃতীয় মুদ্রণ; ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০০)।

১৬. আবদুস সাত্তার, *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮)।

১৭. মুহম্মদ আলমগীর, "খাসিয়া লোক-সংস্কৃতি : প্রেম ও প্রার্থনা সঙ্গীত", *গবেষণা পত্রিকা* (রাজশাহী: কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চদশ খণ্ড, ২০০৯-২০১০), পৃ. ২৫-৩৪।

১৮. Da U Primrose Gatphoh, *Thiah Khop Khop, Ka Khasi Primer Ki Skul Rit, Ki Sim Rit*, 39th Edition (Guwahati: The Dispur Print House, 1995), Lesson 29.

১৯. ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলার তালে তালে ছড়াটি আবৃত্তি করে। হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল আন্দোলনের মাধ্যমে আবৃত্তি শুরু হয়ে বৃদ্ধা আঙ্গুলে গিয়ে শেষ হয়।

২০. অধিকাংশ বাংলা লোকছড়ার নায়ক ছেলে যেমন—

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে। [প্রচলিত ছড়া]

২১. *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ (সম্পা.) (ঢাকা : অনন্যা, ২০০১), পৃ. ১৭৫-১৭৬।

২২. *The Khasis*, p. 76.

২৩. খাসিয়ারা মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে কাঠের প্লাটফর্মের উপর ঘর তৈরি করে এবং একটি ছোট কাঠের সিড়ির সাহায্যে ঘরে পৌঁছে (লেখকের পর্যবেক্ষণ)। আরও দ্রষ্টব্য *The Khasis*, p. 30.

২৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড (ছড়া) (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, প্রকাশকাল অজ্ঞাত), পৃ. ২৮।

২৫. তদেব, পৃ. ৩৭।

২৬. তদেব, পৃ. ৪১।

২৭. তদেব, পৃ. ৬১।

২৮. তদেব, পৃ. ৩০।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "*ছেলেভুলানো ছড়া* : ১", '*লোকসাহিত্য*', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৫), পৃ. ৭৬৬।

৩০. তদেব, পৃ. ৭৫০।

৩১. *বাংলার লোক সাহিত্য*, পৃ. ২৭।

৩২. "*ছেলেভুলানো ছড়া* : ১", পৃ. ৭৫৪।

৩৩. তদেব, পৃ. ৭৫৩।

৩৪. তদেব, পৃ. ৭৫১।

৩৫. তদেব, পৃ. ৭৫০।

৩৬ (ক). আয় ছেলেরা/ আয় মেয়েরা/ ফুল তুলিতে যায়।/ ফুলের মালা গলায় দিয়ে/ মামার বাড়ি যাই।

[মামার বাড়ি – জসীম উদ্‌দীন]

(খ) তাই তাই তাই/ মামা বাড়ি যাই/ মামা দিল দুধ ভাত/ পেট ভরে খাই। [প্রচলিত ছড়া]

পরিশিষ্ট

[ক্ষেত্র সমীক্ষণে তথ্যদাতাদের নাম ও বিবরণ]

১. প্রদীপ লানডং (৫৫, সহকারী প্রধান শিক্ষক, লামনিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), নিজপাট, জৈন্তাপুর, সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান - জৈন্তাপুর, কাল - মার্চ ১৯৯৯।

২. সোহানা কবির মিতা (১৫, নবম শ্রেণির ছাত্রী), জাফলং খাসিয়া পুঞ্জি, জাফলং, সিলেট।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান - জৈন্তাপুর, কাল - মার্চ ১৯৯৯।

৩. কুণ্ডুলিনী খৈরম (৫৫, নিরক্ষর), জৈন্তাপুর খাসিয়া পুঞ্জি, নিজ পাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান - জৈন্তাপুর, কাল - মার্চ ১৯৯৯।

৪. ডলি নাইয়াং (৫০, বাংলা লিখতে ও পড়তে পারেন), জৈন্তাপুর খাসিয়া পুঞ্জি, নিজ পাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান - জৈন্তাপুর, কাল - মার্চ ১৯৯৯।

৫. নমিতা নাইয়াং (১৯, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রী) ও নীলিমা নাইয়াং (১৭, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রী), জৈন্তাপুর খাসিয়া পুঞ্জি, নিজ পাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান - জৈন্তাপুর, কাল - মার্চ ১৯৯৯।

কৃতজ্ঞতা

প্রদীপ লানডং (৫৫), সহকারী প্রধান শিক্ষক, লামনি গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয় , নিজপাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।

প্রয়াত মল্লিকা নাইয়াং ও তাঁর পরিবার, জৈন্তাপুর খাসিয়া পুঞ্জি, নিজপাট, জৈন্তাপুর, সিলেট ।

বিজয়, মোকাম পুঞ্জি, জৈন্তাপুর সিলেট।

মি. আনারুল ইসলাম (কুবল), অফিস সহকারী, জৈন্তাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

জীবনানন্দ দাশ: বিচ্ছিন্নতার নীলকণ্ঠ কবি

এম আবদুল আলীম*

এক.

'সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?'[১]। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) বিচ্ছিন্নতাদীর্ণ কবিসত্তার এ আত্মস্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাঁর কবিতার বিষয় ও প্রকরণশৈলীর মধ্যে। ফলে আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে নির্জন;[২] অন্ধকারের নির্জন কবি;[৩] পৃথিবী পলাতক কবি;[৪] বিষণ্ন বেদনার সিন্ধুতটে নিক্ষিপ্ত কবি[৫] প্রভৃতি অভিধা জীবনানন্দের জন্য অনিবার্যভাবেই জুটে গেছে। অস্তিত্বের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, যান্ত্রিক যন্ত্রণায় পিষ্ট, মৃত্যু যন্ত্রণায় আড়ষ্ট এবং মানসিক ও আত্মিক সংকটে নিমজ্জিত[৬] এ কবি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ; পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এমনকি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের কোন কিছুর সঙ্গে অন্বয় খুঁজে পাননি। প্রেম, নারী, প্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, যুগজীবনের জটিলতা এবং সমকালীন মানুষের ক্লেদাক্তজীবনের বহু-বর্ণিল চিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার মর্মবিদারী যন্ত্রণার কথা বলেছেন। তাঁর কবিচেতনার মর্মমূলে সংগ্রথিত ছিল বিচ্ছিন্নতার প্রাণবীজ। জীবনানন্দের অনতিক্রান্ত এ বিচ্ছিন্নতা যাকে তিনি এড়াতে পারেন না বলে সহজ স্বীকারোক্তিতে মেনে নিয়েছেন, সেটা শুধু বক্তব্যে ও চিন্তায় কাব্যদেহে সমাচ্ছন্ন হয় নি। কবিতার প্রকরণে, শব্দে-শব্দে, বাক্যে-চরণে সর্বত্র বিচ্ছিন্নতার প্রচ্ছাপ ছড়িয়ে গেছে।[৭] ব্যক্তিজীবনের সীমাহীন দুর্ভোগ এবং যুগমানসের জটিলতায় তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন হতাশা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা আর একাকিত্বের গভীরে। 'যুগধর্মের বৈনাশিকতায় তাঁর মানসপ্রান্তর হয়েছিল বৃত্তাবদ্ধ-জীবনসন্ধিগ্ধ শিকড়-উন্মূলিত বিশ্বাসবিচ্যুত, কখনো-বা সত্তাবিচ্ছিন্ন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে চিত্রিত হয়েছে অনাশ্রয়ী পৃথিবীর ছবি, শিল্পিত হয়েছে তাঁর নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত বিপন্ন সত্তার বহুভুজ যন্ত্রণার কথা'।[৮] 'ঝরাপালক' (১৯২৭) থেকে শুরু করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্য এবং অগ্রন্থিত কবিতাসমূহের মধ্যে তিনি বিচ্ছিন্নতার শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিচেতনায় বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গেলে কতকগুলো বিষয়ের উপর আলোকপাত করা অত্যাবশ্যক। সেক্ষেত্রে প্রথমেই আসে কবির ব্যক্তিজীবন, তারপর আসে তাঁর সমকালীন জীবনের মূল্যায়ন, আসে সমকালীন সাহিত্যের নানা প্রবণতা এবং সেগুলোর সঙ্গে কবির সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গ। জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিজীবন ছিল প্রতিকূল পরিস্থিতির সামূহিক বৈনাশিকতায় পর্যুদস্ত। তিনি ছিলেন লাজুক, গম্ভীর, স্বল্পবাক[৯] এবং প্রচার বিমুখ[১০] মানুষ। সাংসারিক কাজকর্মেও উদাসীন ছিলেন। তাঁর জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব চরিতার্থতা লাভ করে নি। ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টি[১১] থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেও প্রত্যাশানুরূপ চাকরি পান নি, দীর্ঘদিন তাঁকে বেকারত্বের গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। চাকরিচ্যুত হওয়ার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। জীবিতকালে জীবনানন্দ দাশ কবি হিসেবে তেমন মূল্যায়িত হন নি; বরং তাঁর কবিতা সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তীর্যক সমালোচনা করা হয়েছে। কবি-'গণ্ডার'[১২]; ভাবান্তরহীন কবি[১৩] প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করে অনেকে তাঁকে প্রাণঘাতী যন্ত্রণা দিয়েছেন। তাঁর চেতনায় বিচ্ছিন্নতা বাসা বাঁধার মূলে বরিশাল ত্যাগ করে কলকাতার জটিল যান্ত্রিকজীবনে বসবাস বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বরিশালের শ্যামলিম প্রকৃতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশব-কৈশোর; বলা চলে বরিশালের প্রকৃতির স্নিগ্ধপরিবেশের সঙ্গে জীবনানন্দ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতা তাঁকে এ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। কলকাতার ফাঁপা মানুষ আর যান্ত্রিক জীবন তাঁর দুর্বিষহ মানসিক যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল না। জীবনানন্দ দাশের দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি। এর মূলে বিশেষভাবে দায়ী অর্থনৈতিক অনটন। তাছাড়া ধীর, স্থির ও স্থিতধী জীবনযাপন স্ত্রী লাবণ্য দাশের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর আচরণে জীবনানন্দ দাশ অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশ বলেছেন :

জীবনানন্দের বিয়ে সম্বন্ধ করে হয়েছিল, তাঁর সম্মতিতেই।...কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওঁদের দু'জনের মধ্যে ভালো মনের মিল হয়নি। তার প্রতিফলন রয়েছে জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে।[১৪]

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।

স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল না হওয়ায় হয়ত তাকে যৌন-অবদমনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, যা তাঁর মধ্যে হতাশা এবং মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাঁকে আরও অন্তর্মুখী করে তোলে। তিনি তাঁর কামনা-বাসনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেন এবং মানসিকভাবে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।[১৫]

জীবনানন্দের সমকাল ছিল নানা ঘটনা ও প্রবণতায় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। পুঁজিবাদ সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের বিনাশ সাধন করে সবকিছুকে পণ্যজ্ঞান করেছিল তাঁর সাহিত্য রচনার যুগে। পুঁজিবাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে বিশ্ববাসীর জীবনে তখন নাভিশ্বাস উঠেছিল। তাছাড়া পৃথিবীজুড়ে সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ-বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোড়োজমি'-তে ফাঁপা মানুষের বিপন্ন প্রতিবেশ[১৬] বিরাজমান ছিল। পরিস্থিতি এ রকম ছিল, যাতে মার্কসের ভাষায়, পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমিক শোষিত হতে হতে নিজেই পণ্যে পরিণত[১৭] হয়েছিল। পুঁজিবাদ সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করায় মানুষ নিজের উৎপাদিত বস্তু এবং আপনসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই পণ্য-সর্বস্ব যুগে সংবেদনশীল মনের অধিকারী অপরাপর শিল্পি-সাহিত্যিকের মতো জীবনানন্দের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল যন্ত্রণার সংবেদ। তিনি সামগ্রিকভাবে হয়ে পড়েছিলেন নিঃসঙ্গ। জরা-ক্লান্তি-বিষণ্ণতা ও অবসাদ তাঁর চিত্তকে বিগলিত করে তুলেছিল। তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দুর্ভিক্ষ, ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা, যুবসমাজের অবক্ষয়-বেকারত্ব, অধিকাংশ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় জীবনানন্দের মানসিক-যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কবিচেতনায় সৃষ্টি হয়েছিল বিচ্ছিন্নতার বলয়। তিনি দেখেছেন দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহরূপ ও ফ্যাসিবাদী শক্তির উন্মত্ত-উল্লাস। সবকিছু মিলিয়ে মার্কস যে আর্থ-সামাজিক- মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন, জীবনানন্দের কবিসত্তা পুঁজিশাসিত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কাছে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে[১৮] সেই বিচ্ছিন্নতার কবলে পতিত হয়েছিল। এর ফলে তাঁর সাহিত্যে অঙ্কিত হয়েছে দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতার দুর্মর যন্ত্রণা, আত্মদহনের তীক্ষ্ণমুখ জ্বালা, নৈঃসঙ্গ্যের দুর্ভরবেদনা এবং ইতিহাসচেতনা ও কালজ্ঞানের আলোয় কখনোবা নিঃসঙ্গতা মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।[১৯] কাজেই জীবনানন্দের কবিসত্তায় বিচ্ছিন্নতা বা নৈঃসঙ্গ্যচেতনার মূলে পুঁজিবাদ শাসিত ও পণ্যযুগের সৃষ্ট সমকালীন নানা অভিঘাত অনেকাংশে দায়ী। এককথায় যুগজীবনের জটিলতা তাঁকে নিক্ষেপ করেছে একাকিত্ব অর্ণবে, তাঁকে জর্জরিত করেছে রোমান্টিক বিষণ্ণতায়, আত্মসমাহিত করেছে মর্মান্তিক বেদনায় আর বিচ্ছিন্নপীড়িত করেছে তাঁর মানসচারিত্র্যকে।[২০]

বিদেশি সাহিত্যের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় বিচ্ছিন্নতার সন্নিপাত ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রন, ম্যানফ্রেড, শেলী, কীটস, ম্যাথিউ আর্নল্ড, টেনিসন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন। এঁদের সাহিত্যে প্রকাশিত জীবনজ্বর, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনা, প্রকৃতির বুকে আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় জীবনানন্দ দাশের কাব্যে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান। ইংরেজি সাহিত্যসেবী জীবনানন্দের বোধের জগতে তাঁর পঠন-পাঠের বহু কিছুই অঙ্গীভূত হয়ে তাঁর মেধা-মননকে সমৃদ্ধ এবং বিকশিত করেছে, সহায়তা করেছে তাঁর অন্তর্বেদনা, জীবনযন্ত্রণা, যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে।[২১] তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে জর্জরিত টি. এস. এলিয়ট, স্যাসুন, ওয়েন প্রমুখ কবির কবিতা। যুদ্ধসৃষ্ট যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করেছেন : 'এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;/কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন'![২২] এতে স্যাসুন এবং ওয়েনের কবিতার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিদৃশ্যমান। যুদ্ধের ভয়াবহতা, অবক্ষয়, ক্লান্তি, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা প্রকটভাবে চিত্রিত হয়েছে টি. এস. এটিয়টের æThe Waste Land", æGerontion", æThe Hollow Men" ইত্যাদি কবিতায়। এসব কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় জীবনানন্দের কাব্যে বিধৃত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। এককথায় ইংরেজি সাহিত্যের অধীত জ্ঞান তাঁর বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়বোধকে তীব্র ও গভীরতর করেছে।

দুই.

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে সন্নিবিষ্ট বিচ্ছিন্নতাকে নানা পরিসরে বিশ্লেষণ করা যায়। কার্ল মার্কস আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ও শ্রেণিশোষণের পটভূমিতে বিচ্ছিন্নতার যে তত্ত্বনির্মাণ করেছেন তা জীবনানন্দের কবিতার বিচ্ছিন্নতা পর্যলোচনায় বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায়। মার্কস পুঁজিবাদী মানুষের মধ্যে চার প্রকার বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন :[২৩]

১. কর্ম বা কর্মপদ্ধতি থেকে বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা;

২. উৎপন্ন সামগ্রী হতে বিচ্ছিন্নতা;

৩. আপনসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং

৪. মানব-প্রকৃতি তথা মানবিক-সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা।

মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বকে সমালোচকগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একজন সমালোচক কার্ল মার্কসের বিচ্ছিন্নতাকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে লিখেছেন : 'প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা, আপনসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা ও মানবপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা।'[২৪] মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীর আলোচনা থেকে আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার বহুভুজচিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আধুনিক মানুষের নানামাত্রিক বিচ্ছিন্নতা হল—প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা, পরিবারবিচ্ছিন্নতা, প্রেমবিচ্ছিন্নতা, সমাজবিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বরবিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধবিচ্ছিন্নতা, সত্তাবিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি।[২৫] এসব বিচ্ছিন্নতার অধিকাংশ জীবনানন্দের কবিতায় বিদ্যমান। তিনি এ বিচ্ছিন্নতাবোধের ব্যাপারগুলো দুভাবে কাব্যদেহে ধারণ করেছেন। এক, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানুষ ও অন্যান্য বিষয়ের বিচ্ছিন্নতা; দুই, কবির নিজস্বসত্তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার বিচ্ছিন্নতা। এগুলো ছাড়াও কবিতার প্রকরণের ক্ষেত্রেও স্বভাবসিদ্ধ বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন প্রকটিত।[২৬]

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি; প্রকৃতির কবি[২৭] হলেও প্রকৃতি তাঁর বিচ্ছিন্নতাপীড়িত কবিচৈতন্যে সৃষ্টি করেছে অনিঃশেষ নিঃসঙ্গতা। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ বিদ্যমান থাকলেও শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত এবং যান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনের নিষ্পেষণে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে শৈথিল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কে বেড়ে গেছে দূরত্ব। নগরকেন্দ্রিক জটিলতা এবং শিল্পকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া প্রকৃতির প্রাণময় রূপকে কলুষিত করেছে। প্রকৃতির কলুষিত রূপ এবং প্রকৃতি-মানবের সম্পর্কের টানাপড়েনে মানবচিত্তে সৃষ্টি হয়েছে একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা। রোমান্টিক চেতনাদীপ্ত ইংরেজ কবিদের মধ্যে প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতার যে সূচনা হয়েছিল, যুগজটিলতা এবং মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা সে বিচ্ছিন্নতাকে আরো প্রবল করে তোলে। রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিদের মধ্যেও প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত এসব কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বিপন্ন প্রকৃতির বিবর্ণরূপ। বসুন্ধরার পীযূষধারা এবং প্রাণময় প্রকৃতির রূপ তাঁরা খুঁজে পান নি। ফলে তাঁদের চেতনায় প্রকৃতি ধূসর, বিবর্ণ এবং বিধ্বস্ত। জীবনানন্দের কাব্যেও প্রকৃতির এ শূন্য, ধূসর এবং বিবর্ণরূপের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির শ্যামল-স্নিগ্ধ স্বাভাবিক রূপ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির সদর্থকরূপের উদ্ভাসনে মহিমান্বিত কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) তিনি জীবিতকালে প্রকাশ করেন নি। অবক্ষয় ও বিচ্ছিন্নরূপে যে প্রকৃতি তাঁর চেতনায় স্থান পেয়েছে তাকে সদর্থক ও মাহাত্ম্যময় করে দেখানোকে তিনি স্ববিরোধী এবং স্বভাববিরুদ্ধ মনে করেছেন। এজন্য 'রূপসী বাংলা' কাব্যের কবিতাগুলো তিনি পত্রিকা কিংবা গ্রন্থে প্রকাশ না করে বাক্সবন্দি করে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিলেন। কবিতা রচনার সূচনালগ্ন থেকে তাঁর কবিসত্তায় হানা দিয়েছে নিরাকপরা প্রকৃতির শূন্যরূপ। প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন : 'আমি কবি,—সেই কবি,—/আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি'![২৮] অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতির ধূসর-ঊষর রূপচ্ছবি অবলোকন করেছেন। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে[২৯] ডুবে থাকাতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। ফলে প্রকৃতিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন হেমন্তের ভয়ংকর শূন্যতার আস্তরণে।[৩০] হেমন্তের ধূসর জীর্ণ-শীর্ণ প্রকৃতি, রিক্ত মাঠ, শূন্য প্রান্তর ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর কবিতায়। জীবনের জ্বালাকে, নিঃসঙ্গচিত্তের বেদনাকে প্রকাশ করতে তিনি হেমন্তকেই বেছে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন :

> বাংলার ষড়ঋতুর মধ্যে একটিমাত্র ঋতুর আবেদন তাঁর মনে। সে হচ্ছে হেমন্ত। মরা পাতা আর ফসল কেটে নেওয়া রিক্ত মাঠের কবি তিনি। সুতরাং বিষণ্নতাই তার কবিতার মূল সুর। ক্লান্তি, অবসাদ, অবকাশ, অবসর, মৃত্যু আর বিচ্ছেদকে নিয়েই তাঁর জীবনবোধ। তিনি একটি বিচ্ছিন্ন কবিসত্তা।[৩১]

কবিসত্তার বিচ্ছিন্নতার কারণে জীবনানন্দের প্রিয় ঋতু হেমন্ত তাঁর চেতনায় প্রাচুর্য নিয়ে উপস্থিত হয় নি, উপস্থিত হয়েছে শূন্যতা, রিক্ততা এবং বেদনা নিয়ে। প্রকৃতির মোহনীয় রূপমাধুরী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন বলে সবুজরূপের মহিমা নয়, হেমন্তের নেতিবাচক ভাবলোকই ভিড় করেছে তাঁর কবিচেতনায় :

প্রথম ফসল গেছে ঘরে, i/ হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;/ অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে/ বাঁশ-পাতাi মরা ঘাসi আকাশের তারা![৩২]

হেমন্তের শূন্যপ্রান্তরের পাশাপাশি কুয়াশাচ্ছন্ন পরিপার্শ্ব, পাখির নষ্টনীড় আর প্রকৃতির বিধ্বস্তরূপের ভয়ালচিত্র পাওয়া যায় জীবনানন্দের কবিতায় :

ভাসিছে কুয়াশা/ দিকে-দিকে, i চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে, i পথের উপর/ পাখির ডিমের খোসা, ঠাণ্ডাi কড়কড়!

শসাফুল, দু'-একটা নষ্ট শাদা শসা, / মাকড়ের ছে'ড়া জাল, শুকনো মাকড়সা লতায়-পাতায়,[৩৩]

এখানে হেমন্তের নিঃস্ব ও রিক্ততা উজ্জ্বলএ চিত্রে শূন্যতা, ক্ষয়িষ্ণুতা ও ক্ষতের গভীরতা ভয়াবহ। বস্তুত, রিক্ততা, শূন্যতা ও অনুর্বরতার মাঝেই তাঁর শিল্পচিত্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।[৩৪] হেমন্ত যদিও পূর্ণতা এবং ফসলের উৎসব বয়ে আনে বাঙালি জীবনে, তবুও কবি এর মধ্যে দেখেছেন বিষণ্নতার চিত্র :

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরী নাই, রূপ ঝ'রে পড়ে তার, / শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে![৩৫]

কখনো কখনো তিনি প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন আবহের সঙ্গে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে একাকার করে দিয়ে লিখেছেন : 'আজ এই হেমন্তের প্রশ্নময় রাতে/ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে... ।'[৩৬] কখনো দূর আকাশের তারা নিখিলের নীরবতা নিয়ে হানা দিয়েছে তাঁর কবিমানসে :

অন্ধকারের ঘুম সাগরের রাতে/ দূর আকাশের তারা,
নীল নিখিলের নীরবতা/ নেই কিছু এ ছাড়া ।'[৩৭]

প্রকৃতির স্বাভাবিকতা ও সবুজাভ রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়ে নি। প্রকৃতিকে যেভাবে উপস্থাপন করলে জরা-ক্লান্তি-যুগজ্বর-অবসাদ-রিক্ততা কিংবা হতাশা-স্থবিরতা-একাকিত্ব-বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, সেভাবেই জীবনানন্দ নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন।[৩৮] তাঁর কবিতায় প্রকৃতির এক ধূসর, ক্ষয়িষ্ণু, শীতার্ত, ম্লান,অন্ধকার প্রকাশ বড়ো হয়ে উঠেছে, বড় অনন্যপূর্ব সে নিসর্গছবি, তবু এক নির্জন ধূসরতায় অবলীন।[৩৯] কেবল হেমন্তের বিষণ্নতা নয়, শীতের রিক্ততাও জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাক্লিষ্ট কবিচিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। মাঘসংক্রান্তির রাত যেমন বার বার স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়, তেমনি রূপায়িত হয়েছে পৌষের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির বিষণ্নমূর্তি :

পউষের কুয়াশায় সাপের খোলস, পাতা, ডিম/ প'ড়ে আছে ঘাসে
কেন যে করুণ চোখ পথ ভুলে ভেসে গেল/ ময়জানি নদীটির পাশে।[৪০]

নিঃসঙ্গতাপীড়িত কবি প্রকৃতির নেতিবাচক চিত্র কাব্যে অঙ্কন করেছেন। নিসর্গের সতেজ, সৌন্দর্যমণ্ডিত, প্রাণোচ্ছল ছবি তিনি আঁকেন নি। কখনো প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপমূর্তি আঁকলেও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেন ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত। নিসর্গের বিবর্ণ-বিকৃত রূপ জীবনানন্দের চেতনায় এসেছে এভাবে :

যেখানে গাছের শাখা নড়ে/ শীত রাতে, মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন!
যেই খানে বন/ আদিম রাত্রির ঘ্রাণ/ বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান![৪১]

জীবনানন্দ দাশ যে ব্যাঘ্রযুগের মানুষ, সে যুগে প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকতা ছিল না। প্রকৃতি তখন বিপন্ন ও বিলীন হয়ে গেছে। বনের সিংহ বন্দি হয়েছে সার্কাসের খাঁচায়। বিপন্নপ্রকৃতির সেই কদর্যরূপ দেখে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

সিংহ অরণ্যকে/ পাবে না আর/ পাবে না আর
কোকিলের গান/ বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।/ হে পৃথিবী,/ হে বিপাশামদির নাগপাশ, তুমি
পাশ ফিরে শোও,/ কোনদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।[৪২]

বরিশালের প্রকৃতির মধ্যে আজন্ম বেড়ে উঠা কবি কলকাতায় এসে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্ঠুরতায় প্রকৃতির বিলীয়মান কৃত্রিমঅবস্থা দেখে তাঁর মনপ্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠেছিল :

চারিদিকে কলকাতার হেমন্তের বিকেল নিভছে;
গ্যাসল্যাম্পে বেশি আভা আকাশের নক্ষত্রলোক হতে
কম আলো কোথাও প্রকৃতি নেই কিংবা তার ভিতরের পাখি।[৪৩]

এমন প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন, প্রকৃতিহীন অবস্থায় বসবাসকারী কবির কবিতায় নিসর্গ অস্বাভাবিক রূপে প্রতিভাত হওয়া অযৌক্তিক নয় মোটেই। এ কারণে জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের শস্যরিক্ত শূন্য মাঠে ম্লান বাঁকা চাঁদ যেন মরণাভিসারে প্রেত দূতী[৪৪] হিসেবে আবির্ভূত হয়। শুধু তাই নয়, হেমন্তের

ঝড়, সবুজ রোমশ নীড়, বাসি পাতা ভূতের মতন, হলুদ জ্যোৎস্না, হলুদ নদী, সোনালী ডিমের মত ফাল্গুনের চাঁদ, নীল হাওয়ার সমুদ্র, শিঙের মত বাঁকা নীল চাঁদ, কমলা রঙের রোদ, শতাব্দীর নীল অন্ধকার প্রভৃতি অস্বাভাবিক নৈসর্গিক প্রসিদ্ধি ব্যবহৃত হয় তাঁর কবিতায়। তাঁর বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাদগ্ধ কবিমানসে প্রকৃতি লাভ করে ধূসর রং। মরাচাঁদের আলোর, হিমের কুয়াশা রাতের পৌষের শস্যরিক্ত মাঠের চিত্ররূপ তাই তাঁর কবিতায় পুনরাবৃত্ত[৪৫] হয় বারংবার।

তিন.

পরিবার এবং প্রেমবিচ্ছিন্নতাজাত যন্ত্রণা আধুনিক মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে একাকিত্ব ও শূন্যতার হাহাকার। সভ্যতার বিকাশের ধারায় সৃষ্ট পরিবারপ্রথা ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যে বন্ধন সৃষ্ট করেছিল পুঁজিবাদী সমাজের অবক্ষয় মানুষের সেই পারিবারিকবন্ধন ছিন্ন করেছে। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের প্রথাগত সেতুবন্ধন ভেঙে দিয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটে তছনছ হয়ে গেছে একান্নবর্তী পরিবারের সুনিশ্চিত নিরাপদআশ্রয়। রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধনও ভেঙে গেছে। সমস্যায় জরাজীর্ণ পারিবারিক জীবন ব্যক্তির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে পালা দিয়ে বেড়েছে প্রেমবিচ্ছিন্নতা। সামাজিক এবং পারিবারিক অবক্ষয়ের পেষণে বিপন্ন হয়েছে মানুষের আন্তঃমানবিক সম্পর্কের বন্ধন। প্রেমের সঞ্জীবনীসুধাও গেছে শুকিয়ে। মরে গেছে প্রেম, মরে গেছে প্রেমের আধার।[৪৬] রেঁনেসা-পরবর্তীকালে প্রেমের যে পরিচ্ছন্নরূপের উন্মেষ ঘটেছিল মানব-মানবীর মনে, পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে সে প্রেম হয়েছে সঙ্কটাপন্ন। পণ্য-সর্বস্ব পুঁজিবাদী যুগ কেড়ে নিয়েছে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, বাড়িয়ে দিয়েছে ভোগস্পৃহা আর শরীরী-প্রেমকে। পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্বচেতনা থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা যতই প্রবল হয়েছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের প্রেমবিচ্ছিন্নতা।[৪৭] পুঁজিবাদের দৈত্য প্রেমকে হরণ করে নিয়ে গেছে এ যুগের প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় থেকে। বাৎসল্যপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেম সর্বত্রই ঢুকিয়ে দিয়েছে অবিশ্বাস আর সন্দেহের বীজ। এই প্রেমবিচ্ছিন্নতা মানুষকে করেছে নিঃসঙ্গ। অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন :

> একালে দাম্পত্য-প্রেমে দেখা দিয়েছে দুর্মর সন্দেহ ও গভীর অবিশ্বাস, বাৎসল্য প্রেম বাণিজ্যিক মূল্যচেতনায় নিপতিত হয়েছে প্রবল চাপের মুখে। যুগলের বিচ্ছিন্নতা মানুষের চেতনায় সৃষ্টি করেছে নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা।[৪৮]

পরিবার ও প্রেমবিচ্ছিন্নতা জীবনানন্দের কবিমানসের অন্যতম মৌল উপাদান। পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সম্মিলনে যে শিক্ষিত, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও আদর্শিক পারিবারিক আবহাওয়ায় জীবনানন্দ বড় হয়েছেন[৪৯] বাস্তবতার নির্মমতায় সে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে ছিল কবির অন্তরঙ্গতা। মঞ্জুশ্রী দাশ জানিয়েছেন : 'আমার ঠাকুমা ছিলেন বাবার সবচেয়ে প্রিয়জন। ঠাকুমার মৃত্যুর সময়ে দেখেছি বাবার মুখে অফুরান বেদনা। কিন্তু চোখে জল নেই'।[৫০] পারিবারিক জীবনে মাতৃনির্ভরতা কবিকে অনেক সময় মানসিক প্রশান্তি দিয়েছিল। সংসারকর্মে উদাসীন, জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত, ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে তাঁর মায়ের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন জীবনানন্দের মানসিক শান্তি বজায় রাখার জন্য। তিনি যাতে সুস্থিরভাবে কাব্যচর্চা করতে পারেন সেজন্য কবিমাতা সারাক্ষণ তাঁকে আগলে রাখতেন। সুচরিতা দাশ লিখেছেন :

> দাদা যে ঠিক সাংসারিক মানুষ নন, তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব যে চরিতার্থতা লাভ করে নি, ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টি যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি লাভ করলেন না, সেজন্য অন্তত তাঁর কাব্যসাধনার জন্য একটুখানি অনুকূল পরিবেশ থাক, আর সেইখানে থাক অন্তত একটু সান্ত্বনা, সারাজীবন ধরে সেই চেষ্টাই করে গেছেন মা।[৫১]

জীবন ও সময়ের তাড়না এবং মহাকালের অমোঘবিধান জীবনানন্দকে মা-বাবা, ভাই-বোনের অন্তরঙ্গতায় গড়া পারিবারিকজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরিবারবিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে অনন্বয় সৃষ্টি করে।

প্রেমবিচ্ছিন্নতা জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন ও কবিসত্তাকে সবচেয়ে বেশি নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত করেছে। 'অপ্রেম' শব্দটি জীবনানন্দই শিখিয়েছেন আমাদের।[৫২] ব্যক্তিজীবনের নানা পরিসরে তিনি প্রেয়সী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তাঁর প্রেমের কাহিনী এখন আর কল্পকথা নয়। বরং পেয়ে হারানোর ট্র্যাজেডিই সত্য হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে।[৫৩] কিশোর বয়সের প্রেমিকা, পরিণত বয়সের প্রেমিকা সবাই তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। স্ত্রীও প্রেম দিয়ে তাঁর মনের অলিন্দ পরিপূর্ণ করেন নি; বরং উপেক্ষার বিষাক্তবাণে তাঁর হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছেন। এ সম্পর্কে আহমদ রফিক বলেছেন :

দিনলিপিতে কথিত গ্রামীণ কিশোরী (রুরাল গার্ল)-কে অনিবার্য কারণে সরে যেতে হয়; কারণ হতে পারে মৃত্যু অথবা সামাজিক বাধ্যবাধকতা। তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে পরিণত বয়সী নাগরিক প্রেমিকাকে (দিনলিপির 'Y' চিহ্নিত নারী) কবি'র জীবন থেকে সরে যেতে দেখা যায়। কবির প্রগাঢ় আহবানে প্রেমিকার তরফ থেকে সাড়া মেলে না। একটি সংরক্ত প্রেমের মৃত্যুই সত্য হয়ে ওঠে। এ ধরনের ঘটনা জীবনানন্দ দাশের আপাত শান্ত জীবনে ঝড় তুলেছিল, চেতনা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।[৫৪]

বিবাহোত্তর পর্বেও দু'দণ্ড শান্তির উৎসব তাঁর জীবনের জন্য তৈরি হয় নি। বিয়ের দুবছর যেতে না যেতেই দাম্পত্য জীবন হয়ে ওঠে প্রেমহীন শয্যার যেন এক দুঃস্বপ্ন।[৫৫] প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বেদনা জীবনানন্দের চিত্তকে বিধ্বস্ত করেছে। তাঁর কবিতার পরতে পরতে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রেমের অপ্রাপনীয়তার বেদনাগাঁথা :

তারে আমি পাই নাই;/ কোন এক মানুষীর মনে/ কোনো এক মানুষের তরে
যে/ জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহবরে!/ নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোন এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে![৫৬]

যে প্রেয়সী জীবনানন্দকে ব্যথা দিয়ে দূরে চলে গেছে তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি কখনো। বার বার তার কথা স্মরণ করেছেন। প্রেয়সীর বিচ্ছেদযন্ত্রণায় তিনি ছটফট করেছেন। প্রেমবিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করে ফেলেছে। হারানো প্রেয়সীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন :

আজ বুঝি ভুলে গেছো প্রিয়া!/ পাতাঝরা আঁধারের মুসাফের/হিয়া
একদিন ছিল তব গোধূলির সহচর,/ ভুলে গেছ তুমি!
এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনির্বার তুমি/ আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ,/ শুধু অবসাদ![৫৭]

প্রেমের আঘাত জীবনানন্দের চিত্তকে আহত করেছে, ব্যথিত করেছে। এ ব্যথা ধীরে ধীরে তাঁর মনে পাণ্ডুরতার ছায়া ফেলেছে।[৫৮] বিচ্ছেদের বেদনা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচ্ছেদের মধ্যে প্রেম ও জীবনের প্রশান্তি খুঁজে পেলেও জীবনানন্দের কাছে মনে হয়েছে বিচ্ছেদ পূর্ণতা দেয়না, বিচ্ছেদ রক্তাক্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত করে হৃদয়, মন, দেহ ও আত্মাকে। তাঁর মনে হয়েছে বিচ্ছেদ মানেই হতাশা, শূন্যতা আর রিক্ততা :

যদিও বীণার মতো বেজে ওঠে হৃদয়ের বন/ একবার/দুইবার/জীবনের অধীর আঘাতে,/
তবু/প্রেম/তবু তারে ছিঁড়েফেঁড়ে গিয়েছে কখন!/ তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু!/অঘ্রানের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চ'লে গেছে ছিঁড়ে/ পাতার মতন ক'রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে![৫৯]

জীবনানন্দ দাশের প্রেমবিচ্ছিন্নতা তীব্রতর হয়েছে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনের কারণে। তাঁর বিবাহিত জীবন যেমন সুখের ছিল না, তেমনি সুখের ছিল না লাবণ্য দাশের দাম্পত্য জীবনও।[৬০] এই অশান্তিময় সংসার জীবনে প্রেম ছিল না। শুরুটা মধুময় হলেও একসময় টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। কবির ভালোবাসা ছিল বহতা নদীর মতো, যার প্রবাহে একদিন ভাটা পড়েছিল। কিন্তু লাবণ্যর দিক থেকে এ প্রবাহ বোধ হয় একদিন শুধু থেমেই যায় নি, ঘৃণা আর উপেক্ষার ঊষর মরুর রূপ নিয়েছে।[৬১] জীবনানন্দ একে 'নক্ষত্রের দোষ' বলে মেনে নিয়েছেন এবং একাকিত্বের অথৈ সাগরে ডুবে গেছেন :

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,/ আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,/ ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে/ যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;/ তবুও সাধনা ছিল একদিন,/ এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা/ আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা করে গেছি; যে নক্ষত্র/নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;/ তবু এই ভালোবাসা/ধুলো আর কাদা/।[৬২]

ব্যক্তিজীবনে প্রেম পান নি বলে এক রোমান্টিক সুদূরতা, বিষণ্ণতা তাঁকে আমূল আচ্ছন্ন করেছিলো।[৬৩] ফলে রোমান্টিক কাব্যে প্রেমের বর্ণনায় যে-মোহাবেশ, যে-উচ্ছ্বাস থাকে জীবনানন্দের কাব্যে তা অনুপস্থিত। যে-প্রেম তিনি পান নি, যে-প্রেম শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আর কোন দিনও ফিরে আসবে না, জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি।[৬৪] কবির জীবনে প্রেমের এই অচরিতার্থতাই তাঁর প্রেমবিচ্ছিন্নতাকে প্রকট করেছে। তাঁর মানসী

বনলতা সেন, সুচেতনা, সুদর্শনা, সুরঞ্জনা, সবিতা, বেহুলা, শ্যামলী, শঙ্খমালা সবাই অনন্তকালের পরিচিত হয়েও যেন চির অচেনা, তারা তাই অধরা প্রতিমারূপে ধরা দিয়েছে। কাব্যজীবনের সূচনা থেকে তিনি নির্বেদ-নিঃসঙ্গতার দুর্মর আবর্তে নিমগ্ন হলেও, কোন নারী এসে সেখান থেকে তাকে মুক্তির অমরাবতীতে নিয়ে যেতে পারে নি, তাই একাকিত্ব আর নৈঃসঙ্গ্যতার বেদনায় দীর্ণ জীবনানন্দ প্রেমের অধরা রূপ ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কবিতায়।[৬৫] কেবল ব্যক্তিজীবনই নয়, যুগজীবনে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত।[৬৬] সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ অথবা যান্ত্রিকযুগের হৃদয়হীনতা কবিকে বিক্ষুব্ধ করেছিল।[৬৭] তাই প্রেমের মহিমাতে তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান নি। নারীকে ভেবেছেন ঘাইহরিণী। প্রেমের পাত্রীর মধ্যে দেখেছেন মেকি কৃত্রিমতা।[৬৮]

চেয়ে দেখি, দুটো হাত, ক'খানা আঙুল/ একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখ দুটো চূন-চূন, মুখ খড়ি-খড়ি!/ থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি
সব বাসি, সব বাসি, একেবারে মেকি![৬৯]

জীবনানন্দ প্রেম নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন প্রেমকে শাশ্বত রূপে দেখতে :

আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে!
তুমি যদি বেঁচে থাকো জেগে রবো আমি এই পৃথিবীর' পর,
যদিও বুকের' পরে রবে মৃত্যু, মৃত্যুর কবর'![৭০]

কবির এ স্বপ্ন শূন্যে মিলে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী প্রেম তিনি পান নি। স্বল্পায়ুপ্রেম তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত করেছে। রিক্ত হাহাকারপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে বলতে হয়েছে :

একদিন একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!/ একরাত একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা!
একদিন একরাত, তারপর প্রেম গেছে চলে,-[৭১]

কবির মনে হয়েছে, যেখানে প্রেম সেখানেই ব্যথা, যেখানে ব্যথা সেখানেই বিচ্ছিন্নতাবোধ।[৭২] প্রেমের এ ব্যথা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে তিনি উচ্চারণ করেছেন :

যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে/ আরো ব্যথা বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,
ওগো প্রেম, সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে![৭৩]

প্রেমবিচ্ছিন্নতা জীবনানন্দের কবিসত্তায় অনন্তশূন্যতা সৃষ্টি করেছে। এ শূন্যতাকে ব্যাপকতা দান করেছে ধানসিঁড়ি নদীর পাশে ভিজে মেঘের দুপুরের চিলের ডাক। বিচ্ছিন্নতার বেদনায় মুষড়ে পড়ে কবি উচ্চারণ করেছেন :

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে/
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
... কে হায় হৃদয় খুঁড়ে/ বেদনা জাগাতে ভালোবাসে![৭৪]

এ বেদনা প্রেমবিচ্ছিন্নতার বেদনা। সুতরাং বলা যায়, জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমবিচ্ছিন্নতার চিত্র উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, অপ্রাপনীয়তার হাহাকার, পেয়ে হারানোর কাতরোক্তি তাঁর কবিসত্তাকে রক্তাক্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত করেছে। নিষ্প্রেম পৃথিবীর প্রেমহীন মানুষদের নির্মমতা তাঁকে বেদনাভারাক্রান্ত করেছে। এর ফলে অনন্বয়ের তীব্র আর্তনাদ ফেটে পড়েছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। বিচ্ছিন্নতার জ্বালা, একাকিত্ব, শূন্যতা, ব্যথাভারাতুরতা আর প্রেমের বিষাদমূর্তিই নির্মিত হয়েছে জীবনানন্দের প্রেমচেতনাজাত কবিতাগুলোর মধ্যে।

চার.

আধুনিক কালে পুঁজিবাদের লাগামহীন দৌরাত্ম্যে উদ্ভূত হয়েছে সমাজবিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধবিচ্ছিন্নতা এবং মানুষের আপনসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা। সমস্যা-সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা বিধানের তাগিদ, আশ্বাস ও নির্ভরতা থেকে এক সময় সমাজ গড়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগে ব্যক্তির সঙ্গে

সমাজের সেই সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ ব্যক্তির দায়িত্ব নিতে আজ অক্ষম, প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ, নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ।[৭৫] এর ফলে প্রকট হয়েছে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা। পণ্য-উৎপাদক পুঁজিবাদী জগতে মানবিক সত্তার চরম অবমাননা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যান্ত্রিকায়ন, শ্রম-বিভাজন, কঠোর বিশেষজ্ঞায়ন, ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতা, জাগতিক পরাভব এসব প্রবণতা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।[৭৬] এর ফলে মানুষ হয়ে পড়েছে নিরাশ, নির্জন এবং একাকী। সামাজিক সঙ্গতিরক্ষক মূল্যবোধসমূহ বিশ্বযুদ্ধোত্তর সঙ্কটের কবলে বিপর্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধাহত, শঙ্কাগ্রস্ত, রুটলেস মানুষদের কাছে সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধ অন্তঃসারশূন্য মনে হয়েছে। মূল্যবোধের প্রতি এই অনাস্থা-অবিশ্বাস মানবচৈতন্যে সৃষ্টি করে শূন্যতাবোধ। সমাজ ও মূল্যবোধবিচ্ছিন্ন যুগে মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে সে তার নিজের কর্মের দ্বারাই সমাজের ঐক্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ছিন্ন হয়ে গেছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সাযুজ্য বন্ধন, তখান বাধ্য হয়ে সে সমাজের অন্য মানুষ থেকে নিজেকে রাখে সংগুপ্ত; সকল সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে গুটিয়ে নেয় আপন চিত্তলোকে।[৭৭] এর ফলে মানবমনে গজিয়ে ওঠে সত্তাবিচ্ছিন্নতার মহীরুহ। প্রচলিত সকল বিধান, ধারণা, বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন মানবচিত্তে সঞ্চারিত হয় সত্তাবিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষিত। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ নিজের কর্মকে বোঝা মনে করে। মার্কস বলেছেন :

কাজকে মনে হয় যন্ত্রণা, শক্তিকে মনে হয় ক্ষমতাহীনতা, উৎপাদনকে মনে হয় শক্তি ক্ষয়। শ্রমিকের নিজস্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং তার ব্যক্তিগত জীবন কিসের জন্য যে জীবনে কোন কাজ নেই, কারণ তার নিজের কাজতো তার বিপক্ষে গিয়েই দাঁড়ায় এ কাজ তার জন্য নয়, এর উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই।[৭৮]

এভাবে নিজের কাজ এবং সৃষ্টির প্রতি আস্থা হারিয়ে সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষ হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো। পরিণতিতে সত্তাবিচ্ছিন্ন শিকড়হীন সংযোগহীন মানুষ যাবতীয় বিশ্বাস প্রত্যয় প্রমূল্য হারিয়ে নিপতিত হয় নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকার গুহায়। অনন্বয়ের অমোঘ পরিণতিতে সমাজবিচ্ছিন্ন সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষ আত্মচেতনায় উপলব্ধি করে আত্মলুপ্তির যন্ত্রণা।[৭৯] এ পরিস্থিতি অনেক মানুষকে প্রলুব্ধ করে আত্মহত্যায়। মৃত্যুর মাধ্যমে সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষ মেটাতে চায় নিঃসঙ্গতার জ্বালা।

জীবনানন্দ দাশকে বলা হয় এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি।[৮০] তাঁর কবিতা রচনার কাল ছিল নানা কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিপর্যয়ের কর্কটরোগে আক্রান্ত। মানুষের স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, হিংসা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংসযজ্ঞ, ফ্যাসিবাদের তাণ্ডবলীলা সমকালীন যুগের এই নির্মম অসঙ্গতিগুলো জীবনানন্দের কবিচিত্তকে আহত করেছিল। পৃথিবীর অসুন্দর রূপ ও যুগজ্বর দেখে ক্লান্ত, নিরাশ এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন : ‘ছিঁড়ে গেছি,ঁ ফেঁড়ে গেছি,ঁ পৃথিবীর পথে হেঁটোঁহেঁটে...।’[৮১] কখনো বলেছেন : ‘আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন...।’[৮২] অধঃপাতকবলিত যুগের বিপন্ন অবস্থা দেখে তিনি শূন্যতা ও হাতাশায় জর্জরিত হয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন : ‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন’।[৮৩]

সমকালীন জীবনের আর্থ-সামাজিক-নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতির রূপ দেখে কবির ধারণা জন্মেছে সবকিছুর মতো মানুষের হৃদয়ও আজ শেয়াল-শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের নির্মমতা যুগের যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার উদ্ভাসন জীবনানন্দের কবিতায় :

কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।/ চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়ঁ অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর ;/ যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
মানুষের লালসার শেষ নেই/ উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ/ অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ/ নেই।[৮৪]

চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া, ধ্বংস আর অন্ধকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার সুনিবিড় বন্ধন নেই। সবকিছুর মধ্যে কেবল শূন্যতা এবং হাহাকার। কবি লিখেছেন :

শূন্য চারিদিকে নীল আকাশের মতো হয়ে আসে;/ ক্রমেই গভীর নীল বলে মনে হয়।’[৮৫]

অবক্ষয়িত এই শূন্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জীবনানন্দ অফুরন্ত ক্লান্তি অনুভব করে লিখেছেন: ‘আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপপাণ্ডুর পৃথিবীতে;’[৮৬] তাঁর মনে হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র নিস্তব্ধতা নেমে এসেছেঁ নেই কোন কোলাহল। নক্ষত্রের আলোও যেন নিভে যাবার উপক্রম :

পৃথিবীর কোলাহল সব ফুরিয়ে গেছে/ সেই শেষ ঘুম এসেছে নক্ষত্রের ভিড়ে
এখুনি তাদের আলো নিভে যাবে।/ পড়ে থাকবে অন্ধকার নিস্তব্ধ চরাচর
পড়ে থাকবে ভালোবাসার চিরকাল/ সেই দিন অন্ধকারের শান্তির ভিতর
বিধাতার হাতের কাজ ফুরিয়ে যাবে।[৮৭]

যুগজীবনের জটিলরূপ দেখে জীবনানন্দ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল এমনকি আপন সত্তার মধ্যেও দানা বেঁধেছে বিষণ্নতা। তাঁর চোখে পড়েছে :

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ/ বিকেল বেলায়ও আজ একটি কঠিন
বিষণ্নতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।'[৮৮]

তিনি অনুভব করেছেন : 'মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে/ চারিদিকে রক্ত ঋণ গ্লানি ধ্বংসকীট নড়েচড়ে'।[৮৯] এ সবকিছু অবলোকন করে কবির ধারণা জন্মেছে: 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ'।[৯০] তিনি দেখেছেন : '–কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস,-/যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন–'।[৯১] যুগের এ অধঃপতিত রূপ এবং জীবনের পরিপূর্ণ বৈপরীত্য দেখে তিনি উচ্চারণ করেছেন :

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই,। প্রীতি নেই,। করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।/ যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।[৯২]

এমন অবস্থায় সংবেদনশীল মানুষদের বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। পরিস্থিতির নির্মম বাস্তবতাই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কেননা নিঃসঙ্গতা বাস্তবের জমি থেকে উঠে আসে। রাষ্ট্রকাঠামো, সমাজ সংগঠন, মানুষের জন্য যে ছক তৈরি করে দিয়েছে, যেভাবে বিজ্ঞান মানব-সম্পদশূন্য এক দেউলে মানবজাতিকে পৃথিবীর প্রভু করে দিয়েছে। সেখানে চোখ দিলে বোঝা যায় সভ্য মানুষ যেন আজ সান্ত্বনাহীন একা ও নিঃসঙ্গ।[৯৩] জীবনানন্দ দাশও সমকালীন জীবনের জটিল অবস্থা দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন সবকিছু থেকে। সময়ের প্রশান্তি নষ্ট হয়েছে যেখানে, চারপাশের সুসজ্জিত শহরের মাঝে যেখানে ঘুণ ধরেছে; বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত যেখানে পৃথিবীর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করেছে—সে পৃথিবীতে কোমল অনুভূতিসম্পন্ন কবির মনে হবে :

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়। বেদনায়। আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের/ আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।'[৯৪]

এই বেদনাভারাক্রান্ত কবি সমাজের সাথে নিজের জীবনধারার সংযোগ খুঁজে পান নি। সমাজ, পরিবার এবং পরিপার্শ্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন দুর্মরযন্ত্রণা এবং হয়ে পড়েছেন বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ :

আমি সব দেবতারে ছেড়ে/ আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :/ সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়![৯৫]

সমসাময়িক অসুস্থ জটিলসভ্যতার অভিশাপে তাঁর কবিচিত্ত দীর্ণ ও অবসন্ন। নিজের অন্তরে তিনি নিয়ত উপলব্ধি করেন আত্মবিনাশী এক অভিজ্ঞান।[৯৬] বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তাঁর কবিমন ভাসে শূন্যতার অথৈ সাগরে। সমাজ, পরিবার তথা জগৎ-জীবনের সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্চারণ করেন :

আলো-অন্ধকারে যাই। মাথার ভিতরে/ স্বপ্ন নয়,। কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়,। শান্তি নয়। ভালোবাসা নয়,/ হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়![৯৭]

ক্লান্তি এবং অবসাদভরা মন নিয়ে তিনি যেদিকে তাকিয়েছেন, সেদিকেই দেখেছেন শূন্যতা। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে তাঁর ইতিহাসচেতনার মধ্যেও এসেছে বেদনার সংবেদ। যুগজ্বর, ক্লান্তি, নৈরাশ্য, স্বপ্নভঙ্গের দুর্বহ যন্ত্রণা এড়াতে তিনি অতীতচারী হয়েছেন। অনন্তকালের জীবনযাত্রা, চড়াই-উৎড়াই এবং ভাঙা-গড়ার নির্বাক সাক্ষী পিরামিডের একাকিত্বের সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গতার সংযোগ সাধন করে লিখেছেন :

হে নির্বাক পিরামিড,/ অতীতের স্তব্ধ প্রেত-প্রাণ/ অবিচল স্মৃতির মন্দির!
আকাশের পানে চেয়ে আজো তুমি বসে আছো স্থির!/ নিষ্পলক যুগ্মভ্রূ তুলে
চেয়ে আছো অনাগত উদধির কূলে/ মেঘ-রক্ত ময়ূখের পানে![৯৮]

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের উল্লেখেও শোনা যায় বিচ্ছিন্নতাজর্জর কবিচেতনার করুণআর্তি : 'এশিরিয়া ধুলো আজ/বেবিলন ছাই হয়ে আছে।'[৯৯] এশিরিয়া, মিশর, বিদিশায় মরে যাওয়া রমণীরা যখন জীবনানন্দের কবিচিত্তে হানা দেয় তখন বেদনাবিধুর বিচ্ছিন্নতাবোধের উন্মেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কখনো বিলুপ্ত নগরীর প্রাসাদের রূপ জাগে তাঁর হৃদয়ে। ভৌতিক, কুহেলিকাময় এবং শ্বাসরুদ্ধকর আবহ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতার এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে তিনি উচ্চারণ করেন :

মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা/ সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।
ভারত সমুদ্রের তীরে/ কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে/ আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ প্রাসাদ ছিল;/ মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
আর তুমি নারী—/ এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।[১০০]

বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে জীবনানন্দ দাশ তাঁর ইতিহাসচেতনার মধ্যে ভয়াবহ বেদনার চিত্র অঙ্কন করেছেন। অতীত ইতিহাসের কোথাও গিয়ে তাঁর কবিসত্তা স্বস্তি পায় নি। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনার অভিঘাতে তিনি একবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দেখেছেন : 'সময়ের হাতে সবি বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুর।'[১০১] কোথাও তিনি আশার আলো দেখতে পান নি; কারণ :

একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেলে এবারে মানুষ/ চেয়ে দেখে আরেক পৃথিবী বুঝি ধ্বংসপ্রায়;
লোভ থেকে লোভে তবু/ ভুল থেকে ভুলে/ শূন্যতার থেকে আরো অবিকল শূন্যতার দিকে
আবর্ত ক্রমেই আরো দ্রুত হ'য়ে আসে।[১০২]

এ হতাশা, অবসাদ ও নৈরাশ্য তাঁর হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল। হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন এবং নক্ষত্রের দিকে চেয়ে উচ্চারণ করেছেন :

সন্ধার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে কোন্ ঘরে যাবো!
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,/ চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে
শান্তি আমি পাবো?/ রাতের নক্ষত্র তুমি, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাবো?[১০৩]

সত্যিই কোন পথ তিনি পান নি, যে পথে শান্তি আছে, আছে আলো। অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতো রাত্রির ভয়াবহতা ছাড়া আর কিছু দেখেন নি তিনি :

চোখের উপরে/ রাত্রি ঝরে :/যেদিকে তাকাই
কিছু নাই/ রাত্রি ছাড়া;/ অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন![১০৪]

জনতার কোলাহলের মধ্যে থেকেও তিনি একাকিত্ব অনুভব করেছেন। একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং নিসঃঙ্গতা তাঁর সমস্তসত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। নাগরিক ব্যস্ততাপূর্ণ দিনের আলো নিভে গেলে রাতের জনশূন্যরাস্তার সঙ্গে তিনি মিতালি করেছেন। তাঁর নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত সত্তার আত্মস্বীকৃতি :

রেনকোট কাঁধে রেখে শহরের রাস্তায় কত বার নেমেছি যে রাতে
কত যে গভীর রাত হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে
কেবল গিয়েছি চলে পিছল পথের থেকে আরো দূর অন্ধকার পথে
গলির ঘুঁজির ফাঁকে। ডাস্টবিন ইঁদুরের বিড়ালের আড়ষ্ট জগতে
কত যে গভীর রাতে রাতে/ হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে।[১০৫]

পাঁচ.

বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে কবির নিজের কাছেই নিজেকে অপরিচিত করে তুলেছে। মার্কসীয় তত্ত্বে দেখা যায় বিচ্ছিন্নতা যেভাবে শ্রমিকের কাছে শ্রমিকের নিজের কাজকে অপরিচিত (Indifferent) বলে মনে হয়, জীবনানন্দেরও ঠিক তেমনি নিজের সত্তাকে, নিজের ভুবনকে অপরিচিত মনে হয়েছে। নিজের প্রতি সংশয়িত। নিজের সত্তার প্রতি দ্বিধান্বিত হয়ে কবি উচ্চারণ করেছেন :

যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে/ জন্ম দেবে। জন্ম দেবে ব'লে :
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন/ আমার হৃদয় নাকি? । তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?'।[১০৬]

কখনো সত্তাবিচ্ছিন্নতার জ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বলেছেন :

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।/ হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনদিন;/ আমি অন্য কোন লক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশ গ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,/ শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এইসব ভয়াবহ আরতি!/ গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?[১০৭]

পরিবার, সমাজ, নৈতিক-সামাজিক মূল্যবোধ এমনকি আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতার পর যে ক্লান্তিচেতনা ও নৈঃসঙ্গ্য সৃষ্টি হয় তার চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। কার্ল মার্কস বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। শিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতাহেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলনহেতু বৈপবিক সংযুক্তি।[১০৮] বুর্জোয়ার পতন ও প্রলেতারিয়তের জয় লাভের ভেতরে ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। জীবনানন্দের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে ও সমর সেন মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের রসদ খুঁজেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ না ধর্ম, না মার্কসবাদ এ দুয়ের কোন কিছুকে অন্বিষ্ট করতে পারেন নি।[১০৯] কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে মৃত্যু তথা জীবন থেকে পলায়নকে তিনি বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের উপায় ভেবেছিলেন। মানবজন্মকে অসার ভেবে কখনো প্রকৃতির বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনের নিঃসঙ্গতার জ্বালা মেটানোর জন্য লিখেছিলেন :

ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস। মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার/ থেকে নেমে।[১১০]

কখনো কমলালেবু, কখনো বনহংস, কখনো শঙ্খচিল, কখনো শালিকের বেশে জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার মর্মভেদী যন্ত্রণা যখন ভোগ করেছেন, তখনই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের জ্বালা মিটিয়ে বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের পথ খুঁজেছেন। তিনি লিখেছেন : 'মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো, —প্রিয়ার মতন!।/চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকিয়েছি মুখ;/...।'[১১১] লিখেছেন : 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!/মরণ সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে!'[১১২] কখনো বলেছেন :

ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব। ধীরে। পউষের রাতে।

কোনদিন জাগবে না জেনে।/ কোনদিন জাগব না আমি। কোনদিন আর।[১১৩]

মৃত্যুচিন্তা তাঁর মনকে বিষণ্ন করেছে। জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত, বাস্তবতার নির্মমকষাঘাতে জর্জরিত, সাংসারিক জীবনে উপেক্ষিত, বিচ্ছিন্নতার মর্মবিদারী যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুকে মুক্তির অমোঘদুয়ার হিসেবে বরণ করতে চেয়েছেন। কবিতা রচনার সূচনালগ্নে তিনি সংশয়িত হয়ে লিখেছেন: 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো/একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন।'[১১৪] শরীরের অবসাদ, হৃদয়ের জ্বর থেকে মুক্তি পেতে এবং বিচ্ছিন্নতার অভিঘাত দূর করতে তিনি মৃত্যুকে ভেবেছেন কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ :

সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে

শহর।বন্দর।বস্তি।কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে/ আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে;

শরীরের অবসাদ।হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।/ শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধ'রে

আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে/ দিনের আলোর লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;[১১৫]

এভাবে জীবনানন্দ "যতদিন বেঁচে আছি", "যেদিন মরিয়া যাব", "ঘুমায়ে পড়িব আমি", "যখন মৃত্যুর ঘুমে", "যদি আমি ঝ'রে যাই", "মনে হয় একদিন", "একদিন কুয়াশায়" প্রভৃতি কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের জ্বালা দূর করার কথা বলেছেন। আত্মহত্যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে লিখেছেন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি।

কাব্যসাধনার শেষ পর্যায়ে এসে জীবনানন্দ জীবনের প্রতি আশান্বিত হয়েছেন। বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের উপায় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন জীবনের ইতিবাচক দিককে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যু কামনা করলেও 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় বলেছেন:

ভালো লাগে পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার দিনের ব্যত্যয়;

অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া। কিন্তু মরণের ঘুম নয়;'[১১৬]

তিনি প্রেম দিয়ে পৃথিবীকে ভরে দিতে চেয়েছেন, প্রেমের মহীয়ান রূপের মধ্যেই খুঁজেছেন বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের পথ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নারীকে ঘাইহরিণী বললেও 'বেলা অবেলা কাল বেলা'য় বলেছেন :

মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে

বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পরে।[১১৭]

তিনি আশাবাদী হয়ে বলেছেন :

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব/ থেকে যায়।'[১১৮]

প্রেমের ইতিবাচক মহিমার রূপায়ণে কখনো লিখেছেন :

হয়তো বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়;

হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে;[১১৯]

কখনো বলেছেন :

আমরা অন্তিম মূল্য চাই। প্রেমে;/ পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান

লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে

সময়ের সমুদ্রকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে।[১২০]

বিচ্ছিন্নতাদীর্ণ কবির নৈরাশ্য যেন কেটে গেছে। মানুষের প্রতি তাঁর চরম আস্থা।আস্থা প্রেমের প্রতিও। জীবনানন্দের ধারণা মানুষের প্রতি মানুষের কল্যাণের সর্বোত্তম সাধনার ভেতর থেকেই বিচ্ছিন্নতাকে অপনোদন আর শান্তি ও স্থিরতাকে জয় করা সম্ভব।[১২১] প্রেম দিয়ে বিচ্ছিন্নতার কালো আঁধার দূর করে পৃথিবীকে আলোকস্নাত করার প্রত্যয় থেকেই তাঁর দৃঢ় উচ্চারণ :

বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে;/ কল্যাণ কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।

শান্তি এই আজ;/ এইখানে স্মৃতি;/ এইখানে বিস্মৃতি তবু; প্রেম

ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।[১২২]

ছয়.

জীবনানন্দের কবিতায় বিষয়ের পাশাপাশি প্রকরণশৈলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ পরিদৃষ্ট হয়। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাজাত অস্থিরতা, ক্লান্তি, মৃত্যুচিন্তা ও বিষণ্নতা তাঁর কাব্য-কবিতার নামকরণ, চরণ ও শব্দবিন্যাস এবং ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেও আভাসিত হয়। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' 'সাতটি তারার তিমির,' 'বেলা অবেলা কালবেলা'।কাব্যের এ জাতীয় নামকরণের মধ্যে শূন্যতা, বিবর্ণতা এবং বিচ্ছিন্নতার আবহ ঘনীভূত হয়। কবিতার নামকরণের মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য পরিদৃশ্যমান। "মরীচিকার পিছে", "জীবন-মরণ দুয়ারে আমার", "অস্তচাঁদে", "ছায়া প্রিয়া", "শ্মশান", "মরুবালু", "নির্জন স্বাক্ষর", "স্বপ্নের হাতে", "হায় পাখি একদিন", "যদি আমি ঝরে যাই", "ভিজে হয়ে আসে মেঘ", "হায় চিল", "নগ্ন নির্জন হাত", "অন্ধকার", "ধান কাটা হয়ে গেছে", "অঘ্রাণ প্রান্তরে", "নিরালোক", "শব", "স্থবির যৌবন", "মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প", "হে হৃদয়", "একটি নক্ষত্র আসে", "মানুষের মৃত্যু হলে", "মৃত মাংস"।কবিতার এসব নাম বিচ্ছিন্নতার ভাবকে প্রকাশ করে।

কাব্যভাষায় বক্তব্য সন্নিবেশে জীবনানন্দের অনন্বয়বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ভাবনা কখনো এলোমেলো, কখনো আবার পরস্পরবিরোধী। একইসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাব্যভাষায় সঞ্চারিত হয়েছে। অনেক সময় কবিতার মধ্যে বিপরীতধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বেদনার উল্লাস, ভয়াবহ স্বাভাবিক, ভীষণ সুন্দর, উল্লাসের মতন যন্ত্রণা প্রভৃতির ব্যবহার বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিচায়ক। একই কবিতার মধ্যে বক্তব্যের বৈপরীত্য আনয়ন করে জীবনানন্দ দাশ বিচ্ছিন্নতাকে প্রগাঢ় করেছেন। তিনি একবার লেখেন : 'মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন'।[১২৩] ঐ কবিতাতেই আবার লিখেছেন : 'ঘুমাব বালির পরে জীবনের দিকে আর যাব নাকো ছুটে'।[১২৪] কখনো বলেছেন :

আমার পায়ের তলে ঝ'রে যায় তৃণ,।/ তার আগে এই রাত্রি দিন/ পড়িতেছে ঝ'রে![১২৫]

একই কবিতায় আবার বলেন :

আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ,।/ তবু সেই রাত্রি আর দিন/ প'ড়ে গেল ঝ'রে![১২৬]।

কখনো একইবাক্যের মধ্যে ভাবের বৈপরীত্য বিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্ট করে তোলে :

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,। জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।[১২৭]

এভাবে কাব্যভাষায় ও ভাবে জীবনানন্দ বিচ্ছিন্নতার এক জটিলগ্রন্থি রচনা করেছেন। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রেও হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, ব্যর্থতা এবং সংশয়ের যন্ত্রণা লক্ষ্যগোচর হয়। কাতর আঁখি, স্তম্ভিত নয়নে, দুরাশার মোহে, কুহকের কুলে, দুপুরের আকাশ, ঝরা পাতা, ভিজে মেঘের দুপুর, মরা দরিয়া, চিলের কান্না, ঘুমসাগরের রাতে, নিখিলের নীরবতা, ধূসর মেঘের ফাঁক, পউষ নিশা, শিরশিরে পুবালী হাওয়া, শ্মশান, মরুবালি, ভাঙ্গা হাল, আলেয়া, অন্ধকার, হায়, নষ্টশসা, পাঁচা চাল কুমড়া, প্রলাপপাণ্ডুর, বৃশ্চিকগ্রথিক আঁধার।এসব শব্দচয়নের মধ্যে এক ধরনের রিক্ততা ও বিষণ্নতার আবহ সৃষ্টি হয়। যা জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রবল করে। বিচ্ছিন্নতা, ক্লান্তি এবং বেদনার সুর প্রকাশ করতে তিনি শব্দচয়ন করেন এভাবে :

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, ।ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী!
।অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে কালো নদী, ।ঢেউয়ের কলসী,/ নিঝ্ঝুম বিছানার 'পরে
মেঘ-বৌ'র খোঁপাখসা জ্যোৎস্নাফুল চুপে চুপে ঝরে,।
চেয়ে থাকি চোখ তুলে। যেনো মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত- চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া!
সে যেনো দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে
মাঠে ঘাটে একা একা, । বুনোহাঁস । জোনাকির ভিড়ে!
দুশ্চর দেউলে কোন্ । কোন্ যক্ষ–প্রাসাদের তটে,
দূর উর। ব্যাবিলোন। মিশরের মরুভূ–সঙ্কটে,[১২৮]

কাব্যে ছন্দ-অলঙ্কার-চিত্রকল্প এবং প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ বিচ্ছিন্নতার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। যুগের ক্লান্তি, তিক্ততা, হতাশা প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলতে যে ছন্দের প্রয়োজন, তিনি সে ছন্দে কবিতা লিখেছেন। তাঁর ছন্দের লয় মন্থর, ভাঙা-ভাঙা অসমান ও পালিশ-না-করা, এ ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে-ভরা সুর, স্বপ্নে ভরা, শিশির কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়।[১২৯] বাস্তবিকই তাঁর ছন্দে ক্লান্তি ও অবসাদ এই মন্থর লয়ে অদ্ভুত রূপ লাভ করেছে।[১৩০]

চোখে কালোশিরার অসুখ,/ কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজা গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে/ নষ্ট শসাাপচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে/ সেই সব।[১৩১]

জীবনানন্দের কবিতায় অলঙ্কার ব্যবহারে রয়েছে বিচ্ছিন্নতার ছাপ। উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা, বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ, বরফের মতো চাঁদ, শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ, শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা, অনন্ত মৃত্যুর মতোা এ জাতীয় উপমা ব্যবহার করে কবি নৈঃসঙ্গ্যের ভয়াবহ রূপ নির্মাণ করেছেন। রূপক ব্যবহারেও একই বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। কুয়াশার ছবি,বালুর কাঁকরের রক্ত,মরণের ঘর,অন্ধকারের স্তন, কল্পনার নিঃসঙ্গতা প্রভাত, অন্ধকারের হিম কঞ্চিত জরায়ু প্রভৃতি রূপক এক বিষণ্ন আবহ সৃষ্টি করে। চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহারে কবি একইচেতনা ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্ধকারের মাধ্যমে মৃত্যুচেতনাকে প্রকাশ করতে কবি সৃষ্টি করেছেন অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রকল্প :

াদূর কুয়াশায়/ চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে;া[১৩২]

কালিক বিষণ্ণতায় বিমূঢ় কবির অসহায়চিত্তের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে চিত্রকল্পের মধ্যে, যা বিচ্ছিন্নতাকে মূর্ত করে তোলে :

এইসব শেষ হ'য়ে যাবে তবু একদিন;া হয়তোবা ক্লান্ত ইতিহাস
শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।[১৩৩]

নির্জনতা, একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার রূপনির্মাণে কবি অজস্র প্রতীক ব্যবহার করেছেন। নির্জন খড়ের মাঠ, ইঁদুর, পেঁচা, নক্ষত্র, ঝিঁঝিঁর ডাক, রাতের তারা, নীরব চাঁদা এসব নির্জনতার প্রতীক। কাজেই জীবনানন্দের কবিতার শৈল্পিক পরিসরেও বিচ্ছিন্নতার উদ্ভাসন পরিলক্ষিত হয়।

বিচ্ছিন্নতা জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তার মর্মমূলে প্রোথিত। ব্যক্তিজীবনের দুর্ভোগ; দৈশিক, বৈশ্বিক এবং কালিক জীবনের জটিলতা তাঁকে নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত করেছে। কবিতার পরতে পরতে, ভাবে এবং ভাষার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাদীর্ণ কবিচেতনাকে তিনি বাঙ্ময় করে তুলেছেন। ধনতান্ত্রিক শোষণ-নিষ্পেষণ, যান্ত্রিকজীবনের অভিঘাতে তিনি পরিবার, সমাজ, সমস্ত মূল্যবোধ এমনকি আপনসত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির জন্য কখনো প্রকৃতির বুকে লীন হতে চেয়েছেন, কখনো প্রেমের মহিমাতে হয়েছেন অবলীন, কখনো আবার মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে চেয়েছেন। সবদিক বিচারে বলা যায়, বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণে জীবনানন্দ সার্থক। কাব্যের বিষয় এবং আঙ্গিক সবকিছুতেই তিনি নির্মাণ করেছেন অতলান্ত নিঃসঙ্গতা, দুঃসহ বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্ভর যন্ত্রণার শিল্পপ্রতিমা।

তথ্যসূচি

---

১. জীবনানন্দ দাশ, "বোধ", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত ও সংকলিত), তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৯। (১৯৪৭ এর পূর্বে জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত কাব্যেগুলো হল- 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'। এরপর কাব্য ও কবির নাম ব্যবহার করা হবে।)

২. বুদ্ধদেব বসু, "জীবনানন্দ দাশ : 'বনলতা সেন," 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩৯।

৩. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, "কবি জীবনানন্দ", পূর্বোক্ত, সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ. ৩৪৮।

৪. রনেশ দাশগুপ্ত "কবি জীবনানন্দ দাশ", 'উত্তরাধিকার', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ২১।

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলিকাতা, ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৫৮৭।

৬. সফিউদ্দীন আহমদ, "বিষণ্নতা ও অস্তিত্বের যন্ত্রণায় জীবনানন্দ দাশ", 'সাহিত্যের কাল ও কালান্তর', বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৫৪।

৭. অনীক মাহমুদ, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ", 'বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য', আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ.৮২।

৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ,"জীবনানন্দ : চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্প","জীবনানন্দ, জসীমউদ্‌দীন এবং',ঢাকা,২০০২, পৃ.১৩।

৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'জীবনানন্দ দাশ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৬।

১০. মঞ্জুশ্রী দাশ, "জীবনানন্দ দাশ : আমার বাবা", 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ. ১০৪।

১১. সুচরিতা দাশ, "কাছের জীবনানন্দ", 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ. ৮২-৮৩।

১২. সজনীকান্ত দাশ, "সংবাদ সাহিত্য", 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৫৫।

১৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পাঁচ বছরের কবিতা ১৩৫৪-১৩৫৯', 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত', দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা পৃ. ৩৩৬।

১৪. অমিতানন্দ দাশ, "আমার জ্যাঠা মশাই", 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি',সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ. ১০৭-১০৮।

১৫. আবু তাহের মজুমদার, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ", 'উত্তরাধিকার', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), পৃ. ১১৭।

১৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "জীবনানন্দ : চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্প", 'জীবনানন্দ, জসীমউদ্‌দীন এবং', পৃ. ১৩।

১৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ. ২৩।

১৮. অজিতকুমার ঘোষ, "জীবনানন্দ প্রসঙ্গ : জীবন নদীর তীরে", 'জীবনানন্দ', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.১৮৭।

১৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'জীবনানন্দ : চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্প", 'জীবনানন্দ, জসীমউদ্‌দীন এবং', পৃ. ১৩।

২০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ. ৬২।

২১. আবু তাহের মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

২২. জীবনানন্দ দাশ, "সবিতা", 'বনলতা সেন,' পৃ.১৭১।

২৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ.২৩।

২৪. তানভীর মোকাম্মেল, 'মার্কসবাদ ও সাহিত্য',দিলওয়ার হোসেন (প্রকাশিত), ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১০২।

২৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ. ২৯।

২৬. অনীক মাহমুদ, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ", 'বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য', পৃ.৭৬।

২৭. বুদ্ধদেব বসু"জীবনানন্দ দাশ:ধূসর পাণ্ডুলিপি","জীবনানন্দ:জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ.৩৩৪।

২৮. জীবনানন্দ দাশ, "আমি কবি, সেই কবি", 'ঝরাপালক', পৃ.৩।

২৯. বুদ্ধদেব বসু, "জীবনানন্দ দাশ : ষূসর পাণ্ডুলিপি", 'জীবনানন্দ:জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ.৩৩৫।

৩০. আসাদুজ্জামান, 'জীবনশিল্পী জীবনানন্দ', রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ.৪।

৩১. রণেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.২২।

৩২. জীবনানন্দ দাশ, "মাঠের গল্প", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পৃ.৫৮।

৩৩. তদেব, পৃ.৬০।

৩৪. সফিউদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫০।

৩৫. জীবনানন্দ দাশ, "অবসরের গান", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', ৮১।

৩৬. ঐ, "আজ এই হেমন্তের রাত", অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৫৫৭।

৩৭. ঐ, "অন্ধকারের ঘুমসাগরের", অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৫৪৭।

৩৮. অনীক মাহমুদ, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ", 'বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য', পৃ.৭৮।

৩৯. প্রদ্যুম্ন মিত্র, 'জীবনানন্দের চেতনাজগৎ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৮৮৩, পৃ.২০।

৪০. জীবনানন্দ দাশ, "গল্পে আমি পড়িয়াছি", অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৪৪২।

৪১. ঐ, "সহজ", ধূসর পাণ্ডুলিপি', পৃ.৬২।

৪২. ঐ, "শীতরাত", 'মহাপৃথিবী', পৃ.১৮৭।

৪৩. ঐ, "জল", অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৪৬১।

৪৪. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.৩৮৬।

৪৫. তদেব, পৃ.৩৭৬।

৪৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ.৩১।

৪৭. তদেব, পৃ.৩১।

৪৮. অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.২৪।

৪৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ', পৃ.৬০৬।

৫০. মঞ্জুশ্রী দাশ, 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ.১০৪।

৫১. সুচরিতা দাশ, 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ.৮২-৮৩।

৫২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'করতলে মহাদেশ', ঢাকা.১৩৮৬, পৃ.৭৩।

৫৩. আহমদ রফিক, "জীবনানন্দের নারীভাবনায় 'মেয়েমানুষ," 'দৈনিক ভোরের কাগজ,' ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।

৫৪. তদেব, পৃ.১৩।

৫৫. আহমদ রফিক, "নির্বাসিত রাজপুত্রে'র জীবননাট্যের ট্র্যাজেডি," 'দৈনিক জনকণ্ঠ,"১৮ ফ্রেরুয়ারি,১৯৯৯।

৫৬. জীবনানন্দ দাশ, "নির্জন স্বাক্ষর," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৫৫।

৫৭. ঐ, "একদিন খুঁজেছিনু যারে," 'ঝরাপালক,' পৃ.১৯।

৫৮. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, "জীবনানন্দ দাশ",'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধায় (সম্পাদিত), পৃ.২০৬।

৫৯. জীবনানন্দ দাশ, "প্রেম," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.১০৩।

৬০. মিনু সরকার, "ঘরোয়া জীবনানন্দ," 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), পৃ.১৫১-১৫২।

৬১. আবু তাহের মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬।

৬২. জীবনানন্দ দাশ, "বোধ," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৮০।

৬৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, "জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা," 'জীবনানন্দ', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ.২৯১।

৬৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ.১২৪।

৬৫. জহর সেনমজুমদার, 'জীবনানন্দ ও পদচিহ্নময় অন্ধকার', কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.২১।

৬৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫১।

৬৭. তদেব, পৃ.১৫৩।

৬৮. অনীক মাহমুদ, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ",'বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য', পৃ.৭৯।

৬৯. জীবনানন্দ দাশ, "পরস্পর," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৭৭।

৭০. ঐ, "প্রেম," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.১০৫।

৭১. তদেব, পৃ.১০৫।

৭২. আবু তাহের মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৫।

৭৩. জীবনানন্দ দাশ, "প্রেম," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.১০৬।

৭৪. ঐ, "হায় চিল", 'বনলতা সেন,' পৃ.১৫৭।

৭৫. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ', প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.২৪।

৭৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ.৩২।

৭৭. তদেব, পৃ.৩৪।

৭৮. Arnst Fischer, æArt and Capitalism", The necessity of Art, শাহাদুজ্জামান (অনূদিত), শিল্প-সাহিত্য এবং পুঁজিবাদ, চর্যা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮, পৃ.৪৭।

৭৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', পৃ.৩৫।

৮০. দীপ্তি ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭।

৮১. জীবনানন্দ দাশ, "১৩৩৩," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পৃ.৯৮।

৮২. ঐ, "বনলতা সেন," 'বনলতা সেন', পৃ.১৫৩।

৮৩. ঐ, "সুচেতনা," 'বনলতা সেন', পৃ.১৭২।

৮৪. ঐ, "এই সব দিন রাত্রি," 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃ.৩১০।

৮৫. ঐ, "জর্নাল১৩৪২," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৫৩০।

৮৬. ঐ, "কালাতিপাত," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৫৭৩।

৮৭. ঐ, "রবীন্দ্রনাথ," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৫৭১।

৮৮. ঐ, "আবছায়া," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৫৭১।

৮৯. ঐ, "মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৪৫৬।

৯০. ঐ, "অদ্ভূত আঁধার এক," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৬০০।

৯১. ঐ, "জীবন-১৬," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পৃ.৯২।

৯২. ঐ, "অদ্ভূত আঁধার এক," অগ্রন্থিত কবিতা, পৃ.৬০০।

৯৩. হাসান আজিজুল হক, "নিঃসঙ্গতার বাস্তব," 'অতলের আঁধি,' ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৩৫।

৯৪. জীবনানন্দ দাশ, "অন্ধকার," 'বনলতা সেন', পৃ.১৬৩।

৯৫. ঐ, "বোধ," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পৃ.৮০।

৯৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "জীবনানন্দের ছোটগল্পে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা", 'জীবনানন্দ, জসীমউদ্‌দীন এবং,' পৃ.২৬।

৯৭. জীবনানন্দ দাশ, "বোধ," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৭৮।

৯৮. ঐ, "পিরামিড," 'ঝরাপালক,' পৃ.৪১।

৯৯. ঐ, "সেই দিন এই মাঠ," 'রূপসী বাংলা,' পৃ.১১৯।

১০০. ঐ, "নগ্ন নির্জন হাত," 'বনলতা সেন,' পৃ.১৫৯।

১০১. ঐ, "প্রেমিক," 'অগ্রন্থিত কবিতা,' পৃ.৫৮৪।

১০২. ঐ, "ভয় মৃত্যু গানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে," 'অগ্রন্থিত কবিতা,' পৃ.৪৪৫।

১০৩. ঐ, "নিরালোক," 'মহাপৃথিবী,' পৃ.১৭৭।

১০৪. ঐ, "উন্মেষ," 'সাতটি তারার তিমির,' পৃ.২১৭।

১০৫. ঐ, "রেনকোট কাঁধে রেখে," 'অগ্রন্থিত কবিতা,' পৃ.৫৯১।

১০৬. ঐ, "বোধ," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৭৯।

১০৭. ঐ, "অন্ধকার," 'বনলতা সেন,' পৃ.১৬৩।

১০৮. কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট ইশতেহার', নির্বাচিত রচনাবলি, ১ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো পৃ.১৫৬।

১০৯. অনীক মাহমুদ, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ",'বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য', পৃ.৮৩।

১১০. জীবনানন্দ দাশ, "ঘাস," 'বনলতা সেন,' পৃ.১৫৭।

১১১. ঐ, "জীবন," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৯৫।

১১২. ঐ, "জীবন," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৯২।

১১৩. ঐ, "অন্ধকার," 'বনলতা সেন,' পৃ.১৬২।

১১৪. ঐ, "জীবন-মরণ দুয়ারে আমার," 'ঝরাপালক,' পৃ.৯।

১১৫. ঐ, "অবসরের গান," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৮৩।

১১৬. ঐ, "আছে," 'শ্রেষ্ঠ কবিতা,' পৃ.৩২৮।

১১৭. ঐ, "তোমাকে," 'বেলা অবেলা কালবেলা,' পৃ.২৫২।

১১৮. ঐ, "মানুষের মৃত্যু হ'লে," 'শ্রেষ্ঠ কবিতা,' পৃ.৩২১।

১১৯. ঐ, "মহাত্মা গান্ধী," 'বেলা অবেলা কালবেলা,' পৃ.২৮৯।

১২০. ঐ, "পৃথিবীতে এই," 'শ্রেষ্ঠ কবিতা,' পৃ.৩৩০।

১২১. অনীক মাহমুদ, "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ",'বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য', পৃ.৮৪।

১২২. জীবনানন্দ দাশ, "অনেক নদীর জল," 'বেলা অবেলা কালবেলা,' পৃ.২৫৪।

১২৩. ঐ, "জীবন-২৩," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৯৫।

১২৪. ঐ, "জীবন-২৯," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৯৭।

১২৫. ঐ, "১৩৩৩," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.১০০।

১২৬. তদেব।

১২৭. জীবনানন্দ দাশ, "সপ্তক," 'সাতটি তারার তিমির,' পৃ.২০৯।

১২৮. ঐ, "অস্ত চাঁদে," 'ঝরা পালক,' পৃ.২২।

১২৯. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.৪৬।

১৩০. দীপ্তি ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭১।

১৩১. জীবনানন্দ দাশ, "বোধ," 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' পৃ.৮০-৮১।

১৩২. ঐ, "যেদিন সরিয়া যাব," 'রূপসী বাংলা,' পৃ.১২৩।

১৩৩. ঐ, "পরিচায়ক," 'মহাপৃথিবী,' পৃ.১৯৬।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

শওকত ওসমানের উপন্যাস: আঙ্গিক বিচার

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম*

Abstract: Shawkat Osman is one of the brightest personalities in the field of bengali novel. Such personality has been expressed in his works of novel. Specially in the novel, he is an individual creator. He has given a special shape to novel since 1947. As a creator of art he is bright with the feature of independence and fulfillment. He is expert in subject selection. In this regard he is also the father of depicting the simple lives of the rural people, agony, sacrifice and psychiatric problem of the middle class people, myth, class discrimination, and the influence of the reactive politics. As a modern artist he has brought a new addition in the novel. Here lies the artistic individuality of Shawkat Osman.

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষার অন্যতম উৎসাহী লেখক। বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে তিনি স্বাধীন, প্রাজ্ঞ, শিল্পীরূপে পরিপূর্ণ এবং স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল করেছেন। একজন সফল ও শক্তিমান লেখকই শুধু নন তিনি বরং মানবিক মূল্যবোধ ও শাশ্বত অনুভূতির রূপকারও। প্রায় সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে বাংলাদেশের উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিরীক্ষার মাধ্যমে শওকত ওসমান তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বিষয় নির্বাচন ও উপকরণ সন্নিবেশের মধ্যে রয়েছে মুনশিয়ানার পরিচয়। শুধু জীবন দর্শনের গভীরতায় নয়, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা-বর্ণনা ও বিশ্লেষণে শওকত ওসমান শিল্পকুশলী এক নান্দনিক কথাশিল্পী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চেতনাপ্রবাহী অন্ত:বাস্তবধর্মী উপন্যাসের অভিনব শিল্পরূপ বাদ দিলে আঙ্গিকগত পরীক্ষায় সবচেয়ে উৎসাহী লেখক হলেন শওকত ওসমান।[১] আঙ্গিক-পরীক্ষায় সতত উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও শওকত ওসমানের শিল্পচেতনা সামাজিক দায়বদ্ধতায় অঙ্গীকৃত। সমাজচেতনা ও মানবিক চেতনা এই দুয়ের সম্মিলিত প্রকাশ শওকত ওসমানের সৃষ্টিকর্মের সবচেয়ে পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের উপন্যাসে ফর্মের সূচি তালিকায় শওকত ওসমানের উপন্যাসগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রথাগত আঙ্গিকই ব্যবহার করেছেন। গ্রামের সহজাত জীবনের চিত্রার্পণ, মধ্যবিত্তের অত্মহুতি, অন্তর্যন্ত্রণা, মনোবিকোলনসমস্যা কিংবা মিথ বা ঐতিহ্য চেতনা, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির দাপট ইত্যাদির চেতনাগত আখ্যান নিরূপণে লেখক এক স্বতন্ত্র আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছেন। একজন বড় শিল্পী হিসেবে তাঁর হাতে শিল্প পেয়েছে নতুন মাত্রা। তাঁর সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পকুশলতা সম্পর্কে সমালোচক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন-

> শওকত ওসমানের কাছে উপন্যাস অথবা গল্পভঙ্গি প্রধান শিল্প নয়। জগৎ সংসারের চিত্র আঁকার ও বোঝার মাধ্যম। প্রতীক নয়, বিরাট কোন ভাবও নয়, নিছক বাস্তবের আকর্ষণ তাঁর কাছে অপ্রতিরোধ্য, সেইজন্য বাস্তবের অবিকল উদ্ভাসনে তাঁর ক্লান্তি নেই। তার কারণ বাস্তবের অবিকল উদ্ভাসন সমাজ সংসারে কঠিন আঘাত হানে; অন্যায় অবিচার নির্বাসন দেয়। এভাবেই শিল্পের সত্য ও সামাজিক ন্যায়বোধের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়; মিত্রতার উদ্ভব হয় স্বাভাবিকতা সঙ্গে বিপ্লবীচিত্তের সমাজ সংস্কারে শিল্পের চিত্তক প্রেরণার কাজ করে থাকে। শওকত ওসমানের *বনীআদম* ও *জননী* উপন্যাসদ্বয় তারই নজির।[২]

লেখক তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে বক্তব্য ও রচনানীতির যে সাধনা করেছেন তা অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে স্বকীয় দ্যোতনার পরিবাহী। রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব সক্রিয়তার পরিচয় রেখেছেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি ভিন্নভিন্ন আঙ্গিকের ব্যবহার করে তাঁর রচনাকে দিয়েছেন বহুমাত্রিকতা। শৈল্পিক সৃজন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব চেতনার সমন্বয় তাঁর অধিকাংশ রচনার বৈশিষ্ট্য।[৩] সমাজের মাত্রা ও ব্যক্তির মাত্রাকে তিনি অভিন্ন বোধের কেন্দ্রে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের প্রশ্নে তিনি ঐকান্তিক। সৃজনশীলতা ও মননশীলতার মাত্রাগত পার্থক্য তাঁর সাহিত্য কর্মে নতুন তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে।[৪] বাঙালি জীবনের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার সকল ক্ষেত্রকে উপন্যাসের মাধ্যমে সনাক্ত করে প্রথাগত আঙ্গিকে অন্বিষ্ট করেছেন। এখানেই তাঁর শিল্প ক্রিয়া সৃজন ও মননধর্মের মূর্ত প্রতীক। আমরা এ পর্বে এখন তাঁর উপন্যাসগুলোর শিল্পকুশলতা বিচারে মনোনিবেশ করব।

বনীআদম: বাংলাদেশের উপন্যাসে ফর্মের নিরীক্ষায় শওকত ওসমানের আর্থ-সামাজিক চেতনানির্ভর প্রথম উপন্যাস 'বনীআদম' এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। উপন্যাসে গভীর জীবন অভিজ্ঞতা ও প্রাগ্রসর অন্তদৃষ্টির সাথে শিল্পচেতনার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। অবশ্য প্রকাশ ভঙ্গির দিক থেকে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

বনীআদম একটি স্বাতন্ত্র্যধর্মী শিল্পকর্ম। তবে প্রথম উপন্যাস হিসেবে লেখক বনীআদমে স্থির করে নিয়েছিলেন তাঁর যাত্রাপথ। পরবর্তী কালে তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে যে আপোষহীন তির্যক বিষয় বিন্যাস ও শিল্প প্রকরণ নির্মাণ করেছেন 'বনীআদমে'ই তার সূচনা। তবে কাহিনী হিসেবে 'বনীআদম' সুবিন্যস্ত নয়। এখানে ব্যাপকতার ব্যাপ্তি ও চরিত্রের জীবন সংগ্রামের কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রের মানস রূপকে তুলে ধরা হয়েছে।[৫] সঙ্গত কারণেই লেখক চরিত্র সৃষ্টিতে যে সংযম ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে লেখক হিসেবে তিনি একজন দক্ষ শিল্প নির্মাতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ উপন্যাসে শহরের যান্ত্রিকতার আহবানে গ্রাম ছেড়ে ছুটে আসা হারেসের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে শহরের বস্তি জীবনের বাস্তবচিত্রও উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে নায়ক হারেসকে স্বদেশীদের দলে যোগ দিতে দেখা গিয়েছে। এই বিভিন্ন ঘটনা পুঞ্জকেই সাবলীল ভাষায় বাস্তবসম্মত রূপদান করা হয়েছে 'বনীআদম' উপন্যাসে। এ উপন্যাসে শওকত ওসমান সমাজের চাহিদা বঞ্চিত মানুষের অপরিমেয় দু:খ কষ্টের চিত্র তুলে ধরে, তাঁর বরাবরে প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি বিশ্বাস অক্ষুন্ন রেখেছেন।[৬] নিঃবিত্ত ও সর্বহারা মানুষদের জীবন সংগ্রাম, তাদের পরিবার পরিজন, শিক্ষা-দীক্ষা, বন্ধুত্ব-ভালবাসা, বিনয়-নম্রতা এসব কিছুকেই তিনি শিল্পিত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত করেছেন। তাই হাহাকার দীর্ণ উপন্যাস হয়েও 'বনীআদম' জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্জীবিত শিল্পরূপ। ভাষা বর্ণনার ক্ষেত্রেও এ উপন্যাসে লেখকের স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল রূপে অভিব্যক্ত-

> হারেসের জন্য সহানুভূতি প্রকাশের প্রশ্ন অবান্তর। জোতদারের ছড়ি কেড়ে নেবে বা অনুরোধ করবে, আর না মিয়া সাহেব এমন বলার কেই ছিল না। পড়ে পড়ে খুবই মার খেত হারেস। কিন্তু তারজ সে চিৎকার প্রকাশের মত দূর্বলতা দেখাবে, তেমন বান্দা হারেস নয়। তখন তার চোখ মুখের পেশী নানা আকার ধারণ করবে। হাত বারবার পিটুনীর জায়গায় পৌছবে, কিন্তু হারেসের গলায় তার প্রকাশ নেই। এক রকম শব্দ তার গলায় কখন খুব মনোযোগ দিলে শোনা যেত। কার অত গরজ? অনেক সময় শাস্তিদাতাই হাল্লাক হয়ে পড়ত। মার শেষ হলে হারেস ঘন ঘন নি:শ্বাস নিত; তখন চোখের জল কিনারায় উঁকিবুকি দিত, উছলে পড়ত না। মুনশি সাহেব নিজে অবাক হয়ে যেতেন কি না আল্লাকে মালুম। মনে মনে ভাবতেন, মার বোধ হয় ওর শাস্তি নয়।[৭]

সংগ্রামশীল মজুর হারেসের জীবনের বর্ণনা এখানে লক্ষণীয়। যা চমৎকার ভাবে শওকত ওসমান আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। লোকজীবনের এমন বর্ণনা শিল্পীত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত।

জননী: মানবিকতা সাহিত্যকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিষয়। শিল্পী যখন তার দৃষ্টি দিয়ে মানবিকতাকে বিশ্বস্তভাবে অধিকতর বাস্তবানুগ করে তুলতে পারেন তখনই তিনি বড় শিল্পীর মর্যাদা পান। সমাজসচেতন ও দায়বদ্ধ শিল্পী শওকত ওসমান এ উপন্যাসে মানবিকতাকে মহিমান্বিত করে দেখিয়েছেন।[৮] শুধু তাই নয়, এ মানবিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করে নি:সন্দেহে বলা যায় যে 'জননী' শওকত ওসমানের মানবতা বাদী চেতনা প্রবাহের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ।[৯] গ্রামীণ জীবনে শোষিত মানুষের আহাজারী এই উপন্যাসে বিধৃত। 'জননী'তে শওকত ওসমান স্বতন্ত্র বাস্তবতাকে নিজস্ব আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি মননধর্মী নয় মনোধর্মী।[১০] এ উপন্যাসে ব্যাপ্তির মধ্যদিয়েই তাঁর চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ বর্ণনা এবং সর্বোপরি সমাজচিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। এ সব বিষয়ের মধ্য দিয়েই বর্ণিত হয়েছে শওকত ওসমানের জীবন দৃষ্টির ব্যাপকতা। এখানকার জীবনরূপ যেমন স্বয়ং সম্পূর্ণতায় ধরা দিয়েছে তেমনি চরিত্রগুলো বিকশিত হয়েছে স্বমহিমায়। জননী দরিয়াবিবি, আজহার খাঁ, চন্দ্রকোটাল, মোনাদির, আমজাদ, ইয়াকুব, এলোকেশি, শৈরমী, রোহিনী চৌধুরী, হাতেম খাঁন এ চরিত্রগুলো প্রভৃতি ঘটনা স্রোতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েও হয়েছে স্বতন্ত্র ও পরিণামী। বস্তুতপক্ষে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো শওকত ওসমানের বক্তব্যের বাহন হয়ে আসেনি, বরং পাত্রপাত্রীগুলোকে তুলে ধরতে গিয়ে এদেরকে নিজস্বতায় সংস্থিত করার প্রয়োজনেই শওকত ওসমানকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হয়েছে।

উপন্যাসে সন্তানহারা মায়ের নিগৃহের বিবরণ পাঠককে আন্দোলিত করে। তাকে ঘিরেই এই উপন্যাসের বিস্তার। প্রথম পক্ষের সন্তান মোনাদিরকে নিয়েই জননী দরিয়ার লড়াই। আজহার খাঁর মৃত্যু দরিয়াবিবিকে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ করেছে। ধনী ইয়াকুবের প্রলোভনের নিকট তাকে পরাজিত হতে হয়েছে। তাই সমাজ বাস্তবতার নিকট দরিয়াকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। তবে ঔপন্যাসিক চরিত্রের অবক্ষয়ী সমাজ বাস্তবতার কাছে নতজানু হলেও দ্রোহী ভূমিকা জলাঞ্জলি দেননি। গ্রামীণ জীবনের সরল মনোজাগতিক সম্পর্ক তিনি উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন। শওকত ওসমান গ্রামীণ জীবনের ও সমাজের বিচিত্র উপাদান এ উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। গ্রাম সমাজের শিক্ষা, ধর্মীয় কুসংস্কার, চিকিৎসা, পর্দা প্রথা, গ্রামের শ্রেণি বিভক্ত সমাজব্যবস্থা, পীর প্রথা, জ্বীন ইত্যাদি অলৌকিক, আর্থিক দূরাবস্থা, বংশাভিযান, দারিদ্র্যের অভিযান, গ্রাম্য সমাজপতি ও মোল্লাদের দৌরাত্ম¨, ধর্মের নামে অবিচার, অন্যায়, দোয়া-তাবিজ, হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য ও বৈরিতা, গ্রাম্য জমিদারদের সংঘাত, গ্রাম্য ও ধর্মীয় দলাদলি, প্রভৃতি মানব জীবনের ও সমাজের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট জননীর উপজীব্য।[১১] গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা সংগ্রাম ও লালিত

মূল্যবোধ নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। লেখক 'জননী' উপন্যাসে ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্রের অভিব্যক্তিতে দুটি মাত্রা ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো নাট্যিকরীতি আবার কখনো চিত্ররীতি প্রয়োগ করেছেন। যা বিস্তৃত ক্যানভাসে বর্ণিত। শওকত ওসমানের Poctorial treatment এবং Dramatic treatment এর জন্ম তার যথা স্থিতবাদী নিরাসক্ত মানসলোকে[১২] উদ্ভাসিত। যা ঔপন্যাসিক শিল্পসিদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

'জননী' শওকত ওসমানের উপন্যাসগুলোর মধ্যে পরিসরের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়। সর্বদর্শী বর্ণনাকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত এ উপন্যাসের কাহিনী কাঠামোতে কোন জটিল বিন্যাস নেই। উপন্যাসের প্রথম দিকে যদিও মনে হয়েছে লেখক ইতিহাস ঐতিহ্যের পটভূমিতে কাহিনী নির্মাণ করতে চেয়েছেন এবং আলী আজহার খাঁর জীবন ভবিষ্যত লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু বেশ কিছু দূর অগ্রসর হলে সে ধারণার পরিবর্তন ঘটে। আমরা বুঝতে পারি সন্তান হোতুর দরিয়া বিবির চরম আত্মনিগ্রহের আঙ্গিক এ উপন্যাসের উপজীব্য। যা লেখকের শিল্প নৈপূণ্যের স্বাক্ষর অম্বিষ্ট। এ প্রসঙ্গে সমালোচক হাসান আজিজুল হকের উক্তি প্রনিধানযোগ্য-

> আমার মনে হয়, বড় ঐতিহাসিক ঘটনা পাশ কাটিয়ে গিয়ে শওকত ওসমান যখন গ্রামই বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের জন্যে, তখন নি:সন্দেহে তিনি চটকদারির মোহ বর্জন করে দরদী শিল্পীর ভূমিকাই পালন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে আমরা পেয়েছি জননীর মত উপন্যাস।[১৩]

সুতরাং আমরা বলতে পারি 'জননী'র আঙ্গিক নির্বাচন যুক্তিযুক্ত। গ্রন্থনে সামান্য বিচ্যুতি লক্ষিত হলেও এর শিল্পমুল্য সৌকর্যপূর্ণ।

ভাষা বর্ণনার ক্ষেত্রেও 'জননী' উপন্যাসে লেখক পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে নিরাবেগ ও সাধু ভাষায়। সুনির্বাচিত শব্দ বিন্যাসে রয়েছে যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও অপূর্ব ধ্বনিসৌকর্য। ব্যঞ্জনাময়, প্রসাদগুণ সম্পন্ন গুরুগম্ভীর শব্দ চয়নে ও ভাষার লালিত্যে শওকত ওসমান ভাস্কর্য সদৃশ শিল্পসুলভ মহিমা দিয়েছেন। অবশ্য সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক কিছুটা হলেও নিস্প্রভ ভূমিকা রেখেছেন। এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার পরও তাদের মুখে আঞ্চলিক শব্দ সম্ভারহীন মার্জিত কথ্য ভাষা প্রায়ই অশোভনীয় হয়েছে। তবে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও উপন্যাসের কোন কোন জায়গায় ভাষা অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। দরিয়া বিবির অবৈধ সন্তান প্রসবের বর্ণনাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

> দরিয়া বিবি প্রথমে শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল। হয়ত তাকে বুকে চাপিয়াই বসিয়া থাকিত। শিশুর চিৎকারে খেয়াল হয়। এই সাবধান বাণীর জন্য দরিয়া বিবি বড় কৃতজ্ঞ। সজল চোখে শিশুর দিকে তাকাইল; তারপর গামলায় গোসলের সব খুটিনাটি সম্পূর্ণ করিল। অতপর শয্যার ব্যবস্থা। কয়েকটি রঙিন কাঁথা দরিয়া বিবি বিছাইল ও দুটি কাঁথা মুড়িয়া নবজাতককে শুয়াইয়া দিল। সে নিজে তখনও দিগ্বসনা। তাড়াতাড়ি নিজে পরিস্কার হইয়া তবে নবতম অতিথিকে মাই খুলিয়া দিল। কি সুন্দর চুক চুক শব্দ হয়। কি মোটা তাজা গৌর রং শিশু। দরিয়া বিবি উম দিতে থাকে। শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল অলক্ষিতে।[১৪]

এ ধরনের বর্ণনা উপন্যাসের ভাষাকে মৌলিকত্বে সমুজ্জ্বল করেছে। আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে প্রকৃত উপন্যাস বলতে যা বুঝানো হয়ে থাকে, সেই প্রেক্ষিতে জননীকে স্বতন্ত্র আঙ্গিকের একখানি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উপন্যাসটিতে শওকত ওসমানের জীবন দৃষ্টি গভীর ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে পরিব্যাপ্ত।

ক্রীতদাসের হাসি: উপন্যাসে শওকত ওসমান একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। যা বিষয় এবং পরিচর্যায় উপন্যাসটি অভিনব। ১৯৬২ সালে লিখিত এ উপন্যাসে রূপক হিসেবে গ্রহণ করেন মধ্যযুগের ইতিহাসে হারুনর রশীদের বাগদাদ নগরী ও তার রাজদরবারকে। পাকিস্তান আমলের সামাজিক শোষণ এবং রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশের একটি কৌশল হিসেবে সেকালের কোন কোন ঔপন্যাসিক মিথ এবং ইতিহাসের আড়ালকে আশ্রয় করেছিলেন। এটি সে কালের একটি উন্নত শিল্প প্রকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শওকত ওসমানই ছিলেন এই প্রকরণের সফল উদ্বোধক।[১৫] পাকিস্তানের সমরশাহীর শাসন পীড়িত বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের বন্দীদশাকে রূপকের মাধ্যমে আভাসিত করতে গিয়েই লেখক এই রূপকের আশ্রয় নেন। সমস্ত পীড়ন ও লাঞ্ছনার মুখে তাতারীর অনমনীয় ও আপোসহীন মনোভাবকে লেখক দৃঢ়তার মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা কোন দেশকালেই কারও প্রভূত্ব স্বীকার করেন। সর্বকালের মানব সত্ত্বার সেই অপরাজেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে কোন অত্যাচারী স্বৈরশাসনই স্তব্ধ করে দিতে পারে না। দূর ইতিহাসের এমনকি এক ঘটনা অবলম্বন করে ষাটের দশকে পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তির্যক প্রতিবাদ হিসাবেই যেন সৃষ্টি হয়েছে 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের শিল্পরীতি।[১৬] যা ঔপন্যাসিক রূপবদ্ধ নির্মাণে হারুনর রশীদের বাগদাদের কাহিনীকে নাট্যরীতিতে পরিচর্যা করেছেন। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' যেন আমাদের জীবনেরই কোন জটিলতর সমস্যার কথা প্রকাশ

করেছে। দূরাগত ঐতিহ্যের আশ্রয়ে, কৌশলের অভিনবত্বে জীবন উপলব্ধির গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে, সর্বোপরি বর্ণনার অনবদ্য আকর্ষণে 'ক্রীতদাসের হাসি' বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারাই একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। অতি বাস্তবতায় এর সূচনা, রোমান্টিক স্পর্শের সজীবতায় এর বিকাশ এবং একটি স্বাপ্নিক পরিবেশে এর উত্তরণ।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক প্লট বা ঘটনা বিন্যাসে নিরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রচলিত উপন্যাসের আঙ্গিকে বিন্যস্ত নয় বলে অভিনবত্বের জন্য এটি সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।[১৭] আবার আরব্য রজনীর কাহিনীকে রূপক রূপে ব্যবহার করে নাটক ও গল্পের আঙ্গিকে বিন্যস্ত করায় কোন কোন সমালোচক 'ক্রীতদাসের হাসি'কে এক ধরনের মিশ্র ও সংকর সৃষ্টি হিসেবে[১৮] অভিহিত করেছেন। উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা হিসেবে লেখকের যে মৌল প্রতিপাদ্যটি কাজ করেছিল তা হল মানব সত্ত্বার অস্বীকৃতি ও অবমাননা। যা শওকত ওসমানের শিল্পমানসকে আলোড়িত করেছিল। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে সম্রাজ্ঞী জোবায়দা কর্তৃক গোপনে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর মিলন ঘটিয়ে বিকৃত পন্থায় নিজের অবদমিত যৌন সম্ভোগ লালসা চরিতার্থ করার ফ্রয়েডীয় প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন।[১৯] জীবন চেতনায় সুগভীর মোহনীয়তা এবং বিশ্লেষণের হৃদয়ভেদী আন্তরিকতা কাহিনীকে করে তুলেছে অপূর্ব গতিময় ও সুষমামন্ডিত। চরিত্রগুলোতে ব্যপ্তির চেয়ে তীক্ষ্ণতা, দ্বন্দ্বের চেয়ে গভীরতা, অভিজ্ঞতার চেয়ে উপলব্ধি অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রতিয়মান হয়। বস্তুত বলা যায় যে, নাট্যধর্মই হলো এ উপন্যাসে শিল্পরীতির মৌল স্বভাব-লক্ষণ।[২০] যে নাট্যরীতির সচেতন প্রয়োগের ফলে কিছুটা হলেও ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের উপস্থিতি এ উপন্যাসকে গৌণ করে ফেলেছে। এর পরও বলা সঙ্গত যে 'ক্রীতদাসের হাসি' লেখকের জীবনদর্শন ও আঙ্গিক নিরীক্ষার এক সফল দৃষ্টান্ত।

শওকত ওসমান কাহিনী বর্ণনা ও সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন পারঙ্গমত্ব। প্রয়োজন অনুসারে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। লুহাওয়া, খুবনি, আঙুর ফল, দজলা, উটের কাফেলা, খেজুর বীথি, আমিরুল মুমেনিন, আল্লনা, ফি আমানিল্লাহ, আসসামায়ো তায়তান, কওমুল আকদার, গোলাম, বেগম, মহল, সিপাহসালার, মাল এ গণিমত, জিল্লুল্লাহ, মহাফেজ, খলিফা, কয়েদ খানা, আমির, ওমরা, জল্লাদ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে খলিফা হারুন-অর-রশীদের সময় কালীন বাগদাদের ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টির প্রয়াসেও লেখকের দক্ষতা লক্ষ্য করার মতো। ক্রীতদাসের হাসিতে আরবি-ফারসি শব্দের সংলাপ ব্যবহারে লেখকের সফলতা লক্ষণীয়-

> হারুন: এই বাগদাদ শহরে তিন খানা আলীশান মাকান ইমারৎ, বাগ-বাগিচা আর বছর বছর পাঁচ হাজার দীরহাম যায় খাজাঞ্জীখানা থেকে। তিনি এসব খোয়াতে থাকেন নাকি তোমার মত আক্কেল দেখাতে গিয়ে? আমি কি দিই, তাও তিনি যেমন জানেন, আমি কি চাই তাও তিনি তেমন বোঝেন। দোকনদার খরিদারে এরকম সম্পর্ক না থাকলে কি দুনিয়া চলে।[২১]
>
> মশরুর: জাঁহাপনা, মেহেরজান সত্যি খুব সুরৎ। মুসলে এক সিপাহসালারের মাল এ গনীমৎ ছিল। বেগম সাহেবা ওকে মহলে আনান। বড় বিশ্বাসী আওরৎ।[২২]
>
> তাতারী: হে আমিরুল মুমেনিন, আপনার মেহেরবানী সীমাহীন, আপনার হৃদয় বিশাল, আমরা উভয়ে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। হে জিল্লুল্লাহ, আপনার দুই বাহুতে আরো শক্তি সঞ্চিত হোক যেন সিকান্দার শার মত আপনি পৃথিবীর অধিশ্বর হন। আমিরুল মোমেনিন জিন্দাবাদ।[২৩]

আদমজী পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'ক্রীতাদাসের হাসি'তে কাহিনী বা আখ্যানের অসংলগ্নতা থাকা সত্ত্বেও শাশ্বত মানবানুভূতির এক গভীর জীবনদর্শন উচ্চারিত হয়েছে। কাহিনী নির্মাণ ও পরিচর্যার অভিনবত্বে, জীবনচেতনার গভীরতায়, পরিবেশ অনুযায়ী সার্থক শব্দ ব্যবহারে 'ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমানের উল্লেখযোগ্য বিশেষ সৃষ্টি।

তারা দুইজন (১৯৫৮): কিশোর উপন্যাস হলেও সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসায় মাটি ও মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিফলন এ উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে। পিতৃমাতৃত্বহীন এতিম বালকদ্বয়ের জীবনকথা করুণরসের প্রস্রবণে লেখক নির্মাণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে এর অবকাঠামোর উত্তরণ। শওকত ওসমান তারা দুইজনে যুদ্ধ দূর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের চিত্র তুলে ধরে যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। যা সমকালীন ঘটনা বাস্তবতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সমাজের উচু ও নিচু শ্রেণির বিভেদী নীতির মুখোশকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। এ উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাস, শিল্পনৈপূণ্য, এবং ভাব তরঙ্গে যুগচেতনা ছাড়াও চরিত্র নির্মাণে লেখকের বিশেষত্ব লক্ষণীয়। উপন্যাসে গহর চরিত্রটি সর্বদিক থেকে বিশেষ ভাবে চমৎকারীত্ব পূর্ণ। কাহিনী, চরিত্র-চিত্রণ ও স্থান কালের প্রক্রিয়ায় 'তার দুইজন' কিশোর উপন্যাস হলেও উপন্যাসোচিত প্রকরণ গ্রন্থটিকে শিল্প সার্থকতা দান করেছে।

সমাগম (১৯৬৭): উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের বিচিত্র আঙ্গিক নিরীক্ষার অন্যতম দৃষ্টান্ত। শওকত ওসমানের সমাগম উপন্যাসটি বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রমী। সমাগম উপন্যাসে শওকত ওসমান তাঁর পলায়নবাদী শিল্পী মানসকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্প আঙ্গিকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন।[২৪] এখানে তিনি ফ্যান্টাসি জগতের পথচারী। বিভিন্ন দেশের নানা কালের মনীষীদের একই স্থানে উপস্থিত করে তাদের জীবন বোধের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আলাওল, বার্নাডশ, রমারলা, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, হাজী মহসীন, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, বেগম রোকেয়া প্রমুখ প্রয়াত মনীষীবৃন্দ ঔপন্যাসিকের স্বপ্নালোকের নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ। মহান মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সব মনীষীরা সকলেই শান্তিপ্রিয় এবং মানবতাবাদী। এরা সকলেই কল্যাণময় এক পৃথিবী স্থাপনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন উৎসব রাত্রিটিতে। উপন্যাসটি পৌরাণিক ও রোমান্টিক আবহে নির্মিত একটি গল্পরস প্রধান উপন্যাস। বিষয়বস্তুর নতুনত্বে বক্তব্য উপস্থাপনের নাটকীয়তা 'সমাগম' একটি উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস।[২৫] চিত্র সংলাপের অন্তর্বয়নে সৃজিত 'সমাগম' এর শিল্পীরীতি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে লেখকের সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও মননশীলতার পরিচয় আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, উপন্যাসের কাহিনী যথেষ্ট শিথিল বিন্যস্ত। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও লেখক পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণ স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে হয়েছেন সোচ্চার। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লেখক সিদ্ধহস্ত। উপন্যাসের সংলাপে বিদেশী শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। এতে আরবি-ফারসি শব্দ ছাড়াও প্রচুর ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার ঘটেছে। তবে বিশ্ব মনীষীদের বাক্যালাপে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ যথাযথ বলে মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ ইংরেজি উদ্বৃতি পরিহার করা যেত বলে মনে হয়। 'সমাগম' উপন্যাসটি গভীর জীবনাভিজ্ঞতা ও অনুধ্যানের বিষয় না হলেও এটি মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখকের একটি উন্নত পরিকল্পনার ফসল। উপন্যাসের আঙ্গিকগত অভিনবত্ব ও বক্তব্যের মহান উদ্দেশ্য অত্যন্ত চমকপ্রদ বলে মনে হয়।

চৌরসন্ধি (১৯৬৮): শওকত ওসমানের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস। এ উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি'র মত ততটা রূপকাশ্রিত নয় কিংবা 'সমাগমের' মত পুরোপুরি বক্তব্য প্রধানও নয়। যদিও এর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রূপকাভাস ও লেখকের বক্তব্যধর্মী ইঙ্গিত স্পষ্ট। চৌরসন্ধির জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের। যা লেখকের পরবর্তী উপন্যাস থেকে সতন্ত্র। শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করে অর্থের লালসায় শিল্পপতিদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের শিল্পরূপ 'চৌরসন্ধি'।[২৬] এখানে কাহিনী গড়ে উঠেছে সমাজের উপরতলার কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এক চোর প্রধানের তৎপরতা এবং অন্য এক চোর প্রধানের সঙ্গে তার এলাকা ভাগাভাগি ও ক্ষমতা বন্টনের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসটি পাঠান্তে সচেতন পাঠক মাত্রই বুঝতে পারেন, সামাজিক দায়বদ্ধ ও রাজনীতি-সচেতন সাহিত্য শিল্পী শওকত ওসমান আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিকতার মূলে তীর্যক আঘাত হেনেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এটি চোরদের কাহিনী হলেও এর পিছনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার স্বার্থ সংঘাতের ফলে দেশ বিভাগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও অনুমান করা যেতে পারে। মূল উপন্যাস শুরু করার আগে লেখক ভূমিকা অংশে চোরদের কাহিনী লেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে রঙ্গ-রসাত্বক ভঙ্গি বেছে নিয়েছেন তার মাধ্যমে উপন্যাসটির অবকাঠামো ধরা পড়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনীতে চোর সর্দার কাল্লুর কাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে কোব্রা সয়ীদের প্রেমপত্র ভিত্তিক উপকাহিনী। উপকাহিনীটি থাকায় উপন্যাসটি বেশ রসঘন হতে পেরেছে। উপন্যাসটির প্রথম কাহিনীতে বর্ণনাত্মকরীতির সঙ্গে নাট্যরীতির সামান্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে এ গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয় ও বিন্যাসের অভিনবত্ব অবশ্য স্বীকার্য।[২৭] যা শ্রেণি সচেতন জীবনধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির শৈল্পীক রূপ। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কাল্লু রিকসা চালক থেকে গুন্ডা দলের সর্দার হয়ে শেষ পর্যন্ত মিল মালিক তথা রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে জীবনবোধের বলিষ্ঠতায় ও শিল্প প্রকরণের সুসন্নিবেশে শওকত ওসমান একজন সফল ঔপন্যাসিক হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন।

'চৌরসন্ধি' উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনারীতিতে অন্যান্য উপন্যাসের মতই শওকত ওসমানের নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষণীয়। শব্দ ও শব্দের অন্বয় নিয়ে নিরীক্ষা এখানেও বিদ্যমান। উপন্যাসে ধাঙড় পল্লির অনুপুঙ্খ বর্ণনায় শওকত ওসমানের দক্ষতার পরিচয় রয়েছে-

> স্পীড একটু কমিয়ে ফেলল কাল্লু। একদম দশ মাইলের নীচে। তারপর কানখাড়া করে সে। বুঝতে একটু দেরী হয়না। ধাঙড় পল্লীতে পচুই কি হাড়িয়া খেয়ে জোসনা রাত্রে সবাই ফুর্তিতে মেতেছে। ব্রেক কষলে কাল্লু। আবার সজাগ কান। এবার সবই স্পষ্ট শুনতে পায় সে। মেথর ধাঙড়রা ডুগডুগি বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান করছে। মাঝে মাঝে ধুয়ার কায়দায় এহহে, এহহে রব অথবা চিৎকার।[২৮]

উপন্যাসে ধাঙড়দের সংলাপও অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই দেখা যায় সংলাপের যথোপযুক্ত ব্যবহার।

> যুবতী। কিরে, তুই কহে হামার মুহে গন্ধ।

যুবক। সাচ।

যুবতী। হাসপাতালের ডাগদর বাবু কইত হামার মুহে গোলাপ ফুল রহে।

যুবক। চুপ, বাজমোতিয়া।[২৯]

উপন্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ পরিহাসের বুনোনিও লক্ষ্য করা যায়। প্রেমিকার প্রেমপত্রে সয়ীদকে সম্বোধন করা হয় 'প্রিয় আমদানী' বলে প্রেমিকার নিজের নাম 'কোব্রা' এ ধরনের শব্দ চয়নে লেখকের তির্যক দৃষ্টির অনুভব না করার উপায় নেই। সব মিলিয়ে আমাদের বিবেচনায় 'চৌরসন্ধি' কেবল সুখপাঠ্য ও নিরীক্ষাধর্মী ও সরস নকশাধর্মী উপন্যাস নয় এবং এর অন্তরালে গভীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি শৈল্পিক ফল্গুধারার আঙ্গিকে বহমান।

রাজা উপাখ্যান (১৯৭০): ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসে পূর্ব বাংলার ষাট এর দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করার যে প্রচেষ্টা শওকত ওসমানের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসে। এ উপন্যাসে তিনি বাস্তবতার জায়গায় স্থান দিয়েছেন প্রতীক ও রূপককে। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সুদূর অতীতের কাহিনী কিংবদন্তির এবং এ সবের মাধ্যমে মানবতা ও মানব অস্তিত্বের বিজয়কে মহিমান্বিত করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিস্বার্থ, ব্যক্তিপ্রেম অপেক্ষা সমষ্টিপ্রেম এই সর্বাধুনিক চেতনা এ উপন্যাসের উপজীব্য।[৩০] যা ঔপন্যাসিক সমকালীন উদ্ভাবনী দক্ষতাকে সময় স্বভাবের সঙ্গে শিল্প অভিপ্রায়ে বিম্বিত করেছেন। 'রাজা উপাখ্যানে'র কাহিনী খুবই চমকপ্রদ এবং সরল ও স্পষ্ট। অভিশপ্ত রাজা জাহুকের শাপমুক্তি এবং নতুন জীবনোপলব্ধিতে উত্তরণ 'রাজা উপাখ্যানে'র মৌল প্রতিপাদ্য। শোষিত অবরুদ্ধ সমাজ জীবনে ব্যক্তিস্বার্থ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয় সামূহিক জীবনচৈতন্যে উত্তরণই হল প্রত্যাশিত। শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, শৃঙ্খল জর্জরিত সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইঙ্গিতে 'রাজা উপাখ্যান' অনন্য।[৩১] পাকিস্তানি ধর্মতন্ত্র ও সেনাতন্ত্র চালিত রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শিল্প উপকরণ হিসেবে তিনি ইসলামি যুগের কাহিনী গ্রহণ করেছেন। পরিচর্যা ও ভাষারীতি প্রয়োগেও তিনি মুসলমানি আবহ সৃষ্টিতে মনোযোগী। ধর্মের ছদ্মবেশী প্রতারক চরিত্রের অন্তরালে যে মনুষ্যত্ব বিরোধী হিংস্র পাশবিকতা পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্র লালন করেছে, রূপক প্রতীকের আশ্রয়ে শওকত ওসমান তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ সময়ের পলায়নপর সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামনে কেন্দ্রীয় চরিত্র হরমুজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিম্বিত করেছেন। এ চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে শ্রেণিবিভক্ত ও শোষণ মূলক সমাজে ব্যক্তি স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করার নিয়মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ।[৩২] শওকত ওসমানের শ্লেষের আঘাতে মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করাই শৈল্পিক দর্শন হরমুজ চরিত্র। যা শওকত ওসমান এ নিটোল কাহিনীকে বিশ্লেষণের গভীরতায় শ্লেষের তীব্রতায় পরিমিতির সৌষম্যে একটি সার্থক শিল্পকর্ম করে তুলেছেন। তাঁর পরিচর্যা বুদ্ধিদীপ্ত, বর্ণনা সংকেতধর্মী, ভাষা গতিশীল, আবেগময় ও বিষয়োপযুক্ত। 'রাজা উপখ্যান' শুধু শওকত ওসমানের অন্যতম শিল্প কর্ম নয়, আমাদের উপন্যাস সাহিত্যেও বিশিষ্টতম শিল্পকর্ম।[৩৩] বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী এ উপন্যাসে এমনভাবে উল্লক্ষিত হয়েছে যে, তার আধুনিকতা ও সর্বজনীনতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

অবশ্য বলতে হয় যে উপন্যাসের কাহিনী কাঠামোর পরিণতি কল্পনা বিলাসী। কল্পনা বিলাসী চোখে শওকত ওসমান জুলুমবাজ রাজাকে জনকল্যাণকামী রাজা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাছাড়া কাহিনী রূপকাশ্রয়ী বলেও কথনভঙ্গি ও আখ্যানে গাঁটছাড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। যা উপন্যাস পাঠান্তে পাঠকের সহজেই এক ঘেয়েমী আসে। এসব ছোট খাট ত্রুটি সত্ত্বেও চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী শৈল্পিক মানদন্ডে চিত্রিত হয়েছে। 'রাজা উপখ্যান' উপন্যাসের ভাষা বিষয় অনুসারী, গতিময় ও আবেগপূর্ণ। রূপকধর্মী রচনা হলেও সমস্যার আধুনিকতা ও সর্বজনিনতা প্রতি মুহূর্তে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। পটভূমি অনুসারে নাট্যরীতি ও চিত্ররীতির প্রয়োগ উপন্যাসে অপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে। এখানেই শওকত ওসমানের শিল্পরীতির উৎকৃষ্ট নির্দশন।

মুক্তি সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ দিনগুলোতে পাকবাহিনীর অত্যাচার ও কাহিনীকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখে সেই সময়কার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই ঔপন্যাসিক নির্মিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলোর প্রকরণ। দেশ ভাগ পরবর্তী উপন্যাসগুলোর সাথে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোর আঙ্গিকগত পার্থক্য গোচরীভূত। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে এপিকের ব্যবহার কম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। এ সময় তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্তচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি লেখককে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে। আমরা জানি আধুনিক বাংলা উপন্যাসে শিল্পরীতির পরিবর্তনের সূচনা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) ও 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)।

প্রথমটিতে বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়টিতে অন্তর্বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা।[৩৪] অনুরূপ ভাবে লক্ষ্য করেছি শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলোর ভাষারীতির ও শিল্পীরীতির পরিবর্তন। সময়, সমাজ ও বাস্তবতার নিরিখে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের প্রকরণ ও আঙ্গিক নির্মাণ করেন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন-

> সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচেনা। আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন।... উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তি মানুষ। এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।[৩৫]

সমালোচকের মন্তব্যের আলোকে বলা সঙ্গত যে ব্যক্তি মানুষ আর সময় এ দুয়ের ভিতর সঙ্গতি স্থাপনই ঔপন্যাসিকের শিল্পগত সার্থকতা। কেননা সময়ের দায় ঔপন্যাসিককে মানতে হয়। এর ভেতর দিয়েই তাকে মানুষের নিকট পৌঁছতে হয়। বস্তুত সে কারণেই ঔপন্যাসিককেই পাল্টাতে হয় উপন্যাসে ফর্ম বা আঙ্গিক। আমরা এবার শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলোর শিল্প-আঙ্গিক আলোচনায় সচেষ্ট হব।

জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১): শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার দৃষ্টিকোণ ও ভাষারীতির প্রয়োগে মুক্তিযুদ্ধ শিল্পমাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত গাজী রহমান শওকত ওসমানের যেন সময়ের বিবেকী কণ্ঠস্বর। গাজী রহমান অন্তর্সংলাপ এর মাধ্যমে ঘটনা বয়ান করেন। উপন্যাসে অবচেতন প্রবাহ ঘটনার সূত্রকে অস্থির ও অনিশ্চিত করে তোলে, শিল্পিত বোধে লেখক এক সমন্বভাবী বাস্তবতাকে তুলে ধরেন।

> ... আজব বিপণি। শুধু নর নারী, শিশু-কিশোরদের দেহ টুকরো ঝুলছে। আংটা থেকে। গোটা কোথাও কিছু নেই। উরু, স্তন, দেহকান্ড-এমন নিছক অংশ পর্যন্ত আছে। কসাইগুলো কাটছে আর ঝুলিয়ে রাখছে।
>
> ''এটা দোকান না?" আমার প্রশ্ন
>
> -আমরা কিছু বেচিনা।
>
> -দোকান কি না?
>
> -না দোকান নয়।
>
> -তবে এই বাজারে?
>
> -ভাস্কর্য। অপরে দেখবে বলে।
>
> -ভাস্কর্য?
>
> -হাঁ জ্যান্ত মাংস লাশ বানিয়ে ভাস্কর্য। আমাদের ভাস্কর আবার
>
> -রণবিশারদ সেনাপতি।
>
> - ''বেশ। কিন্তু তোমাদের খরিদ্দার নেই কেন?" যেই মাত্র এই প্রশ্ন করেছি তারা আমাকে সাত আটজনে ঘিরে ধরল। প্রত্যেকের হাতে কসাইয়ের পেশায় যা যা চিজ লাগে তার সরঞ্জামসহ।
>
> -এগুলো কি হবে?
>
> -তোমাকে কসাই হতে হবে।
>
> -আমি কসাই হতে যাব কেন?
>
> -যাবে।
>
> -মানে?
>
> -হবে। হতে হবে।
>
> -জোর জবরদস্তি?
>
> -তাই।
>
> -যদি না যাই?

-হবে। আলবৎ হবে।

-না আমি কসাই হতে পারব না।[৩৬]

নির্মম বাস্তবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গাজী রহমানের চেতন অবচেতন মনে ধরা দেয় এ প্রতীকধর্মী শিল্পআঙ্গিক। শওকত ওসমান তাঁর এ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' এ নির্মাণ শিল্পে হয়েছেন যত্নবান। কারণ অস্থির সময়কে এ অখন্ড ভাবনায় চিত্রায়ণ করতে গিয়ে অর্ন্তবাস্তবতার রূপায়ণ ঘটাতে হয়েছে। Inner-reality ধর্মী প্রবণতায় চরিত্রের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসাকে সামনে এনে শিল্পী শওকত ওসমান উপন্যাসে মেসেজ দিয়েছেন। তবে কাহিনী বিন্যাসে হয়তো পুরেপুরি সার্থক নয়। কিন্তু মুক্তিকামী বাঙালির রক্তঝরা স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলোর জার্নালধর্মী চিত্রায়ণেই উপন্যাসটির শৈল্পিক সার্থকতা নিহিত। লেখকের মুক্তিযোদ্ধা ভিত্তিক উপন্যাসগুলো দূর্বল আঙ্গিকের হলেও 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' এর গাজী রহমান শিল্প নৈপুণ্যে প্রশংসিত চরিত্র।[৩৭]

নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩): পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে নারী নির্যাতনের চিত্র স্বতন্ত্র আঙ্গিকে এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার আগে দু:খিনী বাংলাদেশের চুড়ান্ত দু:খ যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনার কয়েকটি মর্মবিদারী সত্য ছবি ঔপন্যাসিক গ্রীক চিরায়তিক নাটকের নির্যাসের পদ্ধতিতে[৩৮] তুলে ধরেছেন। 'নেকড়ে অরণ্য' বহুবর্ণ সমন্বিত কোন বৃহৎ আলেখ্য নয়, বরং কয়েকটি রেখার টানে রূপায়িত একটি স্পষ্ট রেখাচিত্র। জীবনের খন্ড খন্ড অংশ বাছাই করে শিল্পকলা খাটিয়ে সাজিয়ে-গেঁথে দেওয়াটাই গল্প উপন্যাস লেখার আঙ্গিকারের মোট কথা। ..... সমাজের খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন অংশের জীবন সত্যই হোক আর সমাজের বৃহত্তর জীবন সত্যই হোক সে সত্য কতটুকু রূপায়িত হবে তা নির্ভর করে জীবনের খণ্ডগুলো বেছে নেয়ার উপর। এই বেছে নেয়ার কাজটা ঠিকমতো না হলে হাজার শিল্প কৌশল প্রয়োগ করেও লেখক সত্যকে রূপ দিতে পারবেননা। 'নেকড়ে অরণ্য'তে এই বেছে নেয়ার কাজটা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সংসাধিত।[৩৯] 'নেকড়ে অরণ্যে'র বক্তব্যের মতো শিল্প প্রকরণেও লেখকের পরিচয় বিদ্যমান। তবে যথাযথ উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য'কে বলা চলে না। কারণ এর মধ্যে চরিত্রসমূহের বিকাশ নেই। এ গ্রন্থ একটি ডায়েরী বা স্মৃতি চিত্র। বিচ্ছিন্ন বিষয়ভিত্তিক হলেও এ বই বাংলাশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি AvwÍK দলিল। শওকত ওসমানের শব্দ ব্যবহার স্টাইলে আরবি-উর্দু এমনিতেই অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বেশি থাকে। 'নেকড়ে অরণ্য'-এ পরিবেশ গত কারণে লেখক নির্বিঘ্নে আরবি ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন।

দুই সৈনিক (১৯৭৩): মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'দুই সৈনিক' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক বাহিনী কর্তৃক সারাদেশে যে হামলা চালায় তারই ক্ষুদ্র শিল্পসৃষ্টি। তাদের পাশবিক ক্রিয়াকলাপই উপন্যাসটির ঘটনা তরঙ্গ। এ উপন্যাসে লেখক আঙ্গিকগত বিবেচনায় তেমন সফলতা দেখাতে পারেননি। তবে উপন্যাসের শিল্পরূপের যে একটি বহু ব্যবহৃত উপকরণ পরিহাস ও শ্লেষ তাকে তিনি হাহাকারের মধ্যেও ঘষে ঘষে ব্যবহার করেছেন।[৪০] কিন্তু তবু শিল্পরীতির মানদন্ডে এ উপন্যাসকে সার্থক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। গ্রন্থটি মূলত মুক্তিযুদ্ধের একটি খন্ডচিত্র। তবে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে লেখকের পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দুই সৈনিকে'র মখদুম হাজির চরিত্রে তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী বাঙালির দালালির অভিনবরূপ পরিলেপনে লেখকের শিল্প আঙ্গিক প্রশংসনীয়। দুই পাকিস্তানি পাষণ্ড সৈনিকের পরিচর্যা করতে গিয়ে ঘরের ইজ্জত খোয়ানোর দরুন যে ক্ষুব্ধ গ্রামীণ প্রধান AvÍnZ¨v করেন এবং যার AvÍnZ¨vq উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে, তারই মোহমুক্তির ইঙ্গিত প্রদানই 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের নির্মাণ শৈলীর উল্লম্ফন।

জলাংগী (১৯৭৩): শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ট্রাজিক উপন্যাস 'জলাংগী'র আখ্যানভাগ যেমন হৃদয়স্পর্শী ও করুণ, তেমনই শানিত দ্যোতনায় ব্যঞ্জিত। এ উপন্যাসে বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক নিষ্ঠুর পরিণতির সত্য ছবি অঙ্কন করেন স্বতন্ত্র শৈলীতে। মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশের তুঙ্গতম বিক্ষুব্ধ রূপ সাধারণ গ্রামবাসীকেও কিভাবে আন্দোলিত করেছে এবং তাতে তাদের সাড়া প্রদান কীভাবে ঘটেছিল তা 'জলাংগী'তে অত্যন্ত দক্ষ ও কৌশলী নির্মাণে ফুটে উঠেছে। এখানে দুটি প্রধান চরিত্র ফয়েজ মৃধা এবং জামিরালি। এদের সম্পর্ক মূলত পিতাপুত্রের। তাদের মধ্যকার সংলাপটি এমন-

-শুধু স্কুল কলেজ না, বা জান। গোটা ঢাকা শহরের কলকারখানা আপিস আদালত সব বন্ধ -ক্যান?

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হুকুম।[৪১]

আবার জামিরালি ও তার চাচা কাজেম মৃধার সংলাপটিও উপলব্ধি করার মতো-

-শহরের খবর কী চাচা জান?

-বয়কট চলছে।

-হেত চলবই। ছ'দফা না পাওয়া পর্যন্ত।

-আমাগো কইলে গায়ে আমরাও খাজনা বন্ধ কইরা দিমু।[৪২]

পাকিস্তানি দু:শাসন, শোষণ-বঞ্চনা, ছলনা এবং এদেশে ঔপনিবেশবাদী শোষণের পরিণামে সাধারণ গ্রামবাসীর অন্তর কীভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছে 'জলাংগী' সেই মূঢ়তারই মূর্ত প্রতীক। শওকত ওসমান বরাবরই একজন অভিজ্ঞ নির্মাতা। উপন্যাসে কাহিনীর প্রয়োজনে যাবতীয় খুঁটিনাটি দিক অখণ্ড মনোযোগের সাথে তিনি সন্নিবেশ করেছেন। শব্দ ব্যবহার, তুলনা, জীবনদর্শন, বর্ণনা, বাক্যের গাঁথুনি, উপমা-ব্যবহার, চরিত্র-নির্মাণ, নাটকীয়তা, কাহিনীর গতি সবই উত্তম উত্তীর্ণ মানের। বিশেষ করে রোমান্টিক কল্পনার স্বপ্নাচ্ছন্নতা যেখানে ভাল লাগার মুগ্ধ আবেশে ভরিয়ে তোলে, ঠিক তেমনি ক্লাইমেক্সের ধাঁধাল পরিণতি ... পাঠককে থমথমে বিষাদে বিমুঢ় করে দেয়।[৪৩] অবশ্য নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবনে লেখকের স্বার্থকতা এখানে অনুপস্থিত। তবে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত ঘটনাক্রম, জাতীয় জীবনের কৌতূহল উৎকণ্ঠা, পাকিস্তানী অপশক্তির বর্বরতা, গ্রামাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি প্রভৃতি প্রসঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ বিন্যাস এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে শিল্পীরীতিতে প্রথাগত আঙ্গিকই লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের শিল্পরীতি মূলত বিষয়বস্তু ও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংশ্লিষ্ট। একটা প্রলয়ঙ্করী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পরীক্ষিত ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের রক্তোজ্জ্বল চেতনার শিল্পরূপ নির্মাণ।[৪৪] যা শওকত ওসমানই করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান আমলের সামাজিক শোষণ এবং রাষ্ট্রীয় পীড়ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশের একটি কৌশল হিসেবে সেকালের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলো একটি উন্নত শিল্প প্রকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শওকত ওসমানই ছিলেন এ প্রকরণের সফল উদ্বোধক। মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসগুলো শিল্পী শওকত ওসমানের হাতে গ্রাম অবকাঠামোর সূত্র ধরে যেমন শিল্পীতরূপ পেয়েছে। তেমনি আন্দোলন সংগ্রামের যোগ সূত্রে হতাশা, নৈরাশ্য, স্বপ্ন ভঙ্গ, আশাবাদ ও বিষয় অনুষঙ্গী হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা এবং মানব অস্তিত্বের নানামুখী সংকট উপন্যাসের বিষয়ের মতো শিল্পকেও প্রভাবিত করেছে। এ পর্যায়ে উপন্যাসের উপকরণ পরিধি যেমন বিস্তৃতিতর হয়েছে, তেমনি সামাজিক জটিলতার বহুলাঙ্গিক প্রকাশ উপন্যাসধৃত চেতনাকে করেছে দ্বন্দ্বক্ষত ও জটিলতর। স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও গতির রূপায়ণে শওকত ওসমান সন্ধান করেছেন অনিবার্য শিল্পরীতি, উদ্ভাবন করেছেন নব আঙ্গিক, বা রূপকল্প। ১৯৭১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাস নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ফলে ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান তাঁর উপন্যাসে সামাজিক ও রূপক প্রতীকে জীবনের সাম্প্রতিক সংকট ও জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করেছেন। শিল্পরূপের সূক্ষ্মত্তর বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য সামাজকাঠামো ও মধ্যবিত্তের মানস গঠনের যে রূপান্তর প্রত্যাশিত ছিল, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তা আজও দূরধ্বনিমাত্র। ফলে উপন্যাসে প্রথাগত সমাজ প্যাটার্ন ও উনিশ শতকীয় রীতি প্রকরণ রয়ে গেছে। আমরা এ পর্বে লেখকের উপন্যাসগুলোর শিল্প প্রকরণ আলোচনা করব।

পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩): উপন্যাসের সূচনায় বাংলাদেশের অখ্যাত পাড়াগাঁ গৌড়গ্রামের জীবন বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। লেখক শওকত ওসমান রূপকের আশ্রয়ে নিগূঢ় সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। যে কারণে সাম্প্রতিক বিশ্বের জটিল ও দ্বন্দ্বময় মানব পরিস্থিতিতে ঔপন্যাসিকরা রূপক ও প্রতীককে সচেতন শিল্প কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৪৫] উপন্যাসে দীর্ঘ খরা, বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পতঙ্গ কুলের আক্রমণ, সঙ্ঘশক্তির উন্মেষ প্রভৃতি অনুসঙ্গ প্রতীকী তাৎপর্যমন্ডিত। যা শওকত ওসমানের জীবন জিজ্ঞাসা মানবমুখী চেতনায় উজ্জ্বল। এ উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবে বেশ কিছু প্রতীক ব্যবহার করেছেন। এসব প্রতীকের সমবায়ে একটি সম্পূর্ণ রূপকীয় বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতাউত্তর কালের সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের অন্ত:শীল চেতনার পুনরুজ্জীবন আকাঙ্ক্ষা 'পতঙ্গপিঞ্জর' উপন্যাসের জীবনার্থের ভিত্তি। শওকত ওসমানের মানবতাবোধ এ উপন্যাসের শিল্পরীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আসলে শওকত ওসমানের সমাজসচেতনতা, জনজীবন সম্পৃক্ততা, মানবহিতৈষণা প্রভৃতি অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে রূপক উপন্যাসগুলোতেই ইতিবাচক অর্থে তীব্রতা লাভ করেছে। আর এরই সার্থক অনুসারী হয়েছে তাঁর শিল্পবোধ ও শিল্পসুষমা তথা শিল্পশক্তি। সার্থক ও সুসমন্বিতভাবে তিনি আঙ্গিককে বিষয়ের অনুগামী করে এই শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।[৪৬] তবে লেখক যে নৈপুন্যের সাথে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তাতে রূপকাভাস ছাড়াও নিজস্ব গল্পের আকর্ষণে

পতঙ্গ পিঞ্জর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যা রূপক আঙ্গিকের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিবাদী।[৪৭] এ গ্রন্থে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফর্ম নিরীক্ষার প্রবণতাকে তুলে ধরা। যাকে বলা হয়, ফর্ম নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পের এক মেধাবী সংযোজন।

'পতঙ্গ পিঞ্জর' উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় লেখক মাঝে মধ্যেই চেতনাপ্রবাহের আশ্রয় নিয়েছেন এবং প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছেন। এজন্য কাহিনীর প্রথম দিকে কিছুটা এক ঘেয়ামী মনে হয়। সতের পর্বে উপন্যাসটির কাহিনী বিন্যস্ত। প্রথম দিকের কাহিনী কিছুটা শ্লথ গতি মনে হলেও শেষের দিকে জমাটবন্ধতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত উপন্যাসটির সমাজ ভাবনা তীক্ষ্ণ ও তীব্র। সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে ভাওতা দেয়ার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের তীব্রতা এ উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক ওজস্বী, গতিশীল অথচ wedrুcvïK ও কৌতুক পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন-

> গফুর গুন গুন সুর ভাজছিল যখন মানুষ অনাহার অনিদ্রা প্রেমের কাছে শুধু তুচ্ছ হয়ে গেলনা তাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার স্তর থেকে নিচে নামতে নামতে একটি মাত্র লয়ে তখন লুপ্ত। তাই গফুর যে নিজেই লয়প্রাপ্ত এতক্ষন অধৈর্যের গঙ্গায় মজ্জমান ছিল, ভেসে উঠল আলতো সমীরের সঙ্গে সুধায় এবং হাত নয়, দুটো আঙ্গুল শুধু বাড়িয়ে দিতে লাগল যতক্ষণ না তা স্পর্শ করে একটা স্তনের চুচুক গোল এবং নরম, অতি নরম, সন্তানের সর্বদৌর্া¨বঞ্চিত। সাপের গায়েও হাত পড়লে এত দ্রুত আঙুল পেছিয়ে নিতে পারতনা গফুর যে ভাবে তার পশ্চাদপসরণ করল। পুনরায় পশ্চাদপসরণের সময় দুই জঙ্ঘামধ্যস্থিত বদ্বীপে যখন আঙুল লাগল, তখন গফুর অদৃশ্য শক্তি আকর্ষিত যেন রকেটের কোন কোন দাহ্য রসায়ন হঠাৎ জ্বলে উঠলনা শুধু, গতির তোড়ে দিকভ্রান্ত আলিঙ্গনের খেলপা জাল অনেক দূর ছড়িয়ে দ্রুত শামুক মুখের মতো বন্ধ হয়ে গেল।[৪৮]

এ উদ্ধৃতি সূত্র থেকে লেখকের সামগ্রিক শক্তি অনুমান করা যায়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা শওকত ওসমানের শৈল্পিক অনুশীলনে সমৃদ্ধ। যা অনিবার্য রূপাঙ্গিক প্রকাশে সমর্থ।

আর্তনাদ (১৯৮৫): শওকত ওসমান স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের সময়কালে একুশের চেতনায় 'আর্তনাদ' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। মাতৃভাষা বাংলার জন্য আলি জাফর নামক একজন কেরানীর Av‡Ïvrmর্গের কাহিনী শিল্পমাত্রায় অভিব্যক্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক সেই সঙ্গে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তি বেদনাকে দেশ মাতৃকার মর্মমূল সংলগ্ন করে সমগ্রতা দান করেছেন। উপন্যাসটিতে যুদ্ধোত্তর শিল্প প্রকরণ সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিক ভাষা আন্দোলনের চেতনাবাহী এ উপন্যাসে সমাজের মাত্রা এবং ব্যক্তির মাত্রাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। 'আর্তনাদ' এর ধ্বনিপুঞ্জ যেন লোকায়ত মানুষ কিংবা উন্নতগ্রীব কোন ঘটনার অমোঘ, অবিনাশী এক আহ্বান, টেকনিক এখানে গৌণ।[৪৯]

উপন্যাসটির নির্মাণ শৈলী কোরাস ও একাকী এই দুটি অংশে বিভক্ত। কোরাস অংশে যাত্রী বোঝায় চলমান বাসের পটভূমিতে কাহিনীর উন্মোচন। ভাষা আন্দোলনে শহীদ সন্তানের পিতার নি:শব্দতা এবং দীর্ঘশ্বাস অতপর তার জিজ্ঞাসা ও ক্রন্দনে সকল যাত্রীর মধ্যে আলোড়ন এ অংশের উপজীব্য। একাকী অংশে Avïকথনের ভঙ্গিতে সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক বাঙালি জাতিসত্ত্বার অন্তরিত হাহাকারকেই রূপায়িত করেছেন। লেখক উত্তম পুরুষে ও বর্ণনাধর্মী প্রবণতায় এবং ইতিহাসের আলোকে ও বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টি দিয়ে[৫০] উপন্যাসটি রচনা করেছেন। ক্লাসিক গুণমণ্ডিত গদ্যের মধ্যে শওকত ওসমান সঞ্চার করেছেন সাম্প্রতিক চেতনা ও প্রকরণের অন্তগুণ। ইতিহাসের অস্বাভাবিক, অভূতপূর্ব, রক্তাক্ত, জটিল ও দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির পরম্পরা গদ্য শৈলীতে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে নেতিবাচক প্রবণতা থেকে মুক্তিলাভের প্রেরণাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।[৫১] ''ওদের ভাষায় আমি মৃতদেহ মূর্খ মূর্খ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল আমার আয়তন" শহীদের এই Avï উদ্ভাসনের মধ্যেই ব্যঞ্জিত হয়েছে উপন্যাসটির নির্মাণ শৈলী। কাহিনী বর্ণনায় লেখক মুনশিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। ছোট ছোট ঘটনার সমন্বয়ে আর্তনাদের আলেখ্য প্রবাহিত। 'আর্তনাদ' বর্ণনাধর্মী উপন্যাস। এ গ্রন্থের চরিত্রগুলো বাস্তবঘেষা ও শিল্পোত্তীর্ণ। ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে এ উপন্যাসের আঙ্গিকগত বিবেচনা যুগের বিশিষ্ট স্বাক্ষর।

রাজসাক্ষী (১৯৮৬): আশির দশকে বাংলাদেশের অভিনব নারী ব্যবসা ও আদম পাচারের বাস্তব কাহিনী সমন্বিত ঘটনার নির্মাণ কৌশল রাজসাক্ষী উপন্যাস। সমালোচকের ভাষায় উপন্যাস এমন একটি আঙ্গিক যার ধারণ ক্ষমতা ব্যাপক। দেশকাল মিলিয়ে যে বিশালতা ও গভীরতা তা মহাকাব্যের মতো।[৫২] উপন্যাসের নায়িকা, সকুরন নেছা কীভাবে সুস্থ ও স্বপ্ন সম্ভাবনাময় জীবনাদর্শ থেকে অপসৃত হয়ে বিপন্ন করেছে নিজের জীবন ও চরিত্র, সেটিই স্বতন্ত্র শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন শওকত ওসমান। Avï‰জবনিক ভঙ্গিতে চরিত্রের মুখে ভাষা প্রদান করে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসের কাহিনী পল্লবিত করেছেন। যাকে চারটি অংশের মাধ্যমে ঘটনার পরিণতি দেখিয়েছেন। সবুরন ও আলামিনের জীবনকথা ও জীবন ভাষ্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। এলোমেলো Avïকথনের মধ্যদিয়ে একটা সামগ্রিক জীবনালেখ্য পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য শ্লথ ও শিথিল

হয়েছে। তবে জীবনচিত্রণে লেখকের আঙ্গিকগত কৌশল প্রশংসনীয়। বিষয় নির্বাচন, কাহিনী বর্ণনা ও ঘটনাসংস্থাপনে উপন্যাসটির সার্থকতা গ্রহণীয়। এ উপন্যাসে লেখক সংলাপধর্মীতা প্রদান করেছেন। জাস্টিস মুনীর এবং মৌলানা বদায়ুনীর সংলাপ এরূপ-

মুনীর : আপনার মতে কাকে মুসলমান বলা যায়?

বদায়ুনী : যে লোক জরুরিয়াৎ-ই-দ্বীন বা ধর্মের প্রয়োজনীয় আচার পালনে বিশ্বাসী তাকে বলা যায় মুমিন। এবং প্রত্যেক মুমিনই মুসলমান।

মুনীর : প্রত্যেক মুমিনই মুসলমান জরুরিয়াৎ-ই দ্বীন কি?

বদায়ুনী : যে লোক ইসলামের পাঁচ স্তম্ভে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় নবী (দ:) প্রেরিত পুরুষ, সেই জরুরিয়াৎ-ই-দ্বীন প্রতিপালন করে।[৫৩]

দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সংলাপ উপস্থাপন করে লেখক কৌশলগত পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও লেখকের কৃতিত্ব অম্বিষ্ট। সুতরাং বলা যায় অন্তর্নিহিত ভাবের ক্ষেত্রে উপন্যাসটির আঙ্গিক গত বিবেচনা সার্থকতাপূর্ণ।

পিতৃপুরুষের পাপ (১৯৮৬): ধনবাদী মানসিকতার এক বিভৎস প্রকরণ 'পিতৃপুরুষের পাপ' উপন্যাস। জন্মদাতা পিতা কন্যাকে পণ্যে পরিণত করে যে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করে সে প্রবণতা লেখকের কলমে গ্রথিত হয়েছে। কাহিনী বিচারে উপন্যাসটি বাহুল্য বর্জিত। দীর্ঘ ও আট-সাট পরিধির মধ্যে ঘটনা স্রোত তরঙ্গিত। এ গ্রন্থে লেখকের সমাজ ও অর্থনৈতিক চেতনা নির্ভরতা বাঙময় হয়েছে। উপন্যাসে চেতনা প্রবাহের ধারায় লালবানুর জাগ্রত স্বপ্নের ছবিগুলো অনেকটাই শিল্প মণ্ডিত।[৫৪] আশির দশকেও বাঙালির মানসিক ও আর্থিক দাসত্বের শৃঙ্খলে যে বেষ্টিবদ্ধ, 'পিতৃপুরুষের পাপ' উপন্যাস অঙ্কন করে শওকত ওসমান তা শিল্পসম্মত ভাবে প্রকাশ করলেন। এখানেই উপন্যাসটির নির্মাণ শৈলীর স্বাতন্ত্র্যতা।

স্বাধীনতা উত্তরকালে যে কজন ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বিশিষ্ট শিল্প প্রকরণ সৃষ্টিতে সচেতন ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন শওকত ওসমান। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের রীতি ও ঐতিহ্য সনাক্ত করণে শওকত ওসমানের মেধাবী সৃষ্টিকর্ম অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের তির্যক দৃষ্টি নিয়ে তিনি কথার শাণিত চাবুক চালিয়েছেন। কারণ হিসেবে তাঁর কাল সচেতনতাকেই স্থাপন করা যায়। যার সঙ্গে রয়েছে লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতার সম্পর্ক। সাহিত্যের শিল্পরীতি মূলতই বিষয়বস্তু এবং সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের আখ্যানে জীবনবোধের এক সুতীক্ষ্ম রূপ ফুটে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টি একদিকে যেমন বঞ্চিত মানুষের সমবেদনার প্রতি সকাতর, তেমনি তাদের জীবনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকেও তিনি রূপায়িত করেছেন জীবনবাদী শিল্পীয় দৃষ্টি থেকে। তাঁর চরিত্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা জীবনের গভীরে ক্রীড়াশীল। তার বুদ্ধিবৃত্তি বস্তুনিষ্ঠতায় নিমগ্ন হয়ে শুধু মাত্র বহিরঙ্গের রং ফুটিয়েই তৃপ্ত থাকেনি, বরং লাভ করেছে শৈল্পিক প্রসাদগুণ। আমাদের চারপাশের ক্লিন্ন আবর্জনা ও অসুস্থ বিকারকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রুপে রূপায়িত করে শিল্প উৎকর্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনদর্শন, আঙ্গিক এবং বিষয় উপকরণে শওকত ওসমান বাংলা উপন্যাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। এখনো পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস, উপন্যাস সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

তথ্যসূচি:

---

[১] অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ৩য় সং, ১৯৯৯), পৃ. ২৯৬।
[২] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, '*গাল্পিক: ঔপন্যাসিক: নাট্যকার/শওকত ওসমান*' (ঢাকা: বই, ৩য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৬৭), পৃ. ১৩।
[৩] রফিকউল্লাহ খান, *শওকত ওসমান: কৃতি ও কীর্তি* (ঢাকা: শৈলী, ৩য়বর্ষ: ২২ সংখ্যা, ১ জানুয়ারি, ১৯৯৮), পৃ. ২৪।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
[৫] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *সমকালীন সাহিত্যের ধারা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৫), পৃ. ২২৯।
[৬] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ১৯৯৫), পৃ. ৮৮।
[৭] শওকত ওসমান, *বনী আদম*, (ঢাকা:স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০৪), পৃ. ১১।
[৮] শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিন জন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৫১।
[৯] সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭), পৃ. ১০১।
[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
[১১] ভূঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসের সমাজ চিত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ১৬৩।
[১২] সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলাকথা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
[১৩] হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪), পৃ. ১৭।
[১৪] শওকত ওসমান, *জননী* (ঢাকা: স্টুডেণ্ড ওয়েজ, ১৪০৩), পৃ. ১৮৮।

[১৫] সারোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস: সেকাল একাল* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯১), পৃ. ১৫০।
[১৬] মুহম্মদ ইদরিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা: বিভাগোত্তর কাল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৪৫।
[১৭] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস* (ঢাকা: পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ. ৫০।
[১৮] ভূঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজ চিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
[২০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২০৭।
[২১] বুলবন ওসমান (সম্পাদিত), *ক্রীতদাসের হাসি, শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড)* (ঢাকা: সময় প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৩৪৮।
[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।
[২৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।
[২৫] সৌরভ শিকদার, *শওকত ওসমান: তার উপন্যাসের বিষয় ও প্রকরণ*, (ঢাকা: শৈলী, ৩য় বর্ষ: ২২ সংখ্যা, ১ জানুয়ারি, ১৯৮৮), পৃ. ২৬।
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
[২৭] মুহম্মদ ইদরিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা*: বিভাগোত্তর কাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
[২৮] শওকত ওসমান, *চৌরসন্ধি* (ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ১৯৮৮), পৃ. ৭৮।
[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
[৩০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।
[৩১] সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
[৩২] রফিকউল্লাহ খান, *শওকত ওসমান: কৃতি ও কীর্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
[৩৩] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
[৩৪] অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮।
[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।
[৩৬] শওকত ওসমান, *জাহান্নম হইতে বিদায়* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০৪), পৃ. ৭৩-৭৪।
[৩৭] শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০০২), পৃ. ১২৬।
[৩৮] রণেশ দাশ গুপ্ত, *নেকড়ে অরণ্য* (ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ৯ সেপ্টেমর, ১৯৭৩), পৃ. ৭।
[৩৯] যতীন সরকার, *নেকড়ে অরণ্য* (ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩), পৃ. ৭।
[৪০] রণেশ দাশ গুপ্ত, *দুই সৈনিক* (ঢাকা: বই পরিচিতি, দৈনিক সংবাদ, ৩০ জুন, ১৯৭৪), পৃ. ১১।
[৪১] শওকত ওসমান, *জলাংগী* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২য় সং, ১৯৮৬), পৃ. ২২।
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
[৪৩] শেখ ফিরোজ আহমদ, *শওকত ওসমানের জলাংগী ট্রাজিক সেক্রিফাইল* (বগুড়া: নিসর্গ, ৬ষ্ঠ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, ১৯৯১), পৃ. ১০৩।
[৪৪] রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দন তত্ত্ব* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০২), পৃ. ১১৩।
[৪৫] Jone Mcormic: 'Alegory and satire', Catastrophe and imagination‌t Great Britain. Longmans. Green and Co. 1957, p. ২৬৮.
[৪৬] সৈয়দ আজিজুল হক, *শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সাহিত্য পত্রিকা, ঊনবিংশ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৯৯৩), পৃ. ২৬৭।
[৪৭] সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
[৪৮] শওকত ওসমান, *পতঙ্গ পিঞ্জর* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃ. ৮১।
[৪৯] সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
[৫০] আমিনুর রহমান সুলতান, *শওকত ওসমানের আর্তনাদ সমকাল চেতনার শিল্পরূপ* (ঢাকা: সংবাদ, ২১ মে, ১৯৯৮), পৃ. ১০।
[৫১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: রাজনীতিচেতনা* (ঢাকা: উত্তরাধিকার, ২৫ বর্ষ: ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭), পৃ. ২২।
[৫২] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *বাংলাদেশের উপন্যাস-বাংলাদেশের সাহিত্য (*ঢাকা: বাংলা একাডেমী (সংকলিত), ১৯৮৮), পৃ. ৩১।
[৫৩] শওকত ওসমান, *রাজসাক্ষী* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৩), পৃ. ৭০।
[৫৪] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

প্লেটোর সিম্পোজিয়ামে প্রেমতত্ত্ব

মোঃ তানভিরুল হক*

Abstract: All Philosophy is a footnote to Plato. Plato's questions remain as real for us today as they were 2400 years ago. The 'Symposium' is a Philosophical text by Plato. It concerns itself at one level with the genesis, objective and nature of love, and is the origin of the concept of platonic love. This article explains the historical and philosophical significance of Plato's views on love narrated in the 'Symposium'.

শব্দকোষে প্রেমের অর্থ যা-ই হোক না কেন, হালে তা বহু বর্ণে দ্যোতিত। প্রেমের আদিকারণ কাম, কিন্তু কাম মানে প্রেম নয়। বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কামের প্রেমে উত্তরণ। প্রেমের প্রারম্ভে জীবে-মানুষে ভেদ নেই, কিন্তু চূড়ান্তে সে মহিমার্ণব। আদিকালে প্রেমের মূলে জীবনধারণের স্থূল ক্রিয়াকাণ্ডই ছিল মুখ্য। প্রেম সেখানে নিছক দেহজ প্রয়োজন। জীবনধারণের নিশ্চয়তার জন্য সমাজে ভোজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বিভাজন ও সংরক্ষণ নির্দিষ্ট বিধানের গণ্ডিতে বাঁধা। তাই সমাজে প্রেমও সর্বযুগে দমিত, শাস্ত্রবিধির অন্তর্গত। কিন্তু প্রেম যখন শরীর ছেড়ে অন্তরিন্দ্রিয় হয়ে ওঠে তখন সকল বিধিকে প্রত্যাখ্যান করে; কখনো কখনো সামাজিক প্রথার বিপর্যয় ঘটায়। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে প্রেমের প্রকৃতির তারতম্য থাকলেও আধুনিক মানুষের মন প্রেমের উপলব্ধি, ব্যাকুলতা ও প্রকাশভঙ্গিতে প্রাচীন মন থেকে খুব বেশি স্বতন্ত্র হতে পারে নি। তাই প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম'-এর স্বরূপ-সন্ধান ও রসোপলব্ধির আলোচনা আজো প্রাসঙ্গিক।

এক.

মানবজাতির আত্মিক সংস্কৃতিতে, দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাসে প্লেটোর (খ্রি.পূ. ৪২৮/৪২৭-৩৪৮/৩৪৭)[১]অবদান অসামান্য। প্লেটোর জন্ম এথেন্সের এক অভিজাত বংশে। প্লেটো যেদিন জন্মগ্রহণ করেন প্রাচীন গ্রীক বিশ্বাস অনুযায়ী সেদিন ছিল দেবতা অ্যাপোলোর (Appollo) জন্মদিন।[২] অ্যারিস্টোক্লেস (Aristocles) প্লেটোর প্রকৃত নাম। তাঁর মাতুল কৃটিয়াস (Critias) 'ত্রিশ স্বৈরশাসকদের' (Thirty Tyrants) একজন ছিলেন সক্রেটিসের ঘনিষ্ঠ। সম্ভবত সেই কারণেই সক্রেটিসের (খ্র. পূ. ৪৭০/৪৬৯-৩৯৯)[৩] সাথে প্লেটোর পরিচয়।[৪]

তারুণ্যে প্লেটো রাজনীতিতে যোগ দিবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু 'ত্রিশ স্বৈরশাসকদের' সময়কার জঘন্য কার্যকলাপ এবং পরবর্তীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডে (খ্রি.পূ. ৩৯৯) প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নামার ঝোঁক তাঁর উবে যায়।[৫] সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো মেগারায় গমন করেন এবং সেখান থেকে সতীর্থ ইউক্লিডেসের সঙ্গে মিশরে যান।[৬] পরে দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতে পরিভ্রমণের ফলে প্লেটোর জ্ঞান ও ধ্যানধারণা যথেষ্ট পুষ্ট হয়। অবশ্য সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগেও পিথাগোরাস, হেরাক্লিটাস, পারমিনাইডিস ও সফিস্টদের মূলভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন প্লেটো।[৭]

পিথাগোরাসের (খ্রি.পূ. ৫৮০-৫০০) নিকট থেকে প্লেটো ধর্মীয় প্রবণতা, অমরত্বে বিশ্বাস, পরজাগতিকতা, পুরোহিতের মেজাজ,[৮] গণিতের প্রতি অনুরাগ এবং বুদ্ধি ও মরমীবাদ (Mysticism) লাভ করেন।[৯] পারমিনাইডিস (খ্রি.পূ.৬০১-?) থেকে তিনি পেয়েছেন বাস্তবতা শাশ্বত ও সময়হীন এবং যৌক্তিক ভিত্তিতে সকল পরিবর্তনই ভ্রমাত্মক।[১০] হেরাক্লিটস (খ্রি.পূ. ৫৩৫-৪৭৫) থেকে তিনি লাভ করেন, ইন্দ্রিয়জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। এই মতের সঙ্গে পারমিনাইডিসের মত যুক্ত হয়ে এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে ইন্দ্রিয় থেকে জ্ঞান পাওয়া যায় না, বরং শুধু বুদ্ধির সাহায্যেই জ্ঞান অর্জিত হয়। এটা পরে পিথাগোরাসবাদের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।[১১] সক্রেটিসের কাছ থেকে তিনি সম্ভবত নৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে নিমগ্ন হবার এবং জগতের ব্যাখ্যা হিসাবে যান্ত্রিক নয়, বরং উদ্দেশ্যবাদী (Teleological) ব্যাখ্যা অন্বেষণের প্রবণতা পান। সক্রেটিসপূর্বদের চেয়ে প্লেটোর চিন্তায় 'ভালো'র চিন্তার প্রাধান্য বেশি এবং এর কারণ হিসেবে সক্রেটিসের প্রভাবকে দায়ী না করা বেশ কঠিন।[১২]

সবগুলো গ্রন্থই নিজের লেখা কি-না তা নিয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বলা যায়, প্লেটোর গ্রন্থসংখ্যা ৩৬টি এবং পত্রসংখ্যা ১৩টি । তাঁর রচনাগুলো কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত বলে সেগুলো 'ডায়ালগস্' (Dialogues) নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর 'ডায়ালগস্'-এর অধিকাংশই গুরু

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী।

সক্রেটিসকে ঘিরেই অবর্তিত। প্লেটোর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রিপাবলিক (Republic), স্টেট্স্ম্যান (Statesman), লজ (Laws), অ্যাপোলজি (Apology), প্রোটাগোরাস (Protagoras), ফেডো (Phaedo), ক্রিটো (Crito) এবং সিম্পোজিয়াম (Symposium) বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য। Encyclopedia Britannica'র ভাষ্য, 'Perhaps all that can be said with certainty is that the great outstanding dialogues, 'Symposium', 'Phaedo', 'Republic', (and perhaps also 'Protagoras') in which Plato's dramatic Power is at its highest'.[১৩]

দুই.

'সিম্পোজিয়াম' প্লেটোর পরিণত বয়সের রচনা। এটি পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি দলিলি বুনিয়াদ। 'সিম্পোজিয়াম' দর্শন ইতিহাসে 'প্রেম' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সুগভীর বিশ্লেষণ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'প্রেম-বন্দনা'। বন্দনাকারীদের মধ্যে আছেন সাহিত্যিক, চিকিৎসক, নাট্যকার, দার্শনিক ও প্রেমিক। আরিস্টোডেমাস নামক সক্রেটিসের জনৈক শিষ্যের কাছ থেকে শুনে আপোলোডোরাস নামক এক ব্যক্তি আবার তার কোনো অনামিত বন্ধুর কাছে হুবহু যা বিবৃত করেছেন তাই 'সিম্পোজিয়ামে' প্লেটো অতন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।[১৪] দীর্ঘ বক্তৃতার একঘেয়েমি দূর করার জন্য বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে নানা হালকা সংলাপের অবতারণা করে প্লেটো 'সিম্পোজিয়াম'কে আরো উপভোগ্য করেছেন।

'Symposium' শব্দটির অর্থ Drinking Party বা পানোৎসব বা আলোচনা-উৎসব। প্রাচীন গ্রিসে এ উৎসব ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য । নিয়মানুযায়ী পেটপূজার পর চলতো মদ্যপানোৎসব। স্ত্রীদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। যদিও পরিবেশনকারিণী, নর্তকী, বংশীবাদিনী এবং উৎকৃষ্ট পতিতারা উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম' আলোচনার পূর্বে আমাদের তৎকালীন গ্রিসের কাম সম্বন্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। প্লেটো এমন একটা সমাজে লিখেছেন যেখানে পুরুষে-পুরুষে কামাচরণ স্বীকৃত ছিল। বিশেষ করে একজন কিশোর এবং পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সম্পর্ক। এখানে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কিশোরের আচার্য হিসাবে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক সমাজের যোগ্য করে তুলতো। তবে সাহিত্যে বন্দনীয় হলেও তা বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতিযোগী ছিল না।[১৫]

তিন.

'সিম্পোজিয়াম'-এ বিবৃত 'প্রেম-বন্দনাগুলো' বেশ দীর্ঘ। বক্তার নাম ও ভাষণের সংক্ষিপ্তসার পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে পেশ করা হলো—

ফেড্রাসের ভাষণ (দুঃখবাদী সাহিত্যিক): 'Love is a mighty god, and wonderful among gods and men, but especially wonderful is his birth. For he is the eldest of the gods, which is an honour to him.[১৬] প্রেমই মানুষের জীবনের একমাত্র নিয়ামক আদর্শ হতে পারে। বংশমর্যাদা, পদমর্যাদা বা ধনসম্পদ কোন কিছুই প্রেমের উচ্চে স্থান পেতে পারে না। প্রেমের প্রভাবে মানুষ নিকৃষ্ট আচরণ করতে পারে না। প্রেম বোধের অভাব হলে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি কারো দ্বারা মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার একটি দল সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে। কারণ প্রেমিক-প্রেমিকাই একে অপরের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে।[১৭] These are my reasons for affirming that love is the eldest and noblest and mightiest of the gods; and the chiefest author and giver of virtue in life, and of happiness after death.'[১৮]

পসেনিয়াসের ভাষণ (আগাথনের প্রেমিক এবং আইন বিশারদ): 'যেহেতু আফ্রোদিতে দুজন, কাজেই প্রেমও দুরকম। দুই আফ্রোদিতের পরিচয়, একজন উরেনাসের কন্যা এবং বিনা-মাতায় এর জন্ম, নাম দিব্য আফ্রোদিতে (Heavenly Aphrodite) অন্যজন থিয়াস ও ডাইয়োনের কন্যার নাম মর্ত্য আফ্রোদিতে (Common Aphrodite) প্রথম আফ্রোদিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রেম হচ্ছে দিব্যপ্রেম, অপরটি মর্ত্যপ্রেম। মর্ত্যপ্রেমের উদ্ভব হয় নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকের চিত্তে। এর প্রথম লক্ষণ এই যে, এ অনুরাগ যেমন রমণীর প্রতি, তেমনি কিশোরদের প্রতিও উদ্রিক্ত হয়; দ্বিতীয়ত উভয়ক্ষেত্রেই এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিক নয় বরং দৈহিক। কেবল ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা মিটানোর দিকে এর দৃষ্টি। এরাই প্রেমের মর্যাদা খর্ব করে। প্রেম যেখানে নিন্দনীয়, সেখানে দেখা যায়, সাধারণ লোকদের চরিত্র অনুন্নত, শাসকেরা ক্ষমতালোভী আর প্রজাগণ কাপুরুষ। যে ব্যক্তি আত্মাকে না ভালবেসে, দেহটাকেই ভালবাসে, এমন ব্যক্তির ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী। কারণ সে যা ভালবাসে, তার স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু মহৎ লোকের প্রেম আজীবন অক্ষুণ্ন থাকে; কারণ সে যাতে আসক্ত সে জিনিসটি নিত্য। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক সম্মানজনক হতে হলে, প্রেমিকের ব্যবহার ও প্রেমাস্পদের জ্ঞানার্জন এক রেখায় মিলতে হবে। প্রেমাস্পদ যদি সত্যি সত্যিই কাউকে সৎলোক ভাবে এবং তার সাহায্যে মানসিক উন্নতি হবে এই বিবেচনায় তাকে প্রশ্রয় দেয় এবং

পরে দেখা যায় যে, লোকটি মন্দ, তা হলে এমন ঠকাও প্রশংসার কাজ। কারণ সে সদগুণ অর্জনের জন্য অপরের বাধ্য হতে প্রস্তুত।[১৯] Thus noble in every case is the acceptance of another for the sake of virtue. This is that love which is the love of the heavenly goddess, and is heavenly, and of great price to individuals and cities, making the lover and the beloved alike eager in the work of their own improvement. But all other loves are the offspring of the other, who is the common goddess.'[২০]

এরিক্সিমেকাসের ভাষণ (চিকিৎসক, পসেনিয়াসের পর ভাষণের পালা ছিল আরিষ্টোফেনিসের। কিন্তু অতিপানহেতু হিক্কা ওঠাতে তাঁর ভাষণ দেবার মতো অবস্থা ছিল না। তাই আরিস্টোফেনিসের বদলে এরিক্সিমেকাস বক্তৃতা শুরু করেন): 'প্রেম শুধু মানুষের আত্মাকে সুন্দরের দিকে ধাবিত করে তাই নয়, বস্তুত প্রেমের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত। জীবজন্তু, লতাগুল্ম এবং ধরতে গেলে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই প্রেমের ধারক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রেমদেব বিশাল ও সর্বব্যাপী, নরলোক ও দেবলোকে এর অপ্রতিহত প্রভাব। আমাদের শারীরিক গঠন প্রকৃতি অনুসারে প্রেমের তারতম্য ঘটে। সুস্থদেহে যে প্রেম বিরাজ করে, তা রুগ্ন দেহের প্রেম থেকে পৃথক। যখন প্রেম সুষম মাত্রায় সন্নিবদ্ধ হয় তখন, মানুষ জীবজন্তু সকলেই সুস্থ-সবলভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন বিষম প্রেমের প্রাবল্য হয়, তখন দেখা যায় প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা। সর্বপ্রকার পাপের উৎসই হচ্ছে, জীবনের প্রত্যেক কার্যে শিষ্ট প্রেমের স্থলে দুষ্টু প্রেমের প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু যে প্রেমের উদ্দেশ্য মহৎ, সেই প্রেমের শক্তি দুর্জয় এবং তার থেকেই সঞ্জাত হয় যাবতীয় প্রশান্তি।'[২১]

আরিস্টোফেনিসের ভাষণ (প্রহসন রচক): 'প্রথমে তিন জাতীয় মানুষ ছিল। পুরুষ জাতি, স্ত্রীজাতি এবং উভজাতি (Androgynous)। প্রত্যেক মানুষ তার পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশ মিলে গোলাকৃতি ছিল। হাত-পা ছিল চারটি করে। আর গোলাকার ঘাড়ের উপর ছিল পরস্পর উলটো দিকে ফিরানো সম্পূর্ণ একাকৃতিবিশিষ্ট দুটো মুখ। এর ছিল চারটা কান এবং দুটো জননেন্দ্রিয় । পূর্বে এ তিন জাতীয় মানুষ থাকার কারণ হলো, আদিতে পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল আদিত্য (Sun) থেকে, স্ত্রী ধরণী (Earth) থেকে এবং উভজাতি চন্দ্র (Moon) থেকে। বল ও বিক্রমে এরা ছিল ভয়ানক। এমনকি এরা দেবতাদের ওপরও হামলা চালাত। এসব দেখে দেবতা থিয়াস ওদের প্রত্যেকটিকে কেটে দু'খণ্ড করে ফেললেন। দু'খণ্ড করার সময় আপোলো তাদের কাটা ঘাড় ও তৎসংলগ্ন মুখটা কাটা অংশের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন যাতে তারা চোখের সামনে কাটা মাংসটা দেখতে পেয়ে শাস্তির কথা মনে করে। মানুষের পূর্বতন দেহ দ্বিধাবিভক্ত হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ড অন্য খণ্ডটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। উভজাতীয় সম্পূর্ণ মানুষের দ্বিখণ্ডণ থেকে উৎপন্ন পুরুষেরা স্ত্রী জাতির প্রতি আসক্ত, সেজন্য ব্যভিচারীদের অধিকাংশই এই দলের। আবার ওই শ্রেণি হতে উৎপন্ন স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত। যে সকল স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ স্ত্রীজাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারা স্ত্রীজাতির প্রতিই আসক্ত হয়। কিন্তু যারা সম্পূর্ণ পুরুষের অর্ধাংশ তারা পুরুষ ভালোবাসে। কেউ কেউ বলে, 'ওরা নির্লজ্জ', কিন্তু তা ঠিক নয়। স্পষ্টতই এদের উভয়ের আত্মারই এমন কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে, যা তারা বাক্যে প্রকাশ করতে পারে না। কেবল আভাসেই অনুভব করে থাকে। মানুষ জাতির সুখ-শান্তির উপায় হচ্ছে, প্রেমদেবের নির্দেশে প্রত্যেকের আপন আপন অর্ধাংশ খুঁজে বের করা। খণ্ডিতের পুনর্মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষার নামই 'প্রেম'।[২২]

আগাথনের ভাষণ (বিয়োগান্ত নাট্যকাব্যের মেডেলপ্রাপ্ত লেখক এবং আলোচনা-উৎসবের আপ্যায়ক)ঃ 'পূর্ববর্তী বক্তাদের উচিত ছিল প্রথমে প্রেমদেবের সত্তাটি কেমন তা যথাযথ উল্লেখ করে, পরে তার প্রদত্ত দান ও অনুগ্রহের সবিশেষ বর্ণনা প্রদান করা। প্রেমদেবই রূপৈশ্বর্যে সর্বাধিক সম্পূর্ণ। দেবতাদের মধ্যে প্রেমদেবই সর্বকনিষ্ঠ। বার্ধক্য একে স্পর্শ করতে পারে না। সে চিরনবীন। দেবতাদের মধ্যে প্রেমদেব উপস্থিত থাকলে কখনো অত্যাচারমূলক ঘটনা ঘটতে পারত না। বাস্তবিক পক্ষে, প্রেমদেবের প্রভাবাধীন হবার পর থেকে এ যাবৎ স্বর্গে সর্বদাই শান্তি বিরাজ করছে। অতএব প্রেমদেব চিরনবীন এবং অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। বাস্তব জগতের কোমলতর বস্তুর ওপরই প্রেমদেবের সঞ্চরণ ও নিবাসন। কঠিন হৃদয় দেখলেই সেখান থেকে প্রেমদেব অন্তর্হিত হন। কদর্যতা একেবারেই এর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে এমন কোনো বস্তু বা আত্মার আশ্রয় করে না, যা প্রস্ফুটিত হতে অক্ষম। শাসন বা অত্যাচার প্রেমকে স্পর্শই করে না এবং যখন মানুষ প্রেমের জন্য সক্রিয় হয়, তখনো কোন প্রকার জোরজবরদস্তি করে না, সবাই স্বেচ্ছায় প্রেমের ইচ্ছা পালন করে। এই স্বেচ্ছা-সম্মতিই ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি। প্রেমের রয়েছে অপূর্ব আত্মসংযম। প্রেমই প্রভু, আর ভোগ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি এর ভৃত্য। অতএব, প্রেমের যখন ভোগ ও আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রভুত্ব রয়েছে, তখন প্রেম নিশ্চয়ই আত্মশাসিত। আফ্রোদিতে সমরদেব আরেসকে বন্দী করেছিল। তাই নিশ্চয় তাকে সর্বাপেক্ষা সাহসী বলে মানতে হবে। প্রেম যাকে স্পর্শ করে তার ভিতরে প্রথমে কাব্যাংশের লেশমাত্র না থাকলেও অবশেষে সেও কবি হয়ে ওঠে। প্রেম যাবতীয় শিল্প সৃষ্টিতেই সিদ্ধহস্ত। প্রেম জ্ঞান থেকেই সবকিছুর জন্ম।'[২৩]

সক্রেটিসের ভাষণ (গ্রিসের স্বর্ণযুগের সর্বশ্রেষ্ট মানব): 'অতীতে কোন সময়ে ম্যাটিনিয়াবাসিনী ডাইয়োটিমা নাম্মী এক মহিলার কাছ থেকে প্রেম সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তার বিবরণ, প্রেম হলো জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্তী অবস্থা। হয়তো তা সুরূপ বা কুরূপ এই দুই বিপরীতের মাঝামাঝি গুণসম্পন্নও হতে পারে। প্রেম হচ্ছে পরাক্রান্ত রুহ্ বা আত্মা, অর্থাৎ অর্ধেক মানব, অর্ধেক দেবতা। এসব ব্যাপারে যে ব্যক্তির দক্ষতা আছে তাকেই বলে 'আধ্যাত্মিক পুরুষ'। পক্ষান্তরে যার কেবল ব্যবসায় ও হস্তশিল্পে দক্ষতা আছে, সেই হলো 'সাধারণ পুরুষ'। আফ্রোদিতের যেদিন জন্ম হয়, সেদিন দেবগণ উৎসবে মগ্ন ছিল। এদের মধ্যে 'উদ্ভাবন' (Discretion)- এর পুত্র 'উপায়ও' (Plenty) ছিল। ভোজের পর উৎসব দেখে 'দারিদ্র্য' (Poverty) কিছু প্রশ্ন নিয়ে দরজায় দাঁড়াল। 'উপায়' সে সময় সুধাপানে মত্ত অবস্থায় থিয়াসের উদ্যানে উপস্থিত হয়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দেখে 'দারিদ্র্য' ভাবল, এই সময় 'উপায়ে'র ঔরসে তার গর্ভে একটি সন্তান ধারণ করে নিতে পারলে হয়তো তার হীনাবস্থা ঘুচে যাবে। তাই সে 'উপায়ে'র পাশে শয্যাগ্রহণ করে 'প্রেমকে' গর্ভে ধারণ করল। 'প্রেম' আফ্রোদিতের জন্মদিনে জন্মে ছিল বলে এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি, তথা আফ্রোদিতের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ থাকাতে সে এই দেবীর অনুগত অনুচর। তার পিতা 'উপায়' ও মাতা 'দারিদ্র্য' বলে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। প্রেম নশ্বরও নয়; শাশ্বতও নয়; সে হয়তো একই দিনে বেশ সতেজভাবে বেঁচে থাকবে, আবার ওই দিনেই তার মরণ হবে; কিন্তু তারপরেই পিতা হতে প্রাপ্ত জীবনীশক্তির বলে আবার বেঁচে উঠবে। সে যা পায়, তা সর্বদাই খোয়াই; এই হেতু সে ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়, মূর্খও নয়। জ্ঞানই সবচেয়ে সুন্দর। আর 'প্রেম' হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রেম। প্রেম অবশ্য সৌন্দর্যের অনুরাগী হবে। অতএব প্রেম যে পর্যায়ে আছে সেটা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্তী অবস্থা। একটি মত অছে এই যে, যারা নিজেদের অপরাংশ অনুসন্ধান করে তারাই প্রেমিক। কিন্তু অর্ধাংশের জন্য ব্যাকুলতাই হোক বা পূর্ণাংশের অনুসন্ধানই হোক, সেই অর্ধাংশ বা পূর্ণাংশ শ্রেয়ধর্মী না হলে তাকে 'প্রেম' বলা চলে না। আসলে 'শ্রেয়কে' চিরকালের জন্য পাবার বাসনার নামই 'প্রেম'। কিন্তু মানুষ তো মরণশীল। তবে মরণশীল হয়েও কেবল সৃষ্টি ও প্রজননের দ্বারাই অমরত্বের কাছাকাছি আসতে পারে। আমরা আগেই মেনে নিয়েছি চিরদিনের জন্য শ্রেয়কে পাওয়াই প্রেমের উদ্দেশ্য। তাই যদি হয় তবে স্বভাবতই শ্রেয়লাভের সঙ্গে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চাইবে। এই কারণে প্রেম শুধু শ্রেয়ের নয়, প্রেম অমরতারও। যশোলিপ্সা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন মানুষের চিরসহচর। এমনকি যশ ও খ্যাতির জন্য লোকে আপন সন্তানের জন্য যতটা করে, তার চেয়েও অধিক বিপদ বরণ করতে, সম্পদ ব্যয় করতে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে, এমনকি জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মানুষ যত মহৎ হয়, তার এই প্রেরণাও তত প্রবল হয়। বলতে গেলে সে অমরত্বের প্রেমে পড়ে যায়। যাদের সৃষ্টিপ্রেরণা জৈবিক, তারা স্ত্রীলোকের নিকট গমন করে, সন্তান উৎপাদনে লিপ্ত হয় এবং এইভাবে প্রেম প্রকাশ করে মনে করে যে তাদের সন্তানসন্ততিদের ভিতর দিয়েই তাদের পুণ্যস্মৃতি চিরকাল বজায় থাকবে। কিন্তু অপর এক শ্রেণির লোক আছে, যাদের সৃষ্টিপ্রেরণা আধ্যাত্মিক। এই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুটি হলো প্রজ্ঞা ও সদ্‌গুণ। দৈব প্রেরণায় কারো মধ্যে কৈশোর থেকেই এইসব গুণের প্রাবল্য অব্যাহত থাকে এবং সে উপযুক্ত সময়ে এই গুণাবলির জন্মদান করেই স্বস্তি পেতে চায়। প্রেমরহস্য সন্ধানের প্রকৃত পথ হচ্ছে পার্থিব জগতের ব্যক্তি ও বস্তু নির্বাচনের প্রতি প্রেম দিয়ে শুরু করে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে গন্তব্যস্থল মনে করে এদের সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে আরোহন করা। এক দেহধারী থেকে দুই, দুই থেকে সমগ্র জীবজগৎ, তারপর দৈহিক সৌন্দর্য থেকে নৈতিক সৌন্দর্য, এর থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৌন্দর্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। এইভাবে নানা প্রকার সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পরম প্রজ্ঞালাভ হয়। যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অখণ্ড সৌন্দর্য লাভ। এই সৌন্দর্য শাশ্বত, এর না আছে আদি-অন্ত, না আছে হ্রাস-বৃদ্ধি। মানুষের জীবনে যেসব কর্তব্য বা লক্ষ্য রয়েছে তার মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে, এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান।'[২৪]

এলসিবিয়াডিসের ভাষণ (সুপুরুষ, সুবক্তা এবং বিশিষ্ট রাজপুরুষ): 'সভ্যগণ আমি উপমার সাহায্যে সক্রেটিসের স্তুতি করতে চাই। মূর্তি নির্মাতার দোকানে রক্ষিত বংশীধারী সিলেনাসের মূর্তির সঙ্গে সক্রেটিসের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সে আবার মার্ঘিয়াস নামক কিন্নরের সঙ্গেও তুলনীয়। মার্ঘিয়াস তার বাঁশির সুরে মানুষের আত্মাকে বিমুগ্ধ করে তুলত। কিন্তু সক্রেটিস শুধু মুখের কথা দ্বারাই সেই প্রভাব উৎপন্ন করতে পারে। যখনই তার কথা শুনি, তখনই আমার হৃদয় ভাবোন্নত্ত ব্যক্তিদের হৃদয়ের চেয়েও দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে আর অশ্রুজলে গণ্ডস্থল সিক্ত হয়। আমি তো আগে পেরিক্লিস ও অন্যান্য সুবক্তার বক্তৃতাও শুনেছি, কিন্তু কই, তখন তো এমন অবস্থা হয় নি। তার মধ্যে রয়েছে অভাবনীয় সংযম। তার কাছে সুশ্রী বা কুশ্রী কোনো পার্থক্য নেই। সে দৈহিক রূপকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে। তার কাছে ধনী-নির্ধনের কোনো মূল্য নেই। আমি অবজ্ঞাত হয়েছি। অন্য দিকে আমি সক্রেটিসের চরিত্র, আত্মসংযম এবং নৈতিক বলের প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলাম। আমি তার ওপর রাগ করে তার সংস্রব থেকে সরেও দাঁড়াতে পারলাম না, আবার তাকে আমার ইচ্ছার বশীভূতও করতে পারলাম না। 'পোটিদিয়া' (Potidaea) যুদ্ধাভিযান কালে কষ্টসাহিষ্ণুতার ব্যাপারে সমগ্র সৈন্যদলের মধ্যে সে ছিল শ্রেষ্ঠ। যদিও নিতান্ত বাধ্য না হলে সে মদ্য স্পর্শ করত না তবু মদ্যপানেও সে ছিল অজেয়। আর

সক্রেটিসকে কেউ কোন দিন পানোন্মত্ত অবস্থায় দেখে নি। যে যুদ্ধে আমি বীরত্বের মেডেল পেলাম, সেখানে সক্রেটিসের কল্যাণেই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। সক্রেটিস সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবিত বা মৃত অন্য কারো মতোই সে নয়। চেহারাতে হোক বা বাক্যালাপেই হোক আমাদের এই বন্ধুর সাথে ক্ষীণতম সাদৃশ্য আছে এমন লোক বর্তমান বা অতীত যুগে খোঁজ করলে একটিও পাওয়া যাবে না । তেমন সাদৃশ্য পেতে হলে মনুষ্যজগৎ ছেড়ে কল্পনার জগতে যেতে হবে। যে কেউ সক্রেটিসের বক্তৃতা শুনলেই হয়তো প্রথমে তা অতিশয় তুচ্ছ বলে মনে করবে। তার অদ্ভুত শব্দচয়ন ও বাক্যাংশের ব্যবহারে মনে হয় যেন একই ভাব বারংবার একই ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ যতি তলিয়ে দেখে, তার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারে, তবে বুঝবে এ যেন মানুষের কথা নয়, দেবতার কথা। এতে রয়েছে আদর্শ উন্নত জ্ঞানের অজস্র চিত্র।'[২৫]

চার.

প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম' গ্রন্থে 'প্রেম-বন্দনা' অত্যন্ত কৌশলের সাথে সকৌতুক কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। প্লেটোর 'Theory of Love' নাটকীয়, অলংকারবহুল এবং দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে উপস্থাপিত।। 'সিম্পোজিয়াম'-এ সক্রেটিস প্রেম সম্পর্কে বলেছেন, 'এই একটি মাত্র বিষয় যে সম্বন্ধে আমি কিছু বুঝি'।[২৬] আক্ষরিক অর্থে এটি একটি অনন্যসাধারণ উক্তি। সক্রেটিস 'Art of Love' সম্পর্কে অবহিত ঠিক ততটাই, যতটা জানেন কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়। 'প্রেম' বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনায় 'সিম্পোজিয়াম' ভরপুর। এখনে প্রেমকে একটি মহৎ বিষয়, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের আত্মবিসর্জনের কার্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

'প্রেম' দু'ধরণের- ঐহিক এবং পূত। ঐহিক প্রেম মানুষের ইন্দ্রিয় থেকে, আর পূত প্রেম তার উন্নত প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। প্রথমটি প্রেমিক-প্রেমাস্পদের শরীর এবং দ্বিতীয়টি তাদের চিত্ত ও চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট। একমাত্র উন্নত প্রেমেই যথোচিত আনন্দ পাওয়া যায়। প্রেমিকের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের মাধ্যমে।

প্লেটোর মতে, মানুষ স্বভাবতই তার চেয়ে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ আকর্ষণ থেকে তার মনে এক ধরনের দুঃখবোধ সৃষ্টি হয়। আর এ দুঃখবোধ থেকে আবার সৃষ্টি হয় শ্রেষ্ঠ বিষয়টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। প্লেটোর মতে, শ্রেষ্ঠ বস্তুটি হলো সৌন্দর্যের প্রত্যয়। সৌন্দর্যের প্রত্যয় অন্যান্য প্রত্যয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিধায় মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং একে পেতে চায়। এ পাওয়ার অভিলাষ থেকেই জাগে 'প্রেমভাব'।

মানুষ মরণশীল নশ্বর জীব, কিন্তু সে অবিনশ্বর হতে চায়। অসীমকে করতে চায় আপন। প্লেটোর মতে এটাই প্রেম। নৈতিকতা, ললিতকলা, জনকল্যাণ, আইন প্রণয়ন, রাজনীতি সবকিছুর ভিতর দিয়ে প্রেম নিজেকে প্রকাশ করে। জাগতিকতা, যৌনতা, আদিমতা প্রেমের সমস্ত রূপই আসলে অনন্তের, অসীমের সাথে মিলিত বা বিলীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আর এটা সম্ভব হলে পাওয়া যাবে 'সত্যপ্রেম'।

পাঁচ.

সেন্ট অগাস্টিনের (খ্রি.৩৫৪-৪৩০) মতে, প্লেটো 'The pagan philosopher who comes nearest to Christianity'. এভাবে নানা মতাদর্শের দার্শনিক, চিন্তাবিদগণ স্বীয় দর্শনের উপর অযাচিতভাবে প্লেটোর দার্শনিক প্রভাব স্বীকার করে আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এভাবেই অনৈতিক চর্চার মাধ্যমে প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে নানা ভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম'ও এ থেকে রক্ষা পায় নি।[২৭]

সক্রেটিস কিশোরদের মঙ্গলচিন্তায় তাদের সাহচার্যের জন্য শরীরচর্চা কেন্দ্রে যেতেন। সমালোচকগণ এ প্রসঙ্গে বলেন, শরীরচর্চা কেন্দ্রে যাওয়ার কারণ আত্মিক নয়, দৈহিক। 'সিম্পোজিয়ামের' শেষাংশে সক্রেটিসের প্রকৃত প্রেমের চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। সুপুরুষ এলসিবিয়াডিসের রূপের গর্ব সক্রেটিস ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে সক্রেটিস এলসিবিয়াডিসকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, তার জীবন-যাপন কতটা বাহ্য এবং সেই সাথে আশার আলো দেখালেন উন্নত ব্যক্তিত্বের। বলা যায় 'It is the soul that interests him, not the body.'[২৮]

ছয়.

এলসিবিয়াডিসের ভাষণের মাধ্যমে প্লেটো জটিল এথেনিয়ো তত্ত্ববিদ্যা 'Paiderastia' র[২৯] অবতারণা করেছেন। এ তত্ত্ব মতে প্রেম দুই প্রকার -

ক) Good Uranian Love: উপাদান আত্মা এবং লক্ষ্য প্রেমাস্পদ কিশোর হৃদয়ে সদ্‌গুণ সঞ্চারিত করা।

খ) Bad Pandemotic Love: উপাদান দেহ এবং লক্ষ্য প্রেমিক পুরুষের যৌন বিলাস।

সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যায়,'Pandemotic Love' অনেক ক্ষেত্রে 'Uranian Love' এর মুখোশ পরে কিশোর প্রেমাস্পদকে ভবিষ্যৎ পুরুষ হিসেবে সমর্থ করে তুলে। তখন প্রেমাস্পদ নিজেকে স্বাতন্ত্র্যহীন নারী আনন্দ উপভোগী না ভেবে সদ্‌গুণের দাস হিসেবে ভাবে। আর এভাবে এলসিবিয়াডিস সক্রেটিস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার সদ্‌গুণের অংশে পরিণত হয়েছেন।

'সিম্পোজিয়াম'-এর শুরুতে দেখা যায় সক্রেটিস আগাথনের গৃহে নিমন্ত্রণে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই মুহূর্তে আরিস্টোডেমাস সেখানে উপস্থিত হলে সক্রেটিস তাকে তার সাথে আগাথনের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে বলেন। আরিস্টোডেমাস জবাবে বললেন, 'তুমি যেমন বল তাই করব'।[৩০] এখানে এলসিবিয়াডিসের সাথে আরিস্টোডেমাসের সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। সক্রেটিস বললেন, 'তবে চল দুজনেই যাই। কথায় বলে ভালো মানুষের[৩১] পার্টিতে ভালো মানুষেরা যায় বিনা দাওয়াতেই'। এরপর তারা রওয়ানা হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সক্রেটিস চিন্তায়মগ্ন হয়ে পিছিয়ে পড়লেন।[৩২] প্লেটো আমাদের বলেন নি সক্রেটিস সেই সময় কি চিন্তা করছিলেন। তবে এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সক্রেটিসের বিখ্যাত 'tri-unity-good, beautiful, wise'. অবশেষে সক্রেটিসকে আসতে দেখে আগাথন বললেন, ' Socrates, come lie down next to me. Who knows, if I touch you I may catch a bit of the wisdom that came to you .....'।[৩৩] উত্তরে সক্রেটিস বললেন, '..... জ্ঞান সম্বন্ধেও যদি পানির নিয়ম সত্য হয়, তবে আমি তোমার পাশে বসবার সুযোগটাকে অতিশয় মূল্যবান মনে করি, কারণ তাহলে অবশ্যই তুমি উচ্চাঙ্গের জ্ঞানপ্রবাহ দিয়ে আমাকে ভরে দিতে পারবে। আমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে সে অতি সামান্য, আর তা-ও স্বপ্নের মতোই অস্পষ্ট আর তোমারটা জাজ্জ্বল্যমান এবং ক্রমে ক্রমে আরো সমুজ্জ্বল হবে'।[৩৪] সক্রেটিসের এ উক্তি প্লেটোর সূক্ষ্ম শিল্পগুণের প্রকাশ। অন্যদিকে একে আমরা 'Paiderastic norms'ও বলতে পারি।

সাত.

'সিম্পেজিয়াম'-এর বক্তাগণও এলসিবিয়াডিসের মতো তাদের নিজেদের প্রেম কাহিনীর ছদ্মবেশে প্রেমের সৌন্দর্যের বয়ান দিয়েছেন। ফেড্রাস ও পসেনিয়াসের কাছে প্রেমের উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্তি হলো প্রেমিক পুরুষ ও প্রেমাস্পদ কিশোরের প্রেম। এরিক্সিমেকাসের কাছে '....medicine may be regarded generally as the knowledge of the loves and desires of the body.'[৩৫] আরিস্টোফেনিসের কাছে প্রেম হলো, মিলনাত্মক নাটক (Comedy)। আগাথনের কাছে প্রেম বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy)। বক্তাগণ অসতর্ক ছিলেন। কিন্তু প্লেটো জানতেন তাদের প্রেম কাহিনীগুলো প্রকাশ করেছে তাদের বৈপরীত্য এবং বিকৃতি। তারা ভেবেছেন তদের গল্পগুলো প্রেমের সত্যচিত্র। কিন্তু আসলে তা ছিল অলীক প্রতিচ্ছবি। সক্রেটিসের ভাষ্যে ডাইয়োটিমা যা পরবর্তীতে আমাদের জানাচ্ছেন। অবশ্য গল্পগুলো ছিল সত্যের প্রয়োজনীয় অংশ। কারণ এগুলোর মাধ্যমে আমরা শেষপর্যন্ত প্রেমের সৌন্দর্য সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

বক্তাদের কাছে 'art of love' কে আরো নির্মলভাবে তুলে ধরার জন্য সক্রেটিসের আরো দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। 'সিম্পোজিয়াম'এ যার যোগান দিয়েছে ডাইয়োটিমা (Diotima) । সক্রেটিস যার সম্পর্কে বলেছেন, ' the one who taught me art of love.'[৩৬] ডাইয়োটিমা সক্রেটিসকে যা শিখিয়েছেন তা হলো- 'Platonism'। অন্যভাষায় ' the theory of Platonic love.' আসলে প্লেটোনিক প্রেমের গল্প হলো সক্রেটিসের 'প্লেটোকরণের' (Platonizing) গল্প। ডাইয়োটিমার মতে, 'ভালো যা কিছু আমরা চাই তা চিরকাল আমাদের থাকুক। কিন্তু যেহেতু আমরা অমর নই, তাই আমরা যা করতে পারি তা হলো পুনরুৎপাদনের অশেষ এক চক্র সৃষ্টি করতে। এতে করে প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের কাছে থাকবে কাঙ্ক্ষিত 'ভালো'। আমরা এটা পেতে পারি 'সুন্দরের জন্মদানের' (birth in beauty) মাধ্যমে'।[৩৭] ডাইয়োটিমা 'সুন্দরের জন্মদানের' দুটি প্রকারের উল্লেখ করেছেন-

(ক) বিষমকামী (Heterosexual Lovers): যারা দৈহিকভাবে গর্ভিত এবং জন্ম দেয় তাদের 'সুন্দরের' প্রতিরূপ।

(খ) সমকামী (Homosexual Lovers): এরা জন্ম দেয় প্রজ্ঞা ও সদ্‌গুণের এবং গর্ভিত আধ্যাত্মিক ভাবে।

প্লেটো তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সমকামিতাকে মেনে নিয়েও তার ঊর্ধ্বে নিজের ভাবনাকে প্রসারিত করেছেন। প্লেটো প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মন্ত্রণার দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে একে শিক্ষক এবং ছাত্রের আদর্শিক সম্পর্কে উন্নীত করেছেন যা দৈহিক আকর্ষণের ঊর্ধ্বে উঠে নিশ্চিত করে তাদের মনোগত কল্যাণ। এটাই বহুল উদ্ধৃত 'প্লেটোনিক প্রেম' (Platonic Love)। University of Arizona'র দর্শনের অধ্যাপক Julia Annas এর ভাষায় যা, 'Love with the form of a romantic relation, but transformed by concern with the soul rather than the body'. [৩৮]

আট.

প্লেটো জ্ঞান অন্বেষা ও অনুধাবনকে যৌন আকাঙ্ক্ষার রূপান্তর হিসাবে 'সিম্পাজিয়াম'-এ তুলে ধরেছেন। তর্কসাপেক্ষে বলা যেতে পারে যে, প্লেটোর এ বক্তব্য কিছুটা ফ্রয়েডের (খ্রি. ১৮৫৬-১৯৩৯) মতো। প্লেটো মনে করতেন, দর্শনতত্ত্ব আসবে ভিতর থেকে এবং তা হবে খাঁটি। প্লেটোর এ ধারণার উৎস হলো 'Lovers desire.' কারণ প্রেম এমনভাবে ভিতর থেকে আসে যে তা সুচিন্তিতভাবে সৃষ্টি করা যায় না । শুধু তাই নয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রেমিক-প্রেমিকা সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে। কিন্তু দর্শনতত্ত্ব একটি যৌথ কার্যও। তাই প্লেটোর মতে, দার্শনিকজ্ঞান লাভ করা যায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা থেকে, কেবলমাত্র একজনের প্রগাঢ় চিন্তা থেকে নয়। প্রেম তৈরি করে যৌথ স্বার্থের একটি সম্পর্ক যা তাদের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে ছাপিয়ে যায়। একইভাবে দার্শনিক জ্ঞানার্জনে দরকার যৌথ আলোচনা এবং বিতর্ক। দর্শনতত্ত্ব এবং প্রেম এভাবে তাদের এক বিমূঢ় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। এ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো দুটির অবস্থানই মানবজীবনে এবং তা মৌলিক ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী।[৩৯]

নয়.

'সিম্পোজিয়াম'-এ প্রেমের ভাববিলাসী এবং কামনার যে দিক প্লেটো উপস্থাপন করেছেন তা সম্পূর্ণ পুরুষ কেন্দ্রিক। নারীদের দিকটি এখানে মনোযোগের সাথে ভাবা হয়নী। যতটুকু বা হয়েছে তা অনেকটা বাতিল বিকল্প হিসেবে। প্লেটোর মতে, পুরুষের পারস্পরিক প্রেম যে বৌদ্ধিক শিশুর (Offspring) জন্ম দেয় তা নিছক নারী-পুরুষের দেহ থেকে সৃষ্ট শিশুর চেয়ে অধিক বরণীয়। প্লেটোর এ মনোভাবের কারণ তিনি মনে করেন, পুরুষে-পুরুষে ভাব সকল ক্ষেত্রেই অগ্রসর। অন্যদিকে নারীতে-নারীতে যে প্রেম তা প্লেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত তিনি এ সম্পর্কে খুব কমই জানতেন। নারী সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তা বেশ গোলমেলে। প্লেটো মনে করেন, নারীদের মধ্যে আছে সমস্যা, সমস্যা আছে তাদের প্রত্যাশাতেও । যদিও তিনি সক্রেটিসকে দিয়ে বলাচ্ছেন, ' I would rehearse a tale of love which I heard from Diotima of Mantineia.'[৪০]

নারীর বহুমুখী ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি না থাকায় প্লেটো সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখার সুযোগ আছে। প্লেটো অন্তত নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, আর তাই তাদের জন্য কিছু একটা করতে চেয়েছেন। এটা প্লেটোর অভিনবত্বের নিদর্শন যা অন্য অধিকাংশ দার্শনিকদের মধ্যে দেখা যায় নি। উদাহরণ হিসেবে এ্যরিস্টটলের (খ্রি. পূ.৩৮৪-৩২২) কথা বলা যেতে পারে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অবস্থানকে তিনি সঠিক মনে করেছিলেন। তবে এ কথা ঠিক, প্লেটো মনে করেছেন বৌদ্ধিক উন্নতিতে লিঙ্গের ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক।[৪১]

'সিম্পোজিয়াম' প্রশ্নাতীতভাবে পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যে 'প্রেম' বিষয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। নবপ্লেটোবাদ (Neoplatonism) থেকে মধ্যযুগীয় মরমিবাদ (Medieval mysticism), অগাস্টিন থেকে দান্তে (খ্রি. ১২৬৫-১৩২১), ফিসিনো (খ্রি. ১৪৩৩-১৪৯৯) থেকে ফ্রয়েড, এঁদের দর্শনের বিকাশে 'সিম্পোজিয়াম'-এর ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক। 'সিম্পোজিয়াম'-এর অন্তর্জ্ঞান পশ্চিমা চিন্তা ও মনোভঙ্গিকে সংস্কৃতির সকল স্তরে নতুন আকার দিয়েছে। সমকালীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, জনপ্রিয় গীতিকবিতায়, বিয়ের শপথে, মধ্যরাতের স্বীকারোক্তিতে, সবখানেই আমরা মুখোমুখি হই শাশ্বত, চিরন্তন 'প্রেমভাবের'। আর তাই প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আজো শোনা যায় ডাইয়োটিমা, সক্রেটিস ও 'সিম্পোজিয়াম'-এর অপারাপর বক্তাদের বাক্যসুষমা।

শরণ:

১। Encyclopedia Britanica, Volume 18, London,1960, P. 48

২। Julia Annas, Plato: A very short Introduction, Oxford University Press, New Delhi, 2006, P.18

৩। হাসান আজিজুল হক, সক্রেটিস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ.৯

৪। প. গ্রাৎসিয়ানস্কি ও অন্যান্য, রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস, খণ্ড-১: প্রাচীন জগৎ ও মধ্যযুগ, অনু. ননী ভৌমিক, অবসর, ঢাকা, ২০০৯,পৃ.৯১

৫। প্রাগুক্ত, পৃ.৯১

৬। ফরহাদ খান, প্রতীচ্য পুরাণ, প্রতীক, ঢাকা, ২০০১, পৃ.১০৪

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৮। Robert Cavalier, Plato for Beginners, Orient Longman, Chennai, 2004 P.16-25

৯। বার্ট্রান্ড রাসেল, প্লেটোর ইউটোপিয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, অনু. মশিউল আলম, অবসর,ঢাকা, ২০০২, পৃ.১৪

১০। প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৩। Ibid. P.49

১৪। প্লেটোর সিম্পোজিয়াম, অনু. কাজী মোতাহার হোসেন, অবসর, ঢাকা, ২০০০, ভূমিকা, পৃ. ১১

১৫। Ibid, p. 45

১৬। http://ebooks.adelaide.edu. au/p/plato/p71sy/symposium.html.

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১০

১৮। Ibid

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১৪

২০। Ibid

২১। প্রাগুক্ত, পৃ.১৪-১৭

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭- ২০

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ, ২২-২৪

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ.২৮-৩৭

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৬

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৭। Ibid, P. 43

২৮। Ibid

২৯। The socially regulated intercourse between an older athenian male and a teenage boy, through which the latter was supposed to learn virtue.

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩১। আগাথন অর্থ গ্রীক ভাষায় Good বা ভাল

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ . ৫

৩৩। Ibid

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩৫। Ibid

৩৬। Ibid

৩৭। প্রাগুক্ত. পৃ.৩২

৩৮। Ibid, P. 45

৩৯। Ibid, p. 46

৪০। Ibid

৪১। Ibid ,p. 49

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৯

বঙ্গ-বাঙ্গালা (বাংলা): মধ্যযুগের সাহিত্যে বাঙালি সমাজ বিকাশের ধারা

ড. আবু নোমান*

ভূগোল, ভাষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালি এবং যে ভূ-খণ্ডকে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে নির্ণয় করে থাকি, তা আধুনিক কালের ধারণায়।[১] প্রাচীনকালে এদেশের নাম বাংলা যেমন ছিল না তেমনি এতদঞ্চল ছিল বিভিন্ন অঞ্চল বা জনপদে বিভক্ত। পরিবর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বাংলার আকার, আয়তন ও অবস্থানের প্রায়শই পরিবর্তন ঘটেছে।[২] মুসলিম বিজয়ের পূর্বেও এ অঞ্চলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শাসকের অধীনে ছিল।[৩] এমনকি সুলতানি আমলেও বাংলা ছিল খণ্ড খণ্ড। ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে।[৪] এ সময় বাংলার অবস্থান ছিল- উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে তেলিয়াগর্হি গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল জনপদ।[৫] স্থানটি গৌড় ও লাখণাবতী হিসেবে পরিচিত হয়।[৬] মুসলমান আগমনের পূর্বে বাংলা অঞ্চলে ছিল প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বসবাস। এ সময়ে ধর্মগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মানবিকতা প্রায়শই অসম্মানিত হয়েছে। অনৈতিকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে সমাজ হয়েছে কলুষিত ও কর্দমাক্ত। সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ একটু সম্মানজনকভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তথাকথিত সমাজের উচ্চবিত্তরা তাঁদের সে আশার পাদপীঠে চপেটাঘাত করে মানবতাকে করেছে লাঞ্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত। একটি রাষ্ট্র ও জাতির বিকাশে যে উপাদানগুলো ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে- ভূখণ্ড, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, শিক্ষা, স্বাধীনতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, পরিবর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি। বাংলা রাষ্ট্র এবং বাঙালি জাতির জাতীয়তাবোধের বিকাশধারা আলোচনা করতে গেলে বাংলার ভূপৃষ্ঠ গঠন থেকে শুরু করে এর ইতিহাস পরিক্রমা আলোচনা প্রয়োজন। পাল শাসনামলে বাংলা ভাষার কিছু কর্ম দেখা যায়। সেনরা রাষ্ট্রীয়ভাবে অসৌজন্যতাবোধের জন্ম দিয়েছিল। এ সময়ের বাংলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে ছিল। অবশেষে মুসলমানরা এ দেশে আসতে শুরু করে এবং হিন্দু সমাজে তাঁদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশে ইসলাম শাসনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানগণ বাংলায় বিজয়ীর বেশে এ দেশে আগমন করার পর এদেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালবেসেছিলেন। এ দেশকে স্থায়ী আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম আমলে সুলতানগণই প্রথম ইসলামের শিক্ষায় প্রতিটি মানুষকে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার প্রতি আস্থাশীল করে তুলে। ফখর আল-দীন মুবারক শাহ পর্যন্ত বাংলায় বাঙালি চেতনাবোধের তেমন কোনো সংগঠিত রূপ দেখা যায়নি। ১৩৪২ সালে সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহ প্রথম খণ্ড খণ্ড বাংলাকে একত্রিত করে একই জাতীয় চেতনাবোধের পতাকায় ঐক্যবদ্ধ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, বখতিয়ার খলজি যে ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে মুসলিম চেতনাবোধকে সামনে রেখে ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন ইতিহাসের পরিক্রমায় শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহ সেই বাঙালি জাতীয়তাবোধকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁকেই সুলতানি আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলা যায়। খণ্ড খণ্ড জনপদ থেকে বাংলা রাষ্ট্র এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি সমাজ বিকাশের একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াশ এই প্রবন্ধে।

দ্রাবিড় ভাষাভাষি নরগোষ্ঠী প্রথম বাংলায় অনুপ্রবেশ করে বলে অনেক ঐতিহাসিক অভিমত পোষণ করেন।[৭] এই দ্রাবিড় গোত্রকে বংগোত্র হিসেবে অনুমান করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতের একজন বঙ্গ নামক রাজা ছিলেন। মহাভারতেও বঙ্গ রাজার উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গ ভূখণ্ডের উল্লেখ প্রাচীন কোনো গ্রন্থে উল্লেখ না থাকলেও ঋগ্বেদে বঙ্গ জাতির উল্লেখ রয়েছে। এরা আর্যদের যজ্ঞের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৮] বঙ্গ রাজাই সম্ভবত বঙ্গভূমির গোড়াপত্তন করেছিলেন। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ বহু প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় কিন্তু তা স্থান হিসেবে নয় জাতি হিসেবে। সম্ভবত বঙ রাজা শাসিত জাতি বংশানুক্রমে যেখানে বসবাস করেছে সে স্থানই বঙ্গ নাম ধারণ করেছে।

ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে বঙ্গ জনপদবাসিদের পুণ্ড্র নামে অভিহিত করা হতো।[১০] পুণ্ড্ররা যে বর্তমান উত্তর বাংলার অধিবাসী ছিল এবং সে অঞ্চলটি যে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদেশ নামে পরিচিত ছিল এ নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতরাও একমত। *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে বঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষিবিশেষের জাত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বঙ্গ ছাড়াও মগধ, চেং ও পাদা শব্দের উল্লেখ

* লেখক প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

রয়েছে। *বোধায়ন ধর্মসূত্রে* বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। *বোধায়ন ধর্মসূত্রে* ভূখণ্ড বা জনপদগুলোকে আর্যদের পবিত্রতার আলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয় যথা- সর্ব নিকৃষ্ট অংশে বঙ্গ এবং কলিঙ্গসহ কয়েকটি ভূখণ্ডের নাম করা হয়েছে। এই নিকৃষ্ট এলাকায় অস্থায়ীভাবে বাস করলেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো।[১১] *পুরাণে*ও বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র ইত্যাদি অঞ্চলের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে।[১২] *রামায়ণে*ও বঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। *রামায়ণে* অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় বঙ্গকে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা যায় যে, পক্ষিবিশেষের জাত হিসেবে বাঙালিদের প্রথমত তিরস্কার করা হলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সম্মানিত জাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১৩] *মহাভারত*েও বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে। *মহাভারতে* দেখা যায় যে বঙ্গ একটি 'পূর্বাঞ্চলীয় দেশ এবং এটি ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমে অবস্থিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে* বঙ্গের 'শ্বেতস্নিগ্ধ' সুতি বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের *রঘুবংশে* বলা হয়েছে যে, রঘু সুহ্মদের উৎখাত করেন এবং বঙ্গদেশের রাজণ্যবর্গের সম্মিলিত রণতরীগুলোকে পরাজিত করেন এবং গঙ্গার দ্বীপপুঞ্জে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই গ্রন্থে বঙ্গকে 'গঙ্গাস্রোত হস্তহরেষু' বা গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী স্থান রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। সেনরাজ বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া লিপি এবং কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে বঙ্গের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। *বৃহৎ সংহিতায়* 'উপবঙ্গ' জনপদের উল্লেখ আছে। *দিগ্বিজয় প্রকাশ* গ্রন্থে উপবঙ্গ বলতে যশোর ও তৎসংলগ্ন বনভূমি বা সুন্দরবনাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। এখানে ধারণা দেয়া হয়েছে উপবঙ্গ বঙ্গেরই অংশবিশেষ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ষটপঞ্চাশদ্দেশ বিভাগ-এ সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে বঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ব্রহ্মপুত্র বলতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বুঝানো হয়েছে।

উপরিউক্ত বর্ণনা ও সূত্র মোতাবেক এবং ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজের তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, পশ্চিমে ভাগীরথী, পশ্চিম-উত্তরে করতোয়া নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড নিয়ে প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল।[১৪] এই আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গ শব্দটি প্রথমে বং নামক এক রাজার নামানুসারে পাওয়া গেছে। অতঃপর উক্ত রাজার রাজ্যের প্রজাগণকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীতে এটি ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।[১৫]

বাংলা নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এবং এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু উঁচু 'আল' বেঁধে বন্যার পানি থেকে তাদের জমির ফসল রক্ষা করতো। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' শব্দটি যুক্ত হয়ে (বঙ্গ+আল) বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[১৬] কেউ কেউ মনে করেন- হযরত নূহ (আ.)-এর অধঃস্তন পুরুষ হিন্দের পুত্র বঙ-এর সন্তানরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। বাংলা ছিল নিচু অঞ্চল। বাংলার প্রধানরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে প্রায় দশ হাত উঁচু ও কুড়ি হাত প্রশস্ত আল বা স্তূপ তৈরি করে তার উপর বাড়ি নির্মাণ করে চাষবাষ করতেন। কালক্রমে এ অঞ্চলের নামকরণ হয় বাঙ্গালা।[১৭] এদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল সেমিটিক দ্রাবিড়। এদের মধ্যএশিয়া থেকে আগমন ঘটেছিল বলে ধারণা করা যায়। সুতরাং উপরিউক্ত সূত্র যৌক্তিক বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্য রমেশচন্দ্র মজুমদার উপরিউক্ত যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি আলাদা স্থান। বঙ্গালই কালক্রমে বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে।[১৮] তবে প্রাচীন বঙ্গ ও বঙ্গালের দুটি আলাদা সীমারেখা তিনিও চিহ্নিত করতে পারেননি। প্রাচীন বঙ্গ বা বাঙ্গালা বহু জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হয়ে বহু জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এর এক এক অংশ এক এক নামে পরিচিত ছিল। এর প্রত্যেক অংশ জনপদ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই জনপদগুলো হলো- গৌড়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রদ্বীপ ও বাংলা। মুসলমানদের লাখণাবতী বিজয়ের পূর্বে একটি অঞ্চল ছিল বঙ বা বাঙ এবং এটি গঙ্গার পূর্বদিকে ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়।[১৯] বঙ্গের দক্ষিণ সীমা ছিল বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০]

প্রাচীন বঙ্গদেশের উল্লেখযোগ্য একটি ক্ষুদ্র জনপদ হচ্ছে বঙ্গ। এখানে বঙ্গ বলতে সামগ্রিক বাংলার একটি ক্ষুদ্র অংশকে বুঝানো হচ্ছে। মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ হতেও অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গ সামগ্রিক বাংলার একটি বিভাগ। লাখণাবতী টাকশাল হতে প্রবর্তিত রুকন আল-দীন কায়কাউস[২১] ও জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের[২২] মুদ্রায় খোদিত (খারাজা মিন বানকে) বা বঙ্গের খারাজ হতে মুদ্রিত অংশটি প্রমাণ করে যে, বঙ্গ বৃহত্তর বাংলার সামগ্রিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ক্ষুদ্র অংশবিশেষকে নির্দেশ করে। বঙ্গ পুণ্ড্রের মত ততটা প্রসিদ্ধ না হলেও বঙ্গের কথাও প্রাচীন সাহিত্য ও গ্রন্থাদিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। *ঐতরেয় আরণ্যকে* উদ্ধৃত 'বঙ্গের কথাও ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। *মহাভারত* ও *হরিবংশে*ও বঙ্গ প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। *রামায়ণে*ও বঙ্গ প্রসঙ্গ উল্লিখিত। এসব সূত্র থেকে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন বঙ্গ জনপদ পুণ্ড্র জনপদের প্রতিবেশী জনপদ ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচ্য জনপদ তথা পুণ্ড্র, গৌড়, কামরূপ ইত্যাদির সঙ্গে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এতে বঙ্গ কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বরাহমিহির (আ. ৫০০-৫৫০) তাঁর '*বৃহৎসংহিতা*' গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গদেশের অন্তর্গত যে কটি জনপদের নাম উল্লেখ

করেছেন সেগুলো হলো- গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, বর্ধমান, তাম্রলিপ্তি, সমতট ও উপবঙ্গ। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মহাকবি কালিদাস রচিত '*রঘুবংশ*' কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে 'বঙ্গ' জয়ের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে কালিদাসের সমকালীন বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পাল ও সেন রাজত্বকালে বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকলেও, গুপ্তযুগে বঙ্গ ও পুণ্ড্র দুটি স্বতন্ত্র শাসন-বিভাগ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বল্লাল সেনের সময় (দ্বাদশ শতাব্দী) বর্তমান বঙ্গদেশ, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

বঙ্গ জনপদের সীমানা বর্ণনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র।[২৩] পুণ্ড্র হচ্ছে প্রাচীন বঙ্গের প্রভাবশালী একটি জনপদ যা বৈদিক যুগে ঐতরেয় মুণি দ্বারা কৃত *ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪] উক্ত গ্রন্থে পুণ্ড্রদের দেশকে প্রাচ্যদেশীয় ও পূর্ব প্রান্তিক বলা হয়েছে। *মহাভারতে*ও পুণ্ড্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে পুণ্ড্রের সঙ্গে আরও কয়েকটি স্থানের নাম বলা হয়েছে সেগুলো হলো- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম।[২৫] পুণ্ড্র জনপদ বা পৌণ্ড্রদেশ অতীতের উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমে কুশী, দক্ষিণে গঙ্গা নদী ও পূর্বে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

*মহাভারতে*র আদিপর্বে বঙ্গ জনপদকে পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ দেশের সঙ্গে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, দেশগুলো পরস্পর প্রতিবেশী এবং বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পূর্বাভিমুখি অভিযান ও দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে *মহাভারতে* যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে পৌণ্ড্রদেশের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[২৬]

বঙ্গরাজা হর্ষবর্ধন ও কামরূপ নৃপতি ভাস্কর বর্মনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ ৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেন। তাঁর এ ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে মগধ ছাড়াও পূর্বভারত হিরণ্যপর্বত (বর্তমান মুঙ্গের), অঙ্গ, পৌণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। চম্পা নগরী ছিল অঙ্গ জনপদের রাজধানী। হিরণ্যপর্বত, অঙ্গ ও কামরূপ ছাড়াও আরো চারটি জনপদ বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমার আওতাধীন ছিল। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতে বঙ্গ জনপদের কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত এ সময়ে বঙ্গ জনপদ তার স্বাধীনতা হারিয়ে অন্য কোনো জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, "তিনি (হিউয়েন সাঙ) বিহার হতে গঙ্গাতীর দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। কিন্তু ঐ দেশের স্বাধীন রাজার বংশ বহু শতাব্দী পূর্বেই লোপ পেয়েছিল এবং এটি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অধীন ছিল। বঙ্গদেশ তখন পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যথা পৌণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ, কামরূপ বা আসাম, সমতট ও পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রোপকূল অঞ্চল।"[২৭] উক্ত মন্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে প্রাচীন বঙ্গ জনপদের মূল অংশ সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আরো দেখা যায় যে, তিনি অঙ্গরাজ্য অতিক্রম করে পৌণ্ড্রদেশে উপনীত হন এবং পরে একটি বিশাল নদী "কালাতু"[২৮] পার হয়ে কামরূপে উপনীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কালাতু নদী ছিল কামরূপ এবং পৌণ্ড্রদেশের প্রাচীন সীমারেখা। নীহাররঞ্জন রায় এই ধারণার সঙ্গে সম্পুর্ণভাবে একমত পোষণ করেন।[২৯] কুশী বা কৌশিক নদী এবং করতোয়া মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী। *রামচরিত* রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীর (অর্থাৎ পুণ্ড্রের) অবস্থান গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবি প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের অবস্থান বিষয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

"পুরব দিকেতে ব্রহ্মপুত্রের মেলানী।/ পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানী।
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা।/ সে দেশে করয়ে কৃপা কামাখ্যা মঙ্গলা॥
মধ্য দিয়া বহি যায় করি টল টল।/ করতোয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট।
পরশুরামের আছে সেখানেতে পাট॥/ -- -- --
এই সীমার মাঝে দেশ পেঠন 'দুয়ার থিতি'/ এই দেশে আমার জাতির বসতি॥"[৩০]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পুণ্ড্রদেশ জনপদের অবস্থিতি সম্পর্কে একটি আস্থাপূর্ণ সীদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত চমৎকার। হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী রাজ্যের ভূমি ছিল সমতল, চিক্কন ও উর্বরা। এখানে সকল ধরনের ফসলই পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হতো। কাঁঠাল এখানকার বিখ্যাত ফসল। স্থানটির পরিধি ছিল ৮০০ মাইল। এখানে ৭০টি বিহার বা সংঘবায় ছিল এবং এসব বিহারে প্রায় তিন শতাধিক বৌদ্ধ বসবাস করতো। এখানে শত শত দেব মন্দির ছিল যেখানে নানা জাত ও সম্প্রদায়ের জনগণ একত্রিত হতো।

এলাকাটির জনসংখ্যা ছিল অত্যধিক। রাজভবন বেশ দর্শনীয় ছিল। সুন্দর জলাশয় এবং পুষ্পোদ্যান ছিল সুবিন্যস্ত।[৩১] হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতেও পুণ্ড্রনগরের এ সমস্ত সৌন্দর্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, পুণ্ড্রনগর প্রাচীনকাল থেকেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত, "সুদূর অতীত থেকে ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমলের শেষপর্যন্ত পুণ্ড্রনগর শুধু প্রধান শাসনকেন্দ্র রূপেই নয়, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং অখণ্ড ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থল পথ বাণিজ্যের বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপেও স্থান অধিকার করেছিল।[৩২] বর্তমান মহাস্থানগড় পূর্বোক্ত পুণ্ড্রনগর ছিল বলে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই একমত। মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লিখিত 'পুন্দনগল', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'পৌণ্ড্র-বর্ধনপুর' হিউয়েন সাঙের 'পুন-ন-ফ-তন্-ন' এক ও অভিন্ন এবং তা যে পুণ্ড্রনগর তাও প্রায় নিশ্চিত। প্রাচীন সাহিত্যাদির বর্ণনা, চৈনিক ভ্রমণ পর্যটক হিউয়েন সাঙ এর প্রতিবেদন, অষ্টাদশ শতকের লোককবি রতিরাম কর্তৃক তাঁর কাব্যে এই ঐতিহ্য রক্ষণ এবং সাম্প্রতিককালে মহাস্থানগড়ে প্রত্নখননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শন ও প্রাচীন কীর্তির অবশেষ থেকেও তা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদের মধ্যে সুহ্ম অন্যতম একটি জনপদ। সুহ্ম নামটি প্রাচীন অনেক সাহিত্যাদিতে বহুল উল্লিখিত ও আলোচিত। এ থেকে ধারণা করা যায় বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম পরস্পর প্রতিবেশী জনপদ। মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে ভীমের দিগ্বিজয় ছাড়াও দুর্যোধন মিত্র কর্ণ, যিনি অঙ্গদেশের শাসনাধিপতি ছিলেন, তিনি সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গ জয় করে বঙ্গকে নিজ রাজ্যের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে ভীম বঙ্গ জয় করার পর ক্রমে তাম্রলিপ্তি, কর্বট এবং সুহ্মরাজকে পরাভূত করেন। কালিদাস রচিত *রঘুবংশে* বঙ্গ জয় করার পূর্বে রঘুর সুহ্মদেশ জয়ের কথা বলা হয়েছে। এ সব বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন সুহ্ম জনপদ সম্ভবত গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীর সংলগ্ন সমুদ্র-উপকূলাঞ্চলসহ দক্ষিণতম অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হাওড়া, হুগলি জেলা ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। *বৃহৎসংহিতার* বর্ণনা থেকে দেখা যায়, সুহ্ম, বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী ভূভাগ, সুহ্ম নামটি বিভিন্ন সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময়ে এ জনপদটি তাম্রলিপ্তি নামে অধিক পরিচিত পায়। জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ গ্রন্থে সুবৃহৎ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বারবার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। *পেরিপ্লাস* গ্রন্থে এবং টলেমি, ফাহিয়েন, যুয়ান চোয়াং ও ইৎসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্তি বন্দরের বর্ণনা আছে। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রই নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও তাম্রলিপ্তি সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে সুহ্ম জনপদটি রাঢ় জনপদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৩৩] বাংলার ইতিহাসে রাঢ় প্রসিদ্ধ একটি জনপদ। এই জনপদের উল্লেখ দেখা যায় প্রাচীন গ্রন্থ '*আচারাঙ্গ*' সূত্রে। সময়ের বিবর্তনে রাঢ় এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সুত্র থেকে ধারণা করা যায় যে, উত্তরে রাঢ়ের সীমা নির্ণিত হতো গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহ দ্বারা এবং অজয় নদী ছিল উভয় রাঢ়ের প্রাকৃতিক সীমারেখা। ধারণা করা যেতে পারে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীর মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-হুগলী-হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ছিল বৃহৎ রাঢ় জনপদ। সমুদ্র উপকুলবর্তী এই জনপদটি ছিল খুব নিচু ও আর্দ্র।[৩৪]

সমতট প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ। চতুর্থ শতকে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের 'এলাহাবাদ-প্রশস্তিতেই' সম্ভবত সমতটের নাম প্রথম দেখা যায়। হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায়, সমতটে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। শীল-ভদ্র এই বংশের উত্তরাধিকার যিনি নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।[৩৫] 'বঙ্গ তখন সমতটের রাজার অধীনে ছিল বলে ধারণা করা হয়। খড়্গ নামধারী এক বৌদ্ধ রাজবংশ এই ব্রাহ্মণ রাজবংশকে উৎখাত করে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। ঢাকায় আশরাফপুর এবং কুমিল্লায় দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত দুটি তাম্রলিপিতে খড়্গোদ্যম, তাঁর ছেলে জাত খড়্গ এবং তাঁর ছেলে দেব খড়্গ এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। দেব খড়্গের মহিষী প্রভাবতী এবং ছেলে রাজরা অথবা রাজরাজ ভটের নামও পাওয়া যায়। তাঁরা ধর্মীয় দিক থেকে ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁদের রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। এদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত। এটি কুমিল্লার অদূরে কামতা বলে ধারণা করা যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চন্দ্রবংশীয় দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন গোপীচন্দ্র এবং লোলিতচন্দ্র।[৩৬] আধুনিককালে ময়নামাতি অঞ্চলে প্রত্নখননের ফলে ও অন্যান্য তাম্রশাসন প্রাপ্তির ফলে প্রমাণিত হয়েছে, দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে কুমিল্লায় 'ময়নামতি-লালমাই' অঞ্চলকে ঘিরে চন্দ্রদেব রাজবংশ রাজত্ব করেছিলেন যা হিউয়েন সাঙ উল্লিখিত সমতট জনপদ। চন্দ্ররাজ ও পরবর্তী শাসক দমোদর দেব কর্তৃক প্রদত্ত তাম্রশাসনে সমতটের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং এসব তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি মূলত মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চল ও সামান্য পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চল, কুমিল্লা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমতট। সমতটের এই সীমা সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জনপদের কোনো অঞ্চল কখনও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কখনও সমতটের কোনো অংশ হাতছাড়া হয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জনপদ বঙ্গ হিসেবে বঙ্গের সঙ্গেই এ ধরনের ঘটনা বেশি ধারণা করা যায়। সম্ভবত এ কারণেই অনেক সময় সমতট আর বঙ্গ সমার্থক বলেও বিবেচিত হয়েছে।

হিউয়েন সাঙ সমতট অতপর তাম্রলিপ্তি হয়ে কর্ণসুবর্ণ জনপদে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান তাম্রলিপ্তি থেকে ১৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কর্ণসুবর্ণে কমপক্ষে ১০টি বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘগ্রাম ছিল, যেখানে দু'হাজার আচার্য বাস করতেন। রাজ্যের অবস্থানিক বিবরণসূত্রে ধারণা করা যায় বর্তমান মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের উত্তরাঞ্চল ও মালদহের কিছু অংশ নিয়ে ছিল কর্ণসুবর্ণ জনপদের বিস্তার। হিউয়েন সাঙের বিবরণানুযায়ী রাজা শশাঙ্ক ছিলেন কর্ণসুবর্ণের সম্রাট। তিনি গৌড়েশ্বর হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। হর্ষচরিতেও তাঁকে 'গৌড়েশ্বর' অভিধায় সম্বোধন করা হয়েছে। বিধায় ধারণা করা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ প্রশাসনিকভাবে স্বাধীন থাকলেও এটি বৃহৎ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। টলেমী রচিত *ভূগোল-বৃত্তান্ত* গ্রন্থে কর্ণসুবর্ণ জনপদের তথ্য অবগত হওয়া যায়। টলেমীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময়ে বঙ্গদেশে কাটিসিনা (কর্ণসুবর্ণ) তমালতিস (তাম্রলিপ্তি) ও গঙ্গারিডি (গঙ্গারাঢ়ি) প্রভৃতি স্বতন্ত্র জনপদের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়।

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত জনৈক কান্তিদেব নামক নৃপতি প্রদত্ত তাম্রশাসনে 'হরিকেল' জনপদের নাম পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ইতশিঙের মতে হরিকেল ছিল প্রাচ্য দেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত জনপদ। কবি হেমচন্দ্র হরিকেলকে বঙ্গের একটি শহর বলে উল্লেখ করেছেন। এই জনপদটি চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। *মঞ্জুশ্রীমূলকল্প* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হরিকেল, বঙ্গ এবং সমতট তিনটি পৃথক অঞ্চল ছিল। তবে এই তিনটি জনপদ কখনও যে একটি অন্যটির অংশের মধ্যে মিলিত হয়ে যায়নি তা এ সূত্র থেকে প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে সপ্তম ও অষ্টম শতক হতে দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হতে হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অংশ বলে ধারণা করা হয়। হরিকেল শ্রীহট্ট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্ট সিলেটের পূর্ব নাম বলে স্বীকৃত।

গৌড় জনপদ প্রাচীন এবং সুপরিচিত। অবশ্য গৌড়ের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও বিস্তৃতি নিয়ে এখনও ধুম্রজাল রয়েছে। বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে গৌড় জনপদ তার পরিধি সম্প্রসারণের জন্য বাংলার বাইরেও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল। গৌড়ের খ্যাতি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোনো কোনো সময় সমগ্র বাংলাই গৌড় নামে আখ্যায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয় পূর্ব ভারতীয় দেশগুলোর সামগ্রিক নাম হিসেবে এমনকি আর্যাবর্ত তথা উত্তর ভারতের নাম হিসেবেও গৌড়কে চিহ্নিত করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে গৌড় বলতে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদহ জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝায়। গৌড়ের উল্লেখ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের লেখক পাণিনি গৌড়পুর নামে একটি নগরের উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী) *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, গৌড়দেশের প্রসিদ্ধি স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারণে। গুপ্তযুগের লেখক বরাহমিহির গৌড়ক এর উল্লেখ করেছেন। পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বঙ্গ, সমতট ও বর্ধমান থেকে আলাদা ছিল এই গৌড়ক। গৌড়ক বলতে গৌড় জনপদকে বুঝানো হয়েছে। কনৌজরাজ ইশান বর্মনের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকে) তাঁর গৌড় বিজয়ের বিবরণ রয়েছে। হড়াহা লিপি অনুযায়ী গৌড়দেশ দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে গৌড়রাজ শশাংক একজন শক্তিশালী শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বানভট্ট তাঁর *হর্ষচরিতে* শশাংককে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ করেছেন। জানা যায় শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। সেই হিসেবে অনেকে মনে করেন কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় অভিন্ন জনপদ। শশাঙ্কের আমলে গৌড় জনপদ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। দক্ষিণ বিহার ও উড়িষ্যা এর অধিভুক্ত ছিল। এই সময়ে গৌড় জনপদের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

ভবিষ্য-পুরাণে গৌড়ের ব্যাপক বিস্তৃতির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে নবদ্বীপ (নদীয়া জেলা), শান্তিপুর (নদীয়া জেলা), মৌলপত্তন (হুগলী জেলার মোল্লাই), কণ্টকপত্তন (বর্ধমান জেলার কাটওয়া) পর্যন্ত একদিকে পদ্মা নদী অপরদিকে বর্ধমান পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলার পূর্বাংশ বঙ্গ এবং পশ্চিমাংশ গৌড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলার পালরাজগণ গৌড়রাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেন রাজাদের উপাধি মুসলমানদের গৌড় বিজয়ের পরে পূর্ববঙ্গের রাজা সেনরাজ বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন।

কলহনের রাজ তরঙ্গিনিতে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে। এই পঞ্চগৌড় হচ্ছে-

(ক) বঙ্গদেশীয় গৌড় (খ) সারসূত দেশ (পূর্ব পাঞ্জাব) (গ) কান্যকুব্জ (কনৌজ) (ঘ) মিথিলা (বিহারে অবস্থিত) (ঙ) উৎকল (উড়িষ্যায় অবস্থিত)। পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের সময়ে এই পঞ্চগৌড়ের প্রভাব ছিল অত্যধিক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে গৌড়ের প্রাচীনত্ব ও অবস্থান এবং এর সংকোচন ও প্রসারণ সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে গৌড় পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে গড়ে উঠেছিল। মালদা-মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলেই ছিল গৌড়ের আদি অবস্থান। পরবর্তীকালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র বঙ্গদেশ গৌড় নামে পরিচিতি অর্জন করে। এমনকি আর্যাবর্তেও গৌড়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়। শুধু তাই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও গৌড়ের অবদান ছিল। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য, শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থাদি, খোদিত শিলালিপি ও তাম্রশাসন কিংবা চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বিবরণীতেই শুধু নয়, গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীদের বিবরণেও পূর্বভারত ও বঙ্গদেশীয় জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেও শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। সম্রাট আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের শেষদিকে পাঞ্জাবে বিতস্তা নদীর তীরে উপনীত হয়েছিলেন। সমসাময়িককালে গঙ্গাতীরবর্তী বর্তমান বিহার, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গকে নিয়ে গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গারাঢ়ি রাষ্ট্র নিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গড়ে উঠেছিল। নাম থেকে মনে হয় গঙ্গার তীরে অবস্থিত রাঢ়দেশই ছিল গঙ্গারাঢ়ি বা গঙ্গারিডি। হেলেনিক ইতিহাসবিদদের কথিত গঙ্গারিডি রাষ্ট্র অর্থাৎ পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গকে নিয়ে গঙ্গারাঢ়ি নামে রাষ্ট্রব্যবস্থা অতি প্রাচীন বলে অনুমিত হয়। সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে এবং কলকাতার আশেপাশে ২৪ পরগনাসহ দক্ষিণাঞ্চলে প্রত্নসন্ধান ও প্রত্নখননে প্রাপ্ত সামগ্রী থেকে এ ধারণাকে আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত করে।

উপরের আলোচনা ও তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক প্রাচীন বঙ্গদেশের সিংহভাগই অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাচীন গৌড়, দক্ষিণবঙ্গ, উৎকল এবং হয়ত বঙ্গেরও বেশ কিছু অঞ্চল তার শাসনাধীনে এনে গৌড় নামে একটি একক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর পর থেকেই বঙ্গদেশ বলতে প্রধানত তিনটি জনপদকে বুঝানো হতো। এগুলো হলো- পৌণ্ড্র, গৌড় এবং বঙ্গ। ক্রমবিবর্তনে পৌণ্ড্র নামটিও গৌড় ও বঙ্গের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। জনপদ হিসেবে বঙ্গ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে রাখলেও প্রাচীন বঙ্গদেশ গৌড়দেশ নামে একক সত্তায় বিকশিত হয়েছিল। পুণ্ড্র থেকে সমতটবাসীদের সবার পরিচিতি ছিল গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় হিসেবে। পাল ও সেন নৃপতিগণ সমগ্র বঙ্গদেশে শাসন পরিচালনা করলেও নিজেদের গৌড়েশ্বর ভাবতেই বেশি গর্ববোধ করতেন। এমনকি প্রকৃত গৌড় অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েও পূর্ববঙ্গে একটি সীমিত অঞ্চলে রাজত্বকারী সেন রাজারা গৌড়েশ্বর উপাধি পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গ নামটি গৌড়ের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

মুসলিম যুগের প্রারম্ভিক স্তরে অর্থাৎ ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে মুসলিম বঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল- বঙ্গ, রাঢ়, বাগড়ী ও বরেন্দ্র (বরিন্দ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'পুণ্ড্র জনপদ' ক্রমশ শাসনতান্ত্রিক বিভাগে পরিণত হয় এবং এর উত্তরোত্তর সীমা বৃদ্ধির ফলে সম্ভবত গুপ্ত আমলেই এর প্রশাসনিক একক হিসেবে নাম হয় পৌণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদটি ক্রমে পাল আমল থেকে বরেন্দ্রী নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাল আমলে দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র নামক জনপদের উল্লেখ দেখা যায় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত '*রামচরিতম*' নামক কাব্যগ্রন্থে। সেখানে কবি প্রশস্তিতে আছে,

বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চুড়ামনি: কুল স্থানম।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর প্রতিব: পুণ্য ভব্বহদ্ধটু।[৩৭]

'রামচরিত' কাব্যে ও কমৌল তাম্রশাসনে বরেন্দ্রীকে পালদের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। সেন ও পাল রাজাদের বিভিন্ন তাম্রশাসন ও উৎকীর্ণ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, বর্তমান দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনার কিয়দংশ নিয়ে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি গড়ে উঠেছিল। আর মুসলিম শাসনে এই বরেন্দ্রী মধ্যযুগীয় 'বরেন্দ্র' জনপদে পরিণত হয়। *তাবাকাত-ই-নাসিরী*তেও দেখা যাচ্ছে, এমনকি ত্রয়োদশ শতকেও বাংলার বিভাগ হচ্ছে- রাঢ়, বরেন্দ্র, সনকনাট বা সমতট এবং বঙ্গ। মুদ্রায় উৎকীর্ণ তথ্য থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে, বঙ্গ বলতে সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চল নয় একটি অংশকে বুঝানো হচ্ছে।

পাল ও সেন আমলে বাংলা নামের প্রচলন ছিল।[৩৮] কিন্তু তা একটি দেশ বা জাতিসত্তার পরিচয় বহন করতো না। ইলিয়াস শাহ-ই প্রথম সুলতান যার শাসনামল থেকে বাঙালি একটি জাতিসত্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৩৯] সামগ্রিক অর্থেও বাংলা নামকরণে মুসলিম সুলতানদের অবদানই অনস্বীকার্য।[৪০]

সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াসশাহ-এর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলিম শাসনাধীনে আসার পর সত্যিকার অর্থে বাংলা স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ তিনটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিল। যথা-লক্ষণাবতী বা লাখনাবতী, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ। সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহ প্রথম (১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে) তিনটি অঞ্চলকে একত্রিত করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'বাঙলা' বা বাঙ্গালা নামের প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকেই সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চলের জন্য বাঙ্গালা নাম অপরিহার্য হয়ে যায়। *তারিখ-ই-ফিরুযশাহী* গ্রন্থে সুলতান শামস আল দীন ইলিয়াস শাহকে অভিহিত করা হয়েছে শাহ-ই-বাঙ্গালা বা শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান অভিধায় এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বাংলার পাইক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানীর মতে সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহ-ই সত্যিকার অর্থে সমগ্র বাংলাদেশকে বাঙ্গালা নাম প্রদানের কৃতিত্বের অধিকারী, নি:সন্দেহে তা যথার্থ।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, পৌণ্ড্র-বরেন্দ্র, গৌড়-কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ-সমতট হরিকেল- এই সব জনপদ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল অতীতের বঙ্গভূমি। আর এ সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র জনপদ সুলতানি আমলের ইলিয়াসশাহী পর্বে বাঙ্গালা নাম ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল আমলে আকবরের শাসনামলে প্রাচীন গৌড়বঙ্গ দেশ পরিণত হল সুবে বাঙ্গালা নামে মুঘল সম্রাজ্যের একটি একক প্রশাসনিক এলাকায়। আবুল ফজল তাঁর *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালী' শব্দের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হলো-প্রাচীন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল শব্দ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে বঙ্গাল, বা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী। এ বিষয়ে সুকুমার সেনের অভিমত হলো প্রথমে বঙ্গ থেকে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাহর নাম সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম শাসনামলে, অতঃপর পারসিক বঙ্গালহ উচ্চারণ থেকে পর্তুগীজরা বানিয়েছে 'বেঙ্গলা' এবং ইংরেজদের মুখে বঙ্গ পরিণত হয়েছে বেঙ্গল (Bengal)-এ। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আজ তা বাংলা। ১৯৭১ খিস্টাব্দে এর একটি অংশ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়ে আজ তা বাংলাদেশ। চতুর্দিকে সবুজ রঙের মধ্যে লালবৃত্ত সূর্যাকৃতির পতাকায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং বাঙালি বা বাংলাদেশি জাতি যুগে যুগে এভাবেই বিকশিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত হচ্ছে।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় বসবাস করতো মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্ত্যজ শ্রেণির অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক জৈন। পাল বংশের পতনের পর থেকে বৌদ্ধদের রাজনৈতিক প্রাধান্য কমতে থাকে। গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু সেন রাজবংশের আরোহণের ফলে বৌদ্ধ, জৈনসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।[৪১] লক্ষণ সেন বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছায় অন্যান্য ধর্মের মানুষদের উৎপীড়ন করেছেন।[৪২] তাঁর সময়েই ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসে নির্যাতন।[৪৩] ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পণ্ডিত তার *শূণ্যপূরাণে* শ্রী নিরঞ্জন রুষ্মায় ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ চিত্র এঁকেছেন কবিতার মাধ্যমে।[৪৪]

সামাজিকভাবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তারা শুদ্র[৪৫] সমাজের মধ্যে গণ্য হতো। শুদ্রদের চেয়ে নিম্নে ছিল অন্ত্যজ শ্রেণি। এই উভয় শ্রেণি সমাজে অবহেলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা এই নিম্নশ্রেণি থেকে সব সময় দূরে থাকত। সমাজে পতিতাবৃত্তি হিন্দু সমাজের উচুঁশ্রেণির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং পতিতাবৃত্তি সমাজে কোন নিন্দনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো না।

মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাংলায় বাংলাভাষার কোনোরূপ সম্মান ছিল না। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সমাজে বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে। তাঁরা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলে মনে করতো।[৪৬] অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষার অধিকারবঞ্চিত এবং বাংলাও ছিল অবহেলিত ও ঘৃণিত।[৪৭] এ কথা অবিদিত নয় যে, মুসলমান শাসকগণই ঘৃণিত ও অবহেলার স্থান থেকে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে সম্মান প্রদান করেন এবং বাঙালি কবি ও বিদ্বানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বাংলা ভাষাকে পরিপূর্ণ একটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪৮] ড. দীনেশ চন্দ্র সেন মুসলমান শাসকগণের বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[৪৯] :

নিম্নশ্রেণি এড়িয়ে চলাই ছিল হিন্দু উচ্চশ্রেণির একটি সংস্কার। তথাপি এই উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা নিম্নশ্রেণির ডোম্বীনীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত রতিক্রিয়ায় মিলিত হতে দ্বিধাবোধ করতো না।[৫০] গৌড়ের যুবক-যুবতিদের কামলীলার কথা, তাদের কামনা ও পোশাকের কথা এবং বঙ্গের রাজ দরবারের অভ্যন্তরে মহিলাদের যে নির্লজ্জ যৌনতা, ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে তাদের কাম-ষড়যন্ত্রের বিবরণ বাৎস্যায়নে বর্ণিত হয়েছে।[৫১] ধোয়ীর *পবনদূত* কাব্যেও কামচরিতার্থতার অবাধ লীলা অত্যন্ত সাড়ম্বরপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির অবস্থার এই অধঃপতনের পেছনে তৎকালীন মানুষের সমাজ, জাত-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যকেই কারণ বলা যায়। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্তি এবং পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে

শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবকেও এজন্য দায়ি বলা যায়। এ কারণেই তৎকালীন জনজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্প-সাহিত্যসহ দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুসঙ্গে যৌন অনাচার নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ববোধ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং রুচির অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছিল।[৫২] ধর্মের নামে অধর্ম, সামাজিকতার বদলে অসামাজিকতা, সংস্কৃতির স্থানে অপসংস্কৃতি এই সময়ের বাংলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাসে* উল্লেখ করেছেন, ''একটা বৃহৎ গভীর ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিল, কিন্তু কেহ তার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা না আসিলে কিভাবে কী উপায়ে কী হইত বলিবার উপায় নাই।[৫৩]"

যে কোন জাতির জন্য সে দেশের মানুষের নৈতিক শক্তি জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। আর যে রাষ্ট্র বা সমাজ থেকে এই দিকটি দুর্বল হয়েছে সে রাষট্রও ধীরে ধীরে পতনের দিকেই এগিয়ে গেছে। তৎকালীন বাঙালি জাতির মধ্যে নৈতিক বল ও চরিত্রবলের অভাব সুস্পষ্ট। সেন বংশীয় রাজাগণ এবং এমনকি রাজা লক্ষণ সেনও এই দুর্বলতার গণ্ডি থেকে বের হতে পারেন নি। ফলে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতো। তৎকালীন রাজকবি হলায়ুধ মিশ্রের কাব্যেও হিন্দুদের নিন্দা ও মুসলমানদের গুণকীর্তনের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।[৫৪] বাংলার সামাজিক অবস্থা দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, ব্রাহ্মণদের নির্যাতন, উশৃংঙ্খল যৌনতা ইত্যাদি সমাজকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। একটু ক্ষীণ আশার আলো বুকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এ থেকে মুক্ত হবার পথ খুঁজছিল।

অষ্টম ও নবম শতক থেকে বাংলা ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। মুসলমান মিশনারী জাতি। মহানবী (স.) ইসলামের সুমহান বাণীকে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। রাসুল (স.) বলেছেন, 'আমার নিকট হতে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে।' উপস্থিত ব্যক্তি আমার নিকট থেকে যা শুনবে তা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট অবশ্যই প্রচার করবে।[৫৫] মহানবীর (স.) এই নির্দেশে সাহাবাগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী অনুসারীগণ যুগে যুগে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের সক্রিয় চেষ্টা করেছেন।[৫৬] ভারতের সিন্ধু মুসলমান নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার পর থেকে এতদঞ্চলে তাঁদের আগমন বৃদ্ধি পায়। এ সময়েই বাংলা ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। বাংলায় ইসলাম প্রচারে উলামা-মাশাইখ ও সুফি-সাধকগণ ব্যাপক অবদান রেখেছেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইসলাম প্রচারক উলামা-মাশাইখ বাংলায় ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অনেকেই ইসলাম প্রচারের স্বার্থে এ দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এদেশবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ব করে তাঁদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের মহান বাণীকে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে বাংলার জনগণের ব্যাপক অংশ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ সমস্ত উলামা-মাশাইখ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে বাংলায় আগমন করেন। এদের অধিকাংশই আরব এবং ইরানীয় বংশোদ্ভুত।[৫৭] এদের কেউ কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং কেউ কেউ শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন। আল কুরআনের নির্দেশনা এবং মহানবীর (স.) বাণীকে উপলক্ষ্য করে উলামা-মাশাইখ ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদে শহর-বন্দরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁদের ধর্মীয় অনুরাগ ধর্ম প্রচারের আগ্রহ, আদর্শ চরিত্র ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলির দ্বারা সাধারণ মানুষ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁদের ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৫৮] ইসলাম ধর্মের বিধানাবলি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের মাধ্যমে উলামা-মাশাইখ ও সুফি সাধকগণের নৈতিক চরিত্রে সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের যে সমাহিত চিত্র ফুটে উঠেছিল তা বাংলার সাধারণ মানুষকে একদিকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল, তেমনিভাবে বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহতকরণ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উজ্জীবনে এ বিষয়গুলো যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। উলামা-মাশাইখ সে সময়ে সমাজের নিগৃহীত হতদরিদ্র বঞ্চিতদের আশ্রয়স্থল ও আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। সমাজে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তায় বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম নৃপতি, বিজেতা ও শাসনকর্তাবৃন্দ রাজ্য বিজয় অথবা ইসলাম ধর্মের গৌরব মহিমা প্রতিষ্ঠায় তাঁদের সাহায্য কামনা করতেন। তাঁরা কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে অস্ত্র ধরেছেন, আবার কখনো তাঁরা নিজেরাই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধবিজয়ী এই উলামা-মাশাইখের কেউ কেউ বিজিত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সমাজে ইসলাম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে এসে এ সমস্ত উলামা-মাশাইখের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক বহু সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছে। হিন্দু অধ্যুসিত বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত উলামা-মাশাইখকে ইসলাম প্রচারে হিন্দু রাজা ও সমাজপতিদের কোপানলে পড়তে হয়েছে। হিন্দু রাজা ও সমাজপতিদের অকথ্য নির্যাতনে জর্জরিত হতে হয়েছে তাঁদের। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কার্যধারাকে বন্ধ ও ব্যাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। উলামা-মাশাইখকে কখনও কখনও বাধ্য হয়ে তাঁদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হলেও হিন্দু রাজশক্তির প্রসন্নতা অর্জনেরও চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টায় কখনও বা তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন তবু একসাথে থেকে বসবাসের চেষ্টা করে গেছেন। তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র, চিন্তা, চেতনা চতুষ্পার্শস্থ অমুসলিম তথা হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

করে। এরই এক প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার আল-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন। ফলে পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারের ধারা রাজকীয় নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হতে থাকে।[৫৯] এভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলা ইসলামের আলোয় প্রোজ্জ্বোলিত হয়ে যায়। বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম প্রচারে উলামা মাশাইখ কোন বহিঃরাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ তো দূরের কথা প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বরং তাঁদের ইসলাম প্রচারে পরবর্তীতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির আগমন ও মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়েছিল বলা যায়।

ইখতিয়ার আল-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের সময় থেকে এই অঞ্চলের মুসলমানদের বসতি ব্যাপকভাবে শুরু হয়। মুসলিম বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজ জীবনেও একটা পরিবর্তনের আভাস পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ সময় থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারকবৃন্দ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় ব্যাপকভাবে আগমন করতে থাকেন।[৬০] মুসলিম বিজয়ের ফলে বঞ্চিত নিম্নশ্রেণির হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা ইসলামের সুমহান ঔদার্য্যে বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে থাকে। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার জনসংখ্যার অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করে। হিন্দুদের সামাজিক অনাচার, উশৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা ও যৌনতার বিরুদ্ধে ইসলামের আদর্শ, উদারতা, নৈতিকতা দর্শনে স্থানীয় বাঙালি সমাজ ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করতে থাকে। দুই ধর্মের সম্প্রীতি ও সহাবস্থান সহজ ছিল না। এক্ষেত্রে ইসলামের উদারতায় হিন্দু সমাজের দুর্নীতির চিত্রগুলো সমাজ থেকে কমতে শুরু করে এবং মুসলিম ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ গঠনে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি মানবকল্যাণের অনুকূলে আসতে থাকে।

মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান সমাজে যে শ্রেণিব্যবস্থা ছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে পাঁচটি শ্রেণি ছিল। যথা- সৈয়দ, শাইখ, মুঘল (পরবর্তিকালে), পাঠান এবং দেশজ। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারটি শ্রেণি বহিরাগত। তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূত্রে বাংলায় আগমন করেন। যেমন- শাসক, সৈনিক ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে। প্রথমত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে হলেও পরবর্তীতে জমিদারী, জায়গীরদারী ও লাখারাজ ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় বাগদাদ, বোখারা, সমরখন্দ ও বসরা থেকে অনেক মুসলমান বঙ্গে আগমন করতে থাকেন। আগত মুসলমানদের অনেকেই এ দেশীয় মুসলমানদের প্রতি ছিল বিদ্বেষী ও অহঙ্কারী। এমনকি তাঁরা এ দেশীয় মুসলমানদের অস্পৃশ্য ও মেলামেশার অযোগ্য বলে ধারণা করতো।[৬১] এর কারণ হিসেবে নিজেদের তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর জাত এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় বেশি দক্ষ মনে করতো। এ সময় তাঁরা নিজেদের বংশগত চেতনাকে বেশি গুরুত্ব দিত এবং নিজেদের সৈয়দ, শাইখ, মুঘল, পাঠানের বংশধর বলে পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হতো। অনেকেই আরবি-ফারসি ভাষায় কুলজী, টিকুজী বা 'সজরা' (বংশলতিকা) প্রণয়ন করে বংশ পরম্পরায় তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রামে কুলীন মুসলিম সমাজে এই 'সজরা' রক্ষা করার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২] তবে একথা স্বীকৃত যে, মুসলমান সমাজের এই কৌলীন্যচেতনা প্রকৃতপক্ষে দেশজ প্রভাবেরই ফল। কারণ অভিজাত মুসলিম সমাজের সকলেই যেমন বহিরাগত নয়, তেমনি সকলেই মুঘল-তুর্কী বংশধর কিংবা আরব সৈয়দের অধঃস্তন পুরুষও নয়। বৈবাহিকসূত্রে এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে এদের অনেকেই দেশীয় হিন্দুর বংশধর কিংবা মাতৃসূত্রে বাঙালি হিন্দুর রক্তে পরিপুষ্ট। মুসলিম সমাজে কুলশ্রেষ্ঠ হলেন সৈয়দ হযরত আলীর পুত্র হাসান-হুসাইনের অধঃস্তন বংশধর বলে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলার সকল সৈয়দই হযরত আলীর বংশধর এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। কথিত আছে যে, সম্রাট আকবর এদেশের কিছু ধর্মান্তরিত মুসলিম ব্রাহ্মণকে সৈয়দ উপাধী প্রদান করেছিলেন।[৬৩] একথা বলাবাহুল্য নয় যে, পূর্বেও অনেক সুযোগসন্ধানী মানুষ নিজেদের সৈয়দ বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তবে বহিরাগত সৈয়দ, শাইখ ও মুঘল, পাঠান এবং ধর্ম প্রচারক অভিজাত মুসলমানদের অনেকেই সে জ্ঞান-গরিমায়, শৌর্যে-বীর্যে দেশজ মুসলমান অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। এর প্রমাণ ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*, সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজীর *সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী* কাব্যে এমনকি পরবর্তীকালে রচিত অষ্টাদশ শতকের রাজসভার সভাকবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* থেকে অবগত হওয়া যায়। মুকুন্দরাম তার কল্পিত ওজরাই নগরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বহিরাগত অভিজাত মুসলমান এবং দেশজ অনভিজাত মুসলমানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। অভিজাত মুসলমান সম্পর্কে কবির কাব্য-

আইল চড়িয়া তাজি- সৈয়দ মৌলনা কাজি/ খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটি বোলায়ে হাসন হাটী/ বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি।[৬৪]

দৌলত কাজী রোসাঙ্গ রাজসভায় প্রভাবশালী মুসলমানদের প্রসঙ্গে যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা সকলেই অভিজাত শ্রেণির-

সৈয়দ কাজী শাইখ মোল্লা আলীম ফকির,/ পুজেহ সেসব যেন আপনা শরীর।[৬৫]

ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের গড় বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সব মুসলমানের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা ছিলেন বহিরাগত এবং অভিজাত গোত্রের:

দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান/ সৈয়দ মল্লিক শাইখ মুঘল পাঠান।[৬৬]

এই অভিজাত মুসলমানদের অনেকেই রাজকর্ম ব্যতিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেও জীবীকা নির্বাহ করতেন।[৬৭] এরা ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ, পুত-পবিত্র চরিত্রাধিকারী। এঁরা এতোই ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, জীবন গেলেও ধর্ম ছাড়তেন না। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম তাই যথার্থই বলেছেন-

বড়ই দানিসম্পদ না জানে কপট ছন্দ/ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।[৬৮]

যেহেতু ইসলাম ধর্ম মূর্তিপূজার বিরোধী এবং এদেশীয় হিন্দুরা মূর্তিপূজক, সে কারণে বহিরাগত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষপরায়ণ। মুসলমানদের এই মানসিক প্রবণতার কথাই উল্লেখ করেছেন দ্বিজ রামদেব তার *'অভায়ামঙ্গল'* কাব্যে-

বসিল মোছলমান নিন্দে তারা হিন্দুয়ান/ কাজি খোন্দকার সৈয়দ সমাজ।[৬৯]

এরূপ ধর্ম-কর্মনিষ্ঠ বিদেশাগত অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে কিছু ছিল ধর্মব্যবসায়ী যারা যজ্ঞ যাজনকারী ব্রাহ্মণদের মতই ছিল লোভী, পরনির্ভরশীল, ভিক্ষাজীবী।[৭০] দেশীয় লোকেরা ধর্মান্তরিত হলেও পেশান্তরিত হতে পারেননি অনেকেই। সে কারণে তাঁরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তাঁদের পরিচয় ছিল বৃত্তিজীবী হিসেবে। কবি মুকুন্দরাম দেশজ মুসলমানদের কথা অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন-

রোজা নামাজ নাম করিয়া কেহ হৈল গোলা।/ তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম ধরাল মুকেরি।/ পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল পিঠারি।
মৎস বেচি কেহ নাম ধরাল কাবাড়ি।/ নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
হিন্দু হইয়া মুছলমান হৈল গবয়াল।/ কেহ রাত্রিকানা হৈয়া মাগে নিশাকাল।
সানা বন্ধিয়া ধরে সানাকার নাম।/ সুন্নত করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম।
পট্টা পরিয়া কেহ ফিরায়ে নগর।/ তীরকর হয়্যা কেহ নির্মাণয়ে শর।
কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।/ নানা স্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া।
কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা।/ নেয়াল বুনিয়া নাম ধরয়ে বেনটা।
রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া।/ গোমাংশ বেচিয়া নাম ধরয়ে কসাই।
এই হেতু খসপূরে তার নাই ঠাই।[৭১]

এরূপ গোলা-জোলা, সুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, গরশাল, সানাকার, হাজাম, কাগজী, দরজী, বেনটা, রঙ্গরেজ, হালান, কসাই, প্রভৃতি, কবি, বর্ণিত বৃত্তিজীবী মুসলমানের সঙ্গে লবণ প্রস্তুতকারী মুলঙ্গী, পালকী বাহক কাহার, ঢাল প্রস্তুতকারী ঢালী, নস্য প্রস্তুতকারী নিশা[৭২] এবং কল্প বা তেলী, মালি, জেলে, বিরদার বা গোরখোদ তুরিয়া বা কুকুর রক্ষক। বৈদ্য, ব্যধ, ধোপা, নাপিত, সাপুড়িয়া বা বেদে, বাজিকর বা ক্রীড়াকৌশলী, ইন্দ্রজালক[৭৩] গাইন বা নিম্নশ্রেণির গায়ক সম্প্রদায়[৭৪] প্রভৃতি বৃত্তিজীবী মুসলমান নিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজ গঠিত ছিল। মুসলিম সমাজে রাজকর্ম বিষয়ক পদবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাজী, খাঁ, চৌধুরী, তালুকদার, মল্লিক, সরকার, মণ্ডল, মিঞা,[৭৫] মুন্সি, মীর, মীর্জা, বেগ, লস্কর, শিকদার, বখশী, সমাদ্দার, পাটোয়ারী, পশারী, ব্যাপারী, প্রভৃতি।[৭৬]

মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে শিক্ষা বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা, অন্যদিকে ধর্ম হিসেবে ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ধারার ইসলামি শিক্ষার বিস্তার। ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মাত্রার সংযোগ ঘটেছিল। সুলতানি আমলের পূর্বে সেন শাসনামলে বাংলার সাধারণ হিন্দুর জন্য শিক্ষার দরজা ছিল রুদ্ধ। বাংলায় মুসলমানদের আগমনে তা হয়ে যায় অবারিত। এ সময়ে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের জন্যও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে শিক্ষার আলোবঞ্চিত নিচু শ্রেণির হিন্দু সমাজ থেকে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভাধর লেখক-কবি সাহিত্যিকের আবিষ্কার সম্ভব হয়। এরা নিম্নশ্রেণি থেকে শিক্ষা অর্জন করে পরবর্তীতে এদের অনেকে অভিজাত শ্রেণিভুক্ত হয়ে রাজদরবারে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়। চৌদ্দ শতকের শেষ পর্বের হিন্দু কবি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৭] সে যুগে বার বৎসর বয়সে পুত্র সন্তানকে গুরুগৃহে পাঠানো হতো। কুল গৌরব ও বংশ গৌরব রক্ষায় সে যুগের মানুষ ছিল অত্যন্ত যত্নবান। ব্রাহ্মণ সন্তানরা রাজপণ্ডিত হওয়া মহাগৌরবের বলে মনে করতেন। কৃত্তিবাস নিজেও সে সম্মান লাভ করেছিলেন। মুসলমান শাসনাধীনে অব্রাহ্মণদের পক্ষে

শিক্ষা গ্রহণে ব্রাহ্মণদের অসন্তুষ্টি উৎপাদনে আর কোনো ভয় ছিল না। বাংলার নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা মুসলমান শাসনের সূচনাকাল থেকেই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন শুরু করে। "*মানিকচন্দ্র রাজার গান*" নামক কাব্য থেকে জানা যায় যে, মুসলিম আমলে হিন্দু সমাজের নিচুশ্রেণির হাড়ি ও মাহুরা (সাহা) দলিল-পত্রাদি পড়বার ও লিখবার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল।[৭৮] এমনকি নাপিত এবং ঝাড়ুদারগণও বিদ্যা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে। কড়চার লেখক কবি গোবিন্দ দাস ছিলেন একজন স্বর্ণকার। নলদময়ন্তীর কবি মধুসুদন ছিলেন জাতিতে একজন ক্ষৌরকার। জনৈক গোয়ালা রাম নারায়ণ গোপ *দেবায়ন উপাখ্যান* রচনা করেন এবং একজন ধোপা ভাগ্য মন্তভূতি *হরিবংশ* লিখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।[৭৯] শ্রী মাঝি কায়েত, গঙ্গাদাস সেন, কালিচরণ গোপ, রাম প্রসাদ দে, রাম দত্ত এবং নিম্নশ্রেণির অনেক হিন্দু সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁদেরকে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে দেখা যায়।[৮০] এমনকি নিম্নবর্ণের রমণীরাও যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য থেকে জানা যায় যে, ব্যাধ রমণী ফুল্লরা, বিপুলা ও বাজুদেবীর হিন্দুশাস্ত্রের উপর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।[৮১] জনৈক মালীর স্ত্রী হিসাব পত্র লিখতে পারতো।[৮২] মধ্যযুগে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা শিক্ষার অবারিত সুযোগ পেয়ে তাঁদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিল যদিও অভিজাত শ্রেণির হিন্দুরা তাদের শিক্ষাদানের সুযোগের অনেক বিরোধিতা করেছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানের চর্চায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতেন। শ্রী চৈতন্য এ সময়ের একজন হিন্দু সংগঠক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি শ্রেণির সাম্য ও সকলের জন্য সমান সুযোগ অবারিত ঘোষণা করলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের এই বৈষ্ণব গুরুর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমান শাসকের নিকট চৈতন্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ বা অভিজাত হিন্দুরা শিক্ষার সুযোগকে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই সীমিত রাখতে চেয়েছে। তবে অনেক অভিজাত হিন্দু তাঁদের বাড়ির বারান্দা, দেউড়ী বা গৃহসংলগ্ন খোলা মাঠে কোনো ছায়াদানকারী বৃক্ষতলে সাধারণ হিন্দুদের শিক্ষাদানের সুযোগ করে দিত।[৮৩]

মধ্যযুগে বাংলায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষের বসবাস ছিল। সামাজিক স্তরের সর্বোত্তম স্তরে অবস্থান ছিল সুলতান ও রাজপরিবারের লোকজন এবং আমীর ওমরাহগণ। এরা ছিলেন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রেণি। বংশগত কারণে নয়, বরং শিক্ষা ও প্রতিভার জন্যেই আমীর ও ওমরাহ পদের উপযোগী হতো। সে সময়ে ক্রীতদাসদেরও শুধুমাত্র শিক্ষার কারণে আমীরের পদ লাভের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মধ্যযুগে শাসকবৃন্দ তো বটেই আমীর ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান গরিমার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা বিদ্বান, জ্ঞানীগুণী ও শিল্পীদের প্রতি উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।[৮৪] এ কথাও সত্য যে অভিজাতদের নিজেদেরও জ্ঞানীগুণীদের কদর বুঝবার যোগ্যতা থাকতে হতো।

মধ্যযুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে একটি শ্রেণিকে নির্ধারণ করা যায়। এঁরা সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবীকা অর্জন করতেন। তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লিখাসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলায় প্রয়োগ করতেন। এ শ্রেণির মানুষ তাঁদের শিক্ষা ও প্রতিভার দিক দিয়ে কায়িক শ্রমজীবী মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। সমাজে এরা বেশ প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু সকল শিক্ষকগণ ও আলিম উলামা শ্রেণি সমাজে বেশ সম্মানজনক অবস্থানে ছিলেন।[৮৫] সমাজে যিনি যত বেশি আলিম বা জ্ঞানী ছিলেন তিনি তত বেশি সম্মানিত হতেন। বুদ্ধিবৃত্তিমুলক পেশায় নিযুক্ত থাকতেন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৮৬] মোটামুটি নিম্নপদস্থ কর্মচারি, কেরানি, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, কবি, সঙ্গীতশিল্পী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ ছিলেন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও কারিগর এবং উৎপাদনকারী ব্যক্তিরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। এ সময়ে শিল্পকলার বেশ সমাদর ছিল। শিল্পী ও কারিগররা সমাজে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারতেন। এ সমস্ত শিল্পীদের অনেকে আড়ম্বর ও ভোগবিলাসপূর্ণ দ্রব্য তৈরি করতে পারতো। এগুলোর চাহিদাও ছিল অনেক। এগুলো তৈরির জন্য সুনিপুণ কারিগরদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হতো।[৮৭] মধ্যযুগে মুসলমানদের নিম্নশ্রেণির লোকেরা সাধারণত সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করা অথবা রাজসরকারে কেরানির চাকুরি করা পছন্দ করতো। হিন্দুদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী।[৮৮] সৈন্যবাহিনীতে দক্ষ, যোগ্য, শক্তি সামর্থ্যবান ও প্রশিক্ষিত সৈন্যের কদর ছিল বেশি। সামরিক বাহিনীতে পদাতিক বাহিনী, হস্তিবাহিনী, নৌ বাহিনী ছিল।[৮৯] প্রত্যেক বাহিনীতেই শিক্ষিতদের কদর ছিল বেশি। শিক্ষিতদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বেশি দেয়া হতো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় যে, আলিম-উলামা তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য সমাজে অত্যন্ত সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রামীণ সমাজে এদের প্রভাব ছিল অনেক। তাঁরা কুরআন হাদিস পর্যালোচনা করে সমাজ থেকে ইসলাম ধর্ম বিরোধী রীতিনীতিগুলো দূরীকরণের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। কবি বিজয়গুপ্ত থেকে জানা যায়, সে সময়ে কাজীরাও উলামাদের উচ্চ সম্মান দিতেন। কবি বলেন, তাকী নামে জনৈক মোল্লা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কাজী ভোজের আয়োজন করলে সকলের পূর্বে আলিমদের খাওয়াতেন। বিজয়গুপ্ত আরো লিখেছেন, কাজী সর্বদা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে আলিমের পরামর্শ নেন। আলিমগণ সবসময় কুরআন হাদিস পর্যালোচনা করে বিভিন্ন বিষয় মীমাংসা করেন।

ধর্মীয় গ্রন্থকে তাঁরা তাঁদের সকল সমস্যার সমাধান বলে মনে করতেন। বিপদের সময় তাঁরা কুরআনের আশ্রয় নিতেন। এতে অবশ্য ঐ যুগের সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের আদিম সংস্কার ও সহজ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে আলিম-উলামা ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাশীল ব্যক্তি। তাঁরা ছিলেন এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় পণ্ডিত, শিক্ষক ও ধর্ম শিক্ষাদাতা এবং ইমাম। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহ পরিচালনা ও সম্পন্ন করতেন।[৯০]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, মধ্যযুগে প্রতিটি পেশায় সফলতার পরিচয় দিতে শিক্ষা জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ছিল অনেক। মধ্যযুগে জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প কিছু ছিল না। মধ্যযুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাভিত্তিক সফলতার পেছনেও এই রীতিটিই কার্যকর ছিল।

মধ্যযুগে বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ভাষার উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থাপত্য ক্ষেত্রে চিত্রকলার উন্নয়নে, লিখন শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাঙালি চেতনা ও জাতীয়তাবাদের বিকাশে এগুলোর অবদানই সর্বাধিক বিবেচিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতা, সম্ভ্রমবোধ, শালীনতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মর্যাদা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সমাজ হয়ে উঠেছিল উষ্ণ, সুন্দর, স্বচ্ছল ও বসবাসযোগ্য। বাংলার এ উন্নতাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যযুগের মুসলমান শাসনপর্বেই। এ সময়ের শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল তাতে বাংলা পৃথিবীর একটি অতি সম্পদশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৯১] কৃষি বাণিজ্য, শিল্প স্থাপত্য নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে, উন্নয়নের কারণে বিদেশি বণিক ও পর্যটকদের প্রশংসা লাভ করে।[৯২] এ সকল প্রাপ্তি ঘটেছিল তৎকালীন জনসাধারণের উপরিউক্ত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের কারণে। এ জ্ঞান অর্জিত হতো কখনো কর্মক্ষেত্রেই, কখনো প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে। এম. এ. রহিম লিখেছেন, চারটি জিনিসের মাধ্যমে একটা জাতির সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়। প্রথম কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, দ্বিতীয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা; তৃতীয়, ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং চতুর্থ, দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থের প্রাচুর্য। সমসাময়িক ফরাসি ঐতিহাসিক ও বিদেশি পরিব্রাজক ও লেখকদের বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, মধ্যযুগে বাংলা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমৃদ্ধির এই চারটি প্রয়োজনীয় উপাদানের অধিকারী ছিল।[৯৩] একথা উল্লেখ্য যে সমকালীন শিক্ষার উৎকর্ষতার কারণেই বাংলার এই সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল।

এ কথা সত্য যে, বাংলার ভূমি ছিল বেশ উর্বর। বাংলার ভূমির উর্বরতা লক্ষ্য করে শ্রীহট্ট থেকে নৌকাযোগে ভ্রমণের সময়ে ইবনে বতুতা বাংলার যে দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন তাঁর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এইভাবে- "নদীপথে মিসরের নীল নদের মতো ডানে ও বামে ছিল অসংখ্য চাকা[৯৪], উদ্যানরাজি এবং গ্রামের পর গ্রাম। আমরা গ্রাম ও উদ্যানরাজির মধ্য দিয়ে পনের দিন নৌকাপথে চলেছি, আমাদের মনে হয়েছে যেন আমরা একটি বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছি।"[৯৫] আবুল ফজল আল্লামী বাংলার বর্ণনায় বলেছেন, "এখানে তিনটি ফসল উৎপন্ন হতো।"[৯৬] এ ছাড়াও বাংলায় প্রচুর শস্য, শাক-সবজি এবং ফলমুল উৎপাদিত হতো। বিভিন্ন ধরনের ধানের চাষ হতো এখানে। এ ছাড়াও ইক্ষু, তুলা, মরিচ, সরিষা, পাট, গুটিপোকার জন্য তুত গাছ ইত্যাদি চাষ করা হতো। এ ছাড়াও কলা, আম, কাঁঠাল, ডালিম, কমলালেবু, খেজুর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। উৎপাদিত ফসল গুণে ও মানে ছিল অত্যন্ত উন্নত। সমকালীন কৃষিজীবীরা তাঁদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নে কার্যকর ছিল।

সাহিত্য একটি সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের দর্পণ। সাহিত্য মানুষকে সুন্দর মন-মনন, নৈতিকতা ও চরিত্র বিকাশে সাহায্য করে। মধ্যযুগে শিক্ষা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ড চর্চিত হতো। এ সময়ে সহিত্যিকরা আরবি, ফারসি ছাড়াও বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষাকে সুসমৃদ্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা ছাড়াও সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেও বাংলা ভাষাকে এ সময়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। সুলতান ও সম্রাটগণ সাহিত্যচর্চার এ ধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে উৎসাহিত করতেন।

মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম শাসকগণ ফারসি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন এবং আল হাদীস আরবি ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে মুসলমানদের কাছে আরবি ভাষা অত্যন্ত সম্মানের। ফলে সুলতানসহ বাংলার গণ্যমান্য রাজদরবারে প্রজাসাধারণের কাছে এ দুটি ভাষার মধ্যে বাংলা প্রধান ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল। উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের কাছে অবশ্য সংস্কৃত ভাষা কিছুটা চর্চিত হতো। কিন্তু এ ভাষার অবাধ চর্চার পথে উচ্চশ্রেণির হিন্দুরাই ছিল বাধা। সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত

ভাষা চর্চা করতে পারতো না। এমনকি তাঁরা এ ভাষায় লিখিত ধর্মীয় পুস্তকাদি স্পর্শও করতে পারত না। সুলতানি শাসনামলে এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত ভাষা চর্চার পথ অর্গলমুক্ত হয়। তেরো শতকের প্রথম দিকে কাজী রুকন আল-দীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'অমৃতকুণ্ড' গ্রন্থটি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

সংস্কৃতে মুসলিম শাসকদের আগ্রহ ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। জানা যায় যে, শামস আল-দীন ফিরুয শাহের শাসনকালে সাতগাঁয়ের বিজেতা ও শাসনকর্তা জাফর খান গঙ্গার প্রশস্তিমুলক কবিতা রচনা করেন। আল্লাহ বখশ নামে জনৈক মুসলিম "*বামন সূত্রবৃত্তি*" নামক একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এমনকি সুলতান মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) এর শাসনামলে সংস্কৃত ভাষায় একটি শিলালিপিও প্রবর্তন করেন। এটি বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি মুসলিম শাসকদের এ পৃষ্ঠপোষকতা সুলতানি শাসনামলের শেষাবধি অব্যাহত ছিল।

ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ শিক্ষা ও সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতান গিয়াস আল-দীন আযম শাহ নিজেই একজন উঁচুমানের কবি ছিলেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। একবার তিনি একটি কবিতার প্রথম লাইন রচনা করে পরের লাইন রচনা করার জন্য পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি হাফিজের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি কবিকে বাংলাদেশে আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, অন্যান্য দেশ থেকে মুসলিমদের আগমন এবং ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের ফলে ইলিয়াসশাহী শাসনামলে বাংলায় শাইখ আলাউল হক ও তাঁর পুত্র শাইখ নূর কুতুব আল আলমের নেতৃত্বে একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা সে সময়ে বাংলায় সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা সৃষ্টিতে ও সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। শাইখ নূর কুতুব আল আলম একজন উঁচুস্তরের পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে একটি ছিল '*আনিস-উল-গুরাবা*' বাংলার সাধারণ মানুষের কাছেও অনেক প্রিয় ছিল। এটি টীকা-সম্বলিত হাদিস সংকলনের অনূদিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। খ্যাতনামা অনেক ব্যাক্তির কাছে লিখিত তাঁর বহু পত্রও পাওয়া গেছে।

সত্যিকার অর্থে বাংলা ভাষায় সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ড চর্চা শুরু হয়েছিল মুসলিম শাসনামলের প্রারম্ভ থেকেই। এর পূর্বে অর্থাৎ বাংলায় মুসলিমদের আগমনের পূর্বে আদি বাংলা ভাষার কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। বস্তুত, বাংলা ভাষা তখন খুব আদিম স্তরে ছিল।[৯৭] যথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তখন এর কোনো সুস্পষ্ট রূপ ছিল না এবং ভবিষ্যতে তা বিকাশ লাভ করবে কিনা তা ছিল অস্পষ্ট। কেবল কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্য এর চর্চা করতেন বলে জানা যায়। তাঁদের লেখায় গৌড়ীয় প্রাকৃতের জন্ম হয়েছিল এবং এ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে বাংলা ভাষা। সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত চর্যাপদগুলো শুধু তাঁদেরই নিকট বোধগম্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ চর্যাপদগুলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম নিদর্শন। পণ্ডিতদের মতে, চর্যাপদগুলো দশ শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে লিখা হয়েছিল। পনেরো শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আর কোনো ধরনের লিখা দেখা যায় না।

প্রাক-মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মণদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। সে সময় সংস্কৃত ভাষা ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র বাহন ছিল এবং রাজদরবারের ভাষা হিসেবে এর ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। তখন সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোনো স্থানীয় ভাষায় সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ড চালানের কোনো সুযোগই ছিল না। এ ছাড়া, সে সময়ে জনসাধারণের অধিকাংশই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং তাঁদের স্থানীয় ভাষা বাংলা ছিল উপেক্ষিত ও ঘৃণিত। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বিধৃত আছে যে, যারা অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে, তারা রৌরব নরকে যাবে।[৯৮] বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণদের এবং সংস্কৃত ভাষার আধিপত্য বিলীন হয়ে যায়। শিক্ষার দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে বাংলা গৌরবের আসন লাভ করে। দেখা যায়, প্রাক-মুসলিম যুগে যে সকল হিন্দু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থাবলি পাঠ করতে পারত না, তারা বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সে গ্রন্থগুলো পাঠ করার সুযোগ পায় এবং নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই না, মুসলিম শাসকদের উদারনীতি ও সহযোগিতার ফলে সকল শ্রেণির হিন্দুরা জ্ঞানার্জন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হয় এবং বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলায় মুসলিম অভিবাসীদের চিন্তাধারা ও আদর্শের সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দুদের মধ্যে এক বিরাট জাগরণ সৃষ্টি হয়। এ জাগরণের কারণে বাংলার সাধারণ হিন্দুরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণির কর্তৃত্বাধীন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং এক অভূতপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হয়। তাই দেখা যায় যে, মুসলিমদের উদারনৈতিক প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ, ধর্মঠাকুরের পূজা বিষয়ক কবিতা, *মঙ্গলকাব্য* ও *সত্যপীরের পাঁচালী* রচিত হয় এবং বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। অন্যদিকে দেখা যায় যে, মুসলিমদের বৈশিষ্ট্যনুযায়ী বাংলার মুসলিম শাসকগণ

প্রজাসাধারণের সাহিত্য সংস্কৃতির আদর্শ রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে তাঁরা বাংলার স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য তৎপর ছিলেন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তাঁদের এ পৃষ্ঠপোষকতার পেছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল। মধ্যযুগে বহু সংখ্যক মুসলিম অভিবাসী বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং তারা এদেশকে নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করেন। ফলে বাংলার আদিবাসীদের মতো বাংলা তাঁদেরও ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই তাঁরাও বাংলা ভাষার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া, শিক্ষিত মুসলিমগণ অনুধাবন করেন যে, যেহেতু সাধারণ মুসলিমগণ আরবি ও ফারসি ভাষা বুঝতে পারেন না। সেহেতু তারা ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত হতে পরেন না। তাই মুসলিমগণ ইসলাম ধর্ম ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক বাংলা ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এভাবে একাধিক কারণে মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষায় সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ডের শুরু হয়েছিল এবং বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ডের প্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা* কাব্যটি। তিনি সুলতান গিয়াস আল-দীন আযম শাহের (১৩৯১-৯২–১৪১০-১১ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে *ইউসুফ-জুলেখা* কাব্যটি বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার মুসলিমদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি ছিল মানুষের বাস্তবভিত্তিক প্রথম রোমান্টিক রম্য উপাখ্যান। এ কাব্যে শাহ মুহাম্মদ সগীর ইসলামের ধর্মীয় কাহিনী যোগ করেন এবং বাংলার কবিদের জন্য নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে মানবীয় রম্য উপাখ্যান প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করে তোলেন। চৌদ্দ-পনেরো শতকে আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। তিনি হলেন বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য রচনা করেন।[৯৯] *ইউসুফ-জুলেখা* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক অনূদিত *রামায়ণ* মহাকাব্য। কবি কৃত্তিবাস সুলতান জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৫–১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় *রামায়ণ* মহাকাব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। শাইখ জয়েনউদ্দীন পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতান শামস আল-দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) *রসুল বিজয়* কাব্য রচনা করেন। এতে তিনি রাসূলের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এ সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভগবতগীতার দশ ও এগারো অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*। তিনি সুলতানের কাছ থেকে গুণরাজ খান উপাধিও লাভ করেন। ইলিয়াসশাহী সুলতানদের আমলে আরও অনেক কবি সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।

হুসাইনশাহী আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) অনেক খ্যাতনামা কবি কাব্য রচনা করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী। সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহের শাসনামলের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) প্রথম দিকে বিজয়গুপ্ত তার কাব্য *পদ্মপুরাণ* রচনা করেন। একই সময়ে বিপ্রদাস পিপলাই রচনা করেন *মনসামঙ্গল কাব্য*। এ সময়ে যশোরাজ খানও রচনা করেন তার কাব্য *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*। আলা আল-দীন হুসাইন শাহের আমলে নবদ্বীপের জনৈক চাঁদকাজী পদাবলি নামে পরিচিত মরমি ভাবধারার কবিতা বাংলায় রচনা করেন। তিনি ছিলেন এ ভাবধারায় গীতি কবিতা রচনার প্রথম খ্যাতনামা কবি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহের সেনাপতি ও চট্টগামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় তিনি *মহাভারতের* একটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহের মতোই তাঁর পুত্র সুলতান নুসরত শাহও (১৫১৯-১৫৩২) শিক্ষা-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শাসনকালে চট্টগামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে কবি শ্রীকর নন্দীকে উৎসাহ প্রদান করেন। এ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের *অশ্বমেধ পর্ব* বাংলায় অনুবাদ করেন। অনূদিত *মহাভারতের* ভূমিকা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতান নুসরত শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরুয শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিজ শ্রীধর নামে আর এক কবি *বিদ্যাসুন্দর* নামে একটি কাব্য রচনা করেন।

হুসাইনশাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) বৈষ্ণব আন্দোলনের ধর্মীয় নেতা শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈষ্ণব আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের বিস্তার রোধ করা। এ কারণে শ্রী চৈতন্যের অনেক অনুসারী ষোল শতকের মাঝামাঝিতে এবং শেষের দিকে শ্রী চৈতন্যের জীবন ও তাঁর শিক্ষার উপর বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিপ্রদাসের *শ্রী চৈতন্যভাগবত* (১৫৩৬ খ্রি.), কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (১৫২৭ থেকে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত) লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ), জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* (১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) ও বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*। এ শতকে মনসা পূজা পদ্ধতির উপরও কিছুসংখ্যক কাব্য লিখা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সারথিবারের *মনসামঙ্গল* (ষোলো শতকের শেষার্ধে) দ্বিজ হরিরামের *চণ্ডীকাব্য* (ষোলো শতকের শেষার্ধে), দ্বিজ

বংশীবদনের *মনসামঙ্গল* (১৫৭৫) ও চন্দ্রাবতীর *মনসামঙ্গল* (১৫৮০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত ষোলো শতকের শেষার্ধে বাংলার হিন্দুরা ধর্মীয় জাগরণকে প্রতীকস্বরূপ ধরে নিয়ে সাহিত্যানুগ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়েও এ ধারা বজায় ছিল এবং সতেরো ও আঠারো শতকে অনেক হিন্দু কবি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিমগণ হিন্দুদের লেখার বিষয়বস্তু দেব-দেবীর পরিবর্তে মানবজীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়াদি এবং ক্রিয়াকলাপ–যেমন, প্রেমের গল্প, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসমূহ, ইসলামী রীতি-নীতি প্রভৃতি নিয়ে তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেন। এ কারণে যথার্থভাবেই বলা হয় যে, মুসলিম লেখক ও কবিগণ অভক্তিমূলক কাহিনী ও রম্য লেখার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। কিন্তু এ কথাও বলা ঠিক হবে না যে, তারা আধ্যাত্মিক ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

উপরিউক্ত সময়ে মুসলিম লেখকরা বিজয়কাব্য, ঐতিহাসিক বিষয়ক গ্রন্থ, রম্য উপাখ্যান, মরমীয় ভাবমূলক গীতি-কবিতা, সত্যপীরের কাহিনী ও ইতিহাস-ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থ, সঙ্গীত বিষয়ক সাহিত্য, ভাষাভিত্তিক এবং ইসলামি ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে যে সকল লেখক বাংলা ভাষায় তাঁদের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শাইখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, সাবিরিদ খান, মুহাম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, শাইখ পীর, শাইখ মুত্তালিব, নসর আল্লাহ খান ও হাজী মুহাম্মদ ছিলেন খ্যাতনামা।

মুসলিম শাসনামলেও আরাকানের দরবারে বাংলা সাহিত্যের বেশ চর্চা হতো এবং সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পনেরো শতক থেকে বাংলার সঙ্গে আরাকান রাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। এ উভয় রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও ছিল। আরকানের রাজারা বাংলা থেকে আগত বিদ্বান ও কবিদেরকে আরাকানে বসতি স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করতেন। ফলে আরাকান রাজদরবার বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মুসলিম শাসনামলে প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা যে প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলায় লিখিত ত্রিপুরার রাজাদের পারিবারিক ইতিহাস গ্রন্থমালায়। ত্রিপুরার অনেক কবি বাংলা ভাষায় মূল্যবান কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে শাইখ চাঁদের *রসুল বিজয়*, *শাহদৌলা*, *কিয়ামতনামা*, *হরগৌরী সম্বাদ* ও *তালিবনামা*, সৈয়দ মুহাম্মদ আকবরের রোমান্টিক কাব্য *জেবাল মুলক শামারুখ*, কবি শুকুর মুহম্মদের *ময়নামতীর গান*, মুহাম্মদ রফিউদ্দীনের *জেবাল মুলক শামারুখ* এবং কবি মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাকের *সাইফলু মুলক লালবানু* প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল।

এভাবে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে মুসলিম কবিদের অবদানসমুহ নানাভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে মানবীয় রূপ দেন এবং সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুনতর দিক উন্মুক্ত করেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং এর দিগন্ত প্রসারিত হয়। এ সময়ে আরবি ও ফারসি শব্দমালা বাংলা সাহিত্যের সম্পদকে সমৃদ্ধ করেছিল। মুসলিম কবিরা আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে বহু শব্দ, প্রবাদ, ভাষা পদ্ধতি ইত্যাদি বাংলায় ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে দারুণভাবে সজীব করে তোলেন।

কবি ফয়জুল্লাহ রচনা করেন *গাজী বিজয়*, *গোরক্ষ বিজয়*, *সত্যপীর পাঁচালী*, *জয়নালের চৌতিষা* ও *রাগমালা*। তিনি সুলতান বারবক শাহের সেনাপতি শাইখ ইসমাইল গাজীর জীবনী অবলম্বনে রচনা করেন তাঁর গ্রন্থ *গাজী বিজয়*। যদিও এটি পুরোপুরি ইতিহাস গ্রন্থ নয়, তবুও গ্রন্থটি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। ফয়জুল্লাহ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের শিক্ষা ও অলৌকিক কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁর *গোরক্ষ বিজয়* কাব্য। এ কাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থরূপে বিবেচিত। তিনি সত্যপীরের কাহিনী ও ঐতিহ্য অবলম্বনেও কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের নাম *সত্যপীর পাঁচালী*। সত্যপীর বিষয়ক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে শাইখ ফয়জুল্লাহ ছিলেন প্রথম বাঙালি কবি। তাঁর রচিত *রাগমালা* বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীত বিষয়ক সাহিত্য। তিনি এ গ্রন্থ রচনা করে বাংলার কবিদের নিকট এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন তাঁর কাব্য *লাইলী মজনু*। এটি একটি প্রেমবিষয়ক কাব্য। এ কাব্যে দৌলত উজির নায়িকার জন্য নায়কের প্রেমকে সুফির প্রেমে উন্নীত করেন এবং তার অহমের জন্য এ প্রেম প্রেয়সীর মধ্যে ব্যক্তিরূপ লাভ করে। এ ধরনের রোমান্টিক কাব্য আরও অনেকে লেখেন। যেমন সাবিরিদ খান *বিদ্যাসুন্দর* নামে একটি সুন্দর রম্য উপাখ্যান রচনা করেন। তাঁর রচিত আরও দুটি কাব্য আছে। এ দুটির একটি হলো *হানুফা ও কয়রাপরী* এবং অপরটি হলো *রসুল বিজয়*। এ সময়ে সোনাগাজীর লেখা *সাইফুল মুলক বদিউজ্জামান* কাব্যটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। মুহাম্মদ কবীর কর্তৃক রচিত পদাবলিও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ষোলো-সতেরো শতকে যে সকল লেখক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে খুবই খ্যাতনামা ছিলেন সৈয়দ সুলতান। তাঁর রচনাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল *নবী বংশ*, *রসুল বিজয়*, *ওফাত-ই-রসুল*, *ইবলিসনামা*, *শব-ই-মিরাজ*, *জ্ঞান চৌতিষা*, *জ্ঞান প্রদীপ* ও কিছু সংখ্যক অতীন্দ্রিয়বাদ সংক্রান্ত গীতি কবিতা। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন শাইখ পীর। তিনি সুরসৃষ্টি রহস্যের উপর *সূরনামা* এবং ইসলামি রীতি-নীতির উপর *নসিহতনামা* গ্রন্থ রচনা করেন। শাইখ পীরের পুত্র শাইখ মুত্তালিবও একজন লেখক ছিলেন। সালাত (নামায)-এর নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয় অনুশীলনের উপর লিখিত তাঁর *'কিফায়াত-উল-মুসাল্লিন'* গ্রন্থটি খুবই সমাদৃত একটি গ্রন্থ। চট্টগ্রামের নসর আল্লাহ খান (১৫৬০-১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন এ সময়কার একজন বিখ্যাত কবি। তিনি ইসলাম ও ইসলামি ঐতিহ্যের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে *জঙ্গনামা*, *মুসার সাওয়াল*, *শরীয়তনামা* ও *হিদায়াত-উল-ইসলাম* উল্লেখযোগ্য।

কাজী রুকন আল-দীন সমরকন্দী বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগের প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আলী মর্দান খলজির শাসনামলে (১২১০-১২১২ খ্রিস্টাব্দ) লাখণাবতীর (গৌড়ের) কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ *অমৃতকুণ্ডের* আরবি অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, ভোজর ব্রাহ্মণ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যোগী কামরূপ থেকে লাখণাবতীতে আসেন এবং কাজী রুকন আল-দীনের সঙ্গে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় লিপ্ত হন। ইসলামের মহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ভোজর ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইসলামি শাস্ত্রে এমনই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে মুফতির মর্যাদা দেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ারও অধিকার প্রদান করেন। ভোজর ব্রাহ্মণ অতীন্দ্রিয়বাদের উপর লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ *অমৃতকুণ্ড* গ্রন্থটি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে জনৈক ব্রাহ্মণ যোগীর সহযোগিতায় অজ্ঞাতনামা এক লেখক *অমৃতকুণ্ড* গ্রন্থটি নতুন করে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। এ সাহায্যকারী যোগী ছিলেন কামরূপের অধিবাসী এবং তিনিও পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। *অমৃতকুণ্ডের* আরবি অনুবাদ থেকে বোঝা যায় যে, এটি হিন্দু মরমিবাদ ও দর্শনের উপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর আরবি অনুবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু ধারণা দেয় যে, এতে রয়েছে মানব ও মানব মনের রহস্য সম্বন্ধীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা। এ গ্রন্থে আরও রয়েছে অভ্যাস ও রিপুর প্রশমন সম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা। এ গ্রন্থে জীবন ও মৃত্যুর বিভিন্ন স্তর, প্রকৃতির বর্ণনা এবং দার্শনিক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে। অনূদিত *অমৃতকুণ্ড* গ্রন্থটিতে লেখকের আরবি ও ফারসি ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, এ অনুবাদকর্মের দ্বারা ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ তথা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা প্রমাণিত হয়।

শাইখ শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামা মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে বাংলার একজন বিখ্যাত সুফি-দরবেশ ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান ছিল। তিনি ইসলামি মরমিবাদের উপর *মাকামাত* নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বলা হয়, এটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি এবং গ্রন্থটি সমগ্র উপমহাদেশের শিক্ষিত মহলে ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ বক্তব্যের যথার্থতা পাওয়া যায় *তারাসসুল-ইল আইন আল-মুলকী* নামক একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দুটো পত্র থেকে। পত্র দুটোয় উল্লেখ আছে যে, লাহোরের শাসনকর্তা সৈয়দ নাসির আল-দীন কোনো এক ব্যক্তির আবেদনক্রমে মাকামাত গ্রন্থের একটি কপি সরবরাহ করেছিলেন। সমসাময়িক লেখক শাহ শুয়াইব তাঁর *'মানাক্বিব-উল-আসফিয়া'* নামক গ্রন্থে আবু তাওয়ামার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশ, আরব, ইরানসহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আবু তাওয়ামা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামি আইন ও সংস্কৃতির উপর লিখিত এ সময়কার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল *নাম-ই-হক*। এ গ্রন্থের লেখক তাঁর নাম গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি। তবে ধারণা করা হয় যে, শাইখ শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামার কোনো এক শিষ্য গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রের উপর লিখিত গ্রন্থটি বাংলায় ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রূপে বিবেচিত। এ গ্রন্থে রয়েছে দশটি অধ্যায় এবং ১৮৩টি কবিতা। শাইখ শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামার শিষ্য মখদুম শরফ আল-দীন ইয়াহিয়া মানেরী তাঁর সময়কালের একজন সুফি-দরবেশ ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষক আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে যাওয়ার পথে মানেরে (বিহারে অবস্থিত) শরফ আল-দীন ইয়াহিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। যুবক শরফ আল-দীন ইয়াহিয়া অতিথি আবু তাওয়ামার জ্ঞানে-গুণে মুগ্ধ হন। ইয়াহিয়া মানেরী সৃষ্টিতত্ত্ব ও মরমিবাদের উপর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ইয়াহিয়া মানেরী সৃষ্টিতত্ত্ব ও মরমিবাদের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুফি জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–*আজীবা*, *ফাওয়াইদ-ইরূকনী*, *ইরশাদুল তালেবনি*, *ইরশাদুল সালেকীন*, *রিসালাহ্ আ-মক্কীয়া*, *মাদান আল-মানী*, *আকাইদ আশরাফী* প্রভৃতি।

পনেরো শতকের মধ্যভাগের বাংলার প্রতিভাবান কবি মোজাম্মেল ইসলামি সংস্কৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুফিমতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রখ্যাত সুফি-সাধক বদর-ই-আলম ছিলেন তাঁর শিক্ষক। শাহ মুহাম্মদ সগীরের মতো কবি মোজাম্মেল ইসলামি রীতি অনুযায়ী মুসলিমদের জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বাংলা ভাষায় ইসলামি সংস্কৃতির উপর গ্রন্থ রচনা করেন। *নীতিশাস্ত্র* নামক গ্রন্থ তারই প্রতিফলন। *সায়াৎনামাহ* কবি মোজাম্মেলের আরেকটি রচনা। এ গ্রন্থ প্রধানত সুফিবাদের উপর লেখা হলেও এতে কিছু কিছু স্থানীয় ভাবধারাও আলোচিত হয়েছে। কবি মোজোম্মেল তাঁর গ্রন্থ রচনার জন্য আরবি ও ফারসি উপাদান থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। ইব্রাহিম কাওয়াম ফারুকী বাংলায় অবস্থানকালে সুলতান রুকন আল-দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-৬০–১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ) *ফারহাঙ-ই-ইব্রাহিমী* নামে একটি ফারসি অভিধান রচনা করেন। এ গ্রন্থ *শরফনামাহ* নামে সমধিক পরিচিত। ফারসি ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থ শুধু বাংলায়ই নয়, সমগ্র উপমহাদেশে ফারসি সাহিত্য জ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। এ গ্রন্থে লেখকের সমকালীন পণ্ডিত ও কবিদের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন–১. আমীর জয়েন আল-দীন হারভী। তিনি একাধারে সভাকবি, সমসাময়িক বাংলার কবিদের মধ্যে প্রধান এবং দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ২. আমীর শাহব আল-দীন হাকিম কিরমানী। তিনি ফারাহাঙ-ই-আমীর শাহব আল-দীন হাকিম কিরমানী নামে আর একটি অভিধান রচনা করেন। তিনি দরবারের উচ্চপদস্থ সাহিত্যিক, সংস্কৃতিজ্ঞ এবং যশস্বী চিকিৎসকও ছিলেন। ৩. মনসুর শিরাজী; ৪. মালিক ইউসুফ বিন হামিদ; ৫. সৈয়দ জালাল; ৬. সৈয়দ মুহাম্মদ রুকন ও ৭. সৈয়দ হাসান, এঁরা সকলেই ছিলেন কবি; ৮. শাইখ ওয়াহিদী। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি *হাবল-মতিন* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবত এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল তাসাওউফ (ইসলামি মরমীবাদ)। শরফনামায় এদের রচনাবলির কিছু কিছু রয়েছে। কবি জয়েন উদ্দীন ছিলেন পনেরো শতকের শেষার্ধের আরেকজন কবি ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর *রসুল বিজয়* কাব্যটি। এটি ধর্মীয় বিষয়ের উপর রচিত। তার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) সভাকবি।

মুসলিম ও হিন্দুগণ নিজস্বধারায় জীবন যাপন করলেও দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে তাঁদের মধ্যে একটা সমঝোতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্যে দেখা যায় যে, মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে বিরাজমান এ সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু এ নজিরগুলো তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে তেমন কোনো তিক্ততা সৃষ্টি বা তাঁদের মধ্যকার আন্তরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করতে পারেনি।

বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সালতানাতের বিরুদ্ধে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু সামন্ত জমিদার, সেনাপতি ও সৈনিকদের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করেন। সুলতান জালাল আল-দীন মুহম্মদ শাহ বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' ও অন্যান্য উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাঁকে সৈন্যদলে উচ্চপদ প্রদান করেন। মুসলিম শাসকগণ রাজ দরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের আহবান করে তাদের সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হিন্দুদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর আগ্রহ উপলব্ধি করে তাঁদের মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করান। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মরমিবাদ গ্রন্থটিও আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুসলমানদের এ ধরনের আগ্রহের পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নততর সামাজিক সমঝোতার পরিচয় পাওয়া যায়।[১০০] সুলতানি শাসকগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে হিন্দুগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে, শিক্ষায় ও ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। আলা আল-দীন হুসাইন শাহ হিন্দু সংস্কারবাদী বিপ্লবী শ্রী চৈতন্যের বিপ্লবী মতবাদ প্রচারে কোনো ধরনের বাধা প্রদান না করে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[১০১] সামাজিকভাবেও মুসলমানরা হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিল। একবার হিন্দু সম্প্রদায়ের দু' গ্রুপের মধ্যে এক সমস্যা ও সংঘর্ষের বিচার করতে গিয়ে কাজী সাহেব এক গ্রুপের পক্ষে রায় প্রদান করলে অপর পক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। কাজী সাহেব চাইলে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি আপোষমুলক নিষ্পত্তির অভিপ্রায়ে দোষী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ভাগ্নে সম্বোধন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।[১০২] এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ তাঁদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নি, ভাগ্নে ইত্যাদি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র নির্মাণ ও পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।[১০৩] দীর্ঘ মধ্যযুগীয় শাসনামলের দু'একটি ঘটনা ছাড়া হিন্দুরা মুসলমানদের বন্ধুসুলভ মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। বাংলার সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় তাঁদের জমিদার, শাসক ও অন্যান্যরা মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। মুসলমান সুলতানগণ যেমন তাঁদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে ও কার্যে হিন্দুদের নিয়োগ দিতেন, হিন্দু জমিদাররাও তাঁদের বিভিন্ন কার্যে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁরা মুসলমান রাজদরবারের শিষ্টাচার ও আনুষ্ঠানিকতায় মুগ্ধ হয়ে সেগুলো নিজেদের দরবারে অনুসরণ করতেন।[১০৪] সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। হিন্দুরা তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক ও

পারিবারিক উৎসবাদিতে মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করতো, মুসলমানরাও তাঁদের এই সমস্ত আনন্দ উৎসবে যোগ দিত। কবি বিজয়গুপ্ত বলেন, চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে নয়শত মুসলমান গায়ক যোগদান করেছিলেন।[১০৫] মুসলমানগণও তাঁদের সামাজিক উৎসবাদিতে হিন্দুদের আমন্ত্রণ জানাতেন। এভাবে সামাজিক লেনদেন ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানের ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অন্যের সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ স্বভাবতই মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদের ভক্তি জাগরিত করেছিল। একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের ফলে বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হয়। সে সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরুর শুভক্ষণে ও পুত্র সন্তান কামনায় আল্লাহর নাম নেয়ার পরামর্শ দিতেন। মুসলমানদের পীর দরবেশদের দরগাহসমূহের শিরনী বা উপঢৌকন প্রদান হিন্দুদের মধ্যেও সমানভাবে প্রচলিত ছিল। পীর দরবেশকে তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতো। তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করতো। যুগ যুগ ধরে শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজীর প্রতি হিন্দুদের ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন *শেক শুভোদয়া* গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা কবিতার প্রারম্ভে মুসলমান পীর দরবেশদের প্রশস্তি লিখে শুরু করতেন।[১০৬] বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্বকালে সামাজিক মেলামেশা এবং সাধারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে সে সময়ের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, দুটো সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কখনো কখনো শত্রুতামুলক ঘটনা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে নি। মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে ভেদাভেদ থাকলেও বিরোধ ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলমানদের আল্লাহ রাসুল এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি হিন্দুসমাজ মানসের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল কাব্যের* নায়ক শৈব সাধক ভাগ্য বিড়ম্বিত চাঁদ সওদাগর পুত্র লক্ষ্মীন্দরকে সর্পদেবী মনসার আক্রোশ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এ কারণেই লক্ষ্মীন্দরকে লৌহ বাসরে অন্যান্য হিন্দুস্থানী রক্ষাকবচের সঙ্গে একখানা পবিত্র কুরআন শরীফ রাখা হয়েছিল।[১০৭] অপুত্রক লক্ষপতি সওদাগর তার অপুত্রক হওয়ার কারণ জানতে ব্রাহ্মণদের ডাকলে তারা আল কুরআন দেখে অঙ্কপাত করেন। অনুরূপ লক্ষপতি সওদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাত্রাকালে হিন্দু দেবদেবীকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকেও স্মরণ করেছেন।[১০৮] সামাজিক জীবনের এই প্রভাব হয়তো সর্বব্যাপী ছিল না, তবে মুসলিম সমাজের ধর্মকর্মের প্রতি সমাজের অনেক হিন্দুর যে উদার মনোভাব ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন হিন্দু কবিদের কেউ কেউ হিন্দু মুসলিম চরিত্র চিত্রায়নে অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর অতিক্রমে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মুসলমান শাসক ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নিয়মনীতি, এমনকি নবী-রাসুল এবং মুহম্মদের (স.) দৌহিত্র হাসান হুসাইনকে আক্রমন করতেও তাঁরা ছাড়েন নি। জবাবে মুসলমান কবিরা অনেক সময় তাঁদের মনোভাবের জবাব রচনার মাধ্যমেই ব্যক্ত করেছেন। এ সমস্ত বিরোধ সমাজকে তেমনভাবে আলোড়িত করেনি, বরং সমাজের মানুষকে ধর্ম সচেতন জাতিতে পরিণত করেছিল। *চৈতন্য মঙ্গলের* কবি জয়ানন্দ এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, "ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।"[১০৯] দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* পুস্তকে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পরে এখানকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলি পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেব মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এ দেশে বাস করার ফলে বাঙ্গালা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাদের পরম কৌতূহল হইল। ...গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।"

বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে গৌড় বা লাখণাবতীকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের বিকাশ শুরু হয়। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন স্থাপিত হয়। সুতরাং বখতিয়ারের বিজয় থেকে শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহের উত্থানকালকে বাঙালি মুসলিম সমাজ গঠনের প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। মুসলমান সমাজের সঙ্গে উপাসনাগৃহ মসজিদের সম্পর্ক ছিল অঙ্গা-আঙ্গিভাবে জড়িত। যেখানেই মুসলমান বসতি গড়ে উঠতো, সেখানেই ধর্মীয় প্রয়োজনে গড়ে তোলা হতো মসজিদ, মাদরাসা ও দরগাহ। সমাজের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কল্যাণে মুসলমান সুলতান এবং তাঁদের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে কূপ, জলাধার, পুকুর খনন অথবা সেতু নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা হতো। মুসলিম দেশের জনগণ হিসেবে হিন্দুরাও এ জনহিতকর কাজের সুবিধা পেয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম শাসকদের সঙ্গে হিন্দু

জনসাধারণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা বিবেচনা করা যায়। এ কথাও উপলব্ধির বিষয় যে, বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা ছড়ি হাতে শাসনকার্য শুরু করে দিতে পারেনি এবং তা তাঁরা চায়ওনি। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিসেবে শাসকদের প্রথমত হিন্দুদের আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়েছিল। নিজেদের শাসনকার্যে দক্ষতা প্রদর্শন, সকল কার্যে সমভাবে সকলের সন্তুষ্টি অর্জন, সর্বোপরি অধিকার ও সম্মানহারা অবহেলিত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্মান প্রদানের মাধ্যমে মুসলমান শাসকগণ নিজ ধর্মে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে একথা বলা যায়, বাংলায় তলোয়ারের মাধ্যমে নয়, আদর্শের মাধ্যমেই মুসলমানরা সংখ্যায় ধীরে ধীরে গরিষ্ঠতা অর্জন করতে থাকে।

হিন্দুরাও মুসলমানদের কাছ থেকে তাঁদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, আচরণ অনেকাংশে গ্রহণ করেছিল। এ কথা সত্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদের কাছ থেকে সাধারণ হিন্দুরা ততটা বৈরি দৃষ্টিভঙ্গি পায় নি, নিজ ধর্মের নেতৃত্বের কাছ থেকে যতটা পেয়েছিল।

সুলতানি বাংলার সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে বৈচিত্রময়। বহু ধর্ম, মত ও সম্প্রদায়ের বসবাস এ অঞ্চলটিতে। সেন আমলে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও মুসলমান বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি গতি প্রবাহ লাভ করে। সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলটি শুধুমাত্র সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরিচালনার অভাবে সর্বোপরি আদর্শের দেওলিয়াত্বে এক সময় ভেসে যেতে বসেছিল। অনৈতিকতা, যৌনতা, অশ্লীলতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, বাংলার সমাজকে কলুষিত ও কর্দমাক্ত করে রেখেছিল। উচ্চশ্রেণির লালসা ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিম্নশ্রেণি ছিল অসহায়। সমাজে তাদের কোনো স্থান ছিল না। একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণিরই ছিল বলে ধরে নেয়া হতো। সমাজের সাধারণ মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছিল। একটু সম্মানের জন্য তারা ছিল বড়ই উন্মুখ। এরই প্রেক্ষাপটে ১২০৪ খিস্টাব্দে ইখতিয়ার আল দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয় করে এদেশের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হন। মধ্যযুগে মুসলমানদের বাংলায় আগমন সমাজের মানুষকে মুক্তির পথ এনে দিয়েছিল। ফলে এ দেশের মানুষ খুঁজে পেয়েছিল সাহস, দেখা পেয়েছিল সম্মানের। মধ্যযুগে বাংলা ভূখণ্ড এবং বাংলা ভাষা দুটোই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এতদঞ্চলের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসা ও স্নেহ-প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করেছে। বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা, সামাজিক সম্প্রীতি একটি সুস্থ ও সুন্দর জাতি গঠনে সমর্থ হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলা একটি প্রাচীন ভুখণ্ড। পূর্বে এর কোনো রাজনৈতিক ঐক্যতা ছিল না। ইতিহাসের পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চল এবং বাংলা সাহিত্য যুগে যুগে অবহেলিত ছিল বলে জানা যায়। পাল আমলে বাংলার চর্চা থাকলেও তা ছিল সীমিত পর্যায়ে। সেন আমলে এসেও বাংলা মর্যাদা পায়নি বরং হয়েছে আরো অবহেলিত। হিন্দুরা বাংলা ভাষা চর্চা করাকে পাপ বলে মনে করতো। অনৈতিক কার্যকলাপের কারণে সেন আমলে বাংলা অঞ্চল পরিচিত ছিল অসভ্যতার স্থান হিসেবে। আন্তঃবর্ণ কোন্দলে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল বাংলার সমাজ। শ্রেণিবৈষম্য এই জরাজীর্ণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল আরো অনেক ধাপ। এমতাবস্থায় বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটতে থাকে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি সর্বপ্রথম বাংলায় নতুন ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলাম। ইসলাম সহনশীল ও মানবতাবাদী ধর্ম। ফলে বঞ্চিত শ্রেণি ইসলামের এ দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে বাংলা হয়ে ওঠে শান্তি ও সুখের আশ্রয়স্থল। আন্তঃবর্ণ-গোত্র, আন্তঃসাম্প্রদায়িক কোন্দলে জর্জরিত বাংলার সমাজ সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের আশ্রয়স্থল ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষার প্রতি শাসকদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এদিকে সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহ ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাংলার একমাত্র সুলতান হিসেবে আবির্ভূত হলে বাংলা হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী ও বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীদের মিলনমেলার একমাত্র আশ্রয়স্থল। বাংলা ভাষার চর্চা বেড়ে যায়। এভাবে বাঙালি জাতির চেতনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাও বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি লাভ করে।

তথ্যসূচি:

[১] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ০১।

[২] এ কে এম শাহনাওয়াজ ও ড. রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ (সম্পাদিত) ÒEducation for Muslims under the Bengal Sultanate", *বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ কে এম ইয়াকুব আলী সংবর্ধনা গ্রন্থ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৭২৯।

[৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* : প্রাচীন যুগ, ১ম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১-২।

[৪] ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার আলদীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় বলেও মতামত পাওয়া যায়। Dr. P.L. Gupta, The Date of Bakhtiyar Khalji's Occupation of Gaur, *Journal of the Varendra Research Museum, Vol. IV*, 1975-76, pp.33-34; ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯), পৃ. ৯৩; মো. আব্দুল করিম, *বাংলার প্রশাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস, মুসলিম আমল (১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.)* সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০।

[৫] A K M. Yaqub Ali, ÒEducation for Muslims under Bengal SultanateÓ, *Islamic Studies*, XXIV. 4, Islamic Research Institute, Islamabad, 1985, p. ৪২০.

[৬] মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ.২৮।

[৭] আবু জাফর শামসুদ্দীন, "বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়" মুস্তফা নূর উল ইসলাম (সম্পা.),*বাংলাদেশ : বাঙ্গালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ২৩৯-২৪০।

[৮] সৈয়দ আলী আহসান, "বাংলাদেশের মানুষের জতিসত্ত্বা: ইতিহাসগত পরিপ্রেক্ষিত", *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়* (সফর আলী আকন্দ সম্পা.) (রাজশাহী: ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯১), পৃ. ৯৭।

[৯] *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, অধ্যায় ৭, শ্লোক ১৮; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, 2nd ed. (Calcutta, 1964), p. ১; রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড* (কলকাতা : (দে'জ পাবলিশিং, ১৩২৪ বাংলা চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৩), পৃ. ১৫; ড. আব্দুল করিম "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী" *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়* (সফর আলী আকন্দ সম্পা.), পৃ. ৬৯; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

[১০] আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, "বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বসিন্দা : নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান" *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*" (রাজশাহী : সম্পাদনা পরিষদ অতিরিক্ত কমিশনার অবঃ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৯।

[১১] R C Majumder, *History of Bengal* , vol. 1 (Dacca : Dacca University, 1943, Second Impression, 1963), p.৮.

[১২] D.C Sircar. *Studies in the Geography of Anicient and Medieval India*, Delhi, 2nd Edition 1971, পৃ. ৩৬-৩৮।

[১৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, পৃ. ৪।

[১৪] ড. আব্দুল করিম "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী" *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, পৃ. ৬৯।

[১৫] অতুল সুর, *বাঙ্গালা ও বাঙালির বিবর্তন* (কোলকাতা: সাহিত্য লেখক, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ২৬।

[১৬] আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*; আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনি, ১৯৮০), পৃ. ১৩-১৪।

[১৭] আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত* পৃ.১৫।

[১৮] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীনযুগ*, পৃ. ২।

[১৯] H. Blochmann, æContribution to the Geography and History of Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol.XLII, part 1, Calcutta, 1873, p. ২১১.

[২০] ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল পৃ. ৯।

[২১] H. E. Stapleton, æContribution to the History and Ethnology of North eastern India" *Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, New Series, 1922, p. ৪১০.

[২২] A. W. Botham, Catalogue of the Provintial Coin Cabinet Assam (Allahbad : Government Press, 1930), p. ১৩৯.

[২৩] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীনযুগ, পৃ. ১০।

[২৪] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, (রাজশাহী : সম্পাদনা পরিষদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮), পৃ. ৭।

[২৫] *প্রাগুক্ত*।

[২৬] রাজসূয়েতে উক্তি করা হয়েছে, অত:পর কৌশিকী কচ্ছবাসী (কুশিগঙ্গার তীরে) মহৌজস রাজা ও মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব রাজা আই দুই পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজিত করে বঙ্গ রাজ্যের প্রতি ধাবমান হলেন। (সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়) উদ্ধৃতি- অজয় রায়, *বাংলাদেশ: পুরাবৃত্ত*, ইতিবৃত্ত পাবলিশার্স, ১৯৯০); পৃ. ২২।

[২৭] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* প্রাচীনযুগ, পৃ. ৯।

[২৮] ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ নদীটি ব্রহ্মপুত্র অথবা যমুনা বলে ধারণা করেন। আবার কেউ এটিকে ত্রিশোতা বা বর্তমান তিস্তাকে চিহ্নিত করেছেন। ১৬৬০ সালে অঙ্কিত ফন ডেন ব্রোকের মানচিত্রে এই নদীটিকে করতোয়া নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

[২৯] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ৮৮।

[৩০] বাংলাদেশ: *বাঙ্গালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, প্রাগুক্ত-এ উল্লিখিত পৃ. ২৪।

[৩১] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০২।

[৩২] *প্রাগুক্ত*- পৃ.২৯৯।

[৩৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১১।

[৩৪] মো. আবদুল জব্বার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* প্রাচীন যুগ (ঢাকা: সিকদার প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৫৪।

[৩৫] ড. আবদুল করিম, "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী " *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

[৩৬] *প্রাগুক্ত*।

[৩৭] *The Ramacharitam of Sandyakara Nandi*, edited by Dr. R. C. Majumdar, Dr. Radhagobinda Basak and Pandit Nanigopal Banarji, published by Varendra Research Museum, p. 153.

[৩৮] হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, "*বঙ্গ কোন দেশ*" মানসী ও মর্মবাণী, কলকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬৮।

[৩৯] A. H. Dani, æ*Shamsuddin Ilyas Shah-i-Bengal*", Sir Jadunath Sarker Commmemoration Volume, Punjab University, 1958, p. ৫৬.

[৪০] B. C. Sen, *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal* (Calcutta : Calcutta University, 1942), p. 1.

[৪১] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ: ৩০।

[৪২] অবশ্য, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার বখতিয়ার খলজিকে একজন লুটেরা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা এও উল্লেখ করেন, লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে বাংলায় সুখ ও শান্তির ফোয়ারা বইছিল। একজন লুটেরা সেখানে আক্রমন করে শান্তি ও সুখ বিনষ্ট করেছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা জাতীয় পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করেছেন।

[৪৩] ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে উদ্ধারকৃত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদে* এ সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। চর্যাপদের কবি ঢেন্ঢন পাদ উল্লেখ করেছে-

''জো সো বুধী সোই নিবুধী/ জো সো চৌর সোই সাধী
অর্থ যে বুঝে সে নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু।''

আর একটি চর্যার কবি ভুসুকুপাদ উল্লেখ করেছেন, ''কাহেরে খিনি মেলি আচ্ছুহু কীস
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস। ।/ অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড় অ ভুসুকু অহেরী। ।/ তিন ন চুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণির নিল অ ণ জানী। ।/ হরিণী বোল অ হরিণা সুন হরিআ তো।
এ বন চাড়ী হোহু ভান্তো। ।/ তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীস অ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঈ। ।"]

উল্লিখিত পদগুলির অর্থ করলে দাঁড়ায়, ''কাকে নিয়ে ছেড়ে কেমন করে আছো, আমাকে ঘিরে চারদিকে হাক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারী ভুসুকু ছাড়ে না। হরিণ ঘাসও ছোয়না, পানিও পান করে না। হরিণ-হরিণীর নিলয় জানা যায় না। হরিণী বলে হরিণ তুমি শোন, এ বন ছেড়ে দূরে চলে যাও। দ্র. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, (কলিকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ:৭৪, ১০২, ১০৩।

[৪৪] কবিতাটি নিম্নরূপ-

''জাজপুর পুরবাদি/সোলসঅ ঘর বেদি/ বেদি লয় কন্নয় যুন ।
দখিন্যা ,মাগিতে জাঅ,/ জার ঘরে নাহি পাঅ/ সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন।।
মালদহে মাগে কর,/ না চিনে আপন পর/ জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়/ দস বিস হয়্যা জড়,/ সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস।।
বেদ করে উচ্চারণ/ বেয়্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,/ দেখিআ সবায় কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মম্ম/ সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,/ তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এই রূপে দ্বিজগণ/ করে সৃষ্টি সংহারণ,/ ই বড় হোইল অবিচার
বৈকণ্ঠে খাকিআ ধম্ম/ মনেতে পাইয়া মম্ম/ মায়াতে হোইল অন্ধকার।।"

আধুনিক বাংলায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায় ''জাজপুরে ষোল শ' বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তারা কানে পৈতা তুলে দক্ষিণা চাইতে যায়। যার ঘরে দক্ষিণা পায় না অভিশাপ দিয়ে তার সংসার পুড়িয়ে দেয়। মালদহে তারা আপন পর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়। তাদের জাল জুয়াচুরীর শেষ নেই। তারা বড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দল বেঁধে সদ্ধর্মীকে (বৌদ্ধ জনসাধারণকে) বিনাশ করছে। তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের মুখ থেকে ঘন ঘন অগ্নি বের হয়, সকলে তা দেখে কম্পমান। সকলে মনে মনে অর্থ বুঝে বলে 'হে ধর্ম দেবতা, রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কে আমাদের উদ্ধার করবে? " দ্র. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড (অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ৫৫-৫৬; কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানদের কথা*, মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাদেশ: *"বাঙালী আত্মপরিচয়ের সম্মানে"* সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ: ৮৬।

[৪৫] বৃহদ্ধর্ম পুরানে শূদ্র জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ১. উত্তম সংকর যথা করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, শঙ্খকার, দাসচাষী, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী ২. মধ্যম সঙ্কর যথা- তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈল কারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক ৩. অধম সঙ্কর যথা মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, খট্টজীবী, ডোলবাহী ও মল্ল। প্রথমে তাদের সংখ্যা ছিল ৩৬ পরবর্তীতে ৫ জাতিতে সংযোজিত করা হয়েছে। দ্র. ড. নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান* সম্পর্ক, (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪০-৪২।

[৪৬] এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ: ১৭৬।

[৪৭] ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিল যে, যারা অষ্ঠাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে তারা রৌরব নামক নরকে প্রবিষ্ট হবে।' দ্র. উৎ. M. Shahidullah, The Influence of Urdu-Hindi on Bengali Language and Literature, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, ৭ম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ০১।

[৪৮] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ: ৭৩-৭৫।

[৪৯] *প্রাগুক্ত।*

[৫০] নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া,
ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।' অর্থাৎ ডোম্বীনীর সঙ্গে মিলিত হবার আশায় ব্রাহ্মণরা তাদের ঘরের আশে পাশে সময়ে অসময়ে কামতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াতো। দ্রঃ অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ:৩৫।

[৫১] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪৬৫।

[৫২] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৭২১-৭২২।

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৭২২।

[৫৪] সুশীলা মণ্ডল, *প্রাগুক্ত* পৃ: ৭৩।

[৫৫] মিশকাত আল মাসাবীহ, কিতাব আল ইলম, নূর সুজস্সত লাইব্রেরী, করাচী, পৃ. ৩২ ও ৩৫।

[৫৬] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৯।

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

[৫৮] এ.কে.এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৪।

[৫৯] ড. আবদুল করিম, *বংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৮।

[৬০] কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, খ্যাতিনামা তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খলজির লাখণাবতী অধিকারের পূর্বের কিছু সংখ্যক আরব বণিক বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ অভিমতের প্রামান্য দলীল না থাকলেও এখানে আগে থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ কখনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। দ্র. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩১-৩২, ৩৯।)

[৬১] মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ৩৬

[৬২] আব্দুল হক চৌধরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ড (চট্টগ্রাম: ১৯৭৬), পৃ. ৪; মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ৩৬।

[৬৩] The Encyclopedia of Islam: Edited by Th. Hautsma, and T. W. Arnold, Old Edition, London, 1911, P.৪৮৫.

[৬৪] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন, *চণ্ডী*, প্রথম ভাগ ৩৪৩।

[৬৫] দৌলত কাজী, *সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী*, পৃ. ৫১।

[৬৬] *ভারত চন্দ্র গ্রন্থাবলী*, পৃ. ১৬৮

[৬৭] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবি কঙ্কন, *চণ্ডী*, প্রথম ভাগ পৃ. ৩৪৫

[৬৮] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবি কঙ্কন, *চণ্ডী*, প্রথম ভাগ পৃ. ৩৪৫

[৬৯] দ্বিজরাম দেব, *অভয়ামঙ্গল* (আশুতোষ দাস সম্পাদিত), (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭), পৃ. ৭৯

[৭০] নসরুল্লাহ খোন্দকার, *শরীয়তনামা* (ড. আব্দুল করিম সম্পাদিত), (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা সাহিত্য সমিতি, ১৯৭৫), পৃ. ১০৫।

[৭১] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবি কঙ্কন, *চণ্ডী*, প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬।

[৭২] কে এম মিছির আলী *বগুড়ার ইতিহাস*, পৃ. ১২৯-৩৩।

[৭৩] মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, প্রাচীন ঢাকা নগরীর মুসলিম সমাজ, *মাহে নও* ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭০, মার্চ ১৯৬৪, পৃ.৩০।

[৭৪] অচ্যুতচরণ চৌধুরী, *শ্রীহট্টের ইতিহাস*, ১৯৬৪, কলিকাতা ১৩১৭. পৃ. ৮৫।

[৭৫] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবি কঙ্কন, *চণ্ডী*, পৃ. ২৬০।

[৭৬] কে এম মিহির আলী, *বগুড়ার ইতিহাস*. পৃ. ১১।

[৭৭] এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য* (ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৯), পৃ. ১৯৩।

[৭৮] মানিকচন্দ্র রাজার গান, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়*, প্রথম খণ্ড- পৃ. ৭২।

[৭৯] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫ এবং ৩০৯-১০।

[৮০] *প্রাগুক্ত।*

[৮১] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ১৮০।

[৮২] *প্রাগুক্ত।*
[৮৩] *প্রাগুক্ত।*
[৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬।
[৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪-২৩৫।
[৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫।
[৮৭] *প্রাগুক্ত।*
[৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭।
[৮৯] মোঃ আব্দুল করিম, *বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস মুসলিম আমল* (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিঃ) (ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৮) পৃ. ৫৪-৫৬।
[৯০] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।
[৯১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২।
[৯২] এ সময়ে বাংলাকে অনেকে উদ্যান, কেউ কেউ স্বর্গ বলে অভিহিত করতেন। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২।
[৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩।
[৯৪] চাকার সাহায্যে সে সময়ে ফসলে পানি দেয়া হতো বলে অনুমিত হয়।
[৯৫] এন কে ভট্টশালী, *Coins and Chronology* তে অনুদিত ও প্রকাশিত- উদ্ধৃতি- পৃ. ১৪২-৪৩
[৯৬] *বিশ্বভারতী এ্যানালস* ১৯৪৫, প্রথম খণ্ড পৃ. ৯৯-১৩২; এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।
[৯৭] M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal Vol. I (1201-1576) (Karachi : Pakistan Historical Society, 1963), p. ২১৪.
[৯৮] Dr. M. Shahidullah, The Influence of Urdu-Hindi on Bengali Language and Literature, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, ৭ম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ০১।
[৯৯] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল ১৩৪০ থেকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অবশ্য প্রফেসর আহমদ শরীফের মতে ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে।
[১০০] *পূর্বোক্ত*, পৃ: ২৯৪।
[১০১] *পূর্বোক্ত*, পৃ: ২৯৫; এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ: ১৪৪।
[১০২] চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ আছে, কাজী সাহেব এভাবে সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা/ দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা/ সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

দ্র. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩২৫।

[১০৩] এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ: ১৪৪।
[১০৪] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৯৫।
[১০৫] বিজয়গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, পৃ. ১৭৯; এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২৯৬।
[১০৬] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২৯৭।
[১০৭] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ: ৩১৯
[১০৮] Azizur Rahman Mallick, *British Pokicy and the Muslims in Bengal*, Dhaka, 1965, p. ৯.
[১০৯] জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, (নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাগ সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩১২ সন, পৃ. ১১।

রোমান্টিক চৈতন্য ও আধুনিকতা: আহসান হাবীব

ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ*

এক

ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার সমাজসচেতন অধ্যায়ে আত্মসংযোগ করে যাঁরা বিশিষ্টতা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আহসান হাবীবও (১৯১৭-১৯৮৫) এক উজ্জ্বল প্রতিভা। প্রথম প্রকাশেই তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।[১] কাব্যসাধনার বিস্তৃত পরিধিতে এই কবি সংহত আবেগ এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্য, শব্দ, উপমা, রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে সমাজের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রায়ণে, প্রচলিত অসুন্দরের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতায় প্রদীপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর কাব্যচর্চার সূত্রপাত অবশ্য অতি শৈশবে। সে সময়ের পরিচয় দিতে গিয়ে কবিসুহৃদ এম.এ. করিম জানান:

> ১৯৩২ সাল। আমি সবেমাত্র ... পিরোজপুর সরকারী হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। ... শুনি কবি হাবীবের নাম মুখে মুখে, সর্বত্র। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সে–– ক্লাসের কবি, স্কুলের কবি, শহরের একমাত্র কবি, হিন্দু-মুসলমান সবারই কবি। কেউ তাকে ভালবাসে, কেউ শ্রদ্ধা করে, আর কেউ স্নেহের চোখে দেখে। সকলের প্রিয় কবি হাবীব। শহরের শিক্ষিত সমাজের এক বিশিষ্ট স্থান তার দখলে।[২]

তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, তখনই হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের উপর কবিতায় একটি রচনা লিখে ক্লাসের বাংলা শিক্ষককে হতবাক করে দেন।[৩] এরপর 'ফাতেহা-ই-দুয়াজ-দহম' উপলক্ষে স্কুলে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর এ কিশোর কবির জন্য প্রথম স্থানটি কেবল সংরক্ষিত থাকত না, বিচারকমণ্ডলী তাঁর রচনাকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণাও করতেন। আর এর সবগুলি তিনি তৈরি করতেন কবিতার আঙ্গিকে।[৪] তখন স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রতি সংখ্যাতেও তাঁর প্রবন্ধ-কবিতা গৌরবের সাথে স্থান পেত।[৫] মাত্র সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় স্কুলের বাইরে *শরীয়তে এসলাম* পত্রিকায় 'প্রদীপ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।[৬] অষ্টম অথবা নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কলকাতার এক বিশিষ্ট পত্রিকায় ক্যাপশান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, তাতেও তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ছবিতে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কোলের ক্রন্দনোদ্যত শিশুকে শান্ত করার জন্য ফিডিং বোতল হাতে জনৈক পিতার ব্যর্থ প্রয়াস। রসোপলব্ধির জন্য কবির পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যাপশানটি উদ্ধৃত হল: 'ফের যদি কাঁদ বেটা বলছি দিব্যি খেয়ে/ বড় হলে বিয়ে দিব মায়ের মতন মেয়ে।'[৭]

তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল আর্দ্র, নম্র, বিনয়াশ্রিত। তা সত্ত্বেও বক্তব্য ছিল ঋজু ও বলিষ্ঠ। একদিন কবির মাতৃহারা বাল্যবন্ধু সাহিত্যিক আকরাম হোসেন মায়ের কবরপাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় অস্থির হয়ে পড়েন। সে দৃশ্য অবলোকন করে তিনি মর্মাহত হন এবং লিখে ফেলেন অনবদ্য-বলিষ্ঠ এক দীর্ঘ কবিতা 'মায়ের কবর পাশে কিশোর'। এটিও ১৯৩৪ সালে স্কুল-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত।[৮] শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর 'মেঘনা পারের ছেলে' বিখ্যাত কবিতাটিও এ বয়সে লিখিত।[৯] কেবল কবি হিসেবেই নয়, স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান ও ভাষণেও সকলকে মুগ্ধ করে রাখতেন।[১০] স্বীয় যোগ্যতাবলে ১৯৩৫ সালে স্কুল-ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।[১১] এ বছরেই তিনি বরিশাল বি.এম. কলেজে ভর্তি হন।[১২] কলেজে অধ্যয়নের সময় তাঁর কবিতা কলকাতার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকায় যেমন– *দেশ*, *মোহাম্মদী*, *হানাফী*, *মুয়াজ্জিন*-এ প্রকাশিত হতে থাকে।[১৩] সে শক্তিকে সম্বল করে ১৯৩৬ সালের শেষার্ধে তাঁকে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় যেতে হয়।[১৪] আপাতদৃষ্টিতে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেও, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা গমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেজন্য সারাজীবনে কখনো এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন নি, যার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির সম্পর্ক ছিল না। কলকাতায় এসে প্রথমে *দৈনিক তকবীর*-এ সহকারী সম্পাদকের পদে কর্মে নিয়োজিত হন।[১৫] তারপর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত[১৬] *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক কৃষক*, *মাসিক সওগাত*, *শিশু সওগাত*, *মাসিক বুলবুল*, *দৈনিক ইত্তেহাদ* ও কলকাতা বেতারে দায়িত্ব পালন করেন।[১৭] রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে (১৯৪৩-৪৮)[১৮] সরকারি চাকরিতে যোগদানের পর, আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে তাঁর কাব্যচর্চার পথ আরো সুগম হয়।[১৯] উক্ত সময়পরিধিতে *রাত্রিশেষ* (প্র. ১৯৪৭)-এর অধিকাংশ কবিতা একে একে রচিত হয়ে, পত্রিকায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। পরবর্তীতে ঢাকায় এসেও তিনি বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকার সাথে নিজেকে জড়িত রাখেন। একমাত্র *দৈনিক বাংলা*-তেই

* অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

(*পূর্বে দৈনিক পাকিস্তান)* প্রায় একুশ বছর (১৯৬৪-৮৫) সাহিত্য সম্পাদকের পদে বিশেষ যোগ্যতার সাথে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২০] এই বিস্তৃত কর্মময় জীবনে কবিতার শিল্পরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে তিনি সমাজকে যেমন নিজের লেখা পরিচ্ছন্ন কবিতা উপহার দিয়েছেন, তেমনি অসীম ধৈর্য ও মমত্ব দিয়ে দেশের জন্য উন্নতমানের সাহিত্যিক তৈরির কাজটিও করে গেছেন। আজকের স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁর আপন হাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

আহসান হাবীব ছিলেন মূলত রোমান্টিক কবি। আসলে কবিমাত্র সকলেই কমবেশি রোমান্টিক চেতনার অধিকারী। বাংলা ক্লাসিকের জনক মধূসুদনও 'কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে'[২১] 'মধুকরী কল্পনা'[২২]—কে আহবান করেছেন। বস্তুত ক্লাসিক ও রোমান্টিক আদর্শের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই আধুনিক কবিতার জন্ম। আধুনিক কবিরা সমাজবাস্তবতার সাথে চতুর্দিক দিয়ে সংলগ্ন থেকে আপন আপন স্বপ্নের বৃত্ত রচনা করেন; নিছক প্রেম, সৌন্দর্য, প্রার্থনা কিংবা অবাস্তব কল্পনার স্বর্গে অলকস্পর্শী বিহার করেন না। তাই যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক, সে অর্থে জীবনানন্দ দাশ নয়। অবশ্য জীবনধর্মিতা আহসান হাবীবেও সচল। তবে এ যুগের কবিরা সমাজসম্পৃক্তি ও জীবনবাস্তবতায় এক বা অভিন্ন লক্ষ্যে ধাবিত হলেও, এঁরা প্রত্যেকে চিন্তায়, ভাষায় ও কণ্ঠস্বরে ভিন্ন প্রকৃতির। উপলব্ধির এমন তারতম্যের কারণে জীবনানন্দ দাশ অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো হতাশা ও যন্ত্রণার কাতরতা আহসান হাবীবে নেই। বরং এই 'বিরূপ বিশ্বে'[২৩] মানসিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি সর্বক্ষণ পীড়িত হয়েছেন। কিন্তু নৈরাশ্যের অতলান্তে কখনো নিমজ্জিত হন নি, প্রবল 'আশাবাদী চৈতন্যে'[২৪] ব্যাপ্ত থেকেছেন। তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যও ছিল, 'নৈরাশ্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেইনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যুদ্ধের পর শান্তি, রোগের পর প্রশান্তি। এ বিশ্বাসেই লিখেছি, লিখে যাবো।'[২৫] তথাপি তাঁর কবিতায় কোথাও কোথাও হতাশার সুর যে ধ্বনিত হয় নি তা নয়। কিন্তু সেখানেও উত্তরণের পথ আবিষ্কারের নিরন্তর প্রয়াস চলেছে। কেননা তিনি দেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সাথে এমন নিবিড় ভালবাসার সম্পর্কে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন যে, সে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কোনো অবস্থাতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে অন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে:

মাটির গন্ধে এতই গভীর এমনি তাহার মোহ / তনুমনে আনে অনুরণনের সীমাহীন সমারোহ। ...
তাই বেদনার বহ্নিও প্রাণে মাধুর্যে সুনিবিড় / ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তাই বাঁধলাম নীড়।[২৬]

সমাজ থেকে, মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন নি বলে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও প্রতিবাদও তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। এই দেশের অধিকাংশ লোক সনাতন গ্রামের বাসিন্দা। অথচ গ্রামীণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা মুখে মুখে অনেক উচ্চারিত হলেও বাস্তবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দুঃখজনকভাবেই বিদ্যমান থেকে গেছে। এই দুই বিপরীত মেরুকে সেতুর বন্ধনে একত্রীকরণের বাসনাও তাঁর মধ্যে ছিল। তাই শহরবাসী ভদ্রলোকের কৃত্রিম জীবনতৃষ্ণার প্রতি কৌশলে ব্যঙ্গের ছুরি হেনে উচ্চারণ করেন:

তুমি খুব রাখাল রাখাল বলো / তুমি খুব বটের ছায়ার কথা বলো
জোয়ারের জলে ভাসা কদম ফুলের কথা বলো / ভরা কলসী নীল শাড়ী রূপোর ঝুমকোর কথা
তুমি খুব বলো। ... / বলেছিলে বাঁশী শুনবো জয়নালকে ডেনে আনো ...
প্রত্যাবর্তনের পর একাধিক অলস বৈঠকে / সোফায় হেলান দিয়ে গালিচায় দু'পা মেলে দিয়ে
কৃতী পর্যটকের ভঙ্গিতে তুমি / এইসব বলো, ...
অস্তিত্বের চারপাশে চেনা / রাখাল বটের ছায়া জয়নালের অলৌকিক বাঁশী
কি সূক্ষ্ম কৌশলে তুমি সুদূর বিদেশ করে তোলো।[২৭]

তবে এই আশাবাদ বিষ্ণুদে'র মতো ততটা ক্রোধ মিশ্রিত নয়, বরং অনেকটা স্বভাবসুলভ অমিয় চক্রবর্তীর ন্যায়। এর কারণ একটাই তা হল, দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁর কবিতা রঙ বদলিয়েছে– ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কণ্ঠস্বর কখনো বদলায় নি। ব্যক্তিচরিত্রের ন্যায় তাঁর কবিতাও সর্বদা শান্ত-বিনীত আবেদন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে:

সুধীজনদের কেউ কেউ বলেন, বলতে বলতে চালু হয়ে / গেছে, আহসান হাবীব মৃদুভাষী কবি। কবিতায় মৃদুভাষিতা কি
জিনিস আমি কিন্তু বুঝি না। ভালো কবিতা আর মন্দ / কবিতা বুঝি, সার্থক রচনা আর অসার্থক রচনা বুঝি।
কবিতার নির্মাণ আর উপস্থাপন যদি সার্থক হয় সেই-ত বলিষ্ঠতা, / বরং অসার্থক কবিতায়ই থাকতে পারে চীৎকারের প্রাধান্য।[২৮]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও আহসান হাবীবের মতো ধীর প্রতিবাদসহ একটা মৃদু-স্বচ্ছ স্বভাব দৃষ্টিভূত হয়। তিনি নিজেও তাঁর কবিতা পছন্দ করতেন এবং বলতেন, 'সর্বত্র যখন বিক্ষোভ তখন আহসান হাবীবের কবিতার মৃদু এবং লঘু স্পন্দন আমাকে আনন্দ দেয়। তিনি কবিতার যে নিভৃতলোক

নির্মাণ করেছেন সেখানে বিশ্রামের শান্তি আছে।'[২৯] এই শান্ত নিভৃতচারী কবি তিরিশের রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের পরিমণ্ডল ধরে এগিয়ে আসলেও তাঁদের কারো একক অনুসারী ছিলেন না। আধুনিক চৈতন্যকে সমগ্রভাবে ধারণ করে, আপন বৈশিষ্ট্যে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব কাব্যভুবন। সে ভুবনের *রাত্রিশেষ* (প্র. ১৯৪৭) থেকে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (প্র. ১৯৮৫) পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি আশায় আশায় ভাস্বর।

দুই

আহসান হাবীবের প্রথম প্রকাশিত কাব্যের নাম *রাত্রিশেষ* (প্র. ১৯৪৭)। ভয়াল অমানিশার চিরসংক্রান্তি। সময়ের দিকটা বিবেচনা করলে এরূপ নামকরণের যৌক্তিকতা আবিষ্কার মোটেই অসম্ভব নয়। গ্রন্থ-ভূমিকায় সূচনালগ্নেই তিনি বলেছেন, '*রাত্রিশেষ*-এর প্রায় সব কবিতাই ইংরেজী ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে লেখা। ... কবিতা যখন সমাজ-সম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে।'[৩০] সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ছাড়াও প্রধান বিষয় ছিল ব্রিটিশ ভারতের অবসান ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশীয়দের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এজন্য কাব্যখানির প্রারম্ভ থেকে চূড়ান্ত অবধি ইংরেজ শোষণের পরিণতি, পরিত্রাণপিপাসু জনতার সঙ্কল্প, ব্যাপক গণঅসন্তোষ এবং শাসকের মহাপ্রস্থান কামনা করে ইতিটানা হয়েছে।

গ্রন্থটির ভূমিষ্ঠলগ্নে অর্থাৎ 'প্রহর' অংশে যুগবাহিত দহনচিত্রের অজস্র প্রতিফলন ঘটেছে। সাথে সাথে দগ্ধীভূত মানস ও সমাজজীবনে পুঞ্জীভূত অসুরাবৃত্তির অশুভ ইঙ্গিতকে যথার্থ রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে স্বস্তিবাচক শব্দের গ্রন্থনে গ্রথিত করেছেন:

দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন / চিরদহনের তিক্ত শপথ করে বহন!
দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে / শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ।[৩১]

স্বর্গ-নরকের প্রকৃত দৃশ্যজগৎ এই মাটির পৃথিবী। এর অনির্বার যাদুমন্ত্রে সকলকে আবদ্ধ হতে হয়। আর প্রচণ্ড উত্তাপ শেষে সুশীতল বাতাস দিয়ে স্নেহময়ী ধরিত্রী যুগে যুগে দেহমনে প্রশান্তি যোগায়:

অনাদি কালের বন্ধন আর বঞ্চনা একসনে / চিরজীবনের শৃঙ্খল সম জড়ানো মানব-মনে! ...
প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু– / এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু।[৩২]

লাগামহীন সম্পদ সংরক্ষণ ও বণ্টনের অব্যবস্থাপনার দরুণ, উদ্ভুত শোষণের শিকার সমাজের বিত্তহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ফলে ধনীর প্রাপ্তিতে যা সহজলভ্য, তা দীনের পক্ষে আকাশকুসুমমাত্র:

কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরাটি লাল,/ কাশ্মিরী মেয়েটির তনু গোলগাল,
ফরিদের ছোট ছেলে নাম আমজাদ/ তার ছিলো সাধ,/ খেলবে ম্যাজিক সেই ঘাগরাটি নিয়ে,[৩৩]

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে গোটা সমাজজীবনে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। এরকম পরিস্থিতিতে আমজাদ ও মেয়েটির মাঝে যে বৈষয়িক ব্যবধান ছিল, তা ঘুচে যায়:

ফিরে গেল দিন:/ কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরা বিলীন,
হাসে তার চোখ।[৩৪]

যুদ্ধের লেলিহান শিখা পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছে এ ধরাধাম। আধিপত্যবাদী পিপাসাকে চরিতার্থ করতে যেয়ে এই অমানবীয় পন্থা তারা বেছে নিয়েছিল। আর এই পশুবৃত্তির প্রতিরোধ লড়াইয়ে মানুষজাতি শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে:

বিংশ শতকী সভ্য দিন–/ শাণিত কৃপাণ শঙ্কাহীন
শস্যে হানবে শুনো ক্ষেতে তার হবে স্বার্থের হীন জরিপ
নীল রক্তের অভিশাপে ঘেরা জাগে নিপিষ্ট রিক্ত দ্বীপ।[৩৫]

সম্ভাবনাময় জীবনের প্রতীতি তিরোহিত। রাজনীতিবিদদের ধোঁকা, প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা এবং কর্মে শ্রমচুরি আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তৎসত্ত্বেও ঐ সমস্ত গ্লানি ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে:

১. প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত,/ আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাববণিক,
নির্মাংশ অস্থির পাশে ভীড় করি কুকুরের মত,/ দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা, জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক্![৩৬]
২. এখানে মোদের প্রতি মুহূর্ত বাণিজ্যের,/ এখানে মোদের রূঢ় জীবনের তিক্ত জের।
হেথা প্রয়োজন-চক্রপীড়ন বিরামহীন,/ এই আমাদের ধূম্রবরণ দগ্ধ দিন।[৩৭]

নিদারুণ বঞ্চনা ও শকুনির শ্যেনদৃষ্টির রোষাগ্নিতে নিপিষ্ট জনতা সম্বিত ফিরে পাচ্ছে না। শনির অপঘাতে বিধ্বস্ত এই সমাজকে হয়ত আরো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আগামীদিনের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভাবলে হৃদয়ে অবসন্নতা আসে:

মনের ফাটলে প্রেত-প্রজনন হানছে, / জ্বাঠর জীবনে এল অনায়াস ভ্রান্তি,
ভবিষ্যতের ভাবনায় এল শ্রান্তি।[৩৮]

'ঈদ' শ্রমজীবী গোষ্ঠীর হৃদয়কে ক্ষণিক উল্লসিত করলেও, বছরের বাকি দিনগুলোতে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া এর উপরে রয়েছে উচ্চবিত্তের বৈভবের প্রদর্শনী। সে প্রতিযোগিতায় কায়িক শ্রমিকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে:

পথের লোকগুলো/ হা ক'রে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে
তুমি যেন কিছু মনে কোর না।[৩৯]

গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। শোষিতরা সংখ্যাধিক্য হলেও রাজনৈতিক কুটচালে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সংসদে নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠানোর কথা ভুলে যায়। অন্যদিকে নির্বাচিত কপট নেতারা সেই সুযোগে শ্রেণীস্বার্থের সুরক্ষাসহ নিজেদের আখের গোছাতে থাকে। ফলে অর্থবণ্টনবৈষম্য আরো বেড়ে চলে:

আমাদের চেয়ারের ভেঙেছে হাতল,/ কলমের মুখে মোরা জোড়া দেই ছেঁড়া সাম্রাজ্যে।
কলম ধারালো তবু ধার ছাড়া চলেনা/ ওপাশের কামরায় ঘড়ির সোনার চেন করে চক্‌চক্।[৪০]

তবে এই অমানিশার ঘোর বেশিদিন থাকবে না। কেননা বঞ্চিতশ্রেণীর মধ্যে চৈতন্যোদয় ঘটছে। যদিও তমসা এখনো কাটে নি, তথাপি মুক্তির নেশায় মত্ত দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই তাদেরকে বিজয়মাল্য পরাবে:

১. তবু ত এলো দিনের সেনা সবেগে,/ পুতিগন্ধের হাওয়ায় নতুন বারতা।
সেই একান্ত আড়াল-আলোর কামনা–/ যদিও এখন অন্ধ গভীর রাত্রি। ...
তবু ত আজ রক্তে এসেছে ব্যঞ্জনা,/ তবু ত আজ নীড়ের নেশা লাগল![৪১]

২. ক্ষুধার অনল চির লেলিহান জ্বলে অশান্ত বায়,
সংগ্রাম জাগে মানুষের পায় পায়।[৪২]

'প্রান্তিক' পর্বে এসে কবি কালযাত্রায় সংঘটিত প্রতিটি সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। কালস্রোতে কত কিছুর উত্থান-পতন সংঘটিত হচ্ছে, সে সবের গোচরীকরণ বড় দুঃসাধ্যের ব্যাপার। কেননা ভাঙ্গা-গড়ার রহস্যলীলায় বর্ণাঢ্য জনপদের বিলুপ্তি ও বুনিয়াদ যেন সমান্তরাল রেখায় বিদ্যমান:

অনেক তরঙ্গ আর অনেক কল্লোল / জন্ম দিয়ে গেছে কবে কোনো এক উপনিবেশের।
তারপর? / তারপর পুরাতন কাহিনীর পুনরাবর্তন।[৪৩]

বর্ষাঋতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য নির্জনতা। এজন্য বাঙালির ঐতিহ্যলালিত তের পার্বণের একটিও এ সময়ে নেই। কেননা বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে সকলকেই গৃহকোণে নির্জীব অবস্থায় প্রহর গুনতে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু শ্রাবণের লোকাস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে। আকাশ ফাটা গর্জন আর অতিবর্ষণকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সমগ্র জাতি উক্ত দিবসে অশ্রুসজল নয়নে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে থাকে:

অনেক শ্রাবণ-দিন বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ / রিক্ত হস্তে ফিরে গেছে, মিশে গেছে তার প্রতিক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়-খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন, / পাণ্ডুর মলিন! ...
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেলো তারে / লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ আঁখির প্রসাদ,
অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ। / বাইশে শ্রাবণ সেই ঊর্ধ্বে তুলি সে মৃত্যুর মসিলিপ্ত কর
রেখে গেলো পৃথিবীতে চিরন্তন অক্ষয় স্বাক্ষর।[৪৪]

অতীতের অভিজ্ঞান বা ইতিহাসের আলোকে জীবনকে পরিচালিত করা উচিত। জীবনায়নের পথে যেসব কৃষ্টি কাঁটা হয়ে আছে সেগুলোকে অধীত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সাহায্যে শোধন করতে হবে। কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে যারা অতীতকে ভুলে থাকে তারা অজান্তে নিজেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। কেননা:

আজকের বসন্ত দগ্ধ হবে / কালকের রৌদ্রদাহে।
কিন্তু / মাটির বুকে ঘুমিয়ে থাকবে/তার বীজ

নববসন্তের জন্মকামনায়। ...
এই ইতিহাস লালন ক'রছে পৃথিবীকে;
এই ইতিহাস আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে;
এই ইতিহাসের ধারায়/ পৃথিবীর বিস্তার আর বিকাশ।[৪৫]

১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীন পতাকা পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হল। এল ইংরেজ। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপে তারা দেশকে শৃঙ্খলিত করে ফেলল। এরপর দীর্ঘ দুশো বছর ধরে কসাইহস্তে দেশমাতৃকার বুকে অর্থনৈতিক শোষণ বলবৎ রাখল। এতদসত্ত্বেও দেশবাসী জাগছে না, লড়ছে না স্বাধিকারের প্রশ্নে। মুষ্ঠিমেয় যে কজন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবন দিল, তাদের বরণীয় পথও যথাযথ অনুসরিত হল না। এসব দেখে কবি জাতির বিবেককে জোরালো কণ্ঠে ধিক্কার দিয়েছেন:

দ্বারপ্রান্তে তোমাদের বন্দী আমি দুই শতকের,
আমার আত্মার তলে অগ্নিশিখা সাতান্ন সনের
আজো অনির্বাণ,/ তবু কি পাহারা দেবে হাসিমুখে আমার জিন্দান?
আমার আত্মার তৃষ্ণা অগ্নিপক্ষ বিহঙ্গের মত/ পক্ষ বিধুননে
ছড়াবে না অগ্নিশিখা শীতল শিথিল তোমাদের/ ঘুমের কাফনে?[৪৬]

'প্রতিভাস' পর্যায়ে এসে কবি দৃষ্টিপাত করেছেন যুদ্ধে বিধ্বস্ত নিঃসীম সমাজের প্রতি। সেই দাবদাহের প্রতিচ্ছবি অতি নিপুণ হস্তে এঁকেছেন প্রত্যেকটি কবিতায়। যেমন, শরতের স্নিগ্ধতার আবেশে, প্রকৃতিরাজ্য নজিরবিহীন সৌম্যমূর্তি ধারণ করে থাকে। দশমী চাঁদের সুশীতল আলো সোনালি ধানের শীষে প্রতিফলিত হয়ে যে মহনীয়তা নিয়ে আসে তা স্বর্গতুল্য। অথচ আজকে তার প্রতিরূপ ভিন্নতর। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণে সেখানে বিরাজ করছে অসামান্য বৈধব্যতা:

বার্তা ল'য়ে চারিদিকে ঘুরিতেছে নিস্প্রদীপ-সেনা।/ এবার শরৎ রাত্রে অরণ্যে প্রদীপ জ্বলিবে না
দশমীর শুভ চাঁদ চূর্ণ হবে নখরের ঘায়;/ এবার চাঁদের কণা গ্যাস হয়ে ঝরিবে ধরায়![৪৭]

শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উদ্দ্যেশ্যে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেইসাথে বিলীন হচ্ছে সভ্যতা ও সম্পদ। ফলত মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জনতার যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তা মূলত যুদ্ধেরই নামান্তর:

সামনের শিশুটার ঘাড়ে দিয়ে হাত,/ অনায়াসে পেছনেতে সরাই দু'হাত।
সারারাত গুঁতোগুঁতি, সারারাত মুখে মার মার;/ পরদিন দুপুরেতে মেলে পুরস্কার! ...
আবার আসবে সন্ধ্যা—/ আবার প্রতীক্ষা আর আবার দেহের রক্ত
বিন্দু বিন্দু ক্ষয়;/ এ কি যুদ্ধ নয়![৪৮]

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি আরো যাতনাবহ। যুগযুগ ধরে আত্মস্থ স্বরলহরী, আশা ও আশ্বাসের প্রাণবিন্দু সেই স্বর্ণপুর আজ আর কোথায়:

অনেক মানুষ ছিল মরেছে অনেক।/ সেই সাথে ম'রে গেছে, তারো চেয়ে বেশী–
শতাব্দীর গ'ড়ে ওঠা এইসব গ্রাম![৪৯]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের জন্য নিরন্তর প্রয়াস এবং স্বদেশীদের সাফল্য 'পদক্ষেপ' কবিতাগুলোর মূলবিষয়। এতসব বিপর্যয় মোকাবিলা করেও মানুষ পুনঃ আশার নীড় গড়ে তোলে। প্রেয়সীর হাতের ছোঁয়ায় সঞ্জীবিত হয় নষ্ট নিলয়। এভাবে আসা-যাওয়া, হাসি-কান্নার নব নব পরিক্রমণ ক্রমাগত চলতে থাকে:

১. এবার আবার সেই দিন!/ সেই ঝরা পলাশের দিন!
তবুও মাটিতে জাগে মৃদুগন্ধ কামনার ভার
তাই নিয়ে হৃদয়ের অসহ্য প্রয়াস বার বার/ বাসা বাঁধবার![৫০]

২. কাল যারা এসেছিল তারা আজ স্মরণ-নির্ভর।
আগামী দিনের যারা–/ এই মৃতস্তূপের উপর

তারা যদি ঘর বাঁধে;/ ভাঙা-চোরা দিনের ফাটলে
তারা যদি ভালবেসে নতুন সূর্যের মত জ্বলে,
তাদের কি দেব না হৃদয়?/ সূর্য থেকে এ পৃথিবী
আরেক সূর্যের পানে বিস্তৃত কি নয়?[৫১]

কালচক্রের জোয়ার-ভাটায় জীবনের যে ভ্রাম্যমানতা, তাতে বৈচিত্র্য আছে ঠিকই কিন্তু নিশ্চিন্ত স্থিরতা নেই। তাই কবির প্রার্থনা:

এখানে নামুক ছায়া/ যে ছায়ারা ঘর বেঁধে রয়,
এখানে নামুক ছায়া/ যে ছায়ারা কায়াহীন নয়।[৫২]

কিন্তু শুধু প্রার্থনাতেই অভীষ্ট সিদ্ধি সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই বাস্তবোচিত পদক্ষেপ। তাই বাঁশরীর সুরসম্মোহন এবং হিংসা-দ্বেষহীন আনন্দাশ্রম গড়তে এই মুহূর্তে প্রয়োজন বীরোচিত আত্মত্যাগ:

এবার বন্যার মত আঁখিজল আনুক বিদ্রোহ।
আসন্ন মৃত্যুর মুখে অগ্নিময় ঝলসি উঠুক/ বাঁচিবার পণ। ...
কেননা গৃহের দ্বারে অহিংস বৌদ্ধের তরবারি/ মৃত্তিকার পিপাসায় জ্বলে! ...
অতএব হে বাঁশরী অসি হও তুমি!/ অসি হও এ মোর প্রার্থনা![৫৩]

যুগবহ্নিকে নিভাতে বিপ্লব দানাবেঁধে ওঠে। চেতনার অগ্নিমশাল জ্বালিয়ে সংগ্রামী জনতা রাজপথে পাড়ি জমায়। সাথে সাথে তারা সমগ্র জাতিকে আহবান জানায় গণবিক্ষোভে শরিক হবার জন্যে:

১. নতুন আগুন জ্বলে সে আগুন ধূলিময় রথে/ আলো দেয় কোনো এক নামজানা পথে।
ঘরে ঘরে সে আগুন নিমন্ত্রণ রেখে যায় তার,/ একদিন পথে আসে আগ্নেয় জোয়ার,[৫৪]

২. সংগ্রামের রাজপথে হাতে হাত রেখে/ সমান পায়ের চিহ্ন যাব এঁকে এঁকে
ডেকে যাব মানুষেরে, মানুষের অচেতন মন,/ দিয়ে যাব জনে জনে মরণেরে যুঝিবার পণ![৫৫]

আর এটা নিশ্চিত যে, সেই গণঅবরোধে ভেঙ্গে পড়বে সাম্রাজ্যবাদ। তখন শোষকেরা প্রাণ বাঁচাতে নিজপন্থা অবলম্বন করবে:

এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকায় হয়ত–/ পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,[৫৬]

অনন্তর প্রয়াণ ও প্রতিঘাতের রাত্রিশেষে দিবসের রক্তিম সূর্য উদিত হয়ে ওঠে। যে প্রাপ্তিতে স্বীকৃত হয়েছে সর্বোচ্চ ত্যাগ:

অন্তঃপর নির্ভীক নবীন/ প্রত্যয়ের প্রতিজ্ঞার এক সূর্য অকুণ্ঠ আত্মায়
বহ্নিমান হয়ে ওঠে অবরুদ্ধ আকাশের গায়![৫৭]

তিন

ছায়া হরিণ (প্র. ১৯৬২) কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা 'হকনাম ভরসা' ও 'ছহিজঙ্গনামা' ব্যতীত সবগুলো ব্রিটিশমুক্ত নতুন আবহে রচিত। কবি এখানে পরিষ্কার করে বলে দিলেন, শোষকের পরিবর্তনে আর যাই হোক শোষণের রূপান্তর ঘটে না। এছাড়া চিরন্তনের পিপাসাও এখানে অত্যুগ্র। সেহেতু হরিণরূপী আত্মার ছায়ার প্রশ্নে নিরন্তর ছুটে চলাই কাব্যখানিতে বিস্তৃত।

মানুষের জন্মস্থান ও ক্রমপরিচিত আধারের প্রতি দুর্বলতা থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কবির জীবনে বয়সানুক্রমে পরিবেশের পালাবদল ঘটেছে সত্য, কিন্তু শৈশব-মানসপটকে মুছে ফেলতে পারেন নি। যুগের খরস্রোতে থাকবার পাশাপাশি অমরত্বের পিপাসাও অনুভব করেন অত্যন্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচচিত্তে:

আমার কবিতা/ সে অমর কাব্যলোকে
জীবনের নতুন আশ্রয়/ খুঁজে নিতে ভয় পায়।[৫৮]

মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ সকলে সহজাতসূত্রে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে জননীই সর্বাপেক্ষা হার্দ্য প্রতিষ্ঠান। বস্তুত দেশ, জননী ও প্রেয়সীকে ঘিরেই তৃষিত আত্মার তৃপ্তি ঘটে থাকে। আর শব্দবাণীর মাধ্যমেই কবি তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে থাকেন:

জীবনে মুকুর তুমি/ কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ
এবং তুমিই/ মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা।[৫৯]

এদেশ গ্রামভিত্তিক হওয়ায় এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর বাসস্থান সেখানে। অন্যদিকে শিক্ষা-দীক্ষার মূলকেন্দ্রবিন্দু শহর। এজন্য শৈশব পেরিয়ে প্রতিটি পল্লীবিদ্যার্থীকে নগরাভিমুখে ছুটতে হয়। জীবনের দ্রুত টানে চলতে গিয়ে এরমধ্যে অনেকেই নগরবাসী হয়ে পড়েন। কিন্তু শৈশবস্মৃতি তো বিস্মৃত হবার নয়:

পুকুরে ঘাটের শেষে/ গলাজলে বুক রেখে
এখানো কি দুই চোখ ছলছল করে/ আর জল ঝরে?[৬০]

এতদ্‌সত্ত্বেও আধুনিক মন সবসময় তাড়া করে ফেরে যুগজিজ্ঞাসার জরুরি আহবানে:

এখন এ-হাটে তার মন নেই/ পৃথিবীর হাটে হাটে
এখন হাটুরে তার মন।[৬১]

মহাকালের ব্যাপ্তিতে একটি জীবনসীমা মুহূর্তমাত্র। এর মধ্যদিয়ে যে ব্যক্তি শাশ্বত দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়, সেই চিরকালের বিশ্ববরেণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়:

... আমার নদীও/ একদা মুক্তোর ভারে হতে পারে সমুদ্র, এবং
তখন বিশাল এই মানব-সমুদ্রে মিশে/ আমিও নির্ভয়ে
অনেক ঢেউয়ের সঙ্গে আরেকটি অনন্য ঢেউ হতে পারি
এবং নির্ভয়ে/ আমিও মিলাতে পারি/ এই কণ্ঠ পৃথিবীর সঙ্গীত সভায়।[৬২]

সৃষ্টি ও প্রলয়ের বৈচিত্র্য সাধনেই পৃথিবীর একমাত্র সুখ। যুগে যুগে এর বুকে কতশত সৌধ নির্মিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেসব ইতিবৃত্ত ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এরূপে নব নব সৃজনের পথে অসংখ্য গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নিরন্তর চলাটাও মানুষের ধর্ম:

ভাঙাচোরা দেয়ালের স্তূপাকার পুরনো ইটের/ ইতিহাস-লাবণ্যের কিছু আভা পাওয়া যায় টের
মনে মনে। কী আবেগে দু'হাতে সরাই/ পুরনো ইটের স্তূপ, লিখে রেখে যাই
আরো কথা, আরো কিছু গান আর নতুন খেয়াল/ বানাই নতুন ইট নতুন দেয়াল।[৬৩]

বৈদেশিক শোষণে এদেশ হারিয়েছে অনেক কিছু। সহায়সম্বল থেকে সম্ভ্রম পর্যন্ত তারা লুট করেছে। সভ্যতা ও আধুনিকতার অগ্রদূত হিসেবে নিজেকে যারা চিহ্নিত করত, তাদেরই নখাগ্রে ক্ষত-বিক্ষত বঙ্গকন্যার দৈহিক রূপটি ফুটে উঠেছে অতি সুন্দরভাবে:

যে নারী নায়িকা ছিলো কোনোকালে এই পৃথিবীর।/সর্বাঙ্গ পুড়েছে তার বণিকের তৃষ্ণার উত্তাপ
হৃদয়ের রক্ত নিয়ে রেখে গেছে নখরের ছাপ,/ দেখে মনে হয়
বহুভোগ্যা এই নারী,/ এ হৃদয় সে হৃদয় নয়।[৬৪]

স্বাধীনতা প্রাপ্তি শুধু মুখের কথায় সম্ভব নয়। তার জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এ উপমহাদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বপ্রথম যে ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তা হল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব। সেই সূত্র ধরে অসংখ্য বিপ্লবীর রক্তের বিনিময়ে জাতির বিজয়ভাগ্য সূচিত হয়:

১. সেই প্রাণ, সে আবেগ, সে অমর্ত্য শিখা/ অতঃপর একদিন সমুদ্রের সেই অভিসারে
ধন্য হলো/ এবং সহসা/ জনারণ্যে আলোর জোয়ার
বয়ে গেলো। সমুদ্রে জোয়ার এলো/ খোলা পালে দিগন্তের ইশারা চঞ্চল।[৬৫]
২. তোমাকে পেয়েছি অতঃপর অতি কাছে/ বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে।
বহু রক্ত/ প্রিয়জন/ অতি প্রিয় জীবনের সব সুধা/ আর আনন্দের বিনিময়ে।[৬৬]

আমিন পাড়ের তালেবালি নিষ্পেষণের উজ্জ্বল প্রতিভূ। যে ব্যবস্থা শ্রমজীবীর আহার সংরক্ষণে অক্ষম, তার বিরুদ্ধে তালেবালিরা লড়তে দ্বিধা করে না। কেননা বাঁচতে হলে এটাই যে একমাত্র উপায়:

১. ... যারা আচম্বিতে/ আমাদের জিন্দিগীর শান কেড়ে নিতে
ফন্দি করে। তাহাদের পথে/ আজ হতে/ এই কাঁটা দিলাম।[৬৭]

২. তবে কেন আজ/ তোমার শ্রাবণ-চোখে
আর একবার সে আদিম সকালের সূর্যের সঙিন
তেমনি অসহ্য তেজে জ্বলে উঠে করবে না ঘোষণা:[৬৮]

রুচি ও চাহিদার ক্রমবিকাশের স্বার্থ মেটাতে ধণিকশ্রেণী সর্বদাই সিংহভাগ মানুষকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এই চক্রান্ত দেশে-বিদেশে পুরোমাত্রায় তবিয়ৎ রয়েছে। কখনো ভাষা, কখনো দেশ এবং জাতিসত্তার প্রশ্ন তুলে তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে। এর ফলে মেহনতি জনতা বাঁচবার ন্যূনতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে:

১. আমাদের বহু নীড় লালসার বে-আইনী হানায়
জ্বলে গেছে! আমরা উদ্বাস্তু তাই।[৬৯]

২. পৃথিবী যদিও/ চিরযৌবনা তবুও
সেই ভোরে/ তাকিয়ে দেখার
কেউ নেই/ জেগে নেই–
যদিও এখনো/ ফুল ফোটে পাখি গায়
আর/ এখনো ভোরের রোদে সোনা ঝরে;[৭০]

তবে এ অবস্থা বেশিদিন টিকে থাকবে না। শোষিতরা একদিন জাগরিত হবে। সেদিন পুরনো কালাকানুন ভেঙ্গে পড়বে এবং তৎস্থলে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে:

১. আমাদের নীড় নেই/ যে ইতিহাসের পাতা সাক্ষী তার
মুক্তি নেই তাদের, তোমাকে/ মুক্তি কেন দেব বলো, ভুলব কেন, এসো
আমাদের পুরনো পৃথিবীতে/ গড়ে তুলি নতুন বসতি![৭১]

২. আসন্ন আগামীকাল/ জন্ম দেবে সে অমর্ত্য অটল মহৎ প্রতিভার
আর/ নতুন সূর্যের তাপে উষ্ণ হবে পৃথিবীর বুক ...।[৭২]

সমাজজীবনের সীমাহীন স্বার্থপরতা ও যন্ত্রণার বিষবাষ্পে আড়ষ্ট এরূপ বন্দীদশা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে চায়। মুক্ত বিহঙ্গের জীবনাচরণের সাথে নিজের অবস্থানের তুলনা করে সে আরো ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে:

পাখির জীবন কভু সংসারে পাবো না
পাখির মতন সুখ-স্বাধীনতা মানুষের ভাগ্যে লেখা নেই
যত ভাবি ততই হৃদয়ে/ ঈর্ষার আগুন জ্বলে
মনে হয় সংসারের সীমা/ ঈর্ষার প্রাচীরে ঘেরা![৭৩]

আমিত্ববোধ, প্রভুত্বলাভের বাসনা মানুষকে ক্ষমতা অর্জনে প্রলুব্ধ করে। এক্ষেত্রে পুঁজি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সদা ধাবমান এই হরিণটির পিছু দৌড়াতে দৌড়াতে সে আজ বড়ই ক্লান্ত। কিন্তু হৃদয়ের এই আত্মসমর্পণের অন্যপাশে রয়েছে কর্তৃক প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। যা ব্যক্তিমানসকে গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন করে থাকে:

পাখিদের সঙ্গ কভু পাইনি–/ জানিনা
তাদের হৃদয় বলে কোন কিছু আছে কি–না/ হৃদয়ে ঈর্ষার

আগুনের মত কিছু জ্বলে কি জ্বলে না!
যে ঈর্ষা আমাকে এই প্রাত্যহিক ভোরের শয্যায়
সব ক্লান্তি মুছে দেয়/ যে ঈর্ষার জ্বালা
প্রত্যহ আমার এই মানবিক তৃষ্ণায় কেবল
অতৃপ্তির হাওয়া দিয়ে তৃষ্ণাকে অমর করে রাখে,
আমাকে অমর করে পৃথিবীর তৃপ্তিহীন মানুষের মাঝে;[৭৪]

সম্পদের প্রবৃদ্ধির বাসনা শুধু এদেশের সমাজ-রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়, তা পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত। তবে আশার বিষয় হল দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষ সুষম বণ্টনের দাবিতে ক্রমে ক্রমে সোচ্চার হচ্ছে:

১. যে বণিক প্রেম এসে পৃথিবীকে সাজালো গণিকা,
ক্ষত চিহ্ন রেখে গেলো কুৎসিত কুটীল কামনার;
যে প্রেম মরিয়া আজ–/ তার মুখোমুখি
আমার সৈনিক প্রেম/ শপথের ভাস্বর স্বাক্ষর করে দান।[৭৫]

২. এখন বিচিত্র এই পৃথিবীর লোকারণ্য থেকে
সুরের সঞ্চয় তুলে অভীপ্সার আলো দিয়ে এঁকে
অতঃপর জ্বেলে নেবে জীবনের নতুন সবিতা
ফিরেছে নীড়ের পাখি কণ্ঠে তার নতুন কবিতা।[৭৬]

৩. দেখো দেখো তোমার আত্মার অন্ধকারে
কে যেন হীরের কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে/ ডাকে শোনো![৭৭]

অর্থআগ্রাসন মনোভাব থেকে জন্ম নেয় সাম্রাজ্য বিস্তারের চিন্তা। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধের কল্যাণে হুজ্জুত সরদারদের সর্বস্ব চলে যায়। শোষকের অপরিণামদর্শিতায় যদি এমনি করে প্রজাসাধারণের নিঃশেষিত হতে হয়, তবে সে দুঃখ রাখবার জায়গা কোথায়:

কোথায় লড়াই হয় রাজায় রাজায়/ ধানের মরাই মোর খালি হয়ে যায়,
খালি হয়ে গেল মোর চালভরা জালা/বন্ধক পড়েছে কবে বাটি আর থালা।
সোনার সংসার মোর হল ছারখার/ একমাত্র পুত্র গেল, মা-জননী তার
গেল সেই পুত্রশোকে। হুজ্জুত্ সরদার/ আমি একা বেঁচে আছি গজব খোদার।[৭৮]

বাংলার প্রাচুর্য লুণ্ঠনের নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে বহু বৈদেশিক বণিকের আগমন ঘটেছে। বাণিজ্যের অনুমতি নিয়ে সময় ও সুযোগ মতো রাজদণ্ডও করায়ত্ব করেছে। তারপর অর্থলাভের পাশাপাশি জৈবিক ক্ষুধাকেও ইচ্ছামত মিটিয়েছে। দেশ আজ হায়েনামুক্ত কিন্তু দেহপসারিণীরা কি মুক্তির আস্বাদ পেতে সক্ষম হয়েছে:

অথচ আশ্চর্য এই/ জননীর সে মহিমা বিলিয়ে পুরনো সেই নাগরের পায়ে
নর্তকীর ভূমিকায় আজো তুমি/মগ্নচেতনার অন্ধকারে আবিষ্ট আত্মার বলি এক।[৭৯]

সামাজিক দৃষ্টি এবং সংস্কারমতে এরা আজ অসতী ও অপাঙ্‌ক্তেয়। অথচ দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তো বটেই, তাছাড়া মানবিক বিচারেও এরা ক্ষমার যোগ্য। সেজন্য এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে সকলকে এগিয়ে আসা উচিত:

এখন তোমার যদি মন চায়/ নিতে পারো ...
এই ঘৃণা আর এই আর্তি থেকে নবজাত শিশুর কাকলি। ...
প্রতিশ্রুতি আদায়ের আশা নিয়ে
এখন নতুন কোনো স্বপ্ন যদি গড়ে নিতে পারো/ খুশী হই।[৮০]

দেশ ব্রিটিশ কব্জামুক্ত; কিন্তু শাসকচক্রের দস্যুতা এখনো কমে নি। পরিণামে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি আজও বিবসনা; নিরন্তর তার বুকে চলেছে খরদাহ। তবুও ঋতু পরম্পরায় আসবে হেমন্ত; তখন সোনার ধানের শীষের শোভা বরণ করতে মিলিত হবে একফালি বাঁকা চাঁদ:

এলোমেলো চুল শীর্ণ দু'চোখে জীর্ণ শরীর/ কোথায় কখন দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার তীর
হেনেছে তোমায়, হয়তো জানোনা, তবু একবার/ আজকে ঝড়ের আকাশে। তবুও আজকে আবার
এড়িয়ে লজ্জা ভাবনা এবং ভয়ের বাঁধকে,/ সন্ধান করো আলিফ-লায়লা রাতের চাঁদকে।[৮১]

সেদিনের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সচেতন নাগরিকবৃন্দ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ:

... হাতে হাতে/ সরাবো রাতের অন্ধকার, ভোর হবে
ফুটবে ফুল, দুটি একটি পাখির ডানায়/ শেষ ঘুম ঝরে যাবে হিজলের ডালে
আদিম আবেগে দেখা দেবে ধানের মঞ্জুরী,[৮২]

চার

এই শতাব্দীর দু-দুটি মহাযুদ্ধের পর জীবনের ন্যায় কবিতাও জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবির *রাত্রিশেষ*, এমনকি *ছায়া হরিণ* পর্বেও বক্তব্যের যে সহজ-নিরাভরণতা, তা পরবর্তী গ্রন্থ *সারা দুপুর* (প্র. ১৯৬৪)-এ লক্ষ্যগোচর হয় না। এখানে কবি শিল্পের সূক্ষ্ম গাঁথুনিতে অধিক সচেতন। ফলে প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্প ইত্যাদির আশ্রয়ে কবিতা দুরূহ হয়ে উঠেছে। তবে অর্থহীন আঙ্গিক সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয় নি। সেখানে যে কালের অবক্ষয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক অসাম্য, বণ্টনবৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা প্রভৃতির বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে তা দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর মতে:

যাঁরা বলেন রাত্রি শেষের ইলোকোয়েন্স নেই পরবর্তী কবিতায়
তাদের জন্য আমি দুঃখিত। আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে,
সময়ের এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি হার মানতে চাই না কখনো।
আর সময় এগোতে এগোতে ভাষা থেকে কিছু কিছু ক্ষয়ে
যাওয়া শব্দ ফেলে রেখে যায়, সামনে থেকে তুলে নেয় কিছু উজ্জ্বল
নতুন শব্দ। ভাষা প্রকরণ থেকে কিছু পুরনো ভঙ্গি মুছে
যেতে থাকে, গড়ে ওঠে কিছু তীক্ষ্ণতর নতুন ভঙ্গি। সময়ের সঙ্গে
থেকে থেকে কবি যদি সময়ের শেষ সীমায় অবগাহন করেন
পাঠককেও থাকতে হবে তার কাছাকাছি। তা না হলেই ইলোকোয়েন্স
বা সাবলীলতায় অভাব, অস্বাচ্ছন্দ্য।[৮৩]

কবির বিবর্তনের ইতিহাস আলোচ্য কাব্যের ভাষাতেও সপ্রতিভ:

একতাল নরম মাংসপিণ্ড যদি/ ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকে হাওয়ার নখরে
আর তার অবোধ আর্তনাদ/ যদি ভেঙ্গে দেয়
পুরনো কবিতার ছন্দ/ সে মুহূর্তে তাকে তোমার ভালবাসাই করুক জয়; ...
তোমার বাসনা-বিহ্বল চোখের/ চরম দৃষ্টি হানো
জন্ম দাও নতুন কবিতার/ শিল্পীকে অমর করো।[৮৪]

প্রেম আদিম-অকৃত্রিম। অথচ তাতেও অরুচি বর্তমান যুগের অন্যতম অনুকৃতি। কালপ্রদাহে সমাজ থেকে সুকুমার বৃত্তিগুলি নির্বাসিত। তথাপি 'আদিম সঙ্গী'—এমন সহৃদয় ব্যক্তির উপস্থিতি একেবারে দুর্লভ নয়। সেই লোকগুলো পুতুলের প্রতীকে আবৃত হয়ে প্রেমকে স্বীকৃতি জানিয়েছে:

পুতুল যদিও/ তবু .../ দু'হাত ভরে সারাদিন ফসল কুড়িয়ে
আদিম স্রোতের ঢেউয়ে হাত ধুয়ে/ বিশ্রামের আয়োজন
আর/ যে আছে আদিম সঙ্গী––তার/ অমাবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে
ফুল তোলে/ নিজ হাতে খোঁপায় সাজায়/ রাণী সাজে।[৮৫]

সময় স্থবির নয়, নদীর স্রোতধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত গতিশীল। তার গতিময় সত্তায় যুগঅন্ধকারে বিবর্ণ পৃথিবী আবার প্রেম, করুণা, সহানুভূতির উজ্জ্বল প্রভায় উদ্দীপ্ত হবে। তখন এর সর্বত্র শরীরী বিকাশ অপ্রেক্ষণীয় থাকবে না। তেমন প্রত্যয় নিয়ে নতুন প্রজন্মের প্রতি সযত্ন পরিচর্যা:

আমাদের আজন্ম অবুঝ সঙ্গী এ দু'টি পুতুল।/ এবং আদিম
অমর যে ফুল দু'টি/ নির্মল রোদের মাঠে ফোটে না
এবং/ লজ্জা পায় লোকালয়ে,/ সেই দু'টি ফুল
দু'টি পুতুলের হাতে তুলে দিয়ে/ আসুন দু'জনে
নিবিড় সন্ধ্যার এই অন্ধকারে আমরাও এখন/ অন্ধকার হয়ে যাই।
... আর প্রায়অন্ধ দু'টি চোখ তুলে/ নির্বোধ পশুর মত চেয়ে থাকি;
হঠাৎ সজীব অবুঝ পুতুল দু'টি/ কিছুক্ষণ খেলুক আঁধারে।[৮৬]

ধনৈশ্বর্যে নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রেমসম্পদেই অন্তর পরিপূর্ণ থাকে। প্রেমহীন অন্ধকার জীবনে কে-ই বা বাস করতে চায়? আয়ুষ্কাল শেষে যখন পরপারের ডাকে সাড়া দেওয়ার পালা তখনও এর ব্যত্যয় হয় না:

যখন মাঝির ডাকে উচ্চকিত ভোরের কুয়াশা/ সংসার সমুদ্রে কাঁপে
দৈনন্দিন স্রোতের ইশারা;/ তখন যদিও
সহজে পায়ের কড়ি গুণে দিয়ে/ সেই ঢেউয়ে মত্ত এ-জীবন;
তবুও সন্ধ্যায়/ ধূলোমাটি ঝেড়ে পুছে/ এবং সস্নেহে
সমস্ত দিনের ক্লান্তি/ ধুয়ে দিয়ে কাছে বসে,/এমন সুজন
স্বজন একজন আছে/ তার নাম প্রেম
হৃদয়ে জাগ্রত আছে/ অবিকল কৈশোরের মত।[৮৭]

যুগযুগান্তে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার কবির মনে জাগায় অসহায় অনুভূতি। তারই অভিব্যক্তি নিয়ে:

হঠাৎ মনে হয় আমি এক অভিশপ্ত মানব সন্তান/ নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি
এবং পথের সব আলো নিবে গেছে/ হৃদয়ে কেবল
বিপন্ন বিব্রত এক আর্শির ছলনা।[৮৮]

জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন হৃদয়ের সমস্ত উষ্মা অন্তর্নিহিত লাবণ্যে মিশিয়ে ফেলে পরিস্থিতির অন্তর্বৃত্তেই যথোচিত তৃপ্তি খুঁজে নেওয়া শ্রেয়তর:

ট্রয়ের আত্মাকে আর হৃদয়কে জ্বালিয়েছে যে আগুন
তার সব দাহ দেহে তার শান্ত হতে পারে/ আর তৃপ্ত হতে পারে
তার সব তৃষ্ণা সে দেহের লাবণ্য হৃদয়ে মেখে নিয়ে
মুহূর্তে এবং তৃপ্ত মানবের বিস্মিত হৃদয়/ তখন সহজে বলে:
যেখানেই দেখি/ বাগানে পথের পাশে পুকুরের ঘাটের কোণায়
এবং যখন হাতে ভালোবেসে তুলে নিই/ তখন এ পৃথিবীতে ফুলের তুলনা নেই।[৮৯]

পঞ্চাশের শেষ হতে ষাট দশকের শুরুর মধ্যেই এদেশের উপর পাকিস্তানি শোষণ-ষড়যন্ত্রের ভিত পাকা হয়ে ওঠে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল, ফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বন্দী, শাসনব্যবস্থা নিয়ে ছিনিমিনি, পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্বপাকিস্তান নাম ধারণ, সামরিক আইন জারি, গণচেতনা বিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন নামে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যাবলী দেশবাসীর মনে অসন্তোষ আর অবিশ্বাস প্রকট করে তোলে। এর প্রতিকরণার্থে সচেতন গণমানসে যে জাগরণ-বিক্ষোভ, সেখানে কবির প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটানো:

আনন্দের চিহ্ন নেই যার মুখে, দেখো/ সে কেমন অবাক,
দু'চোখে বেদনার কারুকার্য কলঙ্কের কালিতে কেমন/ ছেয়ে আছে দেখো ...
এসো তার মুখের সমস্ত কালি মুছে দিয়ে/ এক সঙ্গে পার হই,
শুকনো ঘাটে জোয়ারের ডাক/ আসুক, দুলুক নৌকা আর মরা ঘাসে

দুলুক সমুদ্রপ্রাণ আশায়/ এবং বিবর্ণ বকুল যুঁই পলাশ ছলনা
পার হয়ে নিস্প্রদীপ কুটীরের সব বেড়া/ ছুঁয়ে যাক অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং আত্মার
মলিনতা ধুয়ে নিয়ে এসো পরস্পর সঙ্গী হই।[৯০]

বঞ্চিত-অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে 'রোদে-মেঘে' কবিতায়। রোদ এবং মেঘ চিরকাল সুখ-দুঃখের প্রতীক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিও স্মর্তব্য।[৯১] অনুরূপ মোড়কে আহসান হাবীবের সংক্রন্দন:

... ওকে তুমি আরো দুঃখ দিওনা;/ ও বড় দুঃখী আর ওর সারা আকাশে মেঘের বিষণ্নতা
ওর বাগানে একটিও ফুল ফোটেনা।/ ও বড় রোদের কাঙাল তাই
রোদে দুদণ্ড গা মেলে যদি থাকতে চায় তবে/ ওকে তুমি ফিরিওনা।
ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলো/ দেখো ও বড় পরার্থপর, তাই
কখনো নিজের কথা বলেনা ও/ আর আজীবন সমস্ত মেঘের ভার বুকে নিয়ে
চেয়ে থাকে রোদের পথের দিকে।[৯২]

নদী প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আহসান হাবীবের অনেক কবিতায় তাই নদীর প্রসঙ্গ এসেছে জীবনের উত্থান-পতন কিংবা সফলতা-বিফলতার প্রতীক হিসেবে। যেমন সাফল্যের চিত্রায়ণ:

যখন জোয়ার ছিলো/ ভরা নদী/ ভোরের পাখীরা
প্রবাসের নীড় ছেড়ে নেমে গেলো,/জোয়ারের জলে
গা ধুয়ে ভোরের রোদে ডানা ঝাড়ে;/ তৃষ্ণার সবুজ
তুলে নেয় ঘাসের নরম নম্র কণা থেকে,/ বন্দরের ঘাটে ...।[৯৩]

সাধারণের জীবন ধারণের চিত্রটিও এখানে নিখুঁত-মনোরম:

ভোর থেকে ভোরে/ জোয়ারে জোয়ারে নিত্য আরো বহু অভিজ্ঞ বিষয়ী
প্রজ্ঞাবান গৃহস্থেরা আরো বহু ফসল কুড়িয়ে/ ফিরেছে যে যার ঘরে।[৯৪]

এই প্রাণবন্ত, চরিতার্থ জীবন আজ নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম জৌলুসে মরা নদীর ন্যায় শুষ্ক-আড়ষ্ট:

নতুন যৌবন বিলিয়ে তৃষ্ণার তীব্র/ আগুন জ্বালিয়ে
যে নাগরী নারীর সাম্পান/ঘাটে ঘাটে/ নূপুরের ধ্বনি তোলে।
তার/ কটাক্ষের ঝোড়ো হাওয়া/ কখন তুলেছে ঝড় এখানে। ঘাটের
নিবেছে সমস্ত আলো/ মরা নদী/ নির্জনতা।[৯৫]

বিষণ্নতা-কাঠিন্যতা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, আবার ফিরে যেতে হয় সেই হারানো ঐতিহ্যে– যেখানে জীবন অকৃত্রিম ও স্বল্প আয়তনেও হৃদয়ের প্রশান্তি। কবির অনুভবও তাই:

ছায়ার মিছিলে হেঁটে শান্তি নেই;/ যাই ফিরে যাই
যেখানে মানুষ মাঠ পথ পাখি পলাশ বকুল
আরণ্য বর্ষার জলে পাশাপাশি গা ধোয়
এবং/ আদিম নদীর স্রোতে মানবশিশুরা/ খেলা করে;[৯৬]

প্রাচীন গ্রীক পুরাণে আছে– ধন-দৌলতের দেবতা বাক্কাস লালসাদগ্ধ মিডাসকে বরদান করেছিলেন এই বলে যে, সে যা কিছু ছুঁয়ে যাবে সবই সোনায় পর্যবসিত হবে। বর পেয়ে উন্মত্ত মিডাস বাড়ির সমস্ত কিছুই হস্তস্পর্শে স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করে। এমনকি নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও তার লোলুপ ছোঁয়ায় সোনায় রূপান্তরিত হল। অবশেষে 'সোনার কুৎসিৎ কর্কশ কাঠিন্যে' তার প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, তখন সে আবার ফিরে যেতে চাইল পূর্ব অবস্থাতেই–যেখানে ছিল না স্বর্ণ-রৌপ্যের ছলনা, ছিল অন্তরের স্ফূর্তি। বর্তমান এ সমাজেও মিডাসের ন্যায় এক শ্রেণীর লোক ধনৈশ্বর্যের পিপাসায় মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত:

প্রমত্ত মিডাস্ আমি দেহের প্রাণের/ সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে

কুড়াই অশেষ সোনা দিন রাত্রি। সোনায় কখন/ পাহাড় তুলেছি গড়ে আর সেই পাহাড়ের গুহায় কখন
সোনার পালঙ্কে পাতা সোনার শয্যায়/ ভুলেছি আপনজন আত্মীয় এবং
শিশুপুত্র কিশোরী কন্যার মুখ এবং একদা/ দেখি এ হৃদয় কবে এক খণ্ড বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত।[৯৭]

মিডাসের মতো এইসব অর্থগৃধ্নুদের কবে চৈতন্যোদয় হবে, সে অপেক্ষায় আজ মানুষের বন্দীআত্মার আর্তস্বর:

জানিনা কখন কবে 'মিডাস্'-এর আর্ত অনুনয়ে/ পৃথিবী চঞ্চল হবে, সব ক্ষুধা নগ্ন হবে–উর্ণার আড়াল
ছিন্ন হবে। আর্তির শিখায় দগ্ধ হবে নির্লজ্জ পিপাসা;/ মুক্তদ্বার সোনার পিঞ্জর পড়ে রবে
প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পাখি তার পুরাতন নীড়/ খুঁজে নেবে। যে-মাটি সোনার কঠিন দেয়ালে রুদ্ধ
যার ফুলে-ফলে হাওয়া নেই জল নেই/ এবং সহজ শিশিরসন্নত ভোরে সুকুমার পরিচর্যা নেই–
মুক্ত হবে সে-মাটির বুক, তার হৃতজ্যোতি : পাতায় সবুজ/ কৈশোরের গান হবে ঘরে ফেরা হাওয়ার গুঞ্জন;
তৃষ্ণার পীড়নমুক্ত প্রাজ্ঞ মুহূর্তের সূর্যোদয়ে/ পৃথিবী উজ্জ্বল হবে জানিনা কখন।[৯৮]

মধ্যপ্রাচ্যের কিংবদন্তীর নায়ক আবু হোসেন। বাদশাহ্ হারুন-অর-রশীদ তাকে একদিনের জন্য সিংহাসনে বসিয়ে তার অপূর্ণাঙ্গ সাধ পূরণ করেছিলেন। সে কাহিনীকেও কবি বাংলাদেশের জনজীবনের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে বিশ্বনাগরিকতাবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর হাতে চরিত্রটি যেমন স্বীয় সমাজের মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ, তেমনি আবার রাতারাতি বেড়ে ওঠা ভুঁইফোড় সমাজের প্রতি তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ স্বরূপও। দুঃখ-দৈন্যের হাজার টানাপোড়েন সত্ত্বেও মানুষ আশাকে উজ্জীবিত রেখেই বেঁচে থাকে:

হায় আবু হোসেন .../ সকাল দুপুরে কিম্বা অপরাহ্নে
তুমি সারা শহরে ছড়িয়ে আছো/ আছো রাত্রির নির্ঘুম চোখে
ঘুমের স্বপ্নেও আছো জড়িয়ে। .../ যখন যে মুখ দেখি
বাসে কিম্বা ফুটপাতে/ অথবা পার্কের বেঞ্চিতে অল্প দেহ,
অথবা মার্কেট কিম্বা এ্যভেন্যুয়ে–/ যাকে দেখি যত মুখ দেখি
আহা তারা জীবনের যোদ্ধা কিম্বা/ জীবনযুদ্ধের অভিনয়ে ক্লান্ত বটে! ...
সেই ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ/ সূর্যোদয়ে স্থির হবে আবার নতুন বিশ্বাসে
আবার নতুন উদ্যমে চঞ্চল এবং থরোথরো/ সেই কটি মুখ
আবার তুমিই সারা শহরে ছড়িয়ে দেবে ...
কিছুক্ষণ ধরে তোমার/ ভবিষ্যতে আশা রেখে।[৯৯]

কিন্তু লাগামহীন সম্পদের লালসা আত্মহত্যার সামিল। সেরকম হিংস্র বাসনাকে কবি বিদ্রূপের শাণিত শরে ছিন্নভিন্ন করেছেন:

স্বপ্নাতুর কয়েকটি চোখের তারা/ যখন বিদ্ধ করে আমাকেও
আমার বুকের মেঘেও যখন/ কিছু বিদ্যুতের আলো হানে
আর আমি ক্লান্ত হই/ আমিও বিব্রত হই ...
... তখন আমি আর্শিতে এমুখ দেখতে ভয় পাই,
ভয় পাই তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হতে।/ কেননা, তোমাকে
হায় আবু হোসেন তোমাকে মৃত জেনে/ যদিও ঠকেছি,
তোমার কঠিন হাতে মৃত্যুর শিকার, হতে চাইনা ...।[১০০]

সামাজিক বৈষম্যের প্রতিও ব্যঙ্গ প্রকোপিত হয়েছে 'ডাবল কলাম' কবিতায়। দৈনিক পত্রিকায় দীর্ঘ কলামে প্রকাশ–বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ ক'মাস অক্লান্ত গবেষণার পর এক প্রকার মাটির সন্ধান পেয়েছেন, যেখানে চিরাচরিত পরিচিত কোনো ফসলের পরিবর্তে একশ্রেণীর নতুন বৃক্ষ জন্মাবে। আর তার সবুজপল্লব ঘিরে একজাতীয় পোকা সোনালি সুতা বুনতে থাকবে। সেই রঙিন সুতায় তৈরি হবে বিশেষ ধরণের মূল্যবান পোশাক। কিন্তু দেখা গেল উৎসবের দিনে তা উপহার হয়ে এল কেবল উপরতলাবাসী রানী-শাহ্জাদীদের হাতেই। 'একশত বারো টাকা ছ'আনা' মাসিক বেতনভুক্ত যে সাংবাদিক এ চমৎকৃত খবর পরিবেশন করেছিলেন, কিংবা যে চাষী বা শ্রমিকের ঘাম ঝরা শ্রমের বিনিময়ে এ বর্ণময় উপঢৌকন, তাদের প্রতি কেউ দৃষ্টি মেলে তাকালও না। এমন বঞ্চনাকে:

... সোনালী জাল দিয়ে/ একটি পোশাক হবে, সে পোশাক নিয়ে
আনন্দবিহ্বল চিত্তে এ পৃথিবী দেবে উপহার
যুবতী রাজ্ঞীর হাতে। অভিষেক উৎসব তাহার
ধন্য হবে। এবং বিজ্ঞান/ হবে ধন্য
ধন্য হবে চাষী যার শোণিতে রঙিন এই দান।[১০১]

যন্ত্রনির্ভর ও বুর্জোয়া সভ্যতার ভয়াবহ রূপ প্রকটিত হয়েছে 'সে আসে' কবিতার মধ্যে। তার নির্মম পদদলনে মাটি থেকে ঘাস-ফুলের ন্যায় অন্তরের স্নেহ-মমতা নিশ্চিহ্ন এবং মানুষ ক্রমাগত যন্ত্রদাসে পরিণত। এই মায়ামৃগের পিছনে অন্ধ আবেগে সবাই ছুটে চলেছে; কিন্তু সুখ কোথায়? এতে আতঙ্কগ্রস্ত হলেও এর বিকট গ্রাস থেকে কারো নিস্তার নেই:

টলমল পদভারে সে আসে ...!/ বিপুল দানবদেহ
বজ্রনাদ!/ মাটি কাঁপে/ মাটির মানুষ কাঁপে আতঙ্কে দু'ধারে। ...
কি তার বিপুল দেহ/ ইটের উপর ইট/ সূর্যের সমস্ত মুখ ঢেকে যায়
লোহায়-বিদ্যুতে প্রস্তরখিলানে গড়া/ এবং সে আসে
নির্ভীক নিশ্চিত পায়ে .../ দেশ থকে দেশান্তরে গতি তার সম্রাটের মত।
পৃথিবীর মানবসমাজ/ আজ তার শাসনের অনুগত
কিঙ্করের মত/ নিত্য তাকে অনুসরণেই/ সুখের সন্ধান করে–[১০২]

অর্থ-বৈভব মানুষকে এতই বিবেকহীন, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তুলেছে যে ধন-সম্পদ ছাড়া কোনো কথাই সে ভাবতে পারছে না। নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ফুলের মতো কিছু কল্যাণকর সাধনা থাকলেও তা অজ্ঞতা ও উপহাসের বিষয়:

সেঞ্চুরী ফুলের চারা বাগানে লাগিয়ে/ সযত্নে লালন করে কোনো এক ফুলের পাগল
আর তাই অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে/ পড়সী তার।
লোহা কিম্বা ডালের আড়তে যেতে আসতে সকাল বিকেল/দেখে আর ভাবে
আর ভেবে ভেবে হাসি পায় তার।[১০৩]

তথাপি মোত্তাকিম কাজীর ন্যায় নিরেট বিষয়বিজ্ঞ লোকও শেষ পর্যন্ত নিজের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না:

লোহা ডাল আড়ত এবং/ ইমামগঞ্জের সব গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে হঠাৎ
কাজীর বিষণ্ন চোখ চলে গেল দূরে বহু দূরে/ দুদিনের সংসারের পরপারে
এবং বলেন,/ আমরাও এখন পরপারের পথিক।[১০৪]

সময়ের অদৃশ্য ছায়ায় মানুষের অস্তিত্ব বিকশিত হয় বটে, কিন্তু তা কখনো কালোত্তীর্ণ নয়। অনন্তকালের সঙ্গী হয়ে টিকে থাকার একমাত্র উপায় নিজেকে অশেষ বিস্তার। তাই বাগানের মালিক কাজীর দৃষ্টি উন্মোচন করে বলেন:

... আমি যাবো, আপনিও যাবেন, / শিশু আর কিশোর যুবক সন্তানেরা আমাদের
রয়ে যাবে। সেঞ্চুরীর চারা/ দীর্ঘদিন পরে জানি ফুল দেবে।/ দীর্ঘদিন।
আমরা তখন বেঁচে নেই পৃথিবীতে।/ তাহোক তবুও
আমাদের সন্তানেরা এই পথে প্রত্যহ সকালে/ লোহা কিম্বা ডালের আড়তে যাবে যখন
তখন/ আমাদের কিছু স্নেহ/ কিছু দোয়া বুকে মেখে নিয়ে যাবে তারা।[১০৫]

এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে যা কিছু সুন্দর-কল্যাণকর তার প্রতি দুর্মর আকর্ষণ উন্নত রুচি ও মননশীলতার পরিচায়ক। অথচ প্রগতির নামে ধনতান্ত্রিক নগরজীবনের রুচিহীনতা ও কদর্যতা দিন দিন মানুষের আত্মমর্যাদাকে ধুলায় লুটিয়ে ফেলেছে:

১. আমার তৃষ্ণা পুড়েছে দ্বিচারিণী জননীর পায়ে পায়ে/ আর তার খোঁপার ফুলে
নিত্য পূজো নতুন অতিথির।/ আমার সমস্ত মুখ লজ্জায় আনত
কী দিয়ে তোমাকে বরণ করি বলো![১০৬]

২. ছায়াদের সঙ্গী হয়ে–/ অনুগত প্রাণ
অতিথি গৌরবে নিত্য নিষিদ্ধ সরাই
সন্ধ্যার প্রদীপে ঢালে/ আরো কিছু সুরা![১০৭]

কথায় বলে: 'অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর।' বক্ষ থেকে এই শোকের ভার নামানোর জন্য কান্না এক মোক্ষম অস্ত্র। প্রসঙ্গত টেনিসনের একটি কবিতার উল্লেখ করা চলে[১০৮]– যেখানে মৃত সৈনিকের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে, শোকে নিমজ্জমান বিধবা পত্নী পাথরে পর্যবসিত হয়েছিলেন। তখন নিরুপায় প্রতিবেশিনীরা তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য শিশু-সন্তানটিকে কোলে তুলে দিলে, তাকে জড়িয়ে ধরে প্রবল অশ্রুপাতের মাধ্যমেই তিনি সংবিৎ ফিরে পান। অথচ একালের সভ্যসমাজ কান্নার 'মহৎ মধুর কান্তি'র কথা একেবারে ভুলতে বসেছে। তাদের কাছে এ এক লজ্জাজনক ব্যাপার। এমন ধৃষ্টতায় কবির আক্ষেপ:

আমাকে কাঁদতে দাও, দেখো/ এত যে আঁধার
রৌদ্রের রূপালী পাখা ঢেকে দিয়ে/ কেবল তুফান আঁধারের সারা বিশ্বে ছড়ায়
তবুও দেখো দেখো মানুষ কেমন নিঃশঙ্ক,/ কাঁদে না। ...
আমার চারপাশে .../ তোলে দেখো নতুন দর্শন।
ভাই কিম্বা সন্তানের মুখ/ কেমন কঠিন দেখো আরো দেখো
কি বর্বর গর্বের উত্তাপে জ্বলে সারা মুখ/ আর বলে, কান্নার মতন এই পৃথিবীতে
লজ্জাকর আর কিছু নেই।/ তাই লজ্জা আমার। আমাকে
কিছু কান্নার কুসুম দাও–/ আমি তা ছড়াবো
মানুষের পরিত্যক্ত পুরনো বাগানে।[১০৯]

বুদ্ধিগম্য ব্যক্তিমাত্রে দেশপ্রেমের উষ্ণ অনুরাগে উজ্জীবিত। ব্যক্তিপর্যায়ে হিংসা-স্বার্থপরতার হানাহানি লেগে থাকলেও, দেশমাতার বৃহত্তর স্বার্থে সকলে এক কাতারে সামিল। হাজার পীড়নে-হতাশায়-গ্লানিতে মায়ের স্নেহসুধার ন্যায় জন্মভূমির কাছেও প্রাণের শীতলতা। সে ঋণের দায়ে কৃতজ্ঞতাবোধে অঙ্গীকারবদ্ধ কবিও:

তোমাতেই আশা রাখি আমার অবিনশ্বর জন্মভূমির/ অমথিত অটল রূপের
আর তার অবিনশ্বর ঐতিহ্যের।/ আমার অমর আত্মা তোমাতেই বাঁচে
তাই তুমি বড়ো আমার আত্মার চেয়েও। .../ তুমি আছো আমার আজন্ম সঙ্গী হয়ে
এবং আমার হৃদয়ের আর্তি হয়ে তুমি–/ কি আশ্চর্য, আমাকে তুমি লালন করেছ
আশৈশব। .../ এবং সে আলোর জ্যোতিতে/ মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি খুঁজে পাই।[১১০]

বর্তমান সমাজ মূলত ধনী, দরিদ্র এই দুটি শিবিরে বিভক্ত। সম্বলহীন মানুষ সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী অথবা যন্ত্রযুগের শোষণ-ষড়যন্ত্রের মোহনজালে পিঞ্জরাবদ্ধ। যথার্থ মর্যাদা না দিয়ে, নিজস্ব স্বার্থে তাদের কোন রকমে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু বজায় রেখে, শ্রমশক্তিকে কেবল টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই শোষিতশ্রেণী এতদিন নিয়তির পরিহাস বলে সমস্ত অত্যাচার নিঃসংকোচে মাথা পেতে নিলেও এখন যথেষ্ট সচেতন:

আমার রশিটি/ মুঠো থেকে কোনদিন ছাড়বে তুমি
এমন বিশ্বাস আর নেই আমার।.../ তুমি কিছু রসে-রোদে
আমাকে বাঁচিয়ে রাখো/ সে ত তোমারই গরজ প্রভু।[১১১]

ফলে মুক্তির জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠেছে বিদ্রোহ, প্রতিবাদ:

দয়া নেই তোমার তা জানি,/ তবু মিনতি, দয়া করো, যদি পারো,
একটিবার হাতের মুঠোটি আলগা করে দাও,/ মুক্তি দাও আমাকে
একবার জীবনে/ আমাকে তুমি ডুবতে দাও ইচ্ছের অতলে।[১১২]

পাঁচ

সারা দুপুর (প্র. ১৯৬৪)-এর পর দীর্ঘ সময়ের জের টেনে প্রকাশিত হয় আহসান হাবীবের *আশায় বসতি* (প্র.১৯৭৪)। যদিও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রকাশ, তথাপি এর সবগুলি কবিতাই পাকিস্তানী দুঃশাসনের আমলে: ১৯৬৪-১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বসময় নিয়ে রচিত।

১৯৬২ সালের ছাত্রবিক্ষোভে পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর দেশের যুবশক্তি নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়; এবং পরবর্তী সময়ে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ হয়। এ উপলক্ষে ১৯৬৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রনেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বাইশ দফা দাবিলিপি প্রণয়ন করে।[১১৩] আন্দোলন তীব্রতর রূপ ধারণ করলে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়।[১১৪] অপরদিকে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যমত তৈরি হলে সেখানেও আইউব সরকার কুটকৌশলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে শাসনতন্ত্রে নিজের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করেন[১১৫] এবং ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদলীয় প্রার্থী মিস্ ফাতেমা জিন্নাকে হারিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[১১৬] নির্বাচনের ফলাফল গণতান্ত্রিক মহলে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। এ সময় তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে নগ্ন যৌনচেতনা ও পরাবাস্তবতাবোধের প্রাবল্য দেখা দেয় তাও সম্ভবত এরই পরিণাম। তথাপি আন্দোলন অব্যাহত থাকে, এবং ক্রমান্বয়ে স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। এই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উত্তাল পটভূমিতে দ্বন্দ্ব, সংশয় ও বিপর্যয়ের মধ্যে উত্তরণের পথ আবিষ্কার করে নির্মিত হয়েছে *আশায় বসতি*-র কবিতাগুলি। কাব্যের উদ্বোধনও তাই মিছিলের যাত্রা দিয়ে এবং তাকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে:

...দুর্জয় সাহসে যদি আমাকে কখনো/ ছুঁড়ে দিতে পারো ঐ চীৎকারের অশ্লীল মিছিলে
ঐ মিছিলের অনিচ্ছুক বালকের সামনে, তবে/ দেখবে তুমি কি সহজে অবোধ বালক
সস্নেহে আমাকে নেবে কোলে তুলে হাতে দিবে নীল পদ্ম;[১১৭]

ব্রিটিশের ন্যায় পাকিস্তানি আমলা ও তাদের অনুচরেরা এ দেশে ত্রাণকর্তার মুখোশ পরে বিলাসবহুল জীবনের আবেশে শোষণের মাত্রাকে পুরোপুরি বজায় রেখেছিল। এর প্রতিকার বিধানে কবি স্বীয় মাধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উপরতলাবাসীদের প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ উদ্গিরণ করেছেন:

আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো মসৃণ সদয় দীর্ঘ মই/ আমার আয়ত্তে নেই। নেই
রৌপ্যাধারে সবুজ পানের খিলি তাই/ তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই কিছু পৃথিবীতে, আমি
পরার্থে বিলাবো প্রাণ এমন মহৎ/ উদ্দেশ্যে কখনো নই নিবেদিত। এক
নিরীহ সংসারী আমি, নির্বিবাদী আর/ জীবনের তেমন কোনো চকমপ্রদ দর্শনের অভিমান নেই।[১১৮]

চমকপ্রদ দর্শন কিংবা উচ্চাভিলাষের বশীভূত হয়ে নয়, আটপৌরে জীবনের অভ্যন্তরেই দেশের সাধারণ মানুষ প্রকৃত আত্মসুখ ও মনের প্রশান্তি অন্বেষণ করেছিল। কিন্তু সমকালীন সমাজমর্মে পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনাবোধ হতাশার যে নবঅঙ্কুরোদগম ঘটায় তাতে বিষণ্নতার কালোছায়া ঘনিয়ে আসে:

... প্রত্যহ/ অবিশ্রাম নিরাশ্রয় চীৎকারে খণ্ডিত আর সচকিত
এই লোকালয়ে/ ... আমি সারাদিন
নৈঃশব্দের ভয়াবহ ভারী এক শব কাঁধে নিয়ে/ ঘুরিফিরি।...
... নির্মম তাড়ায়/ সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ আমার নিয়তি যেন।[১১৯]

ব্রিটিশ-কলোনির মতো পশ্চিমাশাসকবর্গ সুপরিকল্পিত উপায়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি শিল্প-কারখানার কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের উৎস এবং তাদের শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের একচ্ছত্র বাজার হিসেবে পরিণত করে। চিরউর্বর স্বদেশভূমির এমন দৈন্যদশায় নাগরিক বিবেক শোকাভিভূত হয়ে পড়ে; এবং তা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে এর প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও মানুষের প্রতি প্রাণঢালা মমত্ব নিকষিত হয়েছে:

তোমার কি মনে পড়ে সেই নদী যে নদীর ঘাটে/ হাজার বৎসর ধরে আমাদের একান্ত স্বজন বহুজন
ক্লান্ত মুখ ধুয়েছে এবং/ বিশ্রামের সব সুখ নদীর জলের মত গায়ে মেখে
ঘুমিয়েছে? এখন সে নদী/ বিদেশী বিচিত্র পালে রুদ্ধশ্বাস
তীরে তার হাটে হাটে নতুন পশরা,/ আমাদের আত্মীয়েরা

এখন কাঞ্চন মূল্যে সেই সব হাটে আজ/ কাঁচের খরিদদার উন্মাদ হাটুরে তারা,[১২০]

অনুভবের প্রচণ্ড দোলায় সঙ্গে সঙ্গে এও অনুমিত হয়েছে, যে ভাবেই হোক শোষণের আশু নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে অনাগত কালের জন্য তা আরো শঙ্কাবহ হয়ে দাঁড়াবে:

এই নদী আহা এই নদী যদি মরে যায়/ ঘাট যদি ঢাকা পড়ে ঘাসে আর জঙ্গলে, তখন
আমরা অথবা/ আমাদের সন্তানেরা কোথায় সহজ স্নানে
স্নিগ্ধ হবে, কোন ঘাটে/ ইচ্ছেমত পা ছড়িয়ে বসবে তারা... ।[১২১]

দীর্ঘদিনের সভ্যতায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নিজস্ব গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। অথচ বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে সমাজের শিক্ষিত তরুণদের একাংশ নিজেদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে পতনের মুখে ধাবিত হয়। সেইহেতু মৌলিকত্ব অনুসন্ধানকারী ও ভবিষ্যৎ গঠনপ্রয়াসীর দুর্দশা:

কোকিল কণ্ঠ তাঁর/ অথচ স্বভাবে/ অকুণ্ঠ কোকিল নয়।
কাকের বাসায়/রাখেনা নিজের ডিম/ অনায়াস-সন্তানের আশা নেই তার, তাই
একদা যখন/ ভবিষ্যৎ সন্তানের বাসনায়/ একান্ত নিজের
বাসার সন্ধানে গেলো বেরিয়ে, তখন/দেখতে পেলো তিলঠাঁয় নেই.....
বাসা তার ভ'রে আছে আসন্নপ্রসবা/ অসংখ্য কাকের ডিমে![১২২]

স্বদেশপ্রীতি এবং স্বীয় সংস্কৃতি ও মৌলিকতাকে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরার আমন্ত্রণ 'মায়ের ডাকের ছড়া' কবিতায়ও সমুজ্জ্বল:

চৌমাথার এক ঘণ্টিওয়ালা পাগলাঘণ্টা বাজাচ্ছে/ সেথায় আসন পেতে খোকন নিজেকে নিজে সাজাচ্ছে হাত পা ছুঁড়ে ঘণ্টিওয়ালার নাচানাচির নেইক শেষ।
ঘণ্টিওয়ালা নাচছে দেখে খোকন বলে, নাচছি বেশ!
উল্টো করে আয়না ধরে বলে খোকন , তাইত,/ ঘরকুনো সেই বেড়ালমুখো চেহারা আর নাইত!...
মা কেঁদে কন, হায়রে অবোধ/ বুড়ো খোকন বুঝলিনে,..../ সং সেজে নেই সুখের সীমা
নিজের আদল খুঁজলিনে।/ দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবো আয়রে খোকন ঘরে আয়!
শীতলপাটি বিছানা দেবো খোকন ফিরে আয়রে আয়![১২৩]

সঞ্চিত আবর্জনার অন্ধকার গুহায় প্রাণের সব আলো পুড়ে নিঃশেষিত হতে চলেছে। রাত্রিভর দুহাতে অন্ধকার ঠেলেও ভোরের সূর্য উদিত হয় না। তবুও ভাগ্যবঞ্চিত মধ্যবিত্তের জন্য আশাই একান্ত জীবনীশক্তি। সেই আশারূপ তরী বেয়ে আগন্তুকের আগমনে কবির উৎফুল্লতা:

আসতে দাও হাওয়া/ উঠুক ভরে বুক/ রোদের আরশিতে
দেখতে দাও মুখ।/ জানালা খুলে দাও/ দরজা খুলে দাও
দেখতে দাও আজ/ ভোরের বাগানের/ সারাটা বুক জুড়ে/ নতুন কারুকাজ।[১২৪]

শোষণ-পীড়নের নির্মম কণ্টকাঘাতে আহত-বিক্ষত হয়ে যাদের পীড়িত পাঞ্জায় আর সাড়া জাগে না, তাদের জন্যও আছে জাগরণী সম্ভাষণ:

বিজন নদী নদীর ঘাটে কি অন্ধকার !/ আলোর পথে বিছায় কাঁটা কোন দুরাচার!
তবু আশার আলোর শিখা নেবে না কার।/ তার দুচোখের আশার আলো উঠোন ভাঙে,
আলোর পথে যায় এগিয়ে ঘাটের গাঙে/ ঘাটের পথে রোজ সে আলো উঠোন ভাঙে![১২৫]

অন্যদিকে রূপকের আশ্রয়ে কামনাব্যর্থ মানুষের প্রতিক্রিয়াজনিত মানসপ্রতিফলন ঘটেছে 'বাস নেই' কবিতায়। একজন লোক প্রতিদিন বাসস্টপে এসে ক্লান্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তার মলিন ভূষায় ভাড়া দেওয়ার সঙ্গতি নেই বুঝতে পেরে বাস এসে থামে না সেখানে। এভাবে প্রতীক্ষায় চেয়ে থেকে তার সময় ফুরিয়ে যায়; তবু গন্তব্যস্থলে সে পৌঁছাতে পারে না। এমন বিদ্রূপাত্মক জীবনের নির্মম প্রতিচ্ছবি:

আজীবন আমি কী চেয়েছি? একটিবার/ কেবল একটিবার। একটিবার বাস্-এ চড়ে
যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছাবো। আর যথাযথ সময়ে। কেবল/ এই আশা নিয়ে
কেটে গেছে সমস্ত যৌবন, সমস্ত জীবন, আহা/ অসীম অনন্ত কাল যেন তবু বাস্
হায়; সেই মোহনবাহন/ কী নির্মম বিদ্রূপের ঘণ্টা নেড়ে চলে দূরে বারবার
আমাকে নিলেনা। বুঝি চোখে দেখে জানতে পায়,তার/ দুহাতে একটিও নেই কানাকড়ি।[১২৬]

অবশেষে লোকটি সমস্ত প্রতীক্ষাকে পরিত্যাগ করে অন্তর থেকে মুছে ফেলে চাওয়া-পাওয়ার অশান্তি। তখন হতে আবার তার মুখাবয়বে ফুটে উঠেছে প্রশান্তির দ্যুতি:

আমি বড় সুখী আজ। যেহেতু আমার
অপেক্ষার অর্থ নেই বাস্ নেই। ওপথে এখন
আসেনা ময়ূরপঙ্খী পাখা নেড়ে।[১২৭]

এখন তার কাছে জীবন সম্পর্কে সত্য বলে যা মনে হয়েছে, তা হল– পৃথিবীতে যদি সবার জন্য ভোগের সমান অধিকার থাকে, তবেই যেন কামনা ফিরে আসে, নতুবা নয়:

যদি কোন দিন এই পৃথিবীতে/ এই সব স্বপ্নের পাখিরা না-ই আসতো
অথবা পাখায় তার/ সকলেরই জায়গা হতো যদি অনায়াসে
আমার আপনার আর ওদের সবার!/ থাকতো যদি বাস্-কড়ি সবার হাতেই![১২৮]

এই ক্রুশবিদ্ধ জীবনের ছবি আরো রূপময় হয়ে উঠেছে 'পাখি পিঞ্জর ইত্যাদি' কবিতায়। মানুষের ইচ্ছানুসারেই পৃথিবীতে সবকিছুর পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাই বাসস্টপে অপেক্ষমান ব্যক্তিটির মতো মধ্যবিত্ত তরুণ মনেও সংঘাত:

বাইরে মেঘ/ ঝড়ো হাওয়া কাঁপে শূন্য স্বপ্নের পিঞ্জরে
তখন সংসারে/ 'স্বপ্ন পুষে কী লাভ কী লাভ' বলে তরুণ স্বাপ্নিক
সংসারীর ক্ষিপ্রতায় বন্ধ করে জানালা এবং/ পিঞ্জর নামিয়ে রাখে মাটিতে,[১২৯]

দৈনন্দিন ব্যর্থতায় আশাভঙ্গ মানুষ স্বপ্নের শূন্য পিঞ্জর মৃত্তিকায় গড়িয়ে দিলেও, সংসারের বন্ধন ও স্মৃতি থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। ফলে অন্তরদগ্ধতা থেকে কারোই পরিত্রাণ নেই:

সারা ঘরে ভয় আর অবিশ্বাস নিজেই নিজের/ কণ্ঠনালী চেপে ধরে বলে, না না খুলবো না জানালা।
'খুলবো না জানালা' বলে সুচতুর সংসারী/ যখন জানালা ছোঁয়, সজোরে দু'পাট এঁটে দেয়
তখন সে দেখে/ হাতের আঙুল তার এঁটে নিয়ে চতুর জানালা
কি নিখুঁত সাফল্যে রেখেছে তাকে ঝুলিয়ে এবং/ সারা ঘরে সংসার বাগান বাঘ পাখি
আর আলো আর অন্ধকার/ ফুল আর সাপের মিশ্রিত এক দুর্বোধ্য চীৎকার।[১৩০]

দারিদ্র্য কেবল ক্ষুধা, তৃষ্ণার প্রতিই ব্যঙ্গ নির্দেশ করে না, অন্তরের স্নেহ-মমতা ও ধৈর্যকেও গ্রাস করে। এ নিষ্করুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়িত হয়েছে–মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর সারাদিন পরিশ্রমের পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরে, স্ত্রীর মুখে কষ্টার্জিত বাসনপত্র ভাঙার অভিযোগে শিশুপুত্রকে শাস্তি প্রদানকালে, স্বীয় জীবনের শৈশবস্মৃতিচারণার মাধ্যমে। তিনিও তো তারুণ্যের উন্মত্ততায় পিতার হাতে শাসিত হতেন এবং নিদারুণ ক্ষোভে পিতার নিষ্ঠুরতার জন্য তার মৃত্যু কামনা করতেন:

খোকনের গালে/ বাঁ হাতের শক্তিটুকু নিঃশেষিত যখন, এবং
ডান হাত ভুলেছি, হঠাৎ মনে হলো/ আমার সম্মুখে
রক্তচক্ষু কোনো এক কৃষ্ণশ্মশ্রু-সজ্জিত পুরুষ/ দু'হাতে আমার কান আকর্ষণ করেছে, এবং
বারবার চায় কোনো প্রশ্নের জবাব।/ রক্তিম আমার মুখে কথা নেই; মনে মনে শুধু
আমি সেই অত্যাচারী পুরুষের মৃত্যুকামনায়/ কেঁপে কেঁপে সারা হই।
উত্তোলিত হাত কেঁপে গেলো।/ পিতার দৃঢ়তা এনে তর্জনীতে
'যাও' বলে যখন কৃত্রিম/ গর্জনে দিলাম মুক্তি খোকনকে , খোকন তখন
যদিও তোলেনি মুখ/ হেঁটে গেলো অবিকল বালক-ভঙ্গিতে।[১৩১]

গতিশীল বিশ্বে সভ্যতার বিকাশ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসংরক্ষণের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে, সমষ্টিগত কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে বিশ্ববাসী সকল প্রাণের আশাপ্রসূন উন্মীলিত হোক এটাই সাধনা। জীবনধর্মের সেই আদর্শ নিয়ে:

...মানব বাগানে/ সযত্নে লালিত নানা স্বভাবের নানাবর্ণ ফুল

তুলেছি, এবং মনে এ বিশ্বাস রেখেছি অটুট :/ ফুলের সৌরভে প্রাণ মুগ্ধ হবে, এবং মানব-
জলসায় সৌরভ তার বয়ে যাবে, আর তার ফলে ফলে/ জীবনের দিন পূর্ণ হবে। নিশ্চিত আশায়
সে ফুল সাজাই ঘরে, তাকে আর নতুন টেবিলে–– দেয়ালে ঘরের দোরে আঙিনায় থরে থরে ফুল![১৩২]

আর:

...অপেক্ষায় বসে থাকি/ কখন দুয়ারে
সাফল্যের ফলভারে নত হবে জীবনবৃক্ষের সব শাখা
জয় ঘোষণার মুহূর্ত কখন এসে দুয়ারে দাঁড়াবে।[১৩৩]

তৎসত্ত্বেও ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ মঞ্চে সভ্যতার ঈপ্সিত সনদ ভঙ্গ হয়। এরও দার্শনিক ব্যাখ্যা সুবিন্যস্ত হয়েছে আক্ষেপ-অনুশোচিত মনোজ্ঞ বর্ণনায় :

আপন-স্বভাব নামে শত্রু এক প্রাণের গভীরে/ শেকড় ছড়িয়ে গেছে দিনরাত্রি আপন-স্বভাবে
নীরবে। আমাকে নিত্য ভুলিয়ে রেখেছে/ এই সহজ তত্ত্বটি:
শুধু ফুলে কভু জন্ম লাভ ঘটে না এ পৃথিবীতে/ কোনো বৃক্ষ অথবা লতার,
ফুলের পেলব পাপড়ির জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী।/ বুঝিনি...
অজ্ঞাতে নিজের শত্রু লালনের এমন নির্মম/ ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলাম নিজেই নিত্য
স্বভাবের দোষে/ হায় রে স্বভাব, হায় 'আপন-স্বভাব'।[১৩৪]

জ্ঞানবৃদ্ধ পূর্বসুরীর কাছে পর্যাপ্ত ঋণ গ্রহণ করে তাঁকেই আবার অস্বীকার করার প্রবণতা বর্তমান যুগে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এর পরিণতি অন্ধকার সরু পথে মৃদু আলোকসম্পন্ন লণ্ঠন থেকে বিচ্ছিন্ন কাফেলা অথবা বৃহৎ সমুদ্র হতে সূত্রহারা তুচ্ছ নদীর মতোই আশঙ্কাজনক। কিশোর-যুবকদের এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ঔদ্ধত্যে ব্যঙ্গপরায়ণ কবি:

আমরা.../ জ্ঞানবৃদ্ধ কিশোর ক'জন সেই অন্ধকার গলির মুখেই
অন্ধকারে গা ডুবিয়ে বিমুঢ় পেছনে/ লণ্ঠনের পরিচিত আলো নেই। গলির এ পথ
কি ক'রে পেরিয়ে যাবো জানি না সমুখে/ অন্ধকার। ভয়। যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের
অন্ধকারে আমরা ক'টি বিভ্রান্ত নাবিক।[১৩৫]

নদীর জোয়ার-ভাটার ন্যায় জীবনের উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী সত্যদর্শন। কোনো দেশ বা জাতির ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাসও তাই। এটাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তা হলেও স্রোতের বিরুদ্ধটানে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব যেন ভেসে না যায়, সেজন্য মানসিক আর্তিও থাকে। সেখানে দেশের মর্যাদা তথা আত্মার পবিত্রতা রক্ষায় সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ:

নিজের বাগানে নিজে সতর্ক দু'হাতে/ জোয়ারের বুক থেকে নোবো কিছু লাবণ্য, এবং
যখন ভাটার টান ..../ দীপ্তি যার ফুরিয়েছে ভাসাবো, তা বলে
আজন্ম-লালিত এই পুরাতন মসজিদের/ আত্মা এই একান্ত 'মিম্বার'
জোয়ারে দেবনা ডুবতে এবং ভাটায়/ ভেসে যেতে দেবনা দেবনা।[১৩৬]

সেতু-সড়ক, দালান-ইমারত, শিল্প-কারখানা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য প্রভৃতি মানবসভ্যতার অশেষ স্বাক্ষর বহন করে। তবে প্রশ্ন থাকে এতসব বৈষয়িক উন্নতি সত্ত্বেও হৃদয় থেকে মনুষ্যত্ববোধ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে কেন? মূল্যবোধের এই অবক্ষয়রোধে কবি উন্মাদ লোকের রূপকে খাঁটি মানুষ গড়ার এক দক্ষ কারিগর অন্বেষণ করে চলেছেন:

একটা লোক। লোকে বলে উন্মাদ। সে নাকি/ দৈনিকে প্রত্যহ দেয় বিজ্ঞাপন, সভায় এবং
ঘরোয়া বৈঠকে তার একই কথা, একটিমাত্র আবেদন তার:/ আমি একটি কারিগর, দক্ষ একটি কারিগর চাই।...
...যার সেতু কিংবা সড়ক.../ অথবা মিনার কিংবা ইমারত গড়ার কৌশল
জানার সামান্য কিছু প্রয়োজন নেই, শুধু জানে/ মানুষ গড়ার কাজ।[১৩৭]

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে স্মরণাতীত মহাপ্লাবন ও ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়, তাতে কয়েক লক্ষ লোক নিহত ও তাদের ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পদ ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও শাসকমহলের উদাসীনতা এদেশের প্রতি চরম অবহেলাই প্রমাণ করেছিল। কবি তখন ব্যথিত চিত্তে ঐ সমস্ত মৃতআত্মা ও আত্মীয়স্বজনহারা স্বদেশবাসী আপনজনদের দুর্দশা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টায় নিরত হয়েছেন:

মুহূর্তে নিজেকে আমি সঁপে দিয়ে ঝড়ের থাবায়/ ছিন্নভিন্ন হয়েছি এবং বুঝতে চেয়েছি কিছু
কিছুই বুঝিনি।/ উন্মত্ত ঢেউয়ের বুকে যতক্ষণ সম্ভব সাঁতার কেটেছি
মনে মনে/ অবশেষে হাতের শিথিল কব্জি থেকে
খসে গেছে বুকের দুলাল/ তবুও বুঝিনি, আহা বুকের দুলাল যার গেছে
তার ব্যথা।.../ ভাবতে চেয়েছি আমি
ভাই গেলো বোন গোলো ভেসে,/ বৃদ্ধ পিতা রুগ্ন মা আমার
আমার একান্ত নিরাপদ জীবনের কামনাতে/ নিয়োজিত সবশেষ মুহূর্ত বিলিয়ে
ভেসে ভেসে চলে গেলো মৃত্যুর অতলে।/ তবুও পারিনি হতে/ সেই ভাই,
প্রলয়ের অন্ধকারে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া ভাই-এর বোন-এর।
পারিনি সন্তান হতে সেই বৃদ্ধ পিতা কিংবা রুগ্ন মার যার
সর্বশেষ নিঃশ্বাসেও উচ্চারিত রেখেছিলো/ আমার জীবন আর কল্যাণ কামনা।[১৩৮]

গ্রন্থের উপসংহারে কবি আধিপত্যবাদের মুখোশ খুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। সেই ফেরাউনের আমল থেকে যুগ যুগ ধরে এর দূর্গ প্রাকারে অসহায় মানুষ মাথা ঠুকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কিন্তু মুক্তি আদৌ হয়নি। শোষণের প্রাচীন স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়লেও, সেখান থেকেই আবার জন্ম নিয়েছে নতুন উৎপীড়কের দল। ওদের আগ্রাসনের চক্রবেড়ায় বন্দী মানবাত্মা আজো আর্তনাদ করে ফিরে:

যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি এই হাটে/ চেনাচেনা কয়েকটা মুখের নিত্য আনাগোনা
কি সহজে হাটদরজা পার হয়ে হাটে যায় তারা/ কি উন্মাদ বেচাকেনা
এবং অশ্লীল/ আয়োজনে মত্ত তারা/ সম্ভারে দুহাত ভরাবার।
তারই চারপাশে আহা সেই একটি অর্বাচীন প্রাচীন প্রার্থনা/ প্রাচীন দেয়ালে নিত্য মাথা ঠোকে––
বারবার খোলা দরজা ছেড়ে/ দেয়ালের অন্ধকারে চোখ রাখে দুর্বল দুহাতে
দেয়ালে আঘাত করে, বলে/ হাটের সময় যায় খুলে দাও/ দরজা খুলে দাও।[১৩৯]

অতঃপর শোক রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধে। ফলে এখন আর দুর্বল মানুষগুলো অন্ধকার প্রাচীরে নিষ্ফল করাঘাতে হাত রক্তাক্ত করে না, শান্ত-সৌম্য মূর্তিতে বসে বসে শুধু শাবল বানায়:

...এবার.../ সেই বিভ্রান্ত দুচোখ
শান্ত, অর্থময় ঘোরেনা দুচোখে মিনতির ছায়া টেনে, তার
গলায় চীৎকার নেই, একমনে বসে/ লোকটা শুধু একমনে বসে বসে শাবল বানায়।[১৪০]

কবি নির্যাতিত দেশবাসীর বিপ্লবের প্রস্তুতি দেখে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শোষণের দুর্ভেদ্য প্রাচীর অচিরেই ভেঙ্গে চৌচির হবে।

ছয়

আহসান হাবীবের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ *মেঘ বলে চৈত্রে যাব* (প্র. ১৯৭৬) পুঞ্জীভূত জলকণার অবসানকল্পে মৌসুমী বায়ুর প্রতীক্ষা; অবশেষে একদিন তার সমাপ্তি। নতুন মানচিত্রে আসে ঈপ্সিত ভূখণ্ড। অতঃপর কিছুকাল যেতে না যেতেই দেখা দেয় হতাশা–মূললক্ষ্য থেকে দূরে সরে আসে স্বদেশবাসী। তারই বাস্তব প্রতিবেদনসহ কাব্যটিতে রয়েছে নগরজীবনের জ্বালাময়ী বিভিন্ন দিক। যুগে যুগে সঞ্চিত এসব জটাজালকে ভস্মীভূত করে তৎপরিবর্তে সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে দেশবাসী ব্যর্থ হয়েছে। সে আক্ষেপ নিয়ে কবি:

একটি ছোট ঘরের কাঠামো বানাবো এবং/খোলা আকাশের
নীচ থেকে সস্নেহে আনবো তুলে/ শীতল মেঝেতে বসিয়ে সস্নেহে তার
সামনে তুলে দেবো একটি ভরাট সমৃদ্ধ শানকি/ ঝড় আর বৃষ্টির আড়ালে

আমি তার ঘুমের নিশ্চিত আয়োজনে/ রত থাকবো
আমি তা পারিনি!/ হায়, আমি তা পারিনি![১৪১]

তা সত্ত্বেও তিনি আশা ছাড়েন নি। বর্তমান ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাই হয়ত তাঁকে পরিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল:

দেখি বন্দরে নতুন সাজ/ চেনা মানুষের নতুন মুখ
সারা বুকে তুমি কি কারুকাজ/ রেখেছো, ভরেছো আমার বুক।[১৪২]

গ্রন্থটির সূচনালগ্নে যাত্রার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকলেও সেটা পেতে বেশি সময় লাগে নি। কেননা অনাবিল সুখ-সমৃদ্ধি আর নির্ভেজাল চিত্তের জন্য প্রয়োজন শত্রুমুক্ত আবাস। এ সবের প্রয়োজনে তাকে এবং স্বীয় প্রতিবেশীকে বড় রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হতে হয়:

মানুষকে কোথাও না কোথাও যেতেই হয়/ স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস তাকে
অবশ্যই গড়ে নিতে হয়/ কোনোখানে।[১৪৩]

দীর্ঘ দু-দশকের সংগ্রাম ও ন'মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা উত্তর জনচিত্তের সেই উল্লাস কবির অভিব্যক্তিতে চিত্রিত হয়েছে এভাবে:

১. স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে/ আমরা সোচ্চার হয়ে আকাশকে সচকিত করে তুলি
আর হাওয়ায় ছড়াই কিছু নতুন গোলাপ,/ দেখি জানালায় ঝুলে আছে নীলাকাশ
সামনের বাগানে/ গোলাপ। বুকের মধ্যে
তুমি/ মনোহর শব্দমালা![১৪৪]

২. এখন আমরা নেমে যেতে পারি/ যখন যেখানে খুশি, কেননা
দরজা খুললেই/ দৈত্যকুলের সেই পুলিশটা নেই দাঁড়িয়ে
বলে না হেঁকে/ কোথাও তোদের নামা হবে না।[১৪৫]

পাকিস্তানমুক্ত পূর্ববাংলাবাসী ভেবেছিল নতুন বাংলাদেশে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই নব্যশাসকেরা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। এহেন পরিস্থিতিতে কবি দেশীয় মানসিকতার আন্তর সাযুজ্য রচনা করেছেন কাঠবেড়ালীর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যে:

দিশেহারা কাঠবেড়ালী একবার মগডালে যায়/ আর একবার গাছের তলায়
ছটফট ছোটাছুটি/ ছুটে ছুটে প্রাণান্ত তবুও
আপন নিবাস/ খুঁজে খুঁজে কোথাও মেলেনা।[১৪৬]

দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে সদ্য মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্য প্রতিচ্ছবি এখানে সুস্পষ্ট। তথাকথিত জননেতাদের ঘন ঘন অধিবেশন এবং পত্র-পত্রিকায় একরাশ জনকল্যাণের ফাঁকা বিবৃতি, পরিস্থিতি সুরাহার পক্ষে মোটেও সহায়ক নয়:

পৌরসভার সভাপতি মহোদয়,/ মানি, রাস্তা থেকে জঞ্জাল সারাবার ব্যবস্থা আপনার পরিপাটি
পানি সরবরাহের ব্যবস্থায় (যখন ওয়াসা ব্যর্থ)/ আপনার ত্রুটি নেই কোনো
বসন্ত রোগের গতিবিধি আপনার চোখ এড়ায় না/ নিয়মিত শুনতে পাই আপনার হুঁশিয়ারি
ছড়িয়ে পড়ে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়/ আপনাকে ধন্যবাদ!...
কিন্তু জনাব,/ শহরের অভ্যন্তরে
জ্বি হাঁ, শহরের কোলাহলমুখর এই হৃদকেন্দ্রে/ আপনার কি চোখে পড়েছে
অশ্লীল কতিপয় শো-কেস কি তুমুল বিক্রমে/ কটুগন্ধ ছড়াচ্ছে[১৪৭]

সমাজ পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত দেশপ্রেম। বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ও শাসন রুখতে দেশবাসী বিভিন্ন সময়ে ইস্পাতদৃঢ় আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এমনকি প্রয়োজনে বুকের রক্ত দিতেও দ্বিধা করেনি:

১. ... এ পৃথিবীতে কে না জানে/ আজন্ম ফুলের শত্রু জান্তব জগৎ
পবিত্র মানব রক্তে চমকে ওঠে/ রক্তে লেখা মৃত্যুর পরোয়ানা
যখন রক্তাক্ত হয়/ভয় পায় পালায় এবং/ বাগানে আবার ফুল ফোটে।[১৪৮]

২. আর সেই প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুকে/ লুকিয়ে সন্তর্পণে ধীর পায়ে
অনন্য কিশোর তার/ সঠিক গন্তব্যে যায় হেঁটে।[১৪৯]

দৈনন্দিন জীবনের সকল সুযোগসুবিধা শহরে বিদ্যমান। খেটে খাওয়া মানুষের লাগাতার পরিশ্রমের ফসল এসব। তবে মালিক এরা নয়। সুদৃশ্য ভবনের কারুকাজ আর পিচঢালা রাস্তা নির্মাণকার্যে কেবল তাদের নিমন্ত্রণ হয়:

আসল আসল মালিকরা সব/ অন্যতর :
কেউ বা টানা-বারান্দাতে টানছে চুরুট/কেউ বাগানে শুঁকছে ফুল
আর/ আমার যখন হাঁটাতে হাঁটতে ফুলছে দু-পা
ট্যাক্সিওয়ালা ধাক্কা মেরে/ শহরটা তোর বাবার না কি
বলতে বলতে/ সামনে গিয়ে
এই শহরের আসল মালিক মহাশয়দের/ দু-একজনকে
'আসুন আসুন' বলতে বলতে/ দু-একজনকে তুলে নিয়েই ছুটতে থাকে।[১৫০]

তবে একদিন এ অচলায়তন ভেঙ্গে পড়বে। তখন :

সবাই মিলে/ নতুন নতুন শহর গড়ব
নতুন নতুন গ্রাম বানাব/ সবাই নতুন
নতুন পথ আর নতুন বাহন/ চলাফেরার এক ব্যবস্থা।
যার যার সব নিজের বাড়ী/ নিজের দরজা নিজের উঠোন
ঘরগেরস্তী সবই নিজের।[১৫১]

ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে জাতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। পুঁজি সংরক্ষণ ও বণ্টনের তারতম্যের ফলেই মূলত এ দুরবস্থার উৎপত্তি। তবে ভরসা হল জনতা জেগেছে অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে:

এবার যখন/ যথারীতি ফিরতি পথে ঘুরেছি অতল নৈরাশ্যের অন্ধকারে
যেমন আমাকে আর আপনাকেও যেতে হয় ফিরে/ যেতে যেতে দেখি
কতিপয় যুবক এগোচ্ছে সামনে/ মেলার সাহসী যাত্রী হাতে হাতে কি তীক্ষ্ণ চাবুক।[১৫২]

যন্ত্রসভ্যতার অসাধারণ ব্যাপ্তিতে প্রকৃতি ও প্রকৃতিলালিত প্রাণীজগতের জীবনসংশয় প্রকট হয়ে উঠেছে। সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিপাটি জীবনের মোহে বিত্তবানরা সদা এ অপকর্মে লিপ্ত। অরণ্যরাজি ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্যের সুরক্ষায় অনাদিকাল থেকে যে দায়িত্ব পালন করছিল, নব নব প্রযুক্তি উপস্থাপনের ফলে তা আজ হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, তুলেছে সর্বোপরি মানুষকেও:

...বিশাল নগরী তার ঘোড়দৌড় মাঠের গতি/ সমবেত জান্তব নিনাদ
বিশাল বিশাল চিমনি কালো ধোঁয়া তার/ পৃথিবীর অমল নিসর্গসজ্জা
আর তার অঙ্কশায়ী সন্তান-সন্ততি/ খেয়ে নেবে![১৫৩]

জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও মেধা লালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র শহর বটে; কিন্তু এর অন্যপৃষ্ঠে রয়েছে অবর্ণনীয় দুর্দশা, যান্ত্রিকতার উৎকট উদ্গিরণ। তাই আগন্তুক নগরবাসীর কিশোর-ভূমি গ্রামীণ সৌন্দর্যলোক স্মৃতিপটে নতুন করে হানা দেয়—ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা নয়, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রশ্নে:

আমার যেতে ইচ্ছে করে/ এক এক সময়ে খুব যেতে ইচ্ছে করে
স্কুলমাঠের সেই অন্ধকারে/ সেই আঠারো বছর বয়সের গা ছুঁয়ে

আস্তিনছেঁড়া গেরুয়ারঙ কামিজের ভেতরে ঢুকে/ আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে
আর বলতে ইচ্ছে করে :/ এই দেখো/ আমি এবার অন্য রকম কাঁদছি
আবার ঠিক সেই রকম কাঁদছি/একজন সুখী রাজার মত।[১৫৪]

নগরজীবনে কর্মব্যস্ততা এতবেশি যে, বৈচিত্র্যের সন্ধানে দুদণ্ড কাটাবার সুযোগটুকুর ফুরসৎও নেই। শুধুমাত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যেই কালাতিপাত করতে হয়:

চোখ মেলে তাকাবার তার/ ইচ্ছে বা সময় নেই
আছে শুধু অফুরন্ত ফুরোবার খেলা/নেই প্রশ্ন, বেলা কি অবেলা।[১৫৫]

দ্রুত নগরায়নের ফলে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে অসংখ্য অট্টালিকা। সেহেতু প্রয়োজন হচ্ছে নির্মাণশ্রমিক। আর মোটা অর্থ রোজগারের আশায় গাঁয়ের কৃষিজীবী যুবকেরা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে রেখে শহরে ভীড় জমায়। অথচ এ সময়টা ছিল তাদের জৈবিক আসক্তি পূরণের জন্য অবধারিত:

তোমার স্বজন আছে এই ব্যাপ্ত আদিগন্ত মাঠের মেলায়/ ঘাটের কলসীতে আছে ঝলকিত পিপাসার জল
তুমি মেতে থাকলে দূর দ্বীপান্তরে নিঃসঙ্গ খেলায়/ বেলা পড়ে যাবে। আর অবেলায় থাকেনা ফসল।[১৫৬]

শুধু আরাম-আয়েস আর ভোগ-বিলাসেই জীবনের সার্থকতা নিহিত নয়। শ্রম ও প্রতিভা বিনিয়োগের মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটনের দ্বারা এর আসল তাৎপর্য অনুভব করা যায়:

নাছোড় সুতোয়/ ঝুলতে ঝুলতে খোয়ালি জীবন। তুই
জীবনকে বেলুনের খাঁচা থেকে বাইরে এনে/ বাইরের আলোতে মুখ
দেখতেই পেলি না। তোর/ করতলে যৌবনের জীবনের নীলপদ্ম কখন শুকোবে, তুই
জানবিনা জীবনে। তুই জানবি না জীবন/ বেলুনের চেয়ে বড়
এবং বিশাল/ জীবনের বাগানে বাগানে নীলপদ্মের বৈভব।[১৫৭]

মন্দ অভ্যাস ও হিংসাদ্বেষ লাঘবের ক্ষেত্রে প্রকৃতি অমোঘ ঔষধ হিসেবে কাজ করে থাকে। তার উদারতার স্পর্শে মানুষ কুপ্রবৃত্তিগুলো ভুলে সহজ হয়ে ওঠে:

বনানীর গভীরে যেখানে/ পাখীর বসতি বাঁধা
নীচে যার কুমারী হরিণী/ ঘুমায়, সেখানে এসো
অবিচল খুনীর মতন দাঁড়াও ত দেখি/ হাত তোলো
দেখি হাত কাঁপে কি কাঁপে না।[১৫৮]

প্রতিভার বিকাশলাভ অনেকভাবে সম্ভব। অর্থ সংরক্ষণ, সাম্রাজ্য বিস্তার, উৎপাদন ও আবিষ্কারের মধ্যে থেকেও তা হতে পারে। এজন্য মনীষার যথেচ্ছা প্রয়োগে যেমন শান্তি বিঘ্নিত হয়, তেমনি যথোপযুক্ত ব্যবহারে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়:

মনীষা কি পারমাণবিক?/ নাপাম? অথবা
মনীষা কি নীলাকাশ নিসর্গ অথবা কোনো স্থিরচিত্র
অভয় এবং নিশ্চয়তা/ ভালোবাসা নামে কোনো নিশ্চিত নিলয়?[১৫৯]

আদিম বর্বরতার অবসান ঘটেছে বহু আগে। আজকের মানুষ পুরাকালের ন্যায় অসত্য রীতিনীতিতে আর অভ্যস্ত নয়। তথাপি এই সভ্যতার অন্তরালে রয়েছে জীবনবিনাসী মারণাস্ত্র। এতদ্সত্ত্বেও মানুষের লক্ষ্য শান্তি ও সমৃদ্ধি:

আমি আছি কথার বৈভবে/ মানব কল্লোলে আছি
যৌবনে-জীবনে আছি/ আছি ঋদ্ধ উৎসের উৎসবে।[১৬০]

সাত

আহসান হাবীবের কবিসত্তার মূলবৈশিষ্ট্য হল, অতীত উন্মোচনের মধ্যদিয়ে বর্তমানকে ছুঁয়ে যাওয়া এবং ভবিষ্যতের বোধ সম্পাদন। আপন গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর তাঁর সে আকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বেজে উঠেছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (প্র. ১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে। সেখানে কবির বক্তব্যও ছিল:

আমি এক বিচলিত মানব-সন্তান একালের/ আমাকে হাঁটতে হবে
দুটি পা রক্তাক্ত হবে/ এ শরীর জ্বলতে থাকবে
চলতে চলতে তবু আমাকে/ একদা নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে বলে
হাঁটতে হাঁটতে এগোতেই হবে।[১৬১]

দু'হাতে দুই আদিম পাথর (প্র.১৯৮০) কাব্যে এসে কবি তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরকে অর্জন করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছেন। এতে সংকলিত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯।[১৬২] কাব্যটির নামকরণে তিনি শুধু মানবসভ্যতার আদিম পর্বকে স্মরণই করেন নি, স্মরণীয়ও করে তুলেছেন সকলের জন্য। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ পাথরে পাথরে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে প্রথম আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়। তারপর সে পাথর দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে বন্যপ্রাণী শিকার করে, এবং তা আগুনে ঝলসিয়ে একত্রে বসে সমানভাবে ভাগ করে খায়। কবি সেই সহস্র সহস্র বছর পূর্বেকার সভ্যতা ও মানবিকতার সঙ্গে– সে যুগের মানুষের রক্তের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হচ্ছে:

আমি প্রস্তর অরণ্য আর ধাবমান হরিণের কাল
পার হয়ে অবিশ্রাম তোমাতে ধাবিত।[১৬৩]

বস্তুত, অতীতের শ্বাপদসংকুল অরণ্য বিজয়ের মতো স্বপ্ন আর সংগ্রাম নিয়ে আজকের মানুষও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর হয়ে উঠুক–সে কথাই কবি *দু' হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করেছেন । অবশ্য কাব্যটির নামকরণের আসল তাৎপর্য আরো ব্যাপক। এ দেশের সমকালীন কাব্যধারায় বিদেশী আবহ নির্মাণের এক কৃত্রিম প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আহসান হাবীব সে যুগস্রোতে গা না ভাসিয়ে সচেতনভাবেই আপন ঐতিহ্যে দৃঢ়মূল থেকেছেন বিশেষত এ কাব্যে। সেজন্য তাঁর অন্তরে কোনো হীনমনস্কতাও প্রকাশ পায় নি। বরং এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে–দেশের মাটি ও এর আদি-অকৃত্রিম মানুষের প্রতি একাত্মতা ঘোষণার সার্থকতায় তিনি চরম আনন্দ এবং গৌরব বোধ করেন। তাতে তাঁর আত্মতৃপ্তি,'মূল বসতি থেকে নির্বাসিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা আর নেই আমার।'[১৬৪] কেবল বিষয়বস্তুতে নয়–গঠনপদ্ধতিতেও এ কাব্যের প্রথম কবিতাতে দেখা যায়, বাংলার চিরলালিত্য স্বরবৃত্ত ছন্দের ঐতিহ্যকে অনুসরণ ও অন্ত্যমিলের সংযোগ কাব্যটির নামকরণের সার্থকতকা ইঙ্গিত করে। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় দেশের জনপদ-জনমানুষ, তাদের বৈষম্য-বঞ্চনা, নৈরাশ্য-নৈরাশ্য থেকে উত্তরণের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, আত্মপীড়ন-আত্মহননের আজীবন বিরোধিতা, এমনকি কালের গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে অমরত্বের বাসনা এখানেও উপস্থিত। কিন্তু*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*-এর কবিতাগুলো উচ্চারণে-প্রকরণে-উপমা-প্রতীকের ব্যবহার যেমন মার্জিত-সন্নিবিষ্ট, তেমনি অধিকতর কাল ও জীবনঘনিষ্ঠ এবং কাব্যময়। কাব্যটির বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ হলে এ সত্য সহজেই অনুমিত হয়।

ইংরেজিতে একটা কথা চালু আছেঃ 'Art is long, life is short.' শিল্প কালপ্রবাহে প্রবাহিত, কিন্তু শিল্পীর জীবন সীমাবদ্ধ। একটা নির্দিষ্ট সময় পেরলেই জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। তথাপি প্রোজ্জ্বল আত্মার কৃতকর্মে জগৎবাসী কৃতজ্ঞ। কেননা তাঁদেরই কষ্টার্জিত সুফল পরবর্তী প্রজন্মের নিকট আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়:

আজন্ম তোমার সঙ্গী, স্বপ্নে আছি সংগ্রামেও আছি/ আমি সঙ্গে থাকি তাই সঙ্গীত-সভায় বাজে করতালি
সঙ্গে থাকি সামনে থাকি তাই রুদ্ধ উৎসব-তোরণ/ কেঁপে কেঁপে ওঠে।[১৬৫]

যৌবন ও বার্ধক্য–এই শ্রেণীকরণ দৈহিক গঠনের উপর প্রযুক্ত হলেও মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সুত্রটি প্রযোজ্য–তা সঠিক নয়। দেহের জীর্ণতা দীর্ণচিত্তের কারক হতে পারে সত্য, কিন্তু উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে সাবলীল রাখা সম্ভব:

সময় ফুরিয়ে গেছে বলে/ যখন চীৎকার করো, দুঃসাহসে আমি যাই চ'লে

সময়ের জন্মকালে, বিনষ্টির কাছাকাছি যাই/ নষ্ট হয়ে যাওয়ার শঙ্কার সেই তীব্রতাকে ধরে রাখতে চাই।[১৬৬]

'সারস' যেন মহাকালের প্রতীক। নিত্য পরিবর্তনের লীলাবৈচিত্র্যের মাধুর্য উপভোগের তার ফুরসত কই? কেননা সময়ের চেয়ে ধ্যানব্রতকে সে প্রাধান্য দিয়ে থাকে:

বহমানতার কোনো চিহ্ন তোর শরীরে তোলে না/ কোনো কম্পন অথবা শব্দ, তুই
ভালোবাসা স্বপ্ন সুখ/ সুখের সমস্ত ভাবনা
পেছনে রাখিস, সারা/ শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা।[১৬৭]

সমাজ-সংসারে বাস করে মানুষকে বহুবিধ ঝামেলা মোকাবিলা করতে হয়। এসব কাজে মানসিক বিড়ম্বনার অন্ত নেই। অরণ্যবাসী পশুদের চিন্তামুক্ত জীবনের কথা ভেবে পূর্বে অনেকে গুহাবাসী হত। কিন্তু আজকের দিনে কেউ আর তেমনটা করছে না। বরঞ্চ সমাজ-বাস্তবতাকে সকলেই সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছে:

ফুলের আতর ধুলোয় মেশে রোদ জ্বলে আর বৃষ্টি ঝরে/ বাইরে আলো ফুলের রেণু আমার বৃষ্টি আমার ঘরে।
কেউ বলে অরণ্যচারী পশুর চোখেই শুদ্ধ আলো।/ আমার কিন্তু ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যাওয়াই লাগছে ভালো।[১৬৮]

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জেলে, ডিঙ্গি নায়ের মাঝি অত্যন্ত বহুল পরিচিত শব্দ। দেশের কিছুলোক সদা এ পেশায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-তুফানের সাথে নিয়ত সংগ্রাম করে তারা রুজিরোজগার মিটিয়ে থাকে। অথৈ পানিতে জাল ফেলে স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে খালেক নিকিরিরা। চলন্ত মানিকের পরিমাণ কতটুকু হবে, শুধু সেই ভাবনায়:

খালেক নিকিরির স্বপ্ন তবু পাশ ফিরে শোয় না একবারও
পোহাতী তারার দিকে চোখ রাখে দু'একবার
অলস হাই তোলে আর সমস্ত চেতনা প্রখর হয়ে থাকে
হাতের মুঠোয়।/ হাতের মুঠোতে একটি মৃদু টঙ্কার, স্বপ্নময়
খালেক নিকিরির চেতনা জুড়ে/ সেই একই স্বপ্নস্রোতে অনবরত অবিরল।[১৬৯]

সংকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মধ্যাহ্নের প্রবল উত্তাপে দেহের ছায়া মিলিয়ে গেছে। অথচ মন চায় একটু শান্তি, স্বস্তি আর সাশ্রয়। তবে সবচেয়ে বেদনাঘন বিষয় হল, জীবিত হৃদয়ে সেগুলোকে ভোগ করা:

দুটি কদাকার জন্তুর মতো ক্ষুধার্থ চোখ/ আমরা আমাদের চারপাশে
ভালোবাসার ভস্মস্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।/ প্রথম ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে জেনেও
আমরা আর উদ্বিগ্ন হলাম না/ আমরা শেষ ট্রেনের অপেক্ষায় থাকবো এমনও মনে হলো না।[১৭০]

নগর পুড়লে যেমন উপাসনালয় রক্ষা পায় না, তেমনি প্রবৃত্তির বিষবাষ্প সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে, তা থেকে নিরপেক্ষ মানুষেরও পরিত্রাণ ঘটে না:

তুমি যতই সাবধানে দাও হামাগুড়ি, তুমি/ যতই সন্তর্পণে পা রাখো মসৃণ পথে
কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের তীক্ষ্ণ কামড় দু'পাশে, তুমি/ এড়াবে কি করে?[১৭১]

সভ্যতার বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রভূমি নগর। সে কারণে জীবনের সকল সুবিধে সেখানে। এই সুযোগের অভীপ্সায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অহরহ লোক শহরমুখী হচ্ছে। তন্মধ্যে যারা নাগরিক আবাসিকতা লাভে সক্ষম হয়, তারাও চিরউপেক্ষিত গ্রামীণসমাজ এবং পূর্বলালিত লোকসংস্কৃতির উত্তরণের কথা ভুলে যায়:

১. স্মৃতিহননের এক উন্মত্ত খেলায় তুমি তোমার বিবরে।
আমি এই খা-খা মাঠ শুকনো নদী ধূসর বনানী
মৃত নীল পাখি নিয়ে একলা পড়ে আছি। তুমি
জলস্রোতে শস্যবীজ সবুজতা এইসব নিয়ে/ ফিরে আসবে বলে গিয়েছিল।[১৭২]

২. অস্তিত্বের চারপাশে চেনা/ রাখাল বটের ছায়া জয়নালের অলৌকিক বাঁশী
কি সূক্ষ্ম কৌশলে তুমি সুদূর বিদেশ করে তোলো।[১৭৩]

কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকল স্থানেই কর্মচারীরা কর্মে ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত। এজন্য সবসময় তারা বড় সাহেবের চলাফেরা নখদর্পণে রাখতে সচেষ্ট হন। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সদা সজাগ থাকলে অবস্থার নিরসন সম্ভবপর:

এসো খানিকক্ষণ বিশ্রাম করি/ এই কথা বলতে বলতে
আমরা সবাই উঠে পড়েই/ কেউ কহারো দিকে না তাকিয়ে
খুব দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলাম/ রাজা তাঁর স্বপ্নের মধ্যে হেঁকে উঠলেন : এই![১৭৪]

তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু পানি, বাঁচার প্রশ্নে সামান্য স্বস্তি, পৃথিবীতে কে না চায়? কিন্তু তা আর হবার নয়। চারপাশে ধূ-ধূ মরুভূমি, মিথ্যা ও হিংসার অন্ধকারে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জুড়ে শূন্যতা। অতএব মুক্তির প্রচেষ্টা দুরাশামাত্র:

চারপাশে মানুষ তুমি মানুষের সঙ্গ ছেড়ে
কোথায় পালাবে?[১৭৫]

শৈশব ও কৈশোরের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যারা উচ্চশিক্ষার্থে গ্রাম ছাড়ে, কিছুকাল পরেই তাদের সেই মনোবাঞ্ছা গুড়িয়ে যায়। এবং জন্মস্থান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের কোনো এক মুহূর্তে যখন কেউ গাঁয়ে ফেরার তাগিদ বোধ করে, তখন পরিচিত প্রতিবেশের সমাপ্তি ঘটে। এই যে, ট্রাজেডি, এও কি মিলিয়ে দেওয়া যায়? তবে এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হল পূর্বসঙ্কল্প মোতাবেক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। কেননা কেবলমাত্র এ পথেই সকল যন্ত্রণার নিষ্পত্তি ঘটানো সম্ভব:

মদিনা বিবির কুলগাছের নীচে দাঁড়ালে/ তোমার কিছু পুরনো স্বপ্নের কথা মনে পড়বে।
কাদমের মার শুকনো কুপিতে/ আলো জ্বালাবার স্বপ্ন ছিলো তোমার
সেই স্বপ্ন ফিরে পেলেই নিঃসঙ্গতার জ্বালা তোমার দুচোখ থেকে ঝরে যাবে।[১৭৬]

দেশপ্রেম অন্তর্হিত। দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে পুরো পরিবেশ। মাতৃভূমির প্রতি যাদের এরূপ আচরণ, তারা দেশমাতার শত্রু। ধরিত্রী এদের পরিচয় রাখে না:

আমি তার সামনে এসে নত মুখে মা বলে ডেকেছি, তবু/ তার চোখে এমন সন্দেহ কেন! তবে কি এখনো
শৈশবের পবিত্রতা নম্রতা এবং সেই বিশ্বস্ততা/ মাকে আমি পারিনি ফিরিয়ে দিতে? তবে কি এখনো
এই আসা এই গতায়াত/ অহংকার আর কিছু প্রতারণা সঙ্গে নিয় আসে?[১৭৭]

যুগযুগ ধরে কৃষক-মজুর, কামার-কুমোর, জেলে-তাঁতির নিরন্তর সাধনায় জ্বলে উঠল আলো, অথচ তারা প্রতিদানে পেল শুধু বঞ্চনা। তাদের এই প্রাপ্যহীন ক্ষোভ হয়ত একদিন সংগ্রামে রূপায়িত হবে এবং মানবতার শত্রুদের সংহার করবে:

এই পুরাতন মঞ্চ অতীতে নিক্ষিপ্ত হবে আর একবার/ আবার নতুন মঞ্চে জ্বালাবো নতুন দীপাবলী, চারপাশে
আমি থাকবো আমার গা ছুঁয়ে থাকবে আমার স্বজন, আর/ সারিবদ্ধ আমরা সবাই থাকবো উৎসব-সূচীতে। আমি
'তোরণ উন্মুক্ত রাখো' এ নির্দেশ টাঙাবো তোরণে।[১৭৮]

জীবন কুসুমশয্যা নয়। শত শত অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাকে বেড়ি মোচন করতে হয়। এজন্য ঝঞ্ঝাপূর্ণ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজনে পূর্বপ্রস্তুতি একটি প্রধান শর্ত:

অনেকেই বলে, যাবো/ সারা পথে
জানে না অনেক/ সন্ত্রাস পেরতে হবে,
এবং যেহেতু/ মখমলে থাকে না আকাঁ মানচিত্র।[১৭৯]

নামসর্বস্ব নববর্ষ এবং গতানুগতিক সংবর্ধনায় নতুনের কোনো গন্ধ নেই। অথচ দিনটি সর্বসাধারণের মাঙ্গলিক সঙ্কল্পে অভিষিক্ত হতে পারত। সেই ন্যায্য দাবির প্রতিষ্ঠায় এ সোচ্চারকণ্ঠ:

গালিচা গুটিয়ে রাখো/ বসো এই মাদুরে আমার সঙ্গে

যা আছে সামান্য তাই তুলে আনো/ তোরঙ্গ উজাড় করে দাও।
যতই সামান্য হোক সকলেই প্রাপ্য পেতে চায়।[১৮০]

বর্তমান সংকট এবং অরাজক পরিবেশের ছোবল হতে রক্ষা পেতে প্রয়োজন চিরাচরিত মূল্যবোধের লালন ও বিকাশসাধন। তজ্জন্যে দরকার চিত্তের সীমাহীন দৃঢ়তা। কেননা সমসাময়িক অশুভ প্রবৃত্তির মূলোৎপাটনের জন্য ঐরূপ মনোবল অতীব আবশ্যক:

.....আমি/ অমরতা অমরতা বলে
হন্তারক সাপের কবলে যাই,/ তারো আগে বিশাল বনানী
কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে ধূসর প্রান্তরে/ একটা ঘোড়া জোয়ান অথচ তার এক পা নেই, তবু
প্রবল বিক্রমে যায় ছুটে যায়/ যেতে যেতে বলে
ফিরে যাও, ফেরার পথেই/ ভালোবাসা অপেক্ষায় আছে।[১৮১]

দেশে প্রতিবছর মহাসমারোহে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। দিনটিতে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের থাকে বিস্তারিত কর্মসূচী। কিন্তু তারপর সবাই বিস্মৃত হয় অমর একুশের শিক্ষা:

উৎসব শেষে তুমি চলে গেলে/ দুই পারে দুই ফাল্গুন,
মাঝখানে তার ধু-ধু প্রান্তর/ ছাই হয়ে ওড়ে এ আগুন।[১৮২]

প্লাবন জমির উৎপাদিকা শক্তিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। আর তারুণ্যের উন্মাদনা সমাজ-সংস্কৃতিতে আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে মাটি যেমন তার উর্বরা ভূমি ফিরে পায়, তেমনি রাষ্ট্রজীবনেও আসে আশাতীত শৃঙ্খলা:

দুর্বহতা দুর্ভার জীবন আমি একা বয়ে যখনই দাঁড়াই/ তোমাদের সামনে, দেখি
নির্ভার বাতাস বয়, ছড়ায় সাহস, আর/ তোমরাই রেখেছো মেলে ভালবাসা/ আদিম শুদ্ধতা।[১৮৩]

সামাজিক অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার কঠিনব্রতে একীভূত যত নতুনের অভিযাত্রীরা। বিপ্লবকে পূর্ণতা দিতে এবং সময়োচিত প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে তাদের এই দুর্বার প্রচেষ্টা:

স্পর্ধিত বালক/ তার নগ্ন হাত একটি লাল গোলাপ। তার
বুকের ভেতরে/ হিমেল বাতাস বয়/ পেশীতে প্রবল
যন্ত্রণার টান ওঠে। গোলাপ গোলাপ/ চীৎকারে দক্ষিণ কাঁপে! উত্তরে বাতাস
ওড়ায় সমস্ত ধুলো/ বদ্ধ করতলে/ জ্বলে ওঠে রক্তিম আগুন।[১৮৪]

শুভ সূর্যোদয়ের আশায় দিন গুনছে যে সব ভুখা-নাঙ্গা মানুষেরা, কবি তাদের স্বজন, তাদেরই একজন:

অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী/ তার ক্লান্ত চোখের আধাঁর
আমি চিনি আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি/ জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি/ সে আমাকে চেনে।[১৮৫]

আট

আহসান হাবীবের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (প্র.১৯৮৫)। এ পর্বে কবি বয়সের অস্তোন্মুখ সীমান্তে পৌঁছে মনের ভগ্নদর্পণে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, এবং সমাজের যন্ত্রণা-আর্তনাদ-হাহাকার অনির্বাণ হলেও, এরই মধ্যে জীবনকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। তবে জীবনশিল্পীরূপে তাঁর ছিল একটু বিশেষ ধরনের বক্তব্য- 'আমি সামান্য সুখকে অনেক বড় করে এবং বড় দুঃখকে লক্ষ লক্ষ দুঃখী মানুষের তুলনায় ক্ষুদ্র করে দেখার চেষ্টা করেছি। সেদিক থেকে নিজেকে আমি এ জীবনে সুখীই বলতে পারি।'[১৮৬] নিষ্ফলায় আবাসন, তথাপি জীবনের প্রতি অনুরক্ত থাকাই ছিল তাঁর আজন্ম সাধনা। এই মর্তপ্রীতিই কাব্যটির মূল প্রতিপাদ্য। কদর্যতা আছে, আশাভঙ্গ নেই। শেষ অবধি প্রেমের অমোঘ অস্ত্রধারণ করে সামাজিক বৈষম্যকে শোধরাতে চেয়েছেন তিনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যুগ অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে, তথাপি দেশের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হয় নি। যারা একসময় বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, তারাই এখন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে শোষকের ভূমিকায় অবনমিত। ফলে দেশবাসীর সুখস্বপ্ন আবার শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্যের বুকে নিমজ্জিত হয়। তারই রূপকাশ্রয়ী অভিব্যক্তি:

একটি ছোট নীল রেলগাড়ি/ ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে ক্লান্ত হতে হতে
যেখানেই থামতে চায়, আলো নিভে যায়।/ চারদিকেই হায় হায় রব স্টেশনের কর্তা বলে নেই
স্বপ্নটপ্ন নামাবার যোগ্য কোন মুটে নেই আমার এখানে/ নেই স্বপ্ন রাখবার মতো যোগ্য কক্ষ একটিও।
হায় নীল রেলগাড়ি একটি ছোট নীল রেলগাড়ি/ স্বপনের বোঝায় ভারি কেবল ছুটতেই থাকে, আর
সামনে কোনো সহৃদয় স্টেশন দেখে না/ শুধু অনন্ত রেলপথ।[১৮৭]

জনগণের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতাত্তোর দেশগড়ার কাজেও তারা মনেপ্রাণে উদ্বুদ্ধ। কেবল রাজনৈতিক বিদ্বেষ আর ভেদবুদ্ধির প্রভাবে ব্যাহত হয়েছে দেশের অগ্রগতি:

.... যেতে যেতে আমরা যখন/ মাঝপথে পৌঁছেছি
পাহারাদার বললে, এদিকে নয় ও দিকে/ আমরা তার দেখানো পথে
পা রাখলাম/ আমরা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম
এবং ক্লান্ত পায়ে আরো কিছুক্ষণ হেঁটে/ আমরা আরেক পাহারাদারের দেখা পেলাম।
তার পায়ে কালো বুট/ পরনে লাল শেলোয়ার
আলোমাথায় সেই পাহারাদার জানতে চাইলে,/ সামনে না পেছনে?
আমরা বললাম, সামনে/ তা হলে পেছন দিকে চলে যান—/ পাহারাদার বললে।[১৮৮]

এখানে শুধু নেতৃত্বের হাত বদল হয়েছে বারবার, কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে কেউ উৎসাহী হয় নি। বরং দলীয় স্বার্থ ও হীনমনস্কতার কবলে সমাজের দুরবস্থা ক্রমেই চরমে পৌঁছেছে। দুর্দৈবের জন্য অন্যকে আর দোষারোপও করা যায় না। আজকের শোষকেরা দেশবাসীরই একান্ত স্বজন। তাই নিজের প্রতি ঘৃণাই একমাত্র সম্বল:

যেতে যেতে কর্দমাক্ত পথে/ আমার দু'পা আটকে গেলো
আমার দু'পাশে নোংরা দুর্গন্ধ জলস্রোত/ তিনটি ঘেয়ো কুকুর তাড়া করে এলো
আমি বাঁচাও বাঁচাও বলে আমার/ দু'হাত ওপরে তুলে
চিৎকার করে উঠলাম।/ এখন আমি কি করি
আমি আমার ভালোবাসা ফিরে পেতে চাই...।
বন্ধুরা বললো, নিজেকে ঘৃণা করতে শেখো।[১৮৯]

দেশের রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক কপটতা উন্মোচিত হয়েছে 'না বাউল, সংসারীও নয়' কবিতায়। এরা আর্দশ নেতার ভান করে মুখে মুখে মানবতার বাণী উচ্চারণ করে খুঁটিহীন-চালহীন মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার আশু সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিন্তু কার্যোদ্ধার হলে এদেরকে আর পাশে পাওয়া যায় না। নিজেরা তখন আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ এদের মধ্যে না আছে মানবপ্রীতি, না রয়েছে ঈশ্বরভক্তি। শিল্পসূচিতায় এদের উপর কবির ব্যঙ্গোক্তি:

প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন কিংবা/ নৈশভোজে দেখিনা কখনো
অথচ ক্ষুধার কথা বলে/ তৃষ্ণার কথাও।
পথে হাঁটে সংসারের দিকে থাকে চোখ.../ ভালোবাসা আছে তবু
ভালোবাসতে দেখিনা কখনো।.../ পথের বাউল নয় সংসারীও নয়
ঈশ্বরের নয় তারা মানুষেরও নয়।[১৯০]

ক্ষমতাবানের অর্থলোলুপতা ও দুর্জনের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি আর দুরাচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিকার বিধানের ক্ষীণ দরজাটুকুও সেখানে রুদ্ধ:

মানব সন্তান/ যতই দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানায়, প্রভু
ছায়া দাও, হাওয়া দাও, প্রভু/ সে কেবল মুমূর্ষু বাঘের মতো গর্জে ওঠে
ঝড় তোলে/ ছড়ায় বিষাক্ত ধোঁয়া/ আর তোলে ধুলোর আধাঁর।[১৯১]

সমাজে শোষণের চিত্র আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে 'চিত্রমালা', 'একদিন বিকেলে এসো' কবিতা দুটোতে। ধনপতিরা সমাজের রক্ত চুষে অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করেছে নিজের হাতে। অথচ মার্জিত আচরণে তাদের স্বরূপ চেনা দায়। এ দৃশ্য সাধারণ চোখে আলোকন না হলেও, কবির দৃষ্টিতে ফাঁকি পড়েনি:

কোথাও পড়েনা চোখে ব্লাডব্যাংক, অথচ প্রত্যহ/ রক্ত নাও, রক্ত নাও, দেখো সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়ায়
মানুষের রক্ত তবু অদৃশ্য সিরিঞ্জ বেয়ে যায়/ চলে যায়, কোথায় উধাও হয়ে যায়! আর
রক্তশূন্য মানুষ কেমন দেখো বীরদর্পে ফিরে যায় ঘরে।[১৯২]

এটাই স্বাভাবিক। কেননা আবর্জনা ঢাকার ন্যায় অভিজাত্যের উজ্জ্বল বেডকভারে হিংস্রতাকে যেভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে, তাকে উল্টিয়ে দেখা যায় না। কবি নিঃসংকোচে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা দেখিয়ে দিয়েছেন:

... ঢেকে রাখার কৌশল/ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত আছে। পৃথিবীর রক্তাক্ত শয়ান
এরকম বেডকভারে এইভাবে ঢাকা থাকে।[১৯৩]

কেবল নগরকেন্দ্রিক জীবনজটিলতা নয়, গ্রামীন মানুষের দুঃখ-বেদনাও এখানে প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত দরদ মিশিয়ে:

ভাঙা সাঁকো পার হলে বাঁশঝাড়/ বাঁশঝাড়ের নীচে
একটি ছোট খড়ের কুটির আছে/ ভাঙাবেড়া পাটখড়ির।
প্রচণ্ড মাঘ মাস/ অনায়াসে আছড়ে পড়ে মাটির মেঝেতে
আর সেই উদোম মেঝেতে/ উদোম কিশোরী এক।[১৯৪]

কৃষক-শ্রমিকের কঠোর শ্রমেই মাঠে ফসল ফলে, নগর পত্তন হয়, অট্টালিকা গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও এরাই আবার জীবনের ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত। এদের মর্মন্তুদ জীবনকাহিনী কবির হাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, ওদেরই কণ্ঠস্বরে:

জঙ্গল কাটিলাম বানাইলাম বসতি/ চৌদিকেতে চন্দনের সারি
মহল বানাইলাম রঙ্গিলা রঙ্গিলা/ পালঙ্কে শুইলো তোমার নারী।...
বুনিলাম তুলিলাম তোমার উঠোনে/ তোমার মরাইয়ে পড়িল তালা
ভাত নাই ভাতুড়ি নাই সোনার অঙ্গ হইলো ছাই/ আমার নারীর হাড়-মাংস কালা।[১৯৫]

যাদের একাগ্র শ্রম-সাধনায় অভিজাত ভদ্র সমাজের জীবনধারণ আরামপ্রদ ও চমৎকৃত হয়েছে, তাদের কথা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বিস্মৃত হতে পারেন নি তিনি। এদের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেছেন:

এই শুভ্র মাঠ এই মাটির সোঁদাল গন্ধ/ এই বন্ধি পথরেখা কার,
কে দেয় পাহারা আর/ কে বৈশাখে মাঠের পানিতে নিত্য
ভোর থেকে মধ্যদিন চালায় লাঙ্গল?.../ চকচকে মসৃণ জাল একহাতে
অন্য হাতে বৈঠা কার/ ভাসমান অথৈ নদীতে?
এ ঝাঁক রূপালি শস্যের খোঁজে কার/ দিন যায় রাত যায়?...
এদের হাতের/ মাটি মাখা মুঠোয় রাখালে হাত
রক্তস্রোত তীব্র হয় কেন? কেননা আমার/ আমাদের একান্ত স্বজন এরা আমাদের ভাই
আমাদের উৎসলোক আলোকিত করে/ এরা আছে/ এরাই ধারণ করে আমাদের জীবন-যাপন।[১৯৬]

আহসান হাবীব দেখেছেন দরিদ্র মাতার যে সন্তান অনাহারে-অবস্ত্রে প্রতিপালিত হয়েও বাল্যসুলভ মনে প্রকৃতির অভিরূপ্যে মুগ্ধ—সে-ই আবার বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে যখন বুঝতে পারে ক্ষুধিত মায়ের কঙ্কাল, তখন আর উদাসীন থাকতে পারেনা। তার উন্মীলিত চক্ষু বিস্ফোরিত হয় এবং বলিষ্ঠ হাতে প্রতিহত করে এর গতি:

এখন প্রত্যহ দেখি গ্রাম প্রান্তে সে এসে দাঁড়ায়/ যেন সিংহ দরোজায় অটল প্রহরী, যেন
অবিচল একাগ্রতা সারাদেহে ইস্পাত কঠিন।/ দু'বাহু বিস্তৃত তার দুই চোখ বিশাল এবং
সে কিছু পোড়াতে চায় চোখের আগুনে। যেন/ জনপদে ধাবমান কোন বৈরী বাতাসের স্রোত
প্রবল বিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছে।[১৯৭]

নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ বরাবর অবিচল সংগ্রাম করেছে– অকৃপণ চিত্তে ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত। প্রয়োজনে আবারও তারা বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ে সারিবদ্ধ:

পৃথিবীর কোথাও কোথাও/ আর্তস্বর উঠে আসে।
ক্রুদ্ধযুবা বিভ্রান্ত যুবতী/ পিতৃগৃহ ছেড়ে যায়
চলে যায় অন্য কোনো বৃক্ষর সন্ধানে/ তাদের দু'পাশে ধ্বংস
পলায়ন এবং ক্রমশ/ সারিবদ্ধ হয়ে যায় মুষ্কের 'চিৎকার'।[১৯৮]

ধ্বংসের পরেই নতুন সৃষ্টি। সেই জীবনের প্রত্যাশায় কবির দৃষ্টি উন্মুখ:

নন্দিত আদিম সকালের অপেক্ষায় আছি.../ আরো একটি আদিম সকাল,
নতুন বর্ণাঢ্য আর ফলবান/ সমৃদ্ধ সকাল, যার
দু'চোখে আমার শুষ্ক মাঠে মাঠে নবতর ফসলের আলো।[১৯৯]

সভ্যতার মূল প্রতিশ্রুতি হচ্ছে অবিমিশ্র মানবতা। রক্তপাতহীন এ অস্ত্র দ্বারাই জগৎ থেকে অশান্তির মূলোৎপাটন সম্ভব। কিন্তু আধিপত্যের আগ্রাসনে মানবতা ভুলুণ্ঠিত। ফলে অহরহ যুদ্ধবিগ্রহে ট্রয়নগরীর মতো বারবার বিধ্বস্ত হচ্ছে অগণিত জনপদ, শহর, বন্দর, খেত খামার ও মানুষের প্রাণ। এই নাশকতা থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীকে আবার সজীব করে তুলতে হলে, মানবতার প্রতিষ্ঠাই একমাত্র পথ। কবির প্রার্থনাও তাই:

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী/ যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যাভিমানকে করে বার বার পরাজিত।/ যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না/ করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র––ভালোবাসা/ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।[২০০]

মানুষ ব্যতীত নদী, বায়ু, পাখি প্রভৃতি গতিশীল সৃষ্টির কারোই কোনো নির্দিষ্ট আবাসস্থল নেই। ঝড়ে-বৃষ্টিতে কে যে কোথায় পড়ে থাকে তার ইয়ত্তা কেউ রাখে না। কিন্তু মানুষের জন্য একটা নিঃসংশয় নিবাস আছে। যেখানে অনেকটা নিরুপদ্রব এবং পারিবারিক সাহচর্যে বহির্জগতের যাতনা-ক্লেশ ভুলে যেতে সক্ষম। তবে এ নির্বিঘ্ন আশ্রয় থেকে তারও একসময় অপসারণ ঘটে। নিজেকে হারিয়ে ফেলার সে বেদনা কবিমানসে সংক্রামিত:

শেলফে সাজানো মননের মালা সঙ্গে স্বজন/ সুখে বসবাস
হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন/ কোথায় নিবাস?[২০১]

অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও কবি স্বীয় জীবনকে, চিরপরিচিত পৃথিবীকে খুব বেশি ভালবেসেছিলেন। সেই ভালবাসার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছ তাঁর 'যাবো না' কবিতায়। গত্যন্তর নেই জেনেও এখানে তিনি জানিয়ে গেছেন, পৃথিবী থেকে বিদায় না নেওয়ার তীব্র বাসনা :

সূর্যাস্ত/ রাখাল যুবক নেহালউদ্দীন/ পাখির পায়ের দাগ
নদীর জলে পাখিদের ছায়া/ পার্কের এক কোণে প্রেমিক যুবক-যুবতী
হাটে-হাটে মানুষের মেলা/ ঘরে ঘরে আপ্যায়ন––/ এই দৃশ্যাবলী আমার সঙ্গী হবে না।
তবে কেন যাবো––/কেন যাবো স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে
অন্ধকারে?/ প্রস্তুতি বড় কষ্টের/ আমার কোনো প্রস্তুতি নেই।[২০২]

নয়

আহসান হাবীবের কবিতায় সর্বত্র রয়েছে সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়। সে প্রত্যয়ে এর একদিকে যেমন সর্বহারা মানুষের প্রতি প্রাণঢালা মমত্ব বিকশিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অত্যাচারী-অধিকার হননকারীর বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন ঘৃণা, তীব্র ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। স্বীয় সৃষ্টিপ্রবাহ সম্পর্কে সর্বশেষ গ্রন্থে নিজেই মন্তব্য রেখেছেন:

> বণ্টনবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য, পরাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম/
> এবং মহাযুদ্ধের দায় এই সবই সমগ্র রাত্রিশেষের উপজীব্য।...
> তারপর ক্রমান্বয়ে ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি
> মেঘ বলেচৈত্রে যাবো, দু'হাতে দুই আদিম পাথর এবং প্রেমের
> কবিতা। শ্রেণীবৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবণের কৃত্রিমতা
> এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রনা এই সবই আজো
> পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু। এক শ্রেণীর মানুষের কৃত্রিম
> জীবন তৃষ্ণা তাদের নীচ জীবনাচরণের প্রতি ব্যঙ্গবাণ––এই সব।[২০৩]

তবে প্রতিরোধ সত্ত্বেও পরিশুদ্ধ রুচিবোধের কারণে তাঁর কবিতার কোথাও উচ্চ সংরাব নেই—অনুচ্চ কণ্ঠেই অভীষ্টে আঘাত হেনেছেন। কবিতার আঙ্গিক গঠনে কবি ছিলেন সতর্ক।[২০৪] অনাবশ্যক শব্দ, অলংকার বা উপমার ব্যবহার তিনি পরিহার করতে সচেষ্ট ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই কবিতায় একটিমাত্র প্রতীকের আশ্রয়ে বক্তব্যকে ঋদ্ধ করে তুলেছেন। প্রতীকায়িত কবিতা তাঁর সিদ্ধহস্তে সার্থক উপমা এবং উজ্জ্বল বাক্প্রতীমা নির্মাণেও সহায়ক হয়েছে। ছন্দ প্রয়োগে তিনি ছিলেন দক্ষ। সকল প্রকার ছন্দই নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া গদ্যরীতিতে তাঁর কুশলী বাক্বিন্যাস অপূর্ব স্পন্দন জাগাতে সক্ষম। চল্লিশ থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত সুবিস্তৃত কাব্যপরিক্রমায় তিনি বদ্ধ জলাশয়ে কখনো আবদ্ধ থাকেন নি, ক্রমপরিণতির পথে শব্দ-ছন্দ-উপমা-রূপক-চিত্রকল্প প্রভৃতির পরিবর্তিত পরিচ্ছন্ন প্রয়োগে নিজেকে সজীব রেখেছেন।

তথ্যনির্দেশ

---

১. সৈয়দ আলী আহসান, 'আহসান হাবীব', *সতত স্বাগত*, (ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃ. ১৬১-৬২।

২. এম.এ. করিম, 'স্কুল জীবনে আহসান হাবীব', *বিচিত্রা*, (৯ আগস্ট, ১৯৮৫), পৃ. ৩৩।

৩. রোকনুজ্জামান খান, 'আমার প্রিয় কবি হাবীব ভাই', রোকনুজ্জামান খান সম্পাদিত, *আহসান হাবীব স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা : আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ১৯৮৭), পৃ. ৭০।

৪. করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৫. খান মুহম্মদ সালেক, 'বন্ধু আহসান হাবীব', খান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

৬. আতাহার খান, 'কবি আহসান হাবীব' *রোববার*, (১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৩), পৃ. ৩২-৩৩।

৭. উদ্ধৃত : সালেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

৮. *তদেব*, পৃ. ১৮।

৯. তুষার দাশ, *আহসান হাবীব, (জীবনী গ্রন্থমালা*, ১৮ খণ্ড) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১২।

১০. সালেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

১১. করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

১২. দাশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

১৩. সাযযাদ কাদির, 'একজন কবির প্রতিকৃতি আহসান হাবীব', *বিচিত্রা*, (৪ নভেম্বর, ১৯৭৭), পৃ. ২৩।

১৪. সালেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

১৫. কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

১৬. মীজানুর রহমান, 'সাঁকো পুরাণ', খান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

১৭. কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

১৮. দাশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

১৯. আবু সাঈদ চৌধুরী, 'আহসান হাবীব স্মরণে', খান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

২০. রোকনুজ্জামান খান, 'আমার প্রিয় হাবীব ভাই', খান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০।

২১. মধুসুদন দত্ত, 'প্রথম সর্গ' *মেঘনাদ বধ কাব্য*, মিলন দত্ত সম্পাদিত, (কলিকাতা : সাহিত্যম, প্রকাশকাল নেই), পৃ. ২।

২২. *তদেব।*

২৩. 'প্রতীক্ষা', *দশমী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ*, (পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪), পৃ. ৩৩৪।

২৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা', *সাহিত্য পত্রিকা*, (কার্তিক, ১৩৯৮), ২৫।

২৫. ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবির বক্তব্য, *রোববার*, (২৪ মে, ১৯৮১), পৃ. ৩৮।

২৬. আহসান হাবীব, 'এই মন-এ-মৃত্তিকা', *রাত্রিশেষ*, (২য় সংস্করণ, ঢাকা : ইন্‌ল্যান্ড প্রেস, ১৩৬২), পৃ. ১১-১২।

২৭. আহসান হাবীব, 'পারঙ্গম একজন' *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, (ঢাকা : কথাসরিৎ, ১৯৮০), পৃ. ৫২-৫৩।

২৮. আহসান হাবীব, 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ', *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*, (চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৮৫), পৃ. ১৪।

২৯. উদ্ধৃত : সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, পৃ. ১৬৪।

৩০. আহসান হাবীব, 'মুখবন্ধ', *রাত্রিশেষ*।

৩১. 'দিনগুলি', *তদেব*, পৃ. ৯।

৩২. 'এই মন-এ-মৃত্তিকা', *তদেব*, পৃ. ১২।

৩৩. 'কাশ্মিরী মেয়েটি', *তদেব*, পৃ. ১৩।

৩৪. *তদেব*, পৃ. ১৪।

৩৫. 'আজকের কবিতা' *তদেব*, পৃ. ১৫।

৩৬. *তদেব*, পৃ. ১৭।

৩৭. 'দিনের সুর' *তদেব*, পৃ. ২৫।

৩৮. 'অপঘাত', *তদেব*, পৃ. ২৬।

৩৯. 'কোন বাদশাযাদীর প্রতি', *তদেব*, পৃ. ১৯।

৪০. 'কনফেশান', *তদেব*, পৃ. ২২।

৪১. 'এই অধ্যায়', *তদেব*, পৃ. ২৩।

৪২. 'দিনের সুর', *তদেব*, পৃ. ২৫।

৪৩. 'বিয়ে', *তদেব*, পৃ. ২৯।

৪৪. 'বাইশে শ্রাবণ', *তদেব*, পৃ. ৩১।

৪৫. 'অন্তপারের আকাশকে', *তদেব*, পৃ. ৩৪।

৪৬. 'সেতু-শতক', *তদেব*, পৃ. ৩৬।

৪৭. 'শরৎ', *তদেব*, পৃ. ৩৯।

৪৮. 'সৈনিক', *তদেব*, পৃ. ৪১।

৪৯. 'একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ', *তদেব*, পৃ. ৪৬।

৫০. 'ঝরা পলাশ', *তদেব*, পৃ. ৫১।

৫১. 'প্রদক্ষিণ', *তদেব*, পৃ. ৫৩।

৫২. 'হে আকাশ হে অরণ্য', *তদেব*, পৃ. ৫৫।

৫৩. 'হে বাঁশরী অসি হও', *তদেব*, পৃ. ৫৭।

৫৪. 'আগুন', *তদেব*, পৃ. ৫৮।

৫৫. 'স্বাক্ষর', *তদেব*, পৃ. ৬০।

৫৬. 'রেড্ রোডে রাত্রিশেষ', *তদেব*, পৃ. ৬৪।

৫৭. 'মৃত্যু', *তদেব*, পৃ. ৬১।

৫৮. আহসান হাবীব, 'সম্রাট', *ছায়া হরিণ*, (৩য় সংস্করণ, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃ. ৪৪।

৫৯. 'তোমাতে অমর আমি', *তদেব*, পৃ. ৩।

৬০. 'জল পড়ে পাতা নড়ে', *তদেব*, পৃ. ৪।

৬১. *তদেব*, পৃ. ৬।

৬২. 'সমুদ্র অনেক বড়', *তদেব*, পৃ. ৮।

৬৩. 'জীবন' *তদেব*, পৃ. ৯।

৬৪. 'ক্রান্তিকাল', *তদেব*, পৃ. ১৪।

৬৫. 'ইতিহাস-বিন্যাসের পথে', *তদেব*, পৃ. ২০।

৬৬. 'যৌবনে জীবনে তুমি', *তদেব*, পৃ. ৫৩।

৬৭. 'হক নাম ভরসা', *তদেব*, পৃ. ২৭।

৬৮. 'পুনর্বাসন', *তদেব*, পৃ. ৩৩।

৬৯. *তদেব*।

৭০. 'সে নেই', *তদেব*, পৃ. ৩০।

৭১. 'পুনর্বাসন', *তদেব*, পৃ. ৩৩।

৭২. 'শুক্লপক্ষের গান', *তদেব*, পৃ. ৬০।

৭৩. 'ঈর্ষার আলোকে আমি' *তদেব*, পৃ. ৩৪।

৭৪. *তদেব*, পৃ. ৩৪-৩৫।

৭৫. 'প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা', *তদেব*, পৃ. ৩৭।

৭৬. 'মুহূর্ত', *তদেব*, পৃ. ৪৬।

৭৭. 'যৌবনে জীবনে তুমি', *তদেব*, পৃ. ৫৫।

৭৮. 'ছহি জঙ্গেনামা', *তদেব*, পৃ. ৫০।

৭৯. 'যৌবনে জীবনে তুমি', *তদেব*, পৃ. ৫৪।

৮০. 'অন্যদিন', *তদেব*, পৃ. ৫৮।

৮১. 'একটি মহৎ কবিতার খসড়া', *তদেব*, পৃ. ৬২।

৮২. 'ফুটবে ফুল', *তদেব*, পৃ. ৬৩-৬৪।

৮৩. আহসান হাবীব, 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ', *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*, পৃ. ১৪।

৮৪. ঐ, 'নতুন কবিতা', *সারা দুপুর*, (ঢাকা : কথাবিতান, ১৯৬৪) পৃ. ১০।

৮৫. 'পুতুল', *তদেব*, পৃ. ১।

৮৬. 'স্বরূপে মহিমা তার' *তদেব*, পৃ. ১৬।

৮৭. 'স্বজন', *তদেব*, পৃ. ১৯-২০।

৮৮. 'তারা দু'জন', *তদেব*, পৃ. ১৪।

৮৯. *তদেব*, পৃ. ১৫।

৯০. 'এসো সঙ্গী হই', *তদেব*, পৃ. ৫-৬।

৯১. দ্রষ্টব্য : 'মেঘ ও রৌদ্র' *গল্পগুচ্ছ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ঊনবিংশ খন্ড, (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৮), পৃ. ২১০-২৮।

৯২. 'রোদে-মেঘে', *সারা দুপুর*, পৃ. ৭-৮।

৯৩. 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান', *তদেব*, পৃ. ১১।

৯৪. *তদেব*, পৃ. ১২।

৯৫. *তদেব*।

৯৬. 'মন বলে', *তদেব*, পৃ. ৩৪।

৯৭. 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা', *তদেব*, পৃ. ৩-৪।

৯৮. *তদেব*, পৃ. ৩।

৯৯. 'তোমাকে মৃত জেনে', *তদেব*, পৃ. ৩৫-৩৬।

১০০. *তদেব*, পৃ. ৩৬-৩৭।

১০১. 'ডাবল কলাম', *তদেব*, পৃ. ৫২।

১০২. 'সে আসে', *তদেব*, পৃ. ৪৭-৪৮।

১০৩. 'রেখে যাবো', *তদেব*, পৃ. ২৯।

১০৪. *তদেব*, পৃ. ৩০।

১০৫. *তদেব*, পৃ. ৩০-৩১।

১০৬. 'হে বৈশাখ, *তদেব*, পৃ. ৩২।

১০৭. 'মন বলে', *তদেব*, পৃ. ৩৩।

১০৮. 'VI' *The Princess*, *The Poetical works of Tennyson*, (London : Oxford University Press, 1954), pp. 189-95; first line of this poem is 'Home they brought her warrior dead:'

১০৯. 'কান্না নেই', *সারা দুপুর*, পৃ. ৩৮-৩৯।

১১০. 'আশা রাখি কেননা', *তদেব*, পৃ. ৪০-৪১।

১১১. 'জাল', *তদেব*, পৃ. ৫৩-৫৪।

১১২. *তদেব*, পৃ. ৫৪।

১১৩. *আজাদ*, (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪), পৃ. ৩, ৭, ৫।

১১৪. *তদেব*, (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪), পৃ. ১; (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪), পৃ. ১, ৮।

১১৫. দ্রষ্টব্য : সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ৭২-৭৩।

১১৬. *আজাদ*, (৩ জানুয়ারী, ১৯৬৫), পৃ. ১, ৮।

১১৭. আহসান হাবীব, 'নৈঃশব্দে নিহিত আমি', *আশায় বসতি*, (ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ১৯৭৪) পৃ. ১০।

১১৮. *তদেব*, পৃ. ৯।

১১৯. নৈঃশব্দে নিহিত আমি', *আশায় বসতি*, পৃ. ৯।

১২০. 'সেই নদী' *তদেব*, পৃ. ১১-১২।

১২১. *তদেব*, পৃ. ১২।

১২২. 'কাক-কোকিল', *তদেব*, পৃ. ১৩।

১২৩. 'মায়ের ডাকের ছড়া', *তদেব*, পৃ. ১৯-২০।

১২৪. 'স্বগত', *তদেব*, পৃ. ১৫।

১২৫. 'কাহিনী নিরন্তর', *তদেব*, পৃ. ১৭।

১২৬. 'বাস নেই', *তদেব*, পৃ. ২২।

১২৭. *তদেব*, পৃ. ২৩।

১২৮. *তদেব*।

১২৯. 'পাখি পিঞ্জর ইত্যাদি' *তদেব*, পৃ. ২৬।

১৩০. *তদেব*।

১৩১. 'আরশি', *তদেব*, পৃ. ২৪-২৫।

১৩২. 'আপন-স্বভাবে', *তদেব*, পৃ. ২৭।

১৩৩. *তদেব*।

১৩৪. *তদেব*।

১৩৫. 'বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা', *তদেব*, পৃ. ৩০।

১৩৬. 'নদীকে সামনে রেখে' *তদেব*, পৃ. ৩১।

১৩৭. 'একটা লোক', *তদেব*, পৃ. ৩৪।

১৩৮. 'ক্ষমাই প্রার্থনা', *তদেব*, পৃ. ৩৭-৩৮।

১৩৯. 'যতবার এবং এবার', *তদেব*, পৃ. ৫৫।

১৪০. *তদেব*, পৃ. ৫৬।

১৪১. আহসান হাবীব, 'আমি তা পারিনি', *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*, (ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৭৬), পৃ. ৩৬।

১৪২. 'যত দূরে যাই', *তদেব*, পৃ. ৭২।

১৪৩. 'আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে', *তদেব*, পৃ. ১২।

১৪৪. 'স্বাধীনতা', *তদেব*, পৃ. ৫৯।

১৪৫. 'কথা বলতে বলতে', *তদেব*, পৃ. ৬১।

১৪৬. 'এক দুই তিন' *তদেব*, পৃ. ১৪।

১৪৭. 'সমীপেষু', *তদেব*, পৃ. ১৫।

১৪৮. 'মানুষ পশু ইত্যাদি', *তদেব*, পৃ. ৫২।

১৪৯. 'সার্চ', *তদেব*, পৃ. ৫৪।

১৫০. 'আমার আমার', *তদেব*, পৃ. ৪৭-৪৮।

১৫১. *তদেব*, পৃ. ৫০।

১৫২. 'ঈদ', *তদেব*, পৃ. ৪২।

১৫৩. 'দোহাই তোমার', *তদেব*, পৃ. ৩৩।

১৫৪. 'আমার যাওয়া হয় না', *তদেব*, পৃ. ২৪।

১৫৫. 'বেলা-অবেলা', *তদেব*, পৃ. ৪৬।

১৫৬. 'ফিরতে হবে', *তদেব*, পৃ. ৩৭।

১৫৭. 'বেলুন', *তদেব*, পৃ. ৩৯-৪০।

১৫৮. 'হত্যাই উদ্দেশ্য যদি', *তদেব*, পৃ. ৬৭।

১৫৯. 'মনীষা মনীষা বলে', *তদেব*, পৃ. ২২।

১৬০. 'এই তীর্থে', *তদেব*, পৃ.৭১

১৬১. আহসান হাবীব, 'আমাকে কোথাও যেতে হবে', *তদেব*, পৃ.১২।

১৬২. দ্রষ্টব্যঃ ঐ, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (ঢাকঃ কথাসরিৎ, ১৯৮০)।

১৬৩. 'আমি আছি', *তদেব*, পৃ.১০।

১৬৪. আহসান হাবীবের 'সাক্ষাৎকার', *সচিত্র সন্ধানী*, (২১ জুন, ১৯৮১), পৃ. ৪০।

১৬৫. 'আমি আছি', *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, পৃ.১০-১১।

১৬৬. 'সময়-অসময়' *তদেব*, পৃ.১৫।

১৬৭. 'সারস' *তদেব*, পৃ.২৫।

১৬৮. 'সারা দিন আমি' *তদেব*, পৃ.৯।

১৬৯. 'আবহমান', *তদেব*, পৃ. ১৩।

১৭০. 'ট্রেন' *তদেব*, পৃ. ২৮।

১৭১. 'থাকো মধ্যম সারিতে', *তদেব*, পৃ. ৩০।

১৭২. 'ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে', *তদেব*, পৃ. ৩৭।

১৭৩. 'পারঙ্গম একজন', *তদেব*, পৃ. ৫৩।

১৭৪. 'রাত নয় দিন নয়', *তদেব*, পৃ. ৪১।

১৭৫. 'পালাতে পালাতে', *তদেব*, পৃ. ৪৪।

১৭৬. 'সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে', *তদেব*, পৃ. ৬৪।

১৭৭. 'গতায়াত প্রসঙ্গে', *তদেব*, পৃ. ৬৬।

১৭৮. 'যতবার ভোর হলো', *তদেব*, পৃ. ২০।

১৭৯. 'জেনে যেতে হবে', *তদেব*, পৃ. ২১।

১৮০. 'নববর্ষ', *তদেব*, পৃ. ৩৩।

১৮১. 'গিলগামেশ কাহিনী', *তদেব*, পৃ. ৩৯।

১৮২. 'একুশ', *তদেব*, পৃ. ৫৮।

১৮৩. 'এবং তখনই', *তদেব*, পৃ. ৬৫।

১৮৪. 'প্রেক্ষাপট', *তদেব*, পৃ. ৬৭-৬৮।

১৮৫. 'আমি কোন আগন্তুক নই', *তদেব*, পৃ. ৭৯-৮০।

১৮৬. উদ্ধৃতঃ আহমেদ হুমায়ূন, 'কাড়াকাড়ির ঊর্ধ্বের সেই মানুষটি',রোকনুজ্জামান খান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।

১৮৭. আহসান হাবীব, 'রূপকথা', *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*, পৃ. ১৮

১৮৮. 'আমরা কয়েকজন', *তদেব*, পৃ. ২০।

১৮৯. 'ভালোবাসা অনিষ্ট', *তদেব*, পৃ. ২৬।

১৯০. 'না বাউল, সংসারীও নয়', *তদেব*, পৃ. ৩৫-৩৬।

১৯১. 'নাইলের বৃক্ষটি', *তদেব*, পৃ. ২৭।

১৯২. 'চিত্রমালা', *তদেব*, পৃ. ৪১।

১৯৩. 'একদিন বিকেলে এসো', *তদেব*, পৃ. ৪৬।

১৯৪. 'কোলাজ', *তদেব*, পৃ. ৪৬।

১৯৫. 'তেমার আমার', *তদেব*, পৃ. ৩৭।

১৯৬. 'স্বজনদের কথা', *তদেব*, পৃ. ৪২-৪৩।

১৯৭. 'রূপান্তর', *তদেব*, পৃ. ২৪।

১৯৮. 'নাইলের বৃক্ষটি', *তদেব*, পৃ.২৮।

১৯৯. 'আর একটি আদিম', *তদেব*, পৃ. ৩১।

২০০. 'সেই অস্ত্র', *তদেব*, পৃ. ৩৯।

২০১. 'বসবাস নিবাস', *তদেব*, পৃ. ১৭।

২০২. 'যাবো না', *তদেব*, পৃ. ৪৭-৪৮।

২০৩. আহসান হাবীব, 'পরিক্রমণ এবং অবস্থান প্রসঙ্গ', *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*, পৃ. ১৩।

২০৪. দ্রষ্টব্যঃ আতাহার খান, 'কবি আহসান হাবীবঃ সাক্ষাৎকার', *রোববার*, (১৬ জানুয়ারি, ১৯৮৩), পৃ. ৩৫

রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা

বাঙলা সাহিত্যিকী